আহকামুন নিসা

নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ফাযায়েল, মাসায়েল, মাছনূন দুআ-দুরূদ
নসীহত ও নেক বিবিদের কাহিনী সম্বলিত ঘর ও
মজলিসে তালীমের উপযোগী কিতাব

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

আহকামুন নিসা

নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ফাযায়েল, মাসায়েল
মাছনূন দুআ-দুরূদ, নসীহত ও নেক বিবিদের কাহিনী
সম্বলিত ঘর ও মজলিসে তালীমের উপযোগী কিতাব

লেখক
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
মুহাদ্দিছ, জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২৩৬

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা নং- ৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

আহকামুন নিসা

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা নং-৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকাল
ছাব্বিশতম মুদ্রণ : জুলাই ২০১৬ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর ২০০৫ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN: 984-8291-43-1

মূল্য ঃ তিনশত চল্লিশ টাকা মাত্র

AHKAMUN NISA

Maulana Muhammad Hemayet Uddin

Price: Tk. 340.00 US$ 20.00

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
● হযরত মাও. মাহমুদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম)-এর অভিমত	২১
● প্রকাশকের কথা	২২
● ভূমিকা	২৩
প্রথম অধ্যায়	
নেক বিবিদের কাহিনী	
● কয়েকজন নবীর স্ত্রী	
হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি হাওয়া	২৫
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরা	২৭
হযরত আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি রহমত	২৯
হযরত মূসা (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি সাফূরা	৩০
● নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ	
হযরত খাদীজা (রাযিঃ)	৩২
হযরত সাওদা (রাযিঃ)	৩৩
হযরত আয়েশা (রাযিঃ)	৩৪
হযরত হাফসা (রাযিঃ)	৩৭
হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রাযিঃ)	৩৭
হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ (রাযিঃ)	৩৮
হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ)	৩৯
হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)	৪০
হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ)	৪১
হযরত মায়মূনা (রাযিঃ)	৪৩
হযরত সাফিয়্যাহ (রাযিঃ)	৪৪
● কয়েকজন নবীর মা	
হযরত মূসা (আঃ)-এর মা ইউখান্দ	৪৫
হযরত ঈসা (আঃ)-এর মা মারইয়াম	৪৬
নবী করীম (সাঃ)এর দুধমাতা হালিমা সা'দিয়া (রাযিঃ)	৪৮

• **কয়েকজন নবীর কন্যা**
হযরত লূত (আঃ)-এর কন্যাগণ ৪৮
হযরত শুআইব (আঃ)-এর কন্যা সাফীরা ৫০

• **নবী করীম (সাঃ)-এর কন্যাগণ**
হযরত যায়নাব (রাযিঃ) ৫০
হযরত রুকাইয়া (রাযিঃ) ৫১
হযরত উম্মে কুলসুম (রাযিঃ) ৫২
হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) ৫৩

• **কয়েকজন সাহাবীর স্ত্রী**
হযরত আবূ তালহা (রাযিঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালীম (রাযিঃ) ৫৫
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিঃ) ৫৭
হযরত উবাদাহ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী উম্মে হারাম (রাযিঃ) ৫৭

• **কয়েকজন সাহাবীর মা**
হযরত আবূ যার গিফারী (রাযিঃ)-এর মা ৫৯
হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ)-এর মা ৫৯
হযরত হুযাইফা (রাযিঃ)-এর মা ৬০
হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর মা ৬১

• **কয়েকজন মহিয়সী নারী**
নমরূদের কন্যা ৬২
বিবি আসিয়া ৬৩
রাণী বিলকীস ৬৪
হযরত মারইয়ামের-এর মা বিবি হান্নাহ ৬৬
হযরত রাবেয়া বসরিয়া (রহঃ) ৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহিলাদের খাস নসীহত

নসীহত-১ (মাতৃজাতির মর্যাদা) ৬৯
নসীহত-২ (নারীদের জান্নাত লাভের সহজ ব্যবস্থা) ৭২
নসীহত-৩ (নারীদের পর্দা প্রসঙ্গ) ৭৩

নসীহত-৪ (নারীদের সাজ-সজ্জা প্রসঙ্গ) ৮১
নসীহত-৫ (স্বামীর খেদমত প্রসঙ্গ) ৮৩
নসীহত-৬ (নারীদের বিশেষ দুটি দোষ প্রসঙ্গ) ৮৫
নসীহত-৭ (মৃত্যুর স্মরণ প্রসঙ্গ) ৮৭
নসীহত-৮ (কবরের আযাব প্রসঙ্গ) ৯০
নসীহত-৯ (জাহান্নামের আযাব প্রসঙ্গ) ৯৪
নসীহত-১০ (জান্নাত প্রসঙ্গ) ১০২

তৃতীয় অধ্যায়
বৎসরের বিশেষ কয়েকদিনের আমল

মুহাররম ও আশুরা ১০৭
১২ই রবিউল আউয়াল ১১১
রাসূল (সাঃ)-এর সীরাত প্রসঙ্গ ১১৭
শবে মে'রাজ ১১৯
শবে বরাত ১৩১
সালাতুত তাসবীহ ১৩৪
শবে ক্বদর ১৩৯
দুই ঈদের রাতে করণীয় ১৪৪
ফাতেহা ইয়াযদহম ১৪৪
৯ই জিলহজ্জ থেকে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীকের বিধান . ১৪৫
ঈদের দিনগুলোর আমল ১৪৫

চতুর্থ অধ্যায়
ইল্‌মে দ্বীন বিষয়ক

• ইল্‌মে দ্বীন সম্পর্কিত আলোচনা
ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার গুরুত্ব ১৪৭
ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার ফযীলত ১৪৮
ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা ১৫১
ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার সহীহ নিয়ত ১৫১
ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার তরীকা ১৫২

[illegible] —— [illegible]
[illegible] সম্পর্কে আকীদা —— ২১[illegible]
[illegible] সম্পর্কে আকীদা —— ২১[illegible]
[illegible] সম্পর্কে আকীদা —— ২১[illegible]
[illegible] সম্পর্কে আকীদা —— ২১[illegible]
[illegible] তালিকা —— ২১[illegible]

● ঈমানের শাখা

[illegible] সম্পন্ন হয় —— ২১৮
[illegible] —— ২২০
তাওবা-এস্তেগফারের নিয়ম-পদ্ধতি —— ২২১
তাওবার জন্য মোট ৫টি কাজ করতে হবে —— ২২১
হুক ফিল্লাহ ও বুগয ফিল্লাহ —— ২২২
রাসূলের প্রতি ভালবাসা প্রসঙ্গ —— ২২৩
এখলাস ও সহীহ নিয়ত —— ২৩০
তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় —— ২৩১
আল্লাহর রহমতের আশা —— ২৩২
হায়া বা লজ্জাশীলতা —— ২৩৩
শোকর প্রসঙ্গ —— ২৩৪
অঙ্গীকার রক্ষা করা প্রসঙ্গ —— ২৩৭
সবর প্রসঙ্গ —— ২৩৮
স্নেহ-মমতা ও সম্মানবোধ —— ২৩৯
সহমর্মিতা —— ২৪০
আল্লাহর ফয়সালায় রাজী থাকা —— ২৪০
তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা —— ২৪১
নিজেকে বড় মনে করা —— ২৪২
হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা —— ২৪২
রাগ বা গোস্বা প্রসঙ্গ —— ২৪৩
কুলগোমানী বা কু-ধারণা প্রসঙ্গ —— ২৪৮
ইজ্জত-সম্মানের মহব্বত —— ২৪৯
মালের মহব্বত —— ২৫১

যুহ্দ বা দুনিয়াত্যাগ ---- ২৫০
যেগুলো যবানের দ্বারা সম্পন্ন হয় ---- ২৫০

• কুরআন তেলাওয়াত

কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের ফায়দা ---- ২৫১
কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে করণীয় আমলসমূহ ---- ২৫১
তেলাওয়াতের সাজদা ---- ২৫৩
কুরআনের আদব ও আযমত সম্পর্কিত আরও কয়েকটি বিধান ---- ২৫৫

• যিকির ---- ২৫৬
যিকিরের সুন্নাত ও আদবসমূহ ---- ২৫৮
অনর্থক কথা ও অতিরিক্ত কথা প্রসঙ্গ ---- ২৫৯
যেগুলো বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন হয় ---- ২৬০
ঋণ সম্পর্কিত আদব ও মাসায়েল ---- ২৬০

• মানুষের হক

চাকর-নওকরদের হক বা তাদের সাথে যা করণীয় ---- ২৬২
মাতা-পিতার হক ---- ২৬২
সন্তানের হক ---- ২৭২
আত্মীয়-স্বজনের হক ---- ২৮০
ওয়াজ-নসীহতের মাসায়েল ---- ২৮১
প্রতিবেশীর হক ---- ২৮২
শুশ্রূষার বিধান ---- ২৮৭
গরীব দুঃখীর হক ---- ২৮৯
সাধারণ মুসলমানের হক ---- ২৯০
অমুসলমানের হক ---- ২৯০
হাঁচি সম্পর্কিত বিধি-বিধান ---- ২৯১
হাই সম্পর্কিত বিধি-বিধান ---- ২৯২
পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর হক ---- ২৯২

• গান-বাদ্য ও ছায়াছবি

গান-বাদ্য শ্রবণ ---- ২৯৩
সিনেমা, বাইস্কোপ ও অশ্লীল ছায়াছবি দর্শন ---- ২৯৪

● কুফ্র, শির্ক ও বিদআত-কুসংস্কার
কতিপয় কুফ্রী ও তার বিবরণ ———— ২৯৪
কতিপয় শির্ক ———— ২৯৬
কতিপয় বিদআত ———— ২৯৮
কতিপয় রসম বা কুসংস্কার ও কুপ্রথা ———— ৩০০

● কবীরা গোনাহ
কবীরা গোনাহ বা বড় গোনাহের তালিকা ———— ৩০২
যেনা বা ব্যভিচার ———— ৩০৮
আমানতদারী ———— ৩০৩
গীবত ———— ৩০৪
সুদ ———— ৩০৯
গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বলা ———— ৩১০
তাকাব্বুর বা অহংকার ———— ৩১০
স্ত্রীর হক ———— ৩১৯
স্বামীর হক ———— ৩২৮
চোগলখোরী (কোটনাগিরি) ———— ৩৩৬
অতিথি পরায়ণতা ———— ৩৩৮
অপব্যয় প্রসঙ্গ ———— ৩৪০
অমিতব্যয় ———— ৩৪০
বুখ্ল বা কৃপণতা ———— ৩৪১

● সগীরা গোনাহ্
সগীরা গোনাহের বিবরণ ও তার একটি তালিকা ———— ৩৪২

● কালিমা ———— ৩৪৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

আসবাব দ্রব্য পাক করার নিয়ম ৩৫৫
যমীন পাক করার নিয়ম ৩৫৬
খাদ্যদ্রব্য পাক করার নিয়ম ৩৫৬
পেশাব-পায়খানার মাসায়েল ৩৫৭

● উযূ, গোসল, মেসওয়াক ও তায়াম্মুম

উযূ করার তরীকা ৩৬০
উযূ শেষ হওয়ার পর করণীয় কয়েকটি আমল ৩৬৫
উযূ মাকরূহ হওয়ার কারণসমূহ ৩৬৬
যে সব কারণে উযূ ভাঙ্গে না ৩৬৬
উযূ ভাঙ্গার কারণসমূহ ৩৬৭
মা'যূর ব্যক্তির উযূর বয়ান ৩৬৮
মেসওয়াকের মাসায়েল ও দুআ ৩৬৯
গোসলে যা যা করতে হয় ৩৭০
গোসলের ফরযসমূহ ৩৭১
যে সব কারণে গোসল ফরয হয় ৩৭২
যে সব কারণে গোসল ফরয হয় না ৩৭৪
যে সব কারণে গোসল মোস্তাহাব ৩৭৪

● তায়াম্মুম

কোন্ অপবিত্রতায় তায়াম্মুম করা যায় ৩৭৪
কখন তায়াম্মুম করতে হবে ৩৭৪
তায়াম্মুম করার তরীকা ৩৭৬
কী কী বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয ৩৭৮
কোন্ কোন্ কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয় ৩৭৮

● মোজায় মাসেহ

মোজায় মাসেহের শর্তসমূহ ৩৭৮
কোন্ ধরনের মোজায় মাসেহ করা জায়েয ৩৭৯
মোজায় কত দিন মাসেহ করা জায়েয ৩৭৯
মোজায় মাসেহের তরীকা ৩৮০
যে সব কারণে মোজায় মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যায় ৩৮০

● হায়েয, নেফাস ও ইস্তেহাযা ইত্যাদি
হায়েযের পরিচয় ....
হায়েযের সময়সীমা ....
হায়েযের মাসায়েল ....
দুই হায়েযের মধ্যবর্তী স্রাব বা পবিত্রতার কিছু মাসায়েল ....
লিকুরিয়া বা সাদা স্রাবের মাসায়েল ....
হায়েযের অভ্যাস পরিবর্তন হওয়া সংক্রান্ত মাসায়েল ....
হায়েয চলাকালীন ও হায়েয শেষে নামায-রোযার মাসায়েল ....
হায়েয চলাকালীন ও হায়েয শেষে সহবাসের মাসায়েল ....
নেফাস কাকে বলে ....
নেফাসের সময়সীমা ....
নেফাসের মাসায়েল ....
হায়েয ও নেফাস উভয়টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মাসায়েল ....
ইস্তেহাযা কাকে বলে ....
ইস্তেহাযার হুকুম ও মাসায়েল ....
গর্ভপাত ও এম আর বিষয়ক মাসায়েল ....
প্রসবকালীন সময়ের কয়েকটি মাসআলা ....
প্রসূতি সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা ....
● আযান, নামায ও জামাআত
আযান ও ইকামতের জওয়াব প্রসঙ্গ ....
আযানের সময়কার বিশেষ কয়েকটি আমল ....
নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা ....
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামায পড়ার তরীকা ....
মহিলাদের জামাআত প্রসঙ্গ ....
মুক্তাদীর জন্য খাস মাসায়েল ....
● দুআ ও মুনাজাত ....
দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত ....
কুরআনে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি মুনাজাত ....
হাদীছে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি মুনাজাত ....
নামাযে মনোযোগ সৃষ্টি করার উপায় ....

● ফরয ও ওয়াজিব নামায এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়

ওয়াক্তিয়া নামায ৪১১
ফজরের নামায ৪১১
যোহরের নামায ৪১২
আসরের নামায ৪১৩
মাগরিবের নামায ৪১৩
ইশার নামায ৪১৪
বিত্‌র নামায ৪১৪
কছরের নামায ৪১৫
নামাযের ফরযসমূহ ৪১৬
নামাযের ওয়াজিবসমূহ ৪১৭
নামায ভঙ্গের কারণসমূহ ৪১৯
নামাযের মাকরূহসমূহ ৪২০
যে সব অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া যায় ৪২২
সাজদায়ে সাহুর মাসায়েল ৪২৩
নামাযের মধ্যে রাকআত নিয়ে সন্দেহ হলে তার মাসায়েল ৪২৫
কাযা নামাযের মাসায়েল ৪২৭
উমরী কাযার মাসায়েল ৪২৮
মাযূর বা অসুস্থ ব্যক্তির নামায ৪২৮
নামাযের ফেদিয়ার মাসায়েল ৪৩০

● সুন্নাত ও নফল নামায

তারাবীহ্‌র নামায ও তার মাসায়েল ৪৩১
নফল নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা ৪৩২
তাহাজ্জুদের নামায ৪৩৩
তাহিয়্যাতুল উযূ নামায ৪৩৫
ইশ্‌রাক এর নামায ৪৩৬
চাশ্‌ত এর নামায ৪৩৬
যাওয়াল বা সূর্য ঢলার নামায ৪৩৭
আওয়াবীন নামায ৪৩৭

সালাতুত তাসবীহ ৪৩৮
এস্তেখারার নামায ৪৩৮
তাওবার নামায ৪৩৯
সালাতুল হাজাত নামায ৪৩৯
শোকরের নামায ৪৪২
সালাতুল খুছূফ (চন্দ্র গ্রহণের নামায) ৪৪২

● রমযান ও রোযা

রমযান মাসের ফযীলত ও করণীয় বিষয় প্রসঙ্গ ৪৪৩
মিসওয়াকের মাসআলা ৪৪৮
ব্রাশ-পেস্টের মাসআলা ৪৪৮
বমি করার মাসআলা ৪৪৯
থুতুর মাসআলা ৪৪৯
তারাবীহের মাসআলা ৪৪৯
রমযানের রোযা ৪৫০
রোযার নিয়তের মাসায়েল ৪৫০
সেহ্রীর মাসায়েল ৪৫১
ইফ্তার-এর মাসায়েল ৪৫১
যে সব কারণে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না ৪৫২
যে সব কারণে রোযা ভাঙ্গে না তবে মাকরূহ হয়ে যায় ৪৫৩
যে সব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয় .... ৪৫[illegible]
যে সব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা, কাফ্ফারা উভয়টা ওয়াজিব হয় ৪৫[illegible]
যে সব কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে .... [illegible]
যে সব কারণে রোযা শুরু করার পর তা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে [illegible]
রোযার কাফ্ফারার মাসায়েল .... [illegible]
রোযার কাফ্ফারার মাসায়েল .... [illegible]
রোযার ফেদিয়ার মাসায়েল .... [illegible]
নফল রোযার মাসায়েল .... [illegible]
আইয়্যামে বীযের রোযা .... [illegible]
শাওয়ালের ছয় রোযা .... [illegible]

৯ই জিলহজ্জের রোযা ৪৬১
মান্নতের রোযার মাসায়েল ৪৬১

● এ'তেকাফ

এ'তেকাফের ফযীলত ও ফায়দা ৪৬২
সুন্নাত এ'তেকাফ (রমযানের শেষ দশকের এ'তেকাফ)-এর মাসায়েল . ৪৬৪
ওয়াজিব এ'তেকাফ (মান্নতের এ'তেকাফ)-এর মাসায়েল ৪৬৫

● যাকাত ও ফিতরা

যাকাতের গুরুত্ব ও ফায়দা ৪৬৬
যাকাতের মাসায়েল ৪৭১
সদকায়ে ফিত্‌র/ফিতরা-এর মাসায়েল ৪৭৬

● কুরবানী, আকীকা, মান্নত ও কছম

কুরবানীর তাৎপর্য ও ফযীলত ৪৭৭
কুরবানীর মাসায়েল ৪৮৫
গোশ্‌ত বন্টনের তরীকা ৪৮৭
কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়া ও দান করার মাসায়েল ৪৮৭
আকীকার মাসায়েল ৪৮৮
মান্নতের মাসায়েল ৪৮৯
কছমের মাসায়েল ৪৯০
কছমের কাফফারা ৪৯২

● হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত ৪৯২

কোন্ প্রকার হজ্জ করা উত্তম ৪৯৮
তামাত্তু হজ্জের নিয়মাবলী ৪৯৮
নফল উমরা ও নফল তাওয়াফের মাসায়েল ৫১৭
যে সব কারণে দম বা সদকা দিতে হয় ৫১৮
মদীনা মুনাওয়ারা-র যিয়ারত ৫১৮

● পর্দার বিধান ৫২২

নারীর মাহরাম ৫২৩
গোঁপ, দাড়ির মাসায়েল ৫২৪

চুল ও শরীরের অন্যান্য পশমের মাসায়েল ৫২৪
তেল, প্রসাধনী ও সাজগোছের বিধি-বিধান ৫২৬
আয়না-চিরুনির বিধি-বিধান ৫২৭
সুরমা, আতর ও সেন্ট ব্যবহারের বিধি-বিধান ৫২৭
অলংকারের বিধি-বিধান ৫২৮
নখ সম্পর্কিত মাসায়েল ৫২৮
মেহেদী ও খেযাব (কলপ) সম্পর্কিত বিধি-বিধান ৫২৮
পোশাক-পরিচ্ছদের মাসায়েল ৫২৯
জুতা/স্যান্ডেল সম্পর্কিত বিধি-বিধান ৫৩০

● ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-ব্যয়

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও ফায়দা ৫৩০
ব্যবসা-বাণিজ্য করতে টাকা খাটানোর মাসায়েল ৫৩১
গরু, ছাগল, হাস, মুরগি রাখালী দেয়ার মাসায়েল ৫৩২
বন্ধকের মাসায়েল ৫৩২
আমানতের মাসায়েল ৫৩৩
ওয়াকফ/সদকায়ে জারিয়ার মাসায়েল ৫৩৩
অসিয়ত ৫৩৪

● বিবাহ-শাদি

যাদের সাথে বিবাহ হারাম ৫৩৫
যাদের সাথে বিবাহ জায়েয ৫৩৬
পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের তরীকা ৫৩৭
বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার তরীকা ৫৩৮
পাত্রী দেখা প্রসঙ্গে ৫৩৮
মহর সম্পর্কিত মাসায়েল ৫৩৮
এযেন নেয়ার তরীকা ও মাসায়েল ৫৩৯
বিবাহের দিন, সময় ও স্থান প্রসঙ্গ ৫৪০
বিবাহে বরকত কীভাবে আসবে? ৫৪১
বিবাহ মজলিসের কয়েকটি রছম ও কুপ্রথা ৫৪২
বাসর রাতের কতিপয় বিধান ৫৪২

ওলীমা বিষয়ক সুন্নাত ও নিয়মসমূহ ৫৪৩
শোয়া এবং ঘুমের মাসায়েল ৫৪৩
স্বপ্ন বিষয়ক বিধি-নিষেধসমূহ ৫৪৫
জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত মাসায়েল ৫৪৬
সহবাসের সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধসমূহ ৫৪৭
গোসল ফরয থাকা অবস্থার বিশেষ বিধি-নিষেধসমূহ ৫৪৮
তালাক দেয়ার মাসায়েল ৫৪৮
ইদ্দতের মাসায়েল ৫৪৯
স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালনের মাসায়েল ৫৫১
পরিবারে সুখ-শান্তি ও মিলেমিশে থাকার নীতি ৫৫১
স্ত্রীর প্রতি স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রীর করণীয় ৫৫৬
স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে স্ত্রী কী করবে? ৫৫৭
স্বামীকে বশীভূত করার পদ্ধতি ও মাসায়েল ৫৫৮
শ্বশুর বাড়ীতে বসবাস ও সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার নীতি ৫৫৯
পুত্রবধূর প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ীর কর্তব্য ৫৬১
ঘর সাজানো-গোছানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাসায়েল ৫৬২

● সন্তান লালন-পালন

শিশুর শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত পরিচর্যা ৫৬৩
শিশুর মানসিক পরিচর্যা ৫৬৬
শিশুদের আদর-সোহাগ প্রসঙ্গ ৫৬৮
সন্তানের নাম রাখা ৫৬৯
সন্তানকে কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা ইত্যাদি প্রদানের মাসায়েল ৫৬৯
সন্তান ও শিশুদের শিক্ষা বিষয়ক নীতি ও মাসায়েল ৫৭১
সন্তানের দাবি-দাওয়া ও জিদ পূরণ করার বিষয়ে কতিপয় নীতি ও মাসায়েল ৫৭২
শিশুদের শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল ৫৭২
সন্তানকে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর তরীকা ৫৭৩
যাদের সন্তান সুপথে আসে না তাদের সান্ত্বনা ৫৭৬
যাদের সন্তান মারা যায় তাদের সান্ত্বনা ৫৭৭
যাদের কোন সন্তান হয় না বা পুত্র হয়না তাদের সান্ত্বনা ৫৭৭
সতীনের সন্তানের জন্য যা করণীয় ৫৭৮

• রান্না-বান্না
রান্না-বান্না ও পানাহারের মাসায়েল ... ৫৭৮
যে সব পশু-পাখী খাওয়া জায়েয ও হালাল ... ৫৭৯
যেসব পশু-পাখী খাওয়া জায়েয নয় ... ৫৭৯
হালাল পশুপাখীর যা যা খাওয়া নাজায়েয ... ৫৭৯
মাছ ও পানির অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কিত মাসায়েল ... ৫৮০
যবাই করার মাসায়েল ... ৫৮০

• পানাহার
পান করার মাসায়েল ... ৫৮২
খাওয়ার মাসায়েল ... ৫৮২
মজলিসে খানার সুন্নাত ও আদবসমূহ ... ৫৮৪
অমুসলিমদের সাথে পানাহার এবং তাদের তৈরী করা খাদ্য-খাবারের মাসায়েল ৫৮৪
মেহমানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ ... ৫৮৫
মেজবানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ ... ৫৮৬

• চলাফেরা ও সফর
ঘরে প্রবেশের মাসায়েল ... ৫৮৬
ঘর থেকে বের হওয়ার মাসায়েল ... ৫৮৭
রাস্তা-ঘাটে চলার মাসায়েল ... ৫৮৮
যানবাহনে চলার মাসায়েল ... ৫৮৮
সফরে যাওয়ার মাসায়েল ... ৫৮৮

• বিপদ-আপদ ও চিকিৎসা
বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবত কেন আসে এবং তখন কী করণীয়? ... ৫৮৯
চিকিৎসার মাসায়েল ... ৫৯০
রোগ অবস্থায় রোগীর যা যা করণীয় ... ৫৯০
মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যারা উপস্থিত থাকে তাদের যা যা করণীয় ... ৫৯১
মৃত্যুর পর করণীয় ... ৫৯২

• কাফন-দাফন
কাফনের কাপড়ের মাসায়েল ... ৫৯৩
মাইয়েতকে গোসল প্রদানের নিয়ম ... ৫৯৪

কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (মহিলার) ৫৯৬
কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (পুরুষের) ৫৯৬
মাইয়েতের পরিবারের সাথে অন্যদের যা যা করণীয় ৫৯৭
ঈছালে ছওয়াব ও তার তরীকা ৫৯৮

সপ্তম অধ্যায়
(মাছনুন দুআ-দুরূদ)

দুআ-দুরূদের গুরুত্ব ও ফায়দা ৬০১
• সকাল সন্ধ্যার দুআ ও আমল ৬০৪
সূর্যোদয়ের সময় দুআ ৬০৬
চাঁদ দেখার দুআ ৬০৬
ফরয নামাযের পরের দুআ ও আমলসমূহ ৬০৬
হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর একটি ঘটনা ৬০৭
• জুমুআর দিনের দুআ ও আমল ৬০৯
• পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত দুআ
নতুন কাপড় পরিধান করার দুআ ৬০৯
কাপড় খোলার দুআ ৬১০
জুতা/স্যান্ডেল পরিধান করা ও খোলার দুআ ৬১০
আয়না-চিরুনির দুআ ৬১০
• ঘুম ও স্বপ্ন বিষয়ক দুআ
শোয়ার সময়ের দুআ ৬১০
ঘুম না আসলে পড়ার দুআ ৬১১
ঘুম থেকে উঠে পড়ার দুআ ৬১১
সহবাসের দুআ ৬১১
• সন্তানাদি সম্পর্কিত দুআ
বদ নজর থেকে হেফাজতের দুআ ৬১১
সন্তান লাভের দুআ ও আমল ৬১২
• পানাহার বিষয়ক দুআ
পানি পান করার দুআ ৬১২

যমযমের পানি পান করার দুআ ৬১২
দুধ, চা, কফি, মাঠা পান করার দুআ ৬১৩
খানার দুআ ৬১৩
দস্তরখানা উঠানোর দুআ ৬১৪
দাওয়াত খাওয়ার দুআ ৬১৪

● ঘর সংক্রান্ত দুআ

ঘরে প্রবেশের দুআ ৬১৫
ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ ৬১৫
সফর সংক্রান্ত দুআ ৬১৫
যানবাহন বিষয়ক দুআ ৬১৬
বিপদ-আপদ সংক্রান্ত দুআ ৬১৭
সুখ-দুঃখ বিষয়ক দুআ ৬১৮
অসুস্থতা সংক্রান্ত দুআ ৬১৯
মৃত্যু সংক্রান্ত দুআ ৬২০
ইস্তেনজা সংক্রান্ত দুআ ৬২১

● দুরূদ শরীফ প্রসঙ্গ

দুরূদ শরীফের ফযীলত ৬২১
দুরূদ পাঠের হুকুম ৬২২

সূচী সমাপ্ত

মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ-এর আমীর
হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)-এর

অভিমত

মানুষের ইহকাল ও পরকালের প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা এবং সফলতা অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি সঠিক ঈমান স্থাপন করা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আমল করা। আর সঠিক ঈমান ও আমলের জন্য প্রয়োজন কুরআন-হাদীছের ইলম তথা জ্ঞান অর্জন করা। নর ও নারী উভয়ের জন্যই তাই কুরআন-হাদীছের জ্ঞান তথা নিজের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ঈমান-আকীদা ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করাকে ফরয করে দেয়া হয়েছে।

নারী সমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্বীনী জ্ঞানের অভাব খুব বেশী হারে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আর দ্বীনী জ্ঞানের অভাবের ফলে তাদের মধ্যে অনেক রকম ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও গলত আমলের প্রচলন খুব ব্যাপক আকারে দেখা যায়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারী সমাজের জন্য ঘরে ঘরে তা'লীমের ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। আলহামদু লিল্লাহ সম্প্রতি অনেক স্থানে শুধু ঘরে নয় নারীদের তা'লীমের জন্য মজলিসেরও এন্তেজাম হতে দেখা যাচ্ছে এবং পর্দার এহতেমামের সাথে এরূপ এন্তেজাম হওয়াও চাই। তবে এসব মজলিসে তা'লীমের জন্য একদিকে সহীহ জ্ঞানেওয়ালী নেককার পরহেযগার মহিলার পরিচালনা থাকা জরুরী, অন্যদিকে তা'লীমের জন্য নির্বাচিত কিতাব-পত্রও সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই।

আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন সাহেব "আহকামুন্ নিসা" নামে নারী সমাজের জন্য ঘরে ও মজলিসে তা'লীমের উপযোগী করে এমন একখানা কিতাব রচনার কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, যার মধ্যে নারীদের জন্য আকায়েদ, ফাযায়েল, মাসায়েল, মাছনূন দুআ-দুরূদ ও খাস খাস বিষয়ের নসীহত ইত্যাদি নেহায়েত প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মেহনতকে কবূল করুন এবং নারী সমাজের জন্য এ কিতাবখানিকে হেদায়েতের ওছীলা বানান। আমীন।

মাহমূদুল হাসান
আমীর- মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ
মুহতামিম- জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া

তাং ২০-৯-২০০৫ ইং

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নারী সমাজের জন্য স্বতন্ত্র দ্বীনী কিতাব রচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকা এবং রচিত হয়েছেও। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, বাজারে নারীদের জন্য এ কিছু বইও চালু রয়েছে, যা-তে শরীয়তের অনেক বিষয়কে অহেতুক জটিল করে গে করা হয়েছে, কিছু কিছু মনগড়া মাসআলাও লিখে দেয়া হয়েছে, আর আজগ কিস্সা-কাহিনীর বর্ণনাতো রয়েছেই। আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের দেশের সচে উলামায়ে কেরামের সতর্কীকরণের ফলে এগুলির প্রসার বাধগ্রস্ত হয়ে চলেছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সতর্ক দ্বীনদার মুসলমান বিশেষ করে শিক্ষিত দ্বীনদ মহিলাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃপক্ষকে নারী জীবে সামগ্রিক বিষয়ে দ্বীনী দিক-নির্দেশনা সম্বলিত একখানা নির্ভরযোগ্য কিতাব সংকলে অনুরোধ জানানো হয়। "আহকামুন্ নিসা" কিতাবখানি মূলতঃ সেই অনুরোধ রক্ষা নারী সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় ফাযায়েল, মাসায়েল, মাছনূন দু'আ দুরূদ ও নসীহ সম্বলিত ঘরে ও মজলিসে তা'লীমের উপযোগী একখানা পূর্ণাঙ্গ কিতাব উপহার দে প্রয়াস গ্রহণেরই ফসল।

বাংলাদেশের বিখ্যাত আলেম ও লেখক জনাব হযরত মাওলানা মুহাম হেমায়েত উদ্দীন ছাহেব "আহকামুন নিসা" কিতাবখানা সংকলন করে দিয়ে জাতি এক অপূরণীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। সেই সাথে মজলিসে দাওয়াতুল হ বাংলাদেশ-এর আমীর মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহে (রহ.)-এর খলীফা, দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মাহমু হাসান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম এ গ্রন্থখানার পাণ্ডুলিপি দেখে ও প্রয়োজন সংশোধনের দিক-নির্দেশনা দান করে এর গুণগত মানকে আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছে আল্লাহ পাক তাঁকে ও লেখককে জাযায়ে খায়র দান করুন।

আমরা কিতাবখানাকে সব রকমের ত্রুটিমুক্ত ও সুন্দর করার সম্ভাব্য সব চে করেছি। এরপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। অতএব কারও দৃষ্টিতে বে অসংগতি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল। ভবিষ্যতে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক এ কিতাবখানাকে কবুল করুন এ এর দ্বারা মা-বোনদেরকে পূর্ণাঙ্গরূপে দ্বীন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ও আমল কর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফীক দান করুন। সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বদ নসীব করুন। আমীন!

নিবেদক

তারিখ : ১৬ই শা'বান, ১৪২৬ হিজরী
২১শে সেপ্টেম্বর ২০০৫ ঈসায়ী

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খ
স্বত্বাধিকারী : মাকতাবাতুল আশ

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ. وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

ইসলাম মানব জীবনের একটি মুকাম্মাল হেদায়াত তথা পূর্ণ দিক-নির্দেশনা। মানব জীবনের সর্ব বিষয়ে ইসলামের দিক-নির্দেশনা ও নীতিমালা রয়েছে। কেউ সেগুলো জেনে সে অনুযায়ী তার পূর্ণ জীবন ঢেলে সাজাতে পারলেই সে পূর্ণ মুসলমান হতে পারবে। যে পূর্ণ মানে সে-ই পূর্ণ মুসলমান।

পূর্ণ মানার জন্য পূর্ণ জানা জরুরী। অর্থাৎ, জীবনের সর্ব বিষয়ে ইল্‌ম হাছেল করা জরুরী। এরূপ জ্ঞান অর্জন করার জন্য যিন্দেগীর যাবতীয় বিষয়ের দিক নির্দেশনা সম্বলিত একখানা কিতাব সামনে থাকলে তা থেকে ভরপুর সহযোগিতা গ্রহণ করা যায়।

নারীদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কিতাব রচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নারী সমাজের জন্য সর্ব বিষয়ের দিক-নির্দেশনা সম্বলিত এবং একই সাথে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন এবং ঘরে ও তা'লীমের মজলিসে তা'লীমের উপযোগী একখানি ব্যাপক কিতাবের প্রয়োজনীয়তাবোধ থেকেই "আহ্কামুন্ নিসা" কিতাবখানি রচনার প্রয়াস।

একখানি কিতাবেই জীবনের সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা ও যাবতীয় হুকুম-আহকাম বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে বয়ান করা সম্ভব নয় তা সকলেরই বোধগম্য। তাই এ কিতাবখানায় নেহায়েত নিত্য প্রয়োজনীয় ও আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে আমলের ফাযায়েলও বয়ান করে দেয়া হয়েছে, যাতে আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। নারীদের তা'লীমের মজলিসের উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের হাদীছ ও আয়াত উল্লেখপূর্বক ওয়াজমূলক কিছু কথা ও বুযুর্গদের কাহিনী সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে। কিতাবখানির শুরুতে বেশ কয়েকজন বুযুর্গ নারীর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ইতিহাস দ্বীনী জীবন গড়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। কিতাবখানির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি সহজ সাবলীল রাখা হয়েছে, যাতে সর্বস্তরের নারী সমাজ সহজে বুঝতে সক্ষম হন। তা'লীমের মজলিসের উপযোগী করার জন্য অনেক স্থানে ওয়াজমূলক বর্ণনাভঙ্গি রাখা হয়েছে।

কিতাবখানি রচনা ও সংকলনের পর মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ -এর আমীর হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম) এর পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় এসলাহের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এতদসত্ত্বেও যদি কোন মুহাক্কিক আলেমের দৃষ্টিতে কোন মাসআলায় বা কোন বিষয়ে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে আমাদেরকে তা অবহিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনী পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক এ কিতাবখানিকে আমাদের মুসলমান মা-বোনদের ইসলামী যিন্দেগী গঠন ও নাজাতের ওছীলা করুন এবং এই অধম লেখকের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবূল করুন। আমীন!

যে সমস্ত মা-বোন এ কিতাবখানি ঘরে বা মজলিসে তা'লীম করবেন, তারা তা'লীমের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে কিতাবখানির সব অধ্যায় থেকেই কিছু কিছু পাঠ করে শোনাবেন। তাহলে সব ধরনের কথা শ্রোতাদের সামনে আসবে এবং তাতে করে তা'লীমের প্রতি তাদের আকর্ষণও বৃদ্ধি পাবে। তা'লীমের সময় প্রয়োজনীয় স্থানে যথাসাধ্য কিছু ব্যাখ্যাও প্রদান করবেন, যাতে শ্রোতাদের বোঝার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা কেটে যায় এবং তাদের পূর্ণ ফায়দা হয়।

তারিখ
২৩/০৬/২০০৫ ইং

বিনীত
মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

নেক বিবিদের কাহিনী

নেককার পরহেযগার লোকদের জীবনী পাঠ করলে তাদের মত নেককার পরহেযগার হওয়ার আগ্রহ পয়দা হয়, তাদের মত আমল ও ইবাদত-বন্দেগী এবং সাধনা করার জযবা সৃষ্টি হয়। ওলী আউলিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীনের কাহিনী শুনলে গাফেল অন্তর জেগে উঠে। ওলী আউলিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীনের হালাত সামনে না থাকলে মানুষ হয়তোবা আমল ও সাধনায় অগ্রসর হতে পারে না কিংবা অল্প আমল ও কিঞ্চিৎ সাধনা করেই মনে করে যে, অনেক করছি। কিন্তু বুযুর্গানে দ্বীনের হালাত দেখলে তখন মানুষ বুঝতে পারে তাদের আমলে কত ত্রুটি ও স্বল্পতা রয়েছে। আমলের আগ্রহ ও জযবা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং দ্বীনের উপর চলার নমুনা বোঝার জন্য নিম্নে নেককার বুযুর্গ বিবিদের কিছু কাহিনী পেশ করা হল।

কয়েকজন নবীর স্ত্রী

হযরত আদম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি হাওয়া

হযরত হাওয়া (আ.) পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ.)-এর স্ত্রী। হযরত আদম (আ.) আদি পিতা আর হযরত হাওয়া (আ.) পৃথিবীর সকল মানুষের মা। আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ শক্তির দ্বারা হযরত হাওয়া (আ.)কে হযরত আদম (আ.)-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর হযরত আদম (আ.)-এর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। তাঁদের উভয়কে জান্নাতে থাকার স্থান দিয়েছেন। আর জান্নাতের বিশেষ একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। শয়তান তাঁদেরকে এই বলে ধোঁকা

দিয়েছে যে, তোমরা এই গাছের ফল আহার করলে জান্নাতে চিরস্থায়ী হয়ে পারবে। তাঁরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সেই গাছের ফল খেয়েছেন। তখন আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন : তোমরা জান্নাত ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে যাও। হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে এসে নিজের ভুলের জন্য খুব কেঁদেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ভুলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে হযরত হাওয়া (আ.) হযরত আদম (আ.) থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। (এক জয়ীফ বর্ণনামতে জান্নাত থেকে হযরত আদম [আ.]কে হিন্দুস্তানে এবং হযরত হাওয়া [আ.]কে জেদ্দায় নামানো হয়েছিল।) আল্লাহ তাআলা উভয়কে একত্রিত করে দিয়েছেন। অতঃপর তাঁদের থেকে অসংখ্য সন্তান সন্ততি হয়েছে।[১]

ফায়দা : লক্ষ করুন ! হযরত আদম (আ.)-এর ন্যায় হযরত হাওয়া (আ.)ও ভুল করেছেন, আবার তওবাও করেছেন। আমাদের অনেক মা-বোন আছেন যারা নিজেদের ভুল হয়ে গেলেও তা স্বীকার করতে চান না বরং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য নানা রকম কথা ও কারণ তৈরি করেন। কোনভাবেই যেন নিজেদের উপর দোষ না আসে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ফলে কখনও সেই পাপ থেকে তওবা করা হয়ে ওঠে না। কারণ পাপকে পাপ মনে করলেই তো তার জন্য তওবা আসবে। এমনও অনেক মহিলা আছেন, যারা জীবনভর পাপ করে যাচ্ছেন, অথচ তা বর্জনের নাম-গন্ধও নেই। বিশেষত গীবত করা ও রছম কুসংস্কার পালন করা মহিলাদের একটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। কোনভাবেই তারা রছম ও বেদআত-কুসংস্কার ছাড়তে চান না। এই অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে। পাপকে পাপ বলে স্বীকার করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিতে হবে।

হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-এর ঘটনা থেকে একথাও বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে জান্নাতের জন্য তৈরী করেছেন। এজন্যই মানব জাতির আদি পিতা মাতাকে জান্নাতেই রাখা হয়েছিল। আমাদের আসল বাড়ি হল জান্নাত। আমাদের আসল ঠিকানা হল জান্নাত। দুনিয়া আমাদের আসল বাড়ি নয়, দুনিয়া আমাদের আসল ঠিকানা নয়। তাই আসল বাড়ির জন্য, আসল ঠিকানার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

১. তথ্যসূত্র : معارف القرآن. البداية والنهاية. قصص القرآن ও بہشتی زیور

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরা

হযরত হাজেরা (আ.)-এর নাম আমরা অনেকেই শুনেছি। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাতা।

হযরত ইসমাঈল যখন দুগ্ধপায়ী শিশু, তখন আল্লাহ তা'আলার মর্জি হল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তানদের মাধ্যমে মক্কা আবাদ করবেন। অথচ তখন মক্কা নগরী ছিল এক জনশূন্য প্রান্তর। হযরত ইবরাহীম (আ.) তখন স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈল সহ বর্তমান ফিলিস্তিনের খলীল শহরে বাস করতেন। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে আদেশ করলেন, হযরত হাজেরাকে তাঁর দুধের শিশুসহ মক্কায় রেখে এসো। আমিই তাঁদেরকে রক্ষা করব। আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) সন্তান ও স্ত্রীকে সেই জনশূন্য প্রান্তরে রেখে এলেন। সম্বল হিসেবে রেখে এলেন এক মশক পানি আর এক থলে খেজুর। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন হযরত হাজেরা ও ইসমাঈলকে সেখানে রেখে শামদেশে চলে আসছিলেন, তখন হযরত হাজেরা (আ.) পিছে পিছে আসছিলেন আর বলছিলেন, আপনি এখানে আমাদেরকে একাকী রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) কোন জবাব দিচ্ছিলেন না। অবশেষে হযরত হাজেরা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কি আপনার প্রভুর নির্দেশে আমাদেরকে রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন : হ্যাঁ! তখন হযরত হাজেরা (আ.) বলে উঠলেন : তাহলে আমাদের আর কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ নিজেই আমাদের অবস্থা দেখবেন।

তারপর হযরত হাজেরা (আ.) আল্লাহর উপর ভরসা করে সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। ক্ষুধা পেলে খেজুর খেয়ে পানি পান করে নিতেন আর হযরত ইসমাঈল (আ.)কে দুধ পান করাতেন। ধীরে ধীরে যখন মশকের পানি ফুরিয়ে গেল, তখন মা পুত্র উভয়ের পিপাসা বাড়তে লাগল। শিশু ইসমাঈল পিপাসায় ছটফট করতে লাগল। মা হাজেরা সন্তানের এই দশা বরদাশত করতে পারলেন না। কোন মা-ই সন্তানের এই করুণ দশা সহ্য করতে পারে না। সন্তানের এই করুণ দশা দেখে মা হাজেরা পানির সন্ধানে নেমে পড়লেন। দৌড়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী 'সাফা' পাহাড়ে আরোহণ করলেন। চারদিকে দৃষ্টি মেলে দেখলেন কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। সেখানে পানির সন্ধান না পেয়ে পার্শ্ববর্তী 'মারওয়া' পাহাড়ে আরোহণ করলেন। দুই পাহাড়ের মাঝখানের সমতল ভূমির মাঝে কিছুটা স্থান নিচু

আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমতল ভূমিতে চলছিলেন, ততক্ষণ বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছিলেন এবং তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছিলেন। যখন ঐ নিচু স্থানে আসলেন, তখন আর বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছিল না। তাই দৌড়ে ঐ নিচু স্থান পার হয়েছিলেন। মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে আবার চারদিকে দৃষ্টি মেলে দেখলেন কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সেখানেও পানির কোন সন্ধান পেলেন না। আবার ছুটে গেলেন সাফা পাহাড়ে। এভাবে সাতবার পানির সন্ধানে উভয় পাহাড়ে চক্কর দিলেন এবং দুই পাহাড়ের মাঝখানের সেই নিচু স্থানটি প্রতিবারই দৌড়ে অতিক্রম করলেন। হযরত হাজেরা (আ.)-এর এই আমল আল্লাহ তাআলার কাছে খুব পছন্দ হল। সেমতে তিনি এই সাফা-মারওয়ার ছোটাছুটিকে হাজীদের নিয়মিত আমলের তালিকাভুক্ত করে দিলেন। এখনও সকল হাজীকে সাফা মারওয়ার মাঝে সায়ী করার সময় মাঝখানের সেই নিচু স্থানটুকু দৌড়ে অগ্রসর হতে হয়।

'মা' হাজেরা ছুটতে ছুটতে অবশেষে যখন মারওয়া পাহাড়ে এসে দাঁড়ান, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পান। আওয়াজ শুনে তিনি থমকে দাঁড়ান। আবার সেই আওয়াজ শুনতে পান। কিন্তু কাউকে দেখতে পান না। হযরত হাজেরা আওয়াজ দিয়ে বললেন : আমি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি ! কেউ সাহায্য করার থাকলে সাহায্য করুন। ঠিক তখনই যমযম কূপের স্থানটিতে একজন ফেরেশতাকে দেখা গেল। ফেরেশতা সেখানে তার ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। আর সেখান থেকে পানি উথলে উঠতে লাগল। হযরত হাজেরা (আ.) চারদিকে মাটির বাঁধ তৈরি করে পানি আটকাতে লাগলেন। পানি দিয়ে মশক ভরে নিলেন। শিশু ইসমাঈলকে পানি পান করালেন। নিজেও পান করলেন।

ফেরেশতা বললেন : ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এখানে আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই ছেলে এবং তার পিতা মিলে এই ঘর নির্মাণ করবে। এখানেও জনবসতি গড়ে উঠবে। তারপর দেখা গেল অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে জনবসতি গড়ে উঠল। একসময় হযরত ইসমাঈল (আ.) বড় হলেন এবং বিবাহ করলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) আগমন করেন। পিতা-পুত্র মিলে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। তখন যমযমের পানি মাটির নিচে চলে গিয়েছিল। কিছুদিন পর কূপের আকারে যমযম আত্মপ্রকাশ করে।[১]

১. তথ্যসূত্র : قصص القرآن، ثُنِّی زبر ও বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ।

ফায়দা : এখানে একটা লক্ষ করার বিষয় হল, হযরত হাজেরা (আ.)-এর অন্তরে আল্লাহ তাআলার প্রতি কত গভীর ভরসা ছিল। তিনি যখন জানতে পারলেন, এই নির্জন মরুভূমিতে আল্লাহর নির্দেশেই তাঁকে রেখে যাওয়া হচ্ছে, তখন তিনি চিন্তামুক্ত হয়ে গেলেন এবং সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করে সেখানে থাকতে লাগলেন। আর আল্লাহর উপর ভরসার কারণে এতসব বরকত লাভ করলেন। সত্যিই যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তাআলাই তার সবকিছু দেখেন। আমরা অনেকে একটু পেরেশানী এলেই ঘাবড়ে যাই, আল্লাহর উপর ভরসা করার কথা ভুলে যাই। অথচ আল্লাহর উপর ভরসা করাই পেরেশানী দূর করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা। একমাত্র তিনিই পারেন সব পেরেশানী দূর করতে।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর স্ত্রী বিবি রহমত

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল রহমত। তিনি স্বামীর এমন সেবা করেছেন, যা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। একবার হযরত আইয়ূব (আ.) খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর সারা শরীর জখমে ছেয়ে যায়। তাঁর আপনজন সকলেই তাঁর কাছ থেকে সরে পড়ে। কাছে থাকেন কেবল তাঁর স্ত্রী রহমত। তিনি তাঁর খেদমতে থাকেন। সব রকম কষ্ট বরদাশত করেন। স্বামীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন।

একবার হযরত আইয়ূব (আ.) কোন কারণে বিবি রহমতের প্রতি রাগান্বিত হয়ে কসম করেন যে, আমি সুস্থ হলে তাঁকে একশত বেত্রাঘাত করব। তিনি যখন সুস্থ হন তখন তাঁর কসম পূরণ করার এরাদা করেন। এখন স্ত্রীকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে। বিষয়টি খুবই কঠিন, এমন সতীসাধ্বী ও স্বামীর খেদমত পরায়ণা স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে বিষয়টি সহজ করে দিলেন। তিনি হযরত আইয়ূব (আ.)কে বলে দিলেন, একশত শলাকা বিশিষ্ট একটি ঝাড়ু নিয়ে একবার আঘাত কর। তাহলে এটাকেই একশত আঘাত হিসেবে গণ্য করা হবে। এবং এভাবে কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি তা-ই করলেন। বিবি রহমত সহজে একশত বেত্রাঘাত খাওয়া থেকে মুক্তি পেলেন।[১]

ফায়দা : চিন্তা করে দেখার বিষয় হল বিবি রহমত কত সতীসাধ্বী নারী ছিলেন যে, এমন কঠিন দুর্দিনেও স্বামীকে ছেড়ে চলে যাননি। স্বামী হযরত

---

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور، قصص القرآن ও বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ।

আইয়ূব (আ.) কসম করেছেন তাকে শাস্তি দিবেন। এতে বোঝা যায় হযরত আইয়ূব (আ.)-এর মেজায তখন কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু স্ত্রী সবই নীরবে সহ্য করেছেন এবং স্বামীর খেদমতে নিয়োজিত থেকেছেন। এরই বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ করে বেত্রাঘাত থেকে বাঁচিয়েছেন বোঝা গেল স্বামীর খেদমত করলে আল্লাহ তাআলা এরকম খুশী হন যে, তার জন্য সব রকম আছানীর ব্যবস্থা করে দেন। স্বামীকে অখুশী রাখলে আল্লাহ তাআলাও অখুশী হন। হাদীছে এসেছে এরূপ নারীর প্রতি লানত হতে থাকে।

হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রী বিবি সাফূরা

হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল সাফূরা। সাফূরা ছিলেন হযরত শুআইব (আ.)-এর বড় কন্যা। তিনি কীভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রী হলেন, তার একটি প্রেক্ষাপট ছিল। হযরত মূসা (আ.) মিসরে বসবাস করতেন। মিসরে তখন ফেরআউনের রাজত্ব ছিল। একদিন ফেরআউনী গোত্রের এক লোক হযরত মূসা (আ.)-এর গোত্রের এক ব্যক্তির ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করল। মূসা (আ.)-এর গোত্রের লোকটা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে সাহায্য চাইল। হযরত মূসা (আ.) তার সাহায্যে এগিয়ে আসলেন এবং ফেরআউনী গোত্রের লোকটাকে শাসন-মূলক একটা থাপ্পড় দিলেন। ঘটনাক্রমে সেই থাপ্পড়ে লোকটা মারা গেল। এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফেরআউন হযরত মূসা (আ.)কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তখন হযরত মূসা (আ.) আত্মগোপন করে পালিয়ে মিসর থেকে বর্তমান সৌদী আরবের মাদইয়ান এলাকায় চলে গেলেন।

হযরত মূসা (আ.) যখন মাদইয়ানের উপকণ্ঠে পৌছেন, তখন দেখেন অনেকগুলো রাখাল কূপ থেকে পানি তুলে নিজ নিজ ছাগল-বকরিগুলোকে পান করাচ্ছে। তিনি দেখলেন সেখানে দুইজন মেয়ে পানি পান করানোর জন্য তাদের ছাগলগুলো কূপের দিকে নিয়ে এসেছে এবং তারা সকলের পেছনে অপেক্ষা করছে। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মেয়ে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজেরা কেন ছাগল চরাতে এসেছ এবং দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তারা জানাল, আমাদের বাড়িতে কাজ করার মতো কোন পুরুষ মানুষ নেই। তাই ছাগল চরাতে আমাদেরকেই আসতে হয়। কিন্তু আমরা মেয়ে মানুষ, তাই দূরে অপেক্ষা করছি। পুরুষরা চলে যাওয়ার পর আমরা আমাদের ছাগলকে পানি পান করাব। তাদের কথা শুনে হযরত মূসা (আ.)-

এর খুব মায়া হল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ঠেলে নিজ হাতে পানি তুলে তাদের ছাগলগুলোকে পান করিয়ে দিলেন। মেয়ে দুটি বাড়িতে গিয়ে তাদের শ্রদ্ধেয় পিতা, বিশিষ্ট নবী হযরত শুআইব (আ.)-এর কাছে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করল।

ঘটনা শুনে হযরত শুআইব (আ.) বড় মেয়েকে এই বলে পাঠালেন যে, যাও আবার সেখানে গিয়ে লোকটিকে ডেকে নিয়ে এসো। মেয়েটি এসে সলজ্জকণ্ঠে হযরত মূসা (আ.)কে জানাল যে, আমার পিতা হযরত শুআইব (আ.) আপনাকে যাওয়ার জন্য বলেছেন। হযরত মূসা (আ.) সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলেন এবং হযরত শুআইব (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। হযরত শুআইব (আ.) মূসা (আ.)-এর ঘটনা শুনে তাঁকে সর্বপ্রকার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : আমার ইচ্ছা আমার একটি মেয়ে তোমার কাছে বিবাহ দিব। তবে শর্ত হল ৮ বৎসর অথবা ১০ বৎসর আমার ছাগল চরাতে হবে। হযরত মূসা (আ.) শর্তে রাজি হয়ে গেলেন। একসময় বড় মেয়ের সাথে বিবাহ হয়ে গেল। এই মেয়েরই নাম ছিল সাফূরা। বিবাহের পরও হযরত মূসা (আ.) কিছুদিন সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন।

এরপর একদিন হযরত মূসা (আ.) পুনরায় মিসরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। পথে প্রচণ্ড শীত পড়ল। তূর পাহাড়ের কাছে এলে শীতের প্রচণ্ডতার কারণে আগুনের প্রয়োজন হল। আগুনের সন্ধানে তিনি এদিক সেদিক দৃষ্টি ফেরাতে থাকলেন। তূর পাহাড়ে আগুন দেখা গেল। তিনি আগুন আনতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন সেতো আগুন নয়, আল্লাহর নূর এবং সেখানেই আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বললেন এবং তাঁকে নবুওয়াত দান করলেন।[১]

ফায়দা : লক্ষ করার বিষয় হল হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রী হযরত সাফূরা ছিলেন নবীর মেয়ে। নবীর মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তিনি কত কষ্ট করে ঘরের কাজ করতেন। পুরুষ মানুষ না থাকায় অপারগ হয়ে বকরী পর্যন্ত চরাতেন। এসব কাজ করতে কোন লজ্জাবোধ করতেন না। কোন অহংকার করতেন না। অপারগ হয়ে যখন পরপুরুষের কাছে নিজের সমস্যার কথা বলেছেন তখনও অত্যন্ত লজ্জা ও বিনয়ের সাথে বলেছেন। সুতরাং ঘরের কাজের ক্ষেত্রে লজ্জা করা বা অলসতা করা ঠিক নয়। নিজের কাজ নিজেরই করা ভাল।

---

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور، البدایہ والنہایہ، قصص القرآن ও বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ

হযরত খাদীজা (রাযি.)

হযরত খাদীজা (রাযি.) বিনতে খুওয়াইলিদ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম স্ত্রী, রাসূলের জীবনের প্রথম জীবনসঙ্গিনী, মহান মর্যাদাবান মহীয়সী নারী। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহের পূর্বে তাঁর আরও দুটি বিবাহ হয়েছিল। প্রথম বিবাহ হয়েছিল আবূ হালা-র সাথে। দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছিল আতীক ইবনে আয়েয মাখযূমী-এর সাথে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৫ বৎসর বয়সে হযরত খাদীজা (রাযি.)কে বিবাহ করেন। তখন হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর বয়স হয়েছিল ৪০ বৎসর। হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর জীবদ্দশায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোন বিবাহ করেননি। একমাত্র ইবরাহীম ব্যতীত হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর গর্ভেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এ গর্ভে চার কন্যা এবং দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত খাদীজা (রাযি.) মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপদ-আপদে তিনি শরীক ছিলেন। হযরত খাদীজা (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত আনুগত্যকারিণী এবং বিপদ-আপদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্ত্বনাদাত্রী ছিলেন। কাফেরদের আচরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দুঃখ-কষ্ট পেতেন তা তিনি ঘরে এসে স্ত্রী খাদীজার কাছে বর্ণনা করতেন। আর হযরত খাদীজা (রাযি.) সব শুনে নবীজীকে সান্ত্বনা দিতেন। স্ত্রী খাদীজার সান্ত্বনামূলক কথায় নবীজীর দুঃখ-কষ্ট অনেকটা লাঘব হত। নবীজীর জন্য তিনি তার ধন-সম্পদ সব বিসর্জন দিয়ে দিয়েছিলেন। নবীজীর প্রতি প্রত্যেকটা পদে পদে তিনি খেয়াল রাখতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খাদীজার প্রতি খুব লক্ষ্য রাখতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজার কথা কখনও ভুলতে পারতেন না। তাঁর ইন্তেকালের পরও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কোন বকরী যবাই হলে তা থেকে তিনি খাদীজার বান্ধবীদের কাছে গোশত হাদিয়া পাঠাতেন।

হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর অনেক ফযীলতের কথা হাদীছে বর্ণিত আছে। তিনি চারজন কামেল নারীর একজন। এক হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : সারা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা চারজন। ১. মারইয়াম। ২. আসিয়া। ৩. খাদীজা ও ৪. ফাতেমা। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে—এই চার জন মহিলা জান্নাতে নারীদের সরদার থাকবেন।

আল্লাহ্‌র কাছেও হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর অনেক মর্যাদা ছিল। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, খাদীজা! আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইলের মাধ্যমে তোমাকে সালাম বলেছেন।

হযরত খাদীজা (রাযি.) রাসূল র সাথে ২৫ বৎসর বৈবাহিক জীবন যাপন করার পর হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে ১০ম নববী সনের রমযান মাসে ৬৫ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[১]

ফায়দা : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজাকে খুব কদর করতেন তাঁর আনুগত্য ও ঈমানদারীর কারণে। নতুবা খাদীজা ছিলেন এক বৃদ্ধা নারী, নবীজীর চেয়ে অনেক বেশী বয়স্কা। হযরত খাদীজার ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, নারীদের উচিত স্বামীর বিপদে-পেরেশানীতে তাকে সান্ত্বনা দেয়া এবং স্বামীর আনুগত্যে নিজেদেরকে নিবেদিত করে দেয়া। এটা স্ত্রীর জন্য উত্তম স্বভাবের কথা। অনেক নারী স্বামীর পেরেশানীর দিকে খেয়াল না করে নিজের দাবী-দাওয়ার কথা বলে স্বামীকে আরও অস্থির করে তোলে। এটা উত্তম চরিত্রের কথা নয়।

হযরত সাওদা (রাযি.)

হযরত সাওদা (রাযি.)ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন জীবন সঙ্গিনী। তাঁর পিতার নাম যাম্‌আ ইব্‌নে কায়স ইব্‌নে আব্‌দে শাম্‌স। মায়ের নাম শামূছ বিন্‌তে কায়স ইব্‌নে আম্‌র ইব্‌নে যায়েদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহের পূর্বে হযরত সাওদা (রাযি.)-এর আর এক বিবাহ ছিল। তাঁর সেই স্বামী ছিল তাঁর চাচাতো ভাই, নাম সুকরান ইব্‌নে আম্‌র আমিরী। যারা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত সাওদা (রাযি.) তাদের একজন ছিলেন।

হযরত সাওদা (রাযি.) ছিলেন দূরদর্শী মহিলা। তিনি তাঁর দূরদর্শীতা দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানসিক কামনা বুঝতে সক্ষম হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের সাথে রাত্রি যাপনের জন্য

১. তথ্যসূত্র : امہات المؤمنین، سیرت مصطفیٰ، تاریخ الاسلام، بہشتی زیور প্রভৃতি গ্রন্থ।

স্ত্রীদের মধ্যে পালা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। সেমতে হযরত সাওদা (রাযি.)-এর জন্যও পালা ছিল। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুশী করার জন্য তাঁর পালার রাত্রিটি রাসূলের প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাযি.)কে দান করে দিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ভালবাসা এবং আনুগত্যে হযরত সাওদার অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। এ ছাড়াও হযরত সাওদা (রাযি.)-এর অনেক গুণ ছিল। যার কারণে হযরত আয়েশা (রাযি.) তাঁর সম্পর্কে বলতেন : পৃথিবীতে একমাত্র সাওদাকে দেখলেই আমার ঈর্ষা হত, আমি যদি তাঁর মত হতে পারতাম!

হযরত সাওদা (রাযি.) অত্যন্ত দানশীলা নারী ছিলেন। তাঁর কাছে দান করার মত কিছু থাকলে তিনি কখনই কোন ফকীর-মিসকীনকে খালি হাতে ফিরাতেন না।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে হযরত সাওদা (রাযি.) ৫৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[১]

ফায়দা : হযরত সাওদা (রাযি.)-এর আত্মত্যাগ কত বড় ছিল। কোন নারীর একাধিক সতীন থাকলে নিজের পালার সময়ে স্বামীকে কাছে পাওয়া তাঁর জীবনে কত বড় প্রত্যাশার বিষয়, তা নারী মাত্রই জানেন। আর তিনি তাঁর সেই প্রত্যাশার বিষয়টিই কুরবানী করে দিয়ে ছিলেন; তাও নিজের সতীনের জন্য। আজকালকার মেয়েরা অনর্থকই সতীনের সাথে লড়াই করে বেড়ায়। সতীনকে দেখলেই হিংসায় মরে যায়। অনেক নারীকে দেখা যায় সদা সর্বদা অনর্থক সতীনের দোষ খুঁজে বেড়ায়। অথচ হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর বিষয়টি দেখুন, তিনি সতীনের প্রশংসা করছেন। সতীনের গুণ গাইতে পারা অনেক বড় হৃদয়ের প্রশস্ততার কথা। মনের মধ্যে এরূপ প্রশস্ততা থাকলে পরিবারে অহেতুক অশান্তি সৃষ্টি হয় না।

হযরত আয়েশা (রাযি.)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় জীবন সঙ্গিনী। তাঁর পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান সাহাবী ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)। তাঁর মাতা উম্মে রূমান। কুমারী অবস্থায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একমাত্র হযরত আয়েশারই বিবাহ হয়।

১. তথ্যসূত্র : امہات المومنین، سیرت مصطفیٰ، بہشتی زیور، নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি গ্রন্থ।

হযরত আয়েশা (রাযি.) ছিলেন মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাদীছ বিশারদ ও ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারীণী। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সোহবতে থেকে দ্বীনী ইল্ম ও হাদীছের অনেক বিরাট জ্ঞান অর্জন করেন তিনি। বড় বড় সাহাবী ও তাবেয়ীগণ পর্যন্ত তাঁর কাছে হাদীছ ও মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন। আর তিনি শরীয়তের পর্দা পূর্ণভাবে রক্ষা করে আড়ালে থেকে খুব ক্ষীণ আওয়াজে সকলের জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন। জ্ঞান অর্জনের প্রতি হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর এত আগ্রহ ছিল যে, জানার জন্য তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেই থাকতেন।

হযরত আয়েশা (রাযি.) অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে যুবায়ের (রাযি.) দুই বস্তা ভরে প্রায় এক লাখ আশি হাজার দেরহাম হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কাছে পাঠান। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সব দেরহাম দান করে দেন। এভাবে বিভিন্ন সময় প্রচুর অর্থ হাতে আসা সত্ত্বেও তিনি তা সব দান করে দিতেন আর নিজের জামায় তালি লাগিয়ে পরিধান করতেন। অর্থের প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিল না। নিজের সাজ-সজ্জার প্রতিও কোন খাহেশ ছিল না।

হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর অনেক মর্যাদার কথা হাদীছে বর্ণিত আছে। একবার এক সাহাবী হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন আয়েশাকে। সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : পুরুষদের মধ্যে কে সবচেয়ে আপনার প্রিয় ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাঁর পিতা। অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)। এছাড়াও হযরত আয়েশা (রাযি.) সম্পর্কে আরও অনেক মর্যাদার কথা বর্ণিত আছে। হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর বুকে মাথা রাখা অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৫৮ হিজরীর রমযান মাসে সোমবার রাতে হযরত আয়েশা (রাযি.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর অসিয়ত মোতাবেক রাতের বেলায় তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

---

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور، سیرت مصطفی، امہات المؤمنین নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি গ্রন্থ।

ফায়দা : হযরত আয়েশা (রাযি.) ছিলেন একজন নারী। অথচ বড় বড় আলেম পুরুষগণ পর্যন্ত তাঁর কাছে হাদীছ ও মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতে আসতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকেই হযরত আয়েশা (রাযি.) এই জ্ঞান শিক্ষা করেছিলেন। অথচ আজকাল দেখা যায় স্বামীরা আলেম হলে তাঁদের কাছ থেকে স্ত্রীরা মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করে শিখতে লজ্জাবোধ করে। এছাড়া কিতাব পড়ে ইল্‌ম শিখার আগ্রহও মেয়েদের মধ্যে খুব কম পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ইল্‌ম শেখার দ্বারাই হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর এত মর্যাদা হয়েছিল। তাই ইল্‌ম শিখতে ত্রুটি না করা চাই।

হযরত হাফসা (রাযি.)

হযরত হাফসা (রাযি.) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন প্রিয় জীবনসঙ্গিনী। তাঁর পিতা ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাযি.)। তাঁর মাতা যয়নব বিন্‌তে মাজউন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ হওয়ার পূর্বে হযরত হাফসা (রাযি.)-এর আর এক ঘরে বিবাহ হয়েছিল। তাঁর পূর্ব স্বামীর নাম ছিল সাহাবী হযরত খুনাইস ইব্‌নে হুযাফা আস-সাহ্‌মী। বদরের যুদ্ধে হযরত খুনাইস (রাযি.) আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করার পর ৩য় হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত হাফসা (রাযি.)-এর বিবাহ হয়।

হযরত হাফসা (রাযি.)-এর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তিনি খুব নফল রোযা রাখতেন এবং খুব নামাযে মগ্ন থাকতেন। বিশেষ করে তিনি খুব তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে একবার একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসা (রাযি.)কে এক তালাক দিয়ে দেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কথায় পুনরায় তাঁকে গ্রহণ করেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জানান যে, হাফসাকে পুনরায় গ্রহণ করুন। কারণ, সে খুব রোযা রাখে এবং রাতের বেলায় খুব নামায পড়ে। জান্নাতেও সে আপনার সঙ্গিনী থাকবে। এ কথার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

হযরত হাফসা (রাযি.) অল্পতে তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্যের গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে দান-খয়রাতের গুণও ছিল লক্ষণীয়। তিনি মৃত্যুর পূর্বে

স্বীয় ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ওমর (রাযি.)কে এই মর্মে অসিয়ত করে যান যে, আমার এতটুকু সম্পদ দান করে দিও ! ওয়াক্‌ফ করার জন্য মৃত্যুর পূর্বে তিনি জমিরও ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন ।

ফায়দা : এখানে দ্বীনদারীর বরকত লক্ষণীয়! হযরত হাফসা (রাযি.)-এর দ্বীনদারীর কারণেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য নবীর কাছে বাণী আসে । এ ঘটনায় ফেরেশতার মাধ্যমে বাণী আসায় হযরত হাফসা (রাযি.)-এর সম্মান বৃদ্ধি পায় । এটাও দ্বীনদারীর বরকত । হযরত হাফসা (রাযি.)-এর দান-সদকা এবং বদান্যতাও লক্ষণীয় । মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর পথে দান খয়রাতের তিনি ব্যবস্থ করে গিয়েছেন ।[১]

হযরত যায়নাব বিন্‌তে খুযায়মা (রাযি.)

হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন স্ত্রী । তাঁর পিতা ছিলেন খুযায়মা ইব্‌নে হারিছ । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহের পূর্বে তাঁর অন্য ঘরে বিবাহ হয়েছিল । এক বর্ণনা মতে তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে জাহ্‌শ (রাযি.) । ৩য় হিজরীতে উহুদের যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে জাহ্‌শ (রাযি.) শাহাদাত বরণ করার পর সে বৎসরই রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বিবাহ হয় । বিবাহের প্রায় সাত মাস পর ৪র্থ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে ৩০ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন । হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রাযি.) দান-খয়রাত খুব বেশী করতেন । দান-খয়রাতে প্রসিদ্ধ থাকার কারণে তাঁকে ইসলাম পূর্বযুগ থেকেই "উম্মুল মাসাকীন" বা "গরীবের মা" বলা হত ।[২]

ফায়দা : দান-খয়রাত নারীদের বিশেষ একটি গুণ । রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে দান-খয়রাতের জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন : হে নারী সমাজ! তোমরা বেশী বেশী দান-খয়রাত কর । কেননা আমি দেখেছি জাহান্নামের সিংহভাগই নারী । নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান-খয়রাতের কথা বলে বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই দান-খয়রাত দ্বারা তোমরা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে । এক হাদীছে আছে—দান-খয়রাত জাহান্নামের আগুনকে নিভিয়ে দেয় ।

---

১. তথ্যসূত্র : امہات المؤمنین، سیرت مصطفیٰ ، بہشتی زیور নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি গ্রন্থ ।

২. তথ্যসূত্র : امہات المؤمنین، سیرت مصطفیٰ নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি গ্রন্থ ।

হযরত যায়নাব বিন্‌তে জাহ্‌শ (রাযি.)

হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাযি.) প্রিয় নবীজীর জীবনসঙ্গিনী। তাঁর পিতা জাহ্‌শ ইবনে রবাব। মা হচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা, নাম উমায়মা। অর্থাৎ, হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাযি.) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন ফুফাতো বোন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপুত্র সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাযি.)-এর সাথে যায়নাব বিনতে জহ্‌শের প্রথম বিবাহ হয়েছিল। ইসলামের প্রথম দিকে পালকপুত্র বানানো বৈধ ছিল। পরে এই হুকুম রহিত হয়ে যায়। হযরত যায়েদ (রাযি.)-এর সাথে যায়নাবের সম্পর্কে অবনতি দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদ (রাযি.) তাঁকে তালাক দিয়ে দেন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ভাবনায় পড়েন। কেননা যায়নাবের ভাই এবং বোন প্রথমে এই বিবাহে রাজী ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় ভাই-বোন রাজী হয়েছিল। তিনি চিন্তা করলেন তাদের মনে সান্ত্বনা দেবার কী উপায় হতে পারে ! অবশেষে মনে করলেন, আমি যদি যায়নাবকে বিবাহ করি তাহলে হয়তো তাঁদের মনে আর কষ্ট থাকবে না।

সাথে সাথে এই চিন্তাও করলেন যে, যায়নাবকে বিবাহ করতে গেলেই কাফেররা এই নিয়ে অনেক কথা বলবে যে, দেখ ! মুহাম্মদ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছে। যদিও শরীয়তে পালকপুত্র আপন পুত্রের মত নয়। তাই পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা যায়। কিন্তু মানুষের মুখ কে ঠেকাবে! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেবেচিন্তে যায়নাবের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। পয়গাম শুনে হযরত যায়নাব (রাযি.) বললেন : আমি আমার বিবেক থেকে কিছুই বলব না। আল্লাহ যা খুশি তাই করবেন এবং তার ব্যবস্থাও তিনিই করবেন। একথা বলে হযরত যায়নাব (রাযি.) উযূ করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযের পর দু'আ করলেন। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী পাঠালেন যে, 'আমি যায়নাবের সাথে তোমার বিবাহ করে দিয়েছি।' আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাবের কাছে গিয়ে আয়াত শুনিয়ে দিলেন।

এই নিয়ে হযরত যায়নাব (রাযি.) সকলের সাথে গর্ব করে বলতেন : দেখ, তোমাদের সকলের বিবাহ দিয়েছেন তোমাদের পিতা-মাতা। আর আমার বিবাহ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ।

হযরত যায়নাব (রাযি.) খুব দানশীলা ছিলেন। ভালো হাতের কাজ জানতেন। চামড়া দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মালামাল প্রস্তুত করে বিক্রি করতেন। তার আয় থেকে ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে দান-খয়রাত করতেন।

একবার সকল স্ত্রী মিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করলেন : আপনার ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম আপনার সাথে গিয়ে মিলিত হবেন কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যার হাত বেশি লম্বা সে। আরবীতে দানশীলকে দীর্ঘহস্ত বা লম্বা হাতওয়ালা বলা হয়। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝাতে চাইলেন যে বেশী দানশীলা সেই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। তারপর বাস্তবেও দেখা গেল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সকলের পূর্বে হযরত যায়নাব বিন্তে জাহাশ (রাযি.) ইন্তিকাল করলেন।[১]

ফায়দা : দান-খয়রাত নারীদের একটি উত্তম গুণ। নিজের সম্পদ থাকলে অকাতরে দান-খয়রাত করা চাই। হযরত যায়নাব বিন্তে জাহ্শ (রাযি.)- এর বিষয়টি দেখুন তিনি নিজের হাতে পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করতেন আর সেখান থেকে দান-খয়রাত করতেন। আজকাল অনেক নারী নিজের হাতে উপার্জন করেন কিন্তু সেই উপার্জন থেকে দান-খয়রাত নয় বরং বিলাসিতার সামগ্রী ক্রয় করার পশ্চাতে সেই অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। কীভাবে আখেরাতের বিলাসিতা অর্জন করা যাবে সেই ফিকির হওয়া চাই।

হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)

হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)ও আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সঙ্গিনী। তাঁর পিতার নাম ছিল আবু উমাইয়া সুহায়ল ইব্নে মুগীরা। তাঁর মাতা ছিলেন আতিকা বিন্তে আমের ইব্নে রাবীআ। হযরত উম্মে সালমা (রাযি.)-এর মূল নাম ছিল হিন্দ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহের পূর্বে তাঁর অন্য এক ঘরে বিবাহ হয়েছিল। তাঁর প্রথম স্বামী ছিল তাঁর চাচাতো ভাই হযরত আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইব্নে আব্দুল আসাদ (রাযি.)। তিনি স্বামীর সাথে কন্যা সালামাকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করার সময় কাফেররা পথিমধ্যে তাঁকে মেয়েসহ আটক করে রাখে। বাধ্য হয়ে এক পর্যায়ে স্বামী একাকী হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উম্মে সালামা

---

১. তথ্যসূত্র : زبیر, سیرت مصطفی بہشتی زیور, امہات المؤمنین নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি গ্রন্থ।

(রাযি.) অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন হন। শেষ পর্যন্ত কাফেররা তাঁর কান্নাকাটি দেখে তাকে ছেড়ে দেয় এবং তিনি মদীনায় আসতে সক্ষম হন। তাঁর স্বামী আবু সালামা (রাযি.) উহুদের যুদ্ধে আহত হন। জখম ভাল হওয়ার পর আর এক যুদ্ধে প্রেরিত হন। সেই যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে পুরাতন জখম ফেটে আবার তাজা হয়ে যায় এবং তাতেই তিনি ৪র্থ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে শাহাদাত বরণ করেন। অতপর ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)-কে বিবাহ করে সম্মানিত স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন।

হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) ছিলেন দানশীল পিতার কন্যা। তিনি নিজেও দানশীলা ছিলেন। জনৈকা মহিলা থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন : আমি একবার হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)-এর কাছেই উপবিষ্ট ছিলাম। কিছু অসহায় লোক তাঁর কাছে এল। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ছিল মহিলাও ছিল। তাঁরা এসে আসন নিয়ে বসে পড়ল। তাঁদের সংখ্যা অনেক। আমি বললাম, চলো এখান থেকে। উম্মে সালামা বললেন : আমি যেতে পারব না। আমার পক্ষ থেকে সকলকে একটি করে খেজুর হলেও দিয়ে দাও! খালি হাতে যাব কেন ?

তিনি ৬২ হিজরীতে (মতান্তরে ৬১/৫৯/৫৮ হিজরীতে) ৮৪ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[১]

ফায়দা : দ্বীনের জন্য কষ্ট স্বীকার ও সবর করায় আল্লাহ তাআলা হযরত উম্মে সালমা (রাযি.)কে নবীর স্ত্রী ও উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। দ্বীনের জন্য যারা কষ্ট স্বীকার করে, আল্লাহ তাআলা কোন না-কোনভাবে তাদেরকে উঁচু মর্যাদা দান করেন।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.)

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) আমাদের প্রিয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনসঙ্গিনী উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের একজন। তাঁর আসল নাম হচ্ছে রামলা। তাঁর পিতা হচ্ছেন হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.)। তাঁর মাতা হযরত উসমান গনী (রাযি.)-এর ফুফু সাফিয়্যা বিনতে আবুল আস।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) ছিলেন প্রথম সারির মুসলমান। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যাঁরা হাবশায় হিজরত করেছিলেন, হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) তাঁদেরই একজন। তখন তাঁর সঙ্গী

১. তথ্যসূত্র : امہات المؤمنین، سیرت مصطفیٰ، بہشتی زیور নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি গ্রন্থ।

ছিল তাঁর প্রথম স্বামী উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব বিন্‌তে জাহাশের ভাই উবায়দুল্লাহ। তিনিও মুসলমান ছিলেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে হাবশায় থাকা অবস্থায় সে ইসলাম ত্যাগ করে খৃস্টান হয়ে যায়। ফলে তাঁর সাথে হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

হাবশার তৎকালীন বাদশাহ—যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন—তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে হযরত উম্মে হাবীবাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তিনি প্রস্তাবে রাজী হন এবং বাদশাহ সেখানে হিজরতকারী মুহাজির সাহাবীদেরকে বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত রেখে বিবাহের এবং ওলীমার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সপ্তম হিজরীতে তিনি মদীনায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে পৌঁছেন।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) তাঁর ভাই হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর খেলাফত আমলে ৪৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[১]

ফায়দা : হযরত উম্মে হাবীবা (রাযি.) দ্বীনের প্রতি কত আন্তরিক ছিলেন। দ্বীনের জন্য নিজের ঘর-বাড়ি আপনজন ছেড়ে হাবশায় হিজরত করেছেন। আর তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে যে পুরস্কার দিয়েছেন তা-ও কল্পনাতীত। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনসঙ্গিনী হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। এবং স্বয়ং বাদশাহ সে বিবাহে মধ্যস্থতা করেছেন। এভাবে যারাই দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কোন না- কোনভাবে অবশ্যই পুরস্কৃত করেন।

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযি.)

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযি.) আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন জীবনসঙ্গিনী। তাঁর মূল নাম বাররা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন জুওয়াইরিয়া। তাঁর পিতা ছিলেন বনূ মুসতালেক গোত্রের সরদার হারেছ ইবনে আবী যেরার।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহের পূর্বে জুওয়াইরিয়া-র আর এক বিবাহ হয়েছিল। তাঁর সেই স্বামী ছিল তাঁর চাচাতো ভাই মুসাফিহ ইবনে সাফওয়ান, যে "যিশ্ শাফার" নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

---

১. তথ্যসূত্র : امہات المؤمنین، سیرت مصطفیٰ، تحفۂ زوجین নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি গ্রন্থ।

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযি.) বনু মুসতালিক নামক যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে এসেছিলেন। সাহাবী ছাবিত ইবন কায়সের ভাগে পড়েছিলেন তিনি। তিনি আবেদন করলেন, আমি আমার রক্তমূল্য দিচ্ছি, আমাকে আযাদ করে দিন। সাহাবী তা মঞ্জুর করে নেন। হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযি.) তাঁর আযাদীর কাজে সহযোগিতা করার আবেদন জানানোর জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুওয়াইরিয়া (রাযি.)-এর দ্বীনদারী ও চারিত্রিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে বললেন : আমি বরং তোমার আযাদীর জন্য যা অর্থ প্রয়োজন তার পুরোটাই দিয়ে দেই। জুওয়াইরিয়া (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ব্যবহার ও চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়ে যান। পরে তাঁর পিতা তাঁকে নিজ এলাকায় ফিরিয়ে নিতে আসলেও তিনি যেতে চাননি বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকতে চান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। জুওয়াইরিয়া (রাযি.) খুশী খুশী এই প্রস্তাবে রাজী হন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বিবাহ হয়ে যায়। তখন তাঁর বয়স ছিল ২০ বৎসর। সাহাবায়ে কেরাম এ বিবাহ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পর তাদের নিকট জুওয়াইরিয়ার গোত্রের যত লোক বন্দী ছিল তাঁদের সকলকেই আযাদ করে দিলেন। কারণ, তাঁরা এখন নবীজীর শ্বশুরালয়ের আত্মীয়। তাদের গোলাম বানিয়ে রাখা বেআদবী। হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন : জুওয়াইরিয়ার মত বরকতময় মহিলা আমি আর দেখিনি, তাঁর দ্বারা তাঁর গোত্রের লোকেরা যতটুকু উপকৃত হয়েছে পৃথিবীতে অন্য কোন নারীর দ্বারা তার গোত্রের লোকেরা ততটুকু উপকৃত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযি.) ৫০ হিজরীর রবীউল আউয়াল মসে ৬৫ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[১]

ফায়দা : লক্ষ্য করার বিষয় হল, দ্বীনদারী কত বড় নেয়ামত। এই দ্বীনদারীর বরকতেই জুওয়াইরিয়া (রাযি.) দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত হয়ে দোজাহানের বাদশাহ হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। দুনিয়ার নারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হওয়ার চেয়ে বড় গর্বের বিষয় আর কী হতে পারে! দ্বীনদারীর বদৌলতেই জুওয়াইরিয়া (রাযি.) এই

১. তথ্যসূত্র : امہات المؤمنین، سیرت مصطفیٰ، بہشتی زیور، নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি গ্রন্থ।

হযরত মায়মূনা (রাযি.) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন স্ত্রী। তাঁর পিতার নাম হারিছ। তাঁর মাতা হিন্দ বিনতে আউফ। হযরত মায়মূনা (রাযি.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর খালা। হযরত মায়মূনা (রাযি.)-এর নাম ছিল বাররা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন মায়মূনা।

নবীজীর সাথে বিবাহের পূর্বে তাঁর এক ঘরে বিবাহ হয়েছিল। তাঁর পূর্বের স্বামীর নাম ছিল আবু রুহ্‌ম ইবনে আব্দুল উয্‌যা। ২৭ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন। ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাসে এহরামের অবস্থায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে মহর ছিল পাঁচশত দেরহাম। অন্য এক বর্ণনামতে তাঁর বিবাহ হয়েছিল একটু ব্যতিক্রমধর্মী কায়দায়। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করেছিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার জীবন আপনার সমীপে তুলে দিচ্ছি। অর্থাৎ আমি কোন মহর ছাড়াই আপনার জীবনসঙ্গিনী হতে রাজী আছি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই এরূপ মহর ছাড়া বিবাহ বৈধ ছিল, অন্য কারও জন্যে এরূপ বিবাহ বৈধ নয়।

হযরত মায়মূনা (রাযি.) ৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষে হযরত মায়মূনা (রাযি.)কে বিবাহ করেন। তারপর আর কাউকে বিবাহ করেননি। আর হযরত মায়মূনাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে সর্বশেষে দুনিয়া ত্যাগ করেন। মক্কার পাশে 'সারিফ' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। এ স্থানেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করেছিলেন, এ স্থানেই তাঁর সাথে বাসর যাপন করেছিলেন।[১]

ফায়দা : তৎকালীন যুগে মহর আদায় করা হত নগদ। আমাদের এই যুগের মত অনির্দিষ্টকালের জন্য মহর বাকি রাখা হত না। কিন্তু হযরত মায়মূনা

১. তথ্যসূত্র : امہات المؤمنین، سیرت مصطفیٰ، بہشتی زیور، নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা, হাদীসের ثمرات প্রভৃতি গ্রন্থ।

(রাযি.)-এর দ্বীনদারী ছিল এত গভীর যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতে পারাকেই তিনি অনেক বড় পাওয়া মনে করেছিলেন। তাই মহর ছাড়াই নিজেকে নবীজীর খেদমতে অর্পণ করে দিতে অগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। নবীকে খুশী করতে পারা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এই যুগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর যে যত বেশী আমল করবে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি তত বেশী খুশী হবেন। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুশী রাখতে পারলে কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশ লাভ করা যাবে।

হযরত সাফিয়্যাহ (রাযি.)

হযরত সাফিয়্যাহ (রাযি.) আমাদের প্রিয় নবী সা.-এর একজন জীবনসঙ্গিনী। তাঁর আসল নাম ছিল যায়নাব। পরে সাফিয়্যাহ নামে প্রসিদ্ধ হন। হযরত সাফিয়্যাহ (রাযি.) ছিলেন হযরত হারুন (আ.)-এর বংশধর। তার পিতা ছিলেন বনূ নযীর গোত্রের সরদার, নাম ছিল হুইয়াই ইবনে আখ্তাব। তার মা ছিলেন কুরায়যা গোত্রের সরদার সামওয়ান-এর কন্যা, নাম ছিল বাররা।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহের পূর্বে তাঁর দুটি বিবাহ হয়। প্রথম বিবাহ হয় সালাম ইবনে মিশকাম কুরাজী-র সাথে এবং দ্বিতীয় বিবাহ হয় কেনানা ইবনে আবুল হুকায়ক-এর সাথে।

হযরত সাফিয়্যাহ (রাযি.) অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, ধৈর্যশীলা ও অসংখ্য উত্তম-গুণের অধিকারীণী ছিলেন। তাঁর ধৈর্য সম্পর্কে একটা ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। একবার তাঁর এক দাসী হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে চোগলখুরী করে বলল : হযরত সাফিয়্যাহর মধ্যে এখনও ইহুদীদের মত শনিবার প্রীতি রয়ে গেছে। এখানে মনে রাখতে হবে হযরত সাফিয়্যাহ (রাযি.) ইয়াহুদী বংশের মেয়ে ছিলেন এবং ইয়াহুদীরা শনিবারকে সম্মান করত। তাই ঐ দাসী বুঝাতে চাইল যে, সাফিয়্যাহ (রাযি.)-এর মধ্যে এখনও শনিবার প্রীতি রয়ে গেছে অর্থাৎ এখনও তিনি পূর্ণ মুসলমান হতে পারেননি। দাসী আর একটা কথা এই বলল যে, ইয়াহুদীদের সাথে তাঁর লেনদেন খুব হয়। হযরত ওমর (রাযি.) হযরত সাফিয়্যাহ (রাযি.)কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে হযরত সাফিয়্যাহ (রাযি.) উত্তরে বললেন : প্রথম কথাটি তো পরিষ্কার মিথ্যা। আমি যখন মুসলমান হয়েছি, তখন থেকেই শনিবারকে নয় বরং

মুসলমানদের ন্যায় জুমুআর দিনকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করি, শনিবারের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। আর দ্বিতীয় অভিযোগটি সত্য। কারণ, তারা আমার আত্মীয়-স্বজন। আর আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল ব্যবহার করা শরীয়ত বিরোধী নয়। অতএব আত্মীয়-স্বজনকে ভালবেসে আমি কোন অন্যায় করিনি।

তারপর হযরত সাফিয়্যাহ (রাযি.) ঐ দাসীকে ডেকে বললেন : তোমাকে মিথ্যা চোগলখুরী করার জন্য কে বলেছে? সে বলল, শয়তান। তখন হযরত সাফিয়্যাহ (রাযি.) বললেন : তোমাকে আযাদ করে দিলাম।

৫০ হিজরীর রমযান মাসে হযরত সাফিয়্যাহ (রাযি.) ইন্তেকাল করেন।[১]

ফায়দা : লক্ষ্য করার বিষয় হল, হযরত সাফিয়্যাহ (রাযি.)-এর কত ধৈর্য ছিল। অধীনস্থ দাসী এমন কাণ্ড করলে কয়জন ধৈর্যধারণ করতে পারে? মাতা-পিতা উভয় দিক থেকে সরদারের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোন দেমাগ ছিল না। বরং দাসীর অবাধ্যতাতেও তিনি কত ধৈর্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। হযরত সাফিয়্যাহ (রাযি.) থেকে আমাদের ধৈর্যের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সকলেরই অধীনস্থদের সাথে এই ধরনের ধৈর্য সহনশীলতার পরিচয় দেয়া উচিত।

কয়েকজন নবীর মা

হযরত মূসা (আ.)-এর মা ইউখান্দ

হযরত মূসা (আ.) ছিলেন মিসরের অধিবাসী। তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈল বংশের নবী। তাঁর জন্মের পূর্ব থেকেই মিসরে ফেরআউনের রাজত্ব ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে গণকরা ফেরআউনকে বলেছিল, বনী ইসরাঈল বংশে এমন এক সন্তান জন্ম লাভ করবে যে আপনার রাজত্ব ছিনিয়ে নিবে। তখন ফেরআউন তার লোকজনকে আদেশ দিল, বনী ইসরাঈলের মধ্যে কোন পুত্র সন্তান জন্ম নিলে তাকে হত্যা করে ফেলবে। তখন সেই আদেশ মোতাবেক বনী ইসরাঈলের অসংখ্য পুত্র সন্তান হত্যা করা হয়। এরই এক ফাঁকে হযরত মূসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের নাম ছিল ইউখান্দ। অন্য বর্ণনামতে ইয়ারুখা বা ইয়ায়ুখ্‌ত। জন্মের সময় হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের অন্তরে আল্লাহ তাআলা

১. তথ্যসূত্র : امہات المؤمنین، سیرت مصطفی، بہشتی زیور। নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি গ্রন্থ।

একথা ঢেলে দিলেন যে, চিন্তার কোনই কারণ নেই। তোমার শিশুকে তুমি নিশ্চিন্তে দুধপান করাতে থাকবে। আর যখন সন্দেহ হবে যে, কেউ জেনে গেছে, তখন শিশুটিকে একটি সিন্ধুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিবে। আমি তাকে আমার ইচ্ছামত হেফাযত করব এবং পুনরায় তোমার কাছে পৌঁছে দিব। হযরত মূসা (আ.)-এর মা আল্লাহ্‌র কথার উপর ভরসা করে সে মোতাবেক কাজ করে গেলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূর্ণ করলেন। শিশু মূসাকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হল। আল্লাহ তা'আলার কুদরত এমন যে, সেই ফেরআউনের ঘরেই হযরত মূসা (আ.) লালিত-পালিত হলেন। এবং যে ফেরআউন মূসা (আ.)কে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল, সেই মূসা (আ.)-ই ফেরআউনের করুণভাবে মৃত্যুর কারণ হল।[১]

ফায়দা : এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের আল্লাহ্‌র প্রতি কী ভরসা। আর সেই ভরসার বরকত কী হল। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে : যারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, আল্লাহ-ই তাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা সামান্য বিপদ-আপদে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা হারিয়ে বসি, ফলে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই সাহায্য করার। বিপদে একমাত্র তিনিই সকলের সহায়।

হযরত ঈসা (আ.)-এর মা মারইয়াম

হযরত মারইয়াম ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর মা। হযরত মারইয়ামের জন্মের পর তাঁর মা তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেলেন এবং সেখানকার বুযুর্গদের খেদমতে গিয়ে আরয করলেন, আমি এই সন্তানকে মসজিদের খেদমতে প্রদান করার মান্নত করেছিলাম। অতএব আপনারা একে গ্রহণ করুন। যেহেতু হযরত মারইয়াম অনেক উঁচু এবং মর্যাদাপূর্ণ বংশের সন্তান ছিলেন, তাই কে এই শিশু সন্তানের দায়িত্বভার নিবে তার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের ইমাম ছিলেন আল্লাহ্‌র এক নবী—হযরত যাকারিয়া (আ.)। হযরত যাকারিয়া (আ.) সম্পর্কে হযরত মারইয়ামের 'খালু' হতেন। খালু হওয়ার সুবাদে মারইয়ামের দায়িত্ব নেয়ার অধিকার ছিল তাঁরই বেশি, কিন্তু অন্য লোকজন সহজে তা মানছিল না। অবশেষে লটারি হল এবং লটারি মোতাবেক হযরত যাকারিয়া (আ.) শিশু মারইয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব লাভ করলেন।

---

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور ও البدایہ والنہایہ، قصص القرآن، معارف القرآن ।

শিশু মারইয়ামকে লালন-পালন করার সময় হযরত যাকারিয়া (আ.) লক্ষ্য করলেন, শিশু মারইয়াম অন্য বাচ্চাদের তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন মারইয়াম শিশুকাল থেকেই বুযুর্গ স্বভবের। হযরত যাকারিয়া (আ.) দেখতেন যে মৌসুমের যে ফল নয় সে মৌসুমে মারইয়ামের কাছে গায়েব থেকে সেই ফল আসত। এই দেখে একদিন হযরত যাকারিয়া (আ.) মারইয়ামকে প্রশ্ন করেছিলেন : মারইয়াম! এই ফল কোত্থেকে এসেছে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন : আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে। এ দ্বারা প্রমাণ হল তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র ওলী। আল্লাহ তা'আলাও কুরআনে কারীমে হযরত মারইয়ামকে ওলী বলে উল্লেখ করেছেন। গায়েব থেকে এই ফল আসা ছিল আল্লাহর ওলী হিসেবে হযরত মারইয়ামের কারামত।

হযরত মারইয়াম যখন যুবতী হলেন, তখন আল্লাহর কুদরতে কোন পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই তিনি গর্ভধারণ করেন। তাঁর গর্ভে জন্ম লাভ করেন আল্লাহ্‌র নবী হযরত ঈসা (আ.)। বিবাহ ছাড়া সন্তান হওয়ার ঘটনায় ইয়াহুদীরা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলতে লাগল। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে হযরত ঈসা (আ.) জন্মের পর থেকেই কথা বলতে থাকেন। অলৌকিকভাবে শিশু ঈসার কথা বলা দেখে বিবেকবান লোকেরা সাথে সাথেই বিশ্বাস করে নিল যে, মারইয়াম সতী-সাধ্বী নারী। পিতা ছাড়াই ঈসার জন্ম হয়েছে। ঈসার জন্ম আল্লাহর কুদরতের এক জ্বলন্ত নমুনা।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মারইয়ামের প্রশংসা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন : নারীদের মধ্যে দুইজন মর্যাদার পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। তাঁদের একজন হযরত মারইয়াম, অন্যজন হযরত আসিয়া।[১]

ফায়দা : লক্ষ্য করার বিষয় হল, হযরত মারইয়ামের মা তাঁর মেয়েকে আল্লাহ্‌র নামে দান করে দিয়েছিলেন। তারই বরকতে মারইয়াম কত বড় মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁর গর্ভে এক সম্মানীত নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন ঘটেছে এবং মারইয়ামের ওছীলায় তার মাতা-পিতা সকলের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনিভাবে যারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের সন্তানকে নিয়োজিত করে, আল্লাহ তাআলা ঐ সন্তানকে বরকতময় করে দেন এবং তাঁর ওছীলায় তার মাতা-পিতা সকলেই সম্মান লাভ করেন।

---

১. তথ্যসূত্র : معارف القرآن، قصص القرآن، البداية والنهاية ও بہشتی زیور ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধমাতা হালিমা সা'দিয়া (রাযি.)

হযরত হালিমা সা'দিয়া (রাযি.) আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ মা। তিনি শিশুকালে আমাদের আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দুধ পান করিয়েছিলেন। তিনি তায়েফ এলাকায় বসবাস করতেন। এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত লাভ করেন। নবুয়ত লাভ করার পর একবার যখন তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে তায়েফ যান, তখন হযরত হালিমা সা'দিয়া (রাযি.) নিজ স্বামীর চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসতে দেন এবং তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হালীমা সা'দিয়াকে খুব সম্মান করতেন। দুধমাতারও হক রয়েছে যেমন আপন মাতার হক রয়েছে।

ফায়দা : এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, হালিমা সাদিয়া নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মা হালিমা সা'দিয়ার গভীর সম্পর্কও ছিল। কিন্তু হালিমা সা'দিয়া এই সম্পর্কের উপর ভরসা করে বসে থাকেননি যে, আমি নবীর মা, পরকালে এই ওছীলাতেই আমার মুক্তি হয়ে যাবে। বরং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কারণ, তিনি জানতেন শুধু সম্পর্কে পার পাওয়া যায় না। আজকাল অনেকে কোন বড় আলেম বা পীরের সন্তান হলে কিংবা বড় কোন পীরের সাথে ভাল সম্পর্ক থাকলে তাঁর ওপর ভরসা করে বসে থাকে যে, এতেই আমার নাজাত হয়ে যাবে। এই ধারণা ঠিক নয়। নিজের নাজাতের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। নিজের ঈমান-আমল ঠিক না থাকলে কোন সম্পর্কই কোন কাজে আসবে না।

কয়েকজন নবীর কন্যা

হযরত লূত (আ.)-এর কন্যাগণ

হযরত লূত (আ.) ফিলিস্তীনের সাদূম এলাকার অধিবাসীদের নিকট নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর কথা মানেনি। আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতারা এসে তাঁকে সংবাদ দিল যে, আপনাকে যারা মানে না, তাদের প্রতি অচিরেই

আল্লাহর আযাব নেমে আসবে। আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাঁকে একথাও জানালেন—আপনি আপনার অনুসারী মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাতের মধ্যেই এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন। সে মোতাবেক তিনি রাতের মধ্যেই মুসলমানদেরকে নিয়ে এলাকা থেকে বের হয়ে গেলেন। তাঁদের বের হয়ে যাওয়ার পর সেখানে আযাব অবতীর্ণ হয়। তাঁর সঙ্গে যেসব মুসলমান এলাকা থেকে বের হয়ে আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে তাঁর কন্যাগণও ছিলেন। তাঁরাও আযাব থেকে রক্ষা পান, কারণ তাঁরাও ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী মুসলমান হয়নি, ফলে সে ঐ এলাকায় কাফেরদের সাথে থেকে যায় এবং আযাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা লূত সম্প্রদায়ের বস্তীকে সম্পূর্ণ ওলট-পালট করে গোটা বস্তীকে ধ্বংস করে দেন। তাদের বস্তী মাটির নিচে চলে যায় এবং সে বস্তীটা একটা সাগরে পরিণত হয়। আজও সেই সাগর আছে, তাকে "মৃতসাগর" বলা হয়। কারণ, সেখানে আল্লাহর গযব নাযেল হয়েছিল, ফলে সেই পানিতে কোন প্রাণী বাঁচে না, তাই তাকে মৃতসাগর বলা হয়।[১]

ফায়দা : এ ঘটনায় লক্ষ করার বিষয় হল, ঈমান এত দামি সম্পদ যে, যখন আল্লাহর ক্রোধ ও আযাব আসে তখন মানুষ ঈমানের বদৌলতে আযাব থেকে রক্ষা পায়। নবীর কন্যাগণ ঈমান এনেছিলেন বলেই তাঁরা আযাব থেকে রক্ষা পান। এ কথাও বোঝা গেল যে, নিজের ঈমান-আমল না থাকলে রক্ষা পাওয়া যাবে না, যেমন : নবীর স্ত্রী হয়েও ঈমান না থাকার কারণে রক্ষা পেল না। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় আপনজন ওলী-আউলিয়া থাকলেই মুক্তি হবে না, নিজেরও ভাল হতে হবে। এ কথাও বোঝা গেল যে, নবীর ঘরে থেকেও মানুষ ভাল না হতে পারে। যেমন লূত (আ.)-এর স্ত্রী নবীর ঘরে থেকেও ভাল হতে পারেনি। কারণ, তার প্রতি আল্লাহর রহমত হয়নি। সে আল্লাহর কাছ থেকে রহমত চেয়ে নিতে পারেনি। আর ভাল হতে পারা আল্লাহর খাস রহমত। তাই ঈমান ও আমলের উপর থাকা চাই এবং ঈমান আমলের উপর থাকতে পারার জন্য আল্লাহর কাছে রহমত ও তাওফীক কামনা করা চাই। আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেদায়েত নসীব করুন, আমাদেরকে হেদায়েতের উপর টিকে থাকার তাওফীক দান করুন।

---

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور، معارف القرآن ও বিভিন্ন তাফসীরে। কিসাস।

হযরত শুআইব (আ.)-এর কন্যা সাফীরা

পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রীর ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল সাফূরা। সাফূরা ছিলেন হযরত শুআইব (আ.)- এর বড় কন্যা। তিনি কীভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রী হয়েছিলেন, তার ঘটনাও বয়ান করা হয়েছে। হযরত শুআইব (আ.)-এর ছোট কন্যার নাম ছিল সাফীরা। অতএব তিনি ছিলেন হযরত মূসা (আ.) এর শ্যালিকা। সাফীরা তার বড় বোন সাফূরার সাথে ঘরের সব কাজ করতেন। পিতা হযরত শুআইব (আ.)-এর খেদমত ও আনুগত্য করতেন। আল্লাহ্‌র নবীর কন্যা হয়েও ঘরের কাজ করতে তাদের কোন শরম ছিল না, ঘরের কাজ করলে ছোট হয়ে যেতে হয় তারা এরূপ মনে করতেন না।

ফায়দা : এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় হল আমাদেরও উচিত মাতা-পিতার খেদমত করা। মাতার সাথে সহযোগিতা করে ঘরের কাজও করা উচিত। ধনীর ঘরের কন্যা হলেও যেভাবে গরীব ঘরের মেয়েরা ঘরের কাজ করে থাকে সেভাবে ঘরের কাজ করা চাই। যারা ঘরের কাজ করে তাদেরকে ছোট মনে করার অবকাশ নেই। নবীর মেয়েরা যদি ঘরের কাজ করতে পারেন, তাহলে অন্য মেয়েরা কেন ঘরের কাজ করতে পারবে না? নবীর কন্যাদের চেয়ে কি অন্য মেয়েরা বেশী সম্মানিত মানুষ ?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণ

হযরত যায়নাব (রাযি.)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার কন্যা ছিল। যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলছুম ও ফাতিমা। এই চার কন্যাই হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এর মধ্যে হযরত যায়নাব (রাযি.) ছিলেন সবচেয়ে বড়। আর হযরত ফাতেমা (রাযি.) ছিলেন সবচেয়ে ছোট। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব (রাযি.)কে খুব ভালবাসতেন।

যায়নাব (রাযি.)-এর প্রথম বিবাহ হয় তার খালাতো ভাই হযরত আবুল আস ইবনুর রাবী' (রাযি.)-এর সাথে। বিবাহের সময় আবুল আস মুসলমান ছিলেন না। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমান-অমুসলমানেও বিবাহ জায়েয ছিল।

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور ।

পরে তা রহিত হয়ে যায় এবং মুসলমান-অমুসলমানে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। হযরত যায়নাব (রাযি.) যখন মুসলমান হন আবুল আস তখন ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এক পর্যায়ে হযরত যায়নাব (রাযি.) স্বামীকে ত্যাগ করে মদীনায় চলে আসেন। ৭ম হিজরীতে হযরত আবুল আসও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় চলে আসেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব (রাযি.)কে পুনরায় হযরত আবুল আস (রাযি.)-এর নিকট স্ত্রী হিসেবে সোপর্দ করেন। ৮ম হিজরীতে হযরত যায়নাব (রাযি.) ইন্তেকাল করেন।

ফায়দা : হযরত যায়নাব (রাযি.)-এর ঘটনায় লক্ষ্য করার বিষয় হল হযরত যায়নাব (রাযি.) ইসলামের জন্য স্বামীকে ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করে চলে এসেছিলেন। ইসলামের খাতিরে সবকিছু ত্যাগ করার জন্য এভাবে সকলকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। ইসলামের পথে চলতে গেলে আত্মীয়-স্বজন যদি অপছন্দ করে, তাহলে তাদের অপছন্দের কোন মূল্য দেয়া যাবে না। যেমন : পর্দা করলে অনেক আত্মীয় অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। ঘরে টেলিভিশন, ভিসিআর ইত্যাদি পাপের সরঞ্জাম না রাখলে অনেক আত্মীয়-স্বজন অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। এরূপ অসন্তুষ্টির কোন পরওয়া করা চাই না। দ্বীনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করার মানসিকতা রাখতে হবে। মুসলমান মানুষের সন্তুষ্টির চেয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিবে।[১]

হযরত রুকাইয়া (রাযি.)

হযরত রুকাইয়াও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের কন্যা। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেজ মেয়ে। তার প্রথম বিবাহ হয় আবু লাহাবের পুত্র উতবার সাথে। তবে বাসর হয়নি। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিবাহ হয়নি তবে বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হওয়ার পর আবু লাহাব ও তার স্ত্রী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরম শত্রুতে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত উতবা তার পিতা আবু লাহাবের চাপে হযরত রুকাইয়াকে ছেড়ে দেয়। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান (রাযি.)-এর সাথে হযরত রুকাইয়ার বিবাহ দেন। মুসলমানদের চরম দুর্দিনের সময় হযরত রুকাইয়া (রাযি.) স্বামী উছমান গনী

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور، سیرت مصطفی، امہات المؤمنین، নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি গ্রন্থ।

(রাযি.)-এর সাথে হাবশায় হিজরত করেন এবং হাবশায় সহায়-সম্বলহীনভাবে অনেক কষ্টে জীবন যাপন করেন।

যখন 'বদর' যুদ্ধ শুরু হয় তখন হযরত রুকাইয়া (রাযি.) অসুস্থ ছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখা-শোনা করার জন্য হযরত উসমান (রাযি.)কে মদীনায় রেখে যান এবং বলে যান, তুমিও জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের সমান সওয়াব পাবে। যেদিন বদরে মুসলমানদের বিজয় হয় সেদিনই হযরত রুকাইয়া (রাযি.) ইন্তেকাল করেন।[১]

ফায়দা : হযরত রুকাইয়া (রাযি.)ও হযরত যায়নাব (রাযি.)-এর ন্যায় ইসলামের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। এভাবে ইসলামের জন্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে সকলকেই প্রস্তুত থাকতে হবে। এটাই হযরত রুকাইয়া (রাযি.)-এর জীবনী থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

হযরত উম্মে কুলসুম (রাযি.)

হযরত উম্মে কুলসুম (রাযি.)ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের কন্যা। তিনি ছিলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় কন্যা। তাঁর বিবাহও প্রথমে কাফের আবু লাহাবের দ্বিতীয় পুত্র উতাইবার সাথে হয়েছিল। বিবাহের পর স্বামীর ঘরে যাওয়ার পূর্বেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত লাভ করেন। তিনি নবী হওয়ার আবু লাহাব ও তার স্ত্রী রাসূলের শত্রুতে পরিণত হয়। তখন উতাইবা তার পিতা আবু লাহাবের পরামর্শে হযরত উম্মে কুলসুম (রাযি.)কে তালাক দিয়ে দেয়। তিনি মদীনায় হিজরত করে পিতা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে অবস্থান করতে থাকেন।

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত রুকাইয়া (রাযি.)কে হযরত উসমান (রাযি.)-এর সাথে বিবাহ দেয়া হয়েছিল। হযরত রুকাইয়া (রাযি.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর কন্যা হাফসাকে বিবাহ করার জন্য উসমান (রাযি.)-এর কাছে প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি তাতে সম্মতি প্রকাশ করলেন না। এতে হযরত ওমর (রাযি.) কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ শুনতে পেয়ে বলেন : আল্লাহ পাক হাফসার জন্য উসমানের চেয়ে ভাল স্বামীর ব্যবস্থা করে রেখেছেন আর উসমানের জন্য

---

১. তথ্যসূত্র : امہات المؤمنین، سیرت مصطفیٰ، بخاری، নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি গ্রন্থ।

হাফসার চেয়ে ভাল স্ত্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বাস্তবেও তা-ই হয়েছে। তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসাকে বিবাহ করেন আর নিজের কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমকে হযরত উসমান (রাযি.)-এর সাথে বিবাহ দেন। এই বিবাহের ঘটনা ঘটে ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে।

হযরত উম্মে কুলসুম (রাযি.) হযরত উসমান গনী (রাযি.)-এর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে মাত্র সাড়ে ছয় বৎসর জীবন যাপন করার পর ৯ম হিজরীর শা'বান মাসে ইন্তেকাল করেন। এভাবে হযরত উসমান (রাযি.)-এর সাথে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একের পর এক দুই কন্যার বিবাহ দেন। এ জন্যেই হযরত উসমান (রাযি.)কে "যিন্নূরাইন" অর্থাৎ, দুই নূরের অধিকারী বলা হয়ে থাকে।[১]

হযরত ফাতেমা (রাযি.)

হযরত ফাতেমা (রাযি.) হলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ছোট কন্যা, সর্বাধিক আদরের মেয়ে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। তাঁকে স্বীয় প্রাণের টুকরা বলেছেন। সকল নারীর সরদার বলেছেন। আরও বলেছেন : যে কারণে ফাতেমার কষ্ট হয়, সে কারণে আমিও কষ্ট পাই।

রেওয়ায়েতে আছে হযরত আবূ বকর (রাযি.) এবং হযরত ওমর (রাযি.) উভয়েই হযরত ফাতেমাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁদের উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ফাতেমার বয়স কম, আপনাদের সাথে মিল হবে না। অন্য এক বর্ণনামতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করতে বলেন। এরপর হযরত আলী (রাযি.) প্রস্তাব করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.)-এর সাথে ফাতেমার বিবাহ দেন এবং বলেন : ফাতেমাকে আলীর সাথে বিবাহ দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ করেছেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের সময় একমাত্র ফাতেমাকে কাছে ডেকে গোপনে বলেছিলেন ফাতেমা, আমার বিদায়ের সময় নিকটবর্তী। ফাতেমা কাঁদতে শুরু করেন। তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আরও কাছে ডেকে কানে কানে বলেছিলেন : কেঁদোনা মা। আমার ইন্তিকালের পর তুমিই সকলের পূর্বে আমার সাথে সাক্ষাৎ

১, তথ্যসূত্র : بہشتی زیور، سیرت مصطفی، امہات المؤمنین নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি গ্রন্থ।

করবে এবং তুমি হবে সকল বেহেশতী নারীর প্রধান। একথা শুনে তিনি হেসে ফেলেছিলেন। তারপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানে কানে তোমাকে কী বলেছেন? কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেননি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। বাস্তবেও তা-ই হয়েছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের ৬ মাস পর সকলের আগে হযরত ফাতেমা (রাযি.) ইন্তেকাল করেন।

হযরত আলী (রাযি.)-এর সাথে হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর যখন বিবাহ হয়, তখন খেজুর আঁশের একটি তোষক, একটি পানির কলস, মাটির দুটি মটকা এবং একটি চাদর ছিল ফাতেমার বিবাহ সামগ্রী। হযরত আলী (রাযি.)-এর ধন-সম্পদ ছিলনা বিধায় ঘরের সব কাজ-কর্ম নবী দুলালী ফাতেমাকেই করতে হত। এ সম্পর্কে একটা রেওয়ায়েত শুনুন। হযরত আলী (রাযি.) একবার তাঁর এক শাগরেদকে বললেন, আমি কি আমার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমার বর্ণনা তোমাকে শোনাব না? শাগরেদ বললেন নিশ্চয় শোনাবেন। তখন তিনি বললেন : ফাতেমা ছিলেন পরিবারের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে আদরের। ফাতেমা নিজ হাতে চাক্কি পিষতেন, ফলে তাঁর হাতে দাগ পড়ে যায়। নিজ হাতে মশক ভরে পানি উঠাতেন, ফলে তাঁর বুকে রশির দাগ পড়ে যায়। নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন, ফলে কাপড় চোপড় প্রায়ই ময়লা থাকত। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অনেকগুলি গোলাম-বাঁদী আসে। আমি ফাতেমাকে বললাম, তোমার আব্বাজানের খেদমতে গিয়ে যদি একজন খাদেম চেয়ে আনতে, তাহলে কাজ-কর্মে অনেক সাহায্য হত। ফাতেমা গিয়ে দেখে যে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লোকজনের অনেক ভিড়। ফলে সে ফিরে আসল। পরের দিন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরীফ এনে জিজ্ঞাসা করেন, মা ফাতেমা! গতকাল তুমি কি জন্য গিয়েছিলে? সে লজ্জায় কিছুই বলল না। আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! চাক্কি চালাতে চালাতে তার হাতে দাগ পড়ে গিয়েছে। মশক উঠানোর দরুণ তার বুকে দাগ পড়ে গেছে। ঘরে ঝাড়ু দেয়ার দরুন প্রায়ই তার কাপড়-চোপড় ময়লা থাকে। গতকাল আপনার খেদমতে কিছু গোলাম-বাঁদী আসায় আমি তাকে বলেছিলাম, একটা খাদেম চেয়ে আনলে

কাজ-কর্মে সাহায্য হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ফাতেমা! আল্লাহ্কে ভয় কর, তাঁর ফরয আদায় করতে থাক। তুমি ঘরের কাজ-কর্ম নিজ হাতেই সম্পাদন করতে থাক এবং যখন শয়ন করবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ে নিও। এ আমল খাদেম থেকেও উত্তম। ফাতেমা বলল : আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ব্যবস্থার উপর সন্তুষ্ট আছি। অন্য হাদীছে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই ফুফাত বোন এবং ফাতেমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়ে নিজেদের কষ্টের কথা প্রকাশ করে খাদেম চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে খাদেম থেকে উত্তম জিনিস সম্পর্কে বলে দিচ্ছি। তা হল, প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ আর ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে এবং একবার পড়বে—[১]

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

কয়েকজন সাহাবীর স্ত্রী

হযরত আবু তালহা (রাযি.)-এর স্ত্রী উম্মে সালীম (রাযি.)

হযরত আবু তালহা (রাযি.) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তাঁর স্ত্রী উম্মে সালীম। হযরত উম্মে সালীম (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট খাদেম ও প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রাযি.)-এর জননী। এক সূত্রে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালাও হন। তাঁর এক ভাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হন। এসব কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালীম (রাযি.)কে যথেষ্ট সম্মান করতেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বেহেশতেও দেখেছেন।

হযরত উম্মে সালীম (রাযি.)-এর জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। তাঁর একটি বাচ্চা ছিল। বাচ্চাটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। একদিন হঠাৎ করে বাচ্চাটি

১. তথ্যসূত্র : امہات المؤمنین، فضائل اعمال، سیرت مصطفیٰ، بہشتی زیور নবী পরিবারের প্রতি ভালবাসা ও বিভিন্ন হাদীস প্রভৃতি গ্রন্থ।

মারা গেল। তখন ছিল রাতের সময়। স্বামী আবু তালহা বাইরে থেকে ঘরে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন বাচ্চার অবস্থা কেমন? হযরত উম্মে সালীম (রাযি.) চিন্তা করলেন, এখন যদি স্বামীকে বাচ্চার মৃত্যু সংবাদ দেই, তাহলে স্বামীর খুব কষ্ট হবে, সারা রাত তাঁর ঘুম হবে না। তাই তিনি উত্তর দিলেন আরামেই আছে। এ কথাটি মিথ্যা ছিল না। কেননা সে মুসলমানদের সন্তান। আর মুসলমানদের সন্তান শিশু অবস্থায় মারা গেলে সে তো জান্নাতী। সুতরাং যে জান্নাতে চলে যায় তার চেয়ে আর কে আরামে থাকে! তাই হযরত উম্মে সালীম (রাযি.) বললেন, সে আরামে আছে। স্বামী কথার মর্ম বুঝতে পারেননি।

যাহোক, হযরত উম্মে সালীম (রাযি.) স্বামীর সামনে খাবার এনে রাখলেন। স্বামী খানা-পিনা শেষ করার পর স্ত্রীর প্রতি খাহেশ হওয়ায় তাকে ব্যবহার করতে চাইলেন। আল্লাহর বান্দী হযরত উম্মে সালীম (রাযি.) তাতেও বাধা দিলেন না। সবকিছু শেষ হওয়ার পর স্বামীকে শান্ত-কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা, কেউ যদি কাউকে কোন জিনিস দিয়ে আবার তা ফেরত নিয়ে নেয়, তাহলে কি তার সেটা অস্বীকার করার অধিকার আছে? স্বামী বললেন, না। তখন হযরত উম্মে সালীম (রাযি.) বললেন : তাহলে আপনার বাচ্চার ব্যাপারেও সবর করুন। একথা শুনে স্বামী হযরত আবু তালহা (রাযি.) খুব রাগ হলেন। বললেন : আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলনি কেন? হযরত আবু তালহা (রাযি.) তখনি গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহর কী কুদরত, সে রাতেই হযরত উম্মে সালীমের গর্ভ হল। সেই গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিল। তাঁর নাম রাখা হল আব্দুল্লাহ। এই আব্দুল্লাহ অনেক বড় আলেম হন। তাঁর বংশেও অনেক বড় বড় আলেম জন্ম নেন।[১]

ফায়দা : এ ঘটনায় লক্ষণীয় হল স্বামীকে কীভাবে শান্তি দিতে হয়, সান্ত্বনা দিতে হয় তা শিখতে হবে। আল্লাহর দেয়া জিনিস আল্লাহ নিয়ে নিলে কী করার আছে! এটা এমন এক সত্য কথা, এ কথাটি মনে রাখলে সবর করা সহজ হয়ে যায়। আর সবরে কেমন বরকত হয় তাতো এ ঘটনায় আল্লাহ পাক প্রমাণ করে দিলেন। তাদের বংশে অনেক বড় বড় আলেম পয়দা হয়েছে। এটা তাদের সবরেরই ফসল। এ জন্যই কথায় বলে সবরে মেওয়া ফলে।

১. তথ্যসূত্র : বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থ ও তার শুরুহাত,

হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাযি.)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাযি.)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিন জন মহিলা সাহাবীর কথা পাওয়া যায়, যারা দ্বীন শেখার জন্য লজ্জা ত্যাগ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লজ্জা বিষয়ক মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। একজন হযরত ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ (রাযি.), আর একজন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্যালিকা উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব (রাযি.)-এর বোন হযরত হামনাহ্ বিনতে জাহ্‌শ (রাযি.), আর একজন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাযি.)-এর স্ত্রী হযরত যায়নাব (রাযি.)। তাঁরা সকলে মিলে নবীজীর দরবারে এসেছিলেন মাসআলা জানার জন্য। প্রথমোক্ত দুইজন 'এস্তেহাযা' সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মাসআলা জানতে চেয়েছিলেন। আর তৃতীয়জন সদকা সম্পর্কে মাসআলা জানতে চেয়েছিলেন।[১]

ফায়দা : এখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হল দ্বীনের প্রতি ঝোঁক থাকতে হবে। দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েল শেখার জন্য আগ্রহ থাকতে হবে। দ্বীনী বিষয় শেখার প্রতি তাঁদের ঝোঁক ও আগ্রহ ছিল বলেই তাঁরা মাসআলা জানার জন্য নবীর দরবারে এসেছিলেন। দ্বীনী বিষয় শেখার ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ তাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অতএব আমাদেরও উচিত, কোন দ্বীনী বিষয় বা মাসআলা-মাসায়েল জানার প্রয়োজন দেখা দিলে তা কোন পরহেযগার আলেমের কাছ থেকে জেনে নেয়া। লজ্জার বিষয় হলে সরাসরি আলেমের কাছে না বলে তার স্ত্রীর কাছে বলে তার মাধ্যমে আলেম থেকে জেনে নেয়া যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, লজ্জা করে মাসআলা না শিখলে আমল সহীহ হবে না। আর আমল সহীহ না হলে আল্লাহর কাছে ধরা পড়তে হবে।

হযরত উবাদাহ্ (রাযি.)-এর স্ত্রী উম্মে হারাম (রাযি.)

হযরত উম্মে হারাম (রাযি.) একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী। তিনি হযরত উবাদাহ্ (রাযি.)-এর স্ত্রী এবং হযরত উম্মে সালীম (রাযি.)-এর বোন। এক সম্পর্কে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে-মধ্যে তাঁর ঘরে যেতেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে গিয়েছেন। খানা খেয়ে একটু শুয়েছেন। এরই

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور।

মধ্যে ঘুম এসে গেল। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে ঘুম থেকে উঠলেন। হযরত উম্মে হারাম (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আমি এই মাত্র স্বপ্নে দেখলাম আমার উম্মতের একটি দল জাহাজে চড়ে জিহাদে যাচ্ছে। তাদের লেবাস-পোশাক এবং মাল- সামান দেখে মনে হয়, তারা যেন আমীর, বাদশাহ। এ কথা শুনে হযরত উম্মে হারাম (রাযি.) আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! দু'আ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকেও তাঁদের মধ্যে শামিল করে নেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন। এরপর আবার তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। একটু পরে আবার পূর্বের মত হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। হযরত উম্মে হারাম (রাযি.) আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : এই জাতীয় আরও কিছু লোক দেখলাম। তিনি পূর্বের মত আবার আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুআ করুন আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে সেই দলের মধ্যে শামিল করেন। এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : না, তুমি প্রথম দলের একজন।

অতঃপর নবীজীর ওফাতের পর মুসলমানগণ সমুদ্র পথে জিহাদ করেছেন। হযরত উম্মে হারাম (রাযি.)-এর স্বামী হযরত উবাদাহ (রাযি.)ও সেই জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। স্বামীর সাথে উম্মে হারামও সেই জিহাদে গিয়েছিলেন। সাগর পার হওয়ার পর একটি জানোয়ারের পিঠে সওয়ার হওয়ার সময় তিনি জানোয়ারের পিঠ থেকে পড়ে যান এবং ইন্তিকাল করেন।[১]

ফায়দা : এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, হযরত উম্মে হারাম (রাযি.) কত দ্বীনদার মহিলা ছিলেন যে, ছওয়াব হাসিল করার জন্য নিজের জীবনের পরোয়া করেননি। নিজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা দুআ করিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আও পুরোপুরি কবুল হয়েছে। কারণ, ঘরে না ফেরা পর্যন্ত পূরো সফরটাই জিহাদের সফর বলে গণ্য। আর জিহাদের সফরে যে কোনভাবে মারা গেলেই শহীদ হওয়ার মর্যাদা পাওয়া যায়। হযরত উম্মে হারাম (রাযি.) এই শাহাদাতের মর্যাদা হাসিল করেছেন। আজকাল মহিলারা দ্বীনের জন্য জীবন দেয়াতো দূরের কথা ইবাদতের জন্য একটু মেহনত-মুজাহাদা করতেও প্রস্তুত হয় না।

১. তথ্যসূত্র : বোখারী, মুসলিম ও শরাহ গ্রন্থ।

কয়েকজন সাহাবীর মা

হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.)-এর মা

হযরত আবু যর গিফারী (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং কাফেররা তাকে মিথ্যা জানল, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়টা যাচাই-বাছাই করার জন্য প্রথমে বড় ভাইকে মক্কায় পাঠালেন, পরে আরও ভালভাবে জানার জন্য নিজে মক্কায় এলেন। সবকিছু দেখে শুনে ইসলাম গ্রহণ করলেন। যখন তিনি বাড়িতে ফিরে গিয়ে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং তিনি ও বড় ভাই উভয়ে মিলে তাঁদের মাকে দাওয়াত দিলেন, তখন বললেন, তোমরা যে ধর্ম গ্রহণ করেছ, আমিও তা অস্বীকার করি না। আমি সেই ধর্ম কবুল করে নিলাম। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।[১]

ফায়দা : এ ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষণীয় হল সত্য কথার সন্ধান পাওয়ার পর আর বাপ-দাদারা কী করে আসছে তা ধরে বসে থাকা যাবে না। যেমন আবু যর গিফারীর মাতা সত্য ধর্মের সন্ধান পাওয়ামাত্র বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে সত্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আমাদেরও উচিত শরীয়তের কোন সহীহ মাসআলা-মাসায়েল জানতে পারলে তা মেনে নেয়া। বাপ-দাদারা বা পূর্ব পুরুষরা কী করে আসছে বা সমাজে কী রছম চলে আসছে, তা না দেখা। অনেক সময় দেখা যায়, বাপ-দাদারা একটা রছম করে আসছে অথচ সেটা ঠিক নয় জানার পরও আমরা তা গ্রহণ করিনা বরং বলে থাকি, বাপ-দাদা এবং মুরব্বীরা করে আসছে, তা ছাড়া যায় না। এরূপ বলা বা এরূপ করে যাওয়া ঠিক নয়। যে কোন সহীহ কথা বা সহীহ মাসআলা শোনার সাথে সাথেই তা মেনে নেয়া উচিত। বাপ-দাদারা করে আসছে, তাই করতে হবে, এটা ছিল কাফেরদের যুক্তি। তারাই বাপ-দাদারা করে আসছে এই যুক্তিতে মূর্তিপূজা করত।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাযি.)-এর মা

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি তাঁর মাকে প্রায়ই ইসলাম ধর্ম কবূল করার জন্য

---

১. উৎসসূত্র : سیرت مصطفیٰ، بہشتی زیور প্রভৃতি গ্রন্থ।

বলতেন কিন্তু তিনি মানতেন না। একবার তার মা ইসলাম সম্পর্কে এ একটি উক্তি করে বসলেন যে, হযরত আবু হুরায়রাহ (রাযি.) তাতে মনে ক কষ্ট পেলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে এলেন এবং আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মায়ের জন্য দুআ করুন আল্লাহ তাআলা যেন তাকে হেদায়েত দান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন যে, হে আল্লাহ! আবু হুরায়রাহ-র মাকে হেদায়েত দান কর। আবু হুরায়রা (রাযি.) আনন্দচিত্তে ঘরে ফিরে গেলেন। দে দেখলেন ঘর বন্ধ, ঘরের ভিতরে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। মনে হল, কে ভিতরে কেউ গোসল করছে। তাঁর মা তাঁর পায়ের শব্দ শুনে ভিতর থেকে বললেন : ওখানেই থাক। আবু হুরায়রাহ (রাযি.) সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর মা গোসল শেষ করে দরোজা খুললেন এবং উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন :

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

মাকে কালেমা পাঠ করতে শুনে আনন্দের আতিশয্যে হযরত আবু হুরায়রাহ (রাযি.) কাঁদতে লাগলেন। এ অবস্থায়ই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরো ঘটনা শোনালেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোকর আদায় করলেন। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাযি.) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহর কাছে দুআ করে দিন মুসলমানদের সাথে যে আমাদের ভালবাসা হয়ে যায় এবং আমাদের মা-ছেলে উভয়ের সাথেও যে মুসলমানদের ভালবাসা হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই দুআ করে দিলেন।[১]

ফায়দা : এই হল নেক সন্তানের ফায়দা। নেক সন্তান মাতা-পিতাকে সত্যের দিকে, নেক আমলের দিকে এবং জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। তাই নিজেদের সন্তানদেরকে নেক বানানোর চেষ্টা করা উচিত, তাদেরকে দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দেয়া উচিত। তাহলে তাদের দ্বারা নিজেরাও উপকৃত হওয়া যাবে।

হযরত হুযাইফা (রাযি.)-এর মা

হযরত হুযাইফা (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি বলেন : একদিন আমার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

১. তথ্যসূত্র : [illegible]।

তুমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওখানে যাও না কতদিন হল? আমি বললাম, এত দিন। তিনি আমাকে খুব বকাঝকা করলেন। আমি বললাম : আজ যাব এবং মাগরিবের নামাযও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পড়ব এবং বলব তিনি যেন তোমার এবং আমার জন্যে ক্ষমার দুআ করে দেন। কথামত আমি গেলাম এবং মাগরিবের নামায পড়লাম। ইশার নামাযও পড়লাম। ইশার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রওনা হলেন আমিও সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলাম। আমার পায়ের শব্দ শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হুযাইফা! আমি বললাম : জ্বী, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কোন প্রয়োজন আছে কি? আল্লাহ তাআলা তোমাকে এবং তোমার মাকে ক্ষমা করুন।[১]

ফায়দা : এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, কত নেককার মা ছিলেন তিনি। নিজের সন্তানের ব্যাপারে এ বিষয়টাও খেয়াল রাখতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে ঠিক মত যায় কি-না। আমাদেরও উচিত সন্তানদেরকে বুযুর্গ আলেম উলামার খেদমতে পাঠানো। তাহলে তাদের সোহবতে গিয়ে সন্তানরা বরকত হাসেল করতে পারবে। সন্তানদেরকে ভাল লোকের সোহবতে পাঠালে সন্তানরা ভাল হবে, আর খারাপ লোকের সংস্পর্শে পাঠালে তাঁরা খারাপ হবে।

হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর মা

হযরত মুআবিয়া (রাযি.) হলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবী এবং তাঁর শ্যালক। হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর মা হলেন হযরত হিন্দ বিন্তে উত্‌বা। এই হযরত হিন্দ বিন্তে উত্‌বা একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তো আমার অবস্থা এই ছিল যে, আমি সবচেয়ে বেশী আপনার ক্ষতি এবং লাঞ্ছনা কামনা করতাম। আর ইসলাম গ্রহণ করার পর আমার অবস্থা এই হয়েছে যে, এখন আপনার সম্মানই আমার কাছে সবচেয়ে বেশী কাম্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার অবস্থাও তা-ই।[২]

ফায়দা : এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় কত সত্যবাদী নারী ছিলেন হযরত হিন্দ। অকপটে মনের সত্য কথাটা ব্যক্ত করেছেন। আরও বোঝা গেল নবী

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور। ২. তথ্যসূত্র : ایضا।

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি কত বেশী ভালবাসতেন। আমাদেরও উচিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসা এবং সত্য কথা অকপটে স্বীকার করা। তবে এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার তরীকা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং তাঁর আদর্শকে ভালবাসা। হাদীছেও বর্ণিত হয়েছে— রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে আমাকে ভালবাসল।

কয়েকজন মহিয়সী নারী

নমরূদের কন্যা

নমরূদ ছিল বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত বাবেল শহরের একজন জালেম সম্রাট। নমরূদ এবং তার সম্প্রদায় ছিল মূর্তিপূজারী কাফের। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে এবং তার সম্প্রদায়কে মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে বললেন। কিন্তু তারা মূর্তিপূজা ত্যাগ করল না। অধিকন্তু নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ.)কে মেরে ফেলার জন্য বিশাল অগ্নিকুণ্ড তৈরী করে তাতে নিক্ষেপ করেছিল। নমরূদের এক কন্যা ছিল। তার নাম রা'যাহ। সে উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল যে, আগুন হযরত ইবরাহীম (আ.)কে পোড়াচ্ছে না। তখন সে চিৎকার করে হযরত ইবরাহীম (আ.)কে জিজ্ঞাসা করল : ব্যাপার কী, আগুন আপনাকে পোড়াতে পারছে না কেন? তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, ঈমানের বরকতে আল্লাহ তাআলাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তখন নমরূদের কন্যা বলতে লাগল, অনুমতি দিলে আমিও এই আগুনের মধ্যে চলে আসতে চাই! হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইবরাহীমু খলীলুল্লাহ' বলে চলে আস এ কথা শুনে নমরূদের কন্যা ঐ কালেমা পাঠ করতে করতে নির্দ্বিধায় আগুনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আগুন তাকেও জ্বালালো না তারপর সে আগুন থেকে বেরিয়ে এসে পিতা নমরূদকে অনেক বকাঝকা করল। নমরূদও তাকে কঠিন শাস্তি দিল। কিন্তু সে ঈমানের ওপর অটল থাকল। জালেম নমরূদের কোন শাস্তি তাকে ঈমান থেকে সরাতে পারল না।[১]

ফায়দা : এ ঘটনায় লক্ষ্য করার বিষয় হল, নমরূদের কন্যা কত সাহসী মেয়ে ছিল এবং ঈমানের উপর তার কত অটলতা ছিল। কঠিন নির্যাতন সত্ত্বেও

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور ও معارف القرآن ।

সে ঈমান ত্যাগ করেনি। এ থেকে আমাদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা চাই। আমরা যেন বিপদ-আপদ, নির্যাতন কোন অবস্থাতেই ঈমান-আমল ত্যাগ না করি। এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকে বাঁচিয়ে রাখেন কেউ তাকে মারতে পারে না। জীবন মরণ আল্লাহ্র হাতে। যার যেভাবে মৃত্যু লেখা আছে, সেভাবেই তার মৃত্যু হবে, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। তাই জীবনের মায়ায় ধর্ম ত্যাগ করতে নেই।

বিবি আসিয়া

মিসরের বাদশাহ ছিল ফেরআউন। সে নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছিল। হযরত আসিয়া ছিলেন এই ফেরআউনেরই স্ত্রী। আল্লাহ্র কী অপূর্ব লীলা, স্বামী এক শয়তান আর স্ত্রী হলেন আল্লাহ্র প্রিয় ওলী, যার সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে প্রশংসা এসেছে এবং আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন : পুরুষদের মধ্যে কামেল হয়েছে অনেকে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে হযরত মারইয়াম ও হযরত আসিয়া ব্যতীত আর কেউ কামেল হয়নি। তবে একথাটি পূর্ববর্তী উম্মতের আলোচনা প্রসঙ্গে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। অন্যথায় হাদীস শরীফে হযরত ফাতেমা (রাযি.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনিই সমস্ত নারীর সরদার হবেন।

এই বিবি আসিয়া-ই হযরত মূসা (আ.)কে শিশু অবস্থায় জালেম ফেরআউনের হাত থেকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। বিবি আসিয়ার ভাগ্যে ছিল, তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনবেন, তাই মূসা (আ.)-এর শিশুকাল থেকেই তার প্রতি আসিয়ার গভীর ভালবাসা জমে উঠেছিল। যখন হযরত মূসা (আ.) নবুওয়াত লাভ করেন, তখন ফেরআউন তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। কিন্তু তার স্ত্রী হযরত আসিয়া মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন। যখন ফেরআউন একথা জানতে পারল যে, আসিয়া মূসা-র প্রতি ঈমান এনেছে, তখন তার সাথে খুব কঠিন আচরণ শুরু করে। বিভিন্নভাবে তাকে নির্যাতন করে, কিন্তু বিবি আসিয়া ঈমানের ওপর অটল অবিচল থাকেন এবং ঈমানের সাথেই দুনিয়া ত্যাগ করেন।[১]

ফায়দা : এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল বিবি আসিয়ার ঈমান কত মজবুত ছিল। স্বামী বেঈমান ছিল, তার সাথে সব রকম নির্যাতন করেছে, কিন্তু

১. তথ্যসূত্র : بہشتی زیور ও قصص القرآن، معارف القرآن ।

তিনি ঈমান ত্যাগ করেননি। মনে রাখতে হবে— ঈমান অনেক বড় স
যত কষ্টই হোক না কেন দ্বীন ও ঈমানের খেলাফ কোন কাজ না করা
স্বামী যদি কখনো ধর্ম বিরোধী কাজ করে, তবুও তাকে সমর্থন করা যাবে
আর সে যুগে কাফের স্বামীর সাথে বিবাহ ও ঘর-সংসার করা জায়েয
তবে আমাদের শরীয়তে এটা জায়েয নেই। এখন কোন মুসলমান
কাফের হয়ে গেলে তার সাথে বিবাহ ভেঙ্গে যায়।

রাণী বিলকীস

রাণী বিলকীস ছিলেন হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বকালে
রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। সমস্ত প্রাণীর উপর হযরত সুলাইমান (আ.)-এর
ছিল। হযরত সুলাইমান (আ.) পাখির কথাও বুঝতেন। একদিন
নামক এক পাখি এসে হযরত সুলাইমান (আ.)কে সংবাদ দিল যে,
সাবা রাজ্যে এক নারী সম্রাজ্ঞীকে দেখে এসেছি। সে সূর্যের পূজা
হযরত সুলাইমান (আ.) একটা চিঠি লিখে হুদহুদকে দিলেন যে,
বিলকীসের দরবারে চিঠিটি ফেলে দিয়ে আসবে। হুদহুদ যথাসময়ে
পৌঁছে দিল।

হযরত সুলাইমান (আ.) সেই চিঠিতে লিখেছিলেন : "তোমরা
মুসলমান হয়ে আমার দরবারে হাজির হও।" চিঠি পেয়ে বিলকীস পরা
জন্য তার আমীর ও মন্ত্রীবর্গকে ডাকলেন। অনেক কথাবার্তার পর অব
রাণী বিলকীস নিজেই এই সিদ্ধান্ত দিল যে, আমি তাঁর খেদমতে কিছু উ
সামগ্রী পাঠাব। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন, তাহলে বুঝব তিনি দুনি
বাদশাহ্। আর যদি গ্রহণ না করেন, তাহলে বুঝব তিনি আল্লাহর
সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করা হল। উপহার সামগ্রী হযরত সুলাইমান (
এর হাতে আসার পর তিনি এই বলে তা ফেরত পাঠালেন যে, আ
আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের সম্পদের চেয়ে অনেক উত্তম। তো
তোমাদের হাদিয়া ফেরত নাও। আর জেনে রাখ ঈমান না আনলে শিগ
তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য পাঠাচ্ছি। একথা শুনে রাণী বিলকী
দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, হযরত সুলাইমান (আ.) নিশ্চিতই আল্লাহর নবী। এ
রাণী বিলকীস ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নিজ দেশ ছেড়ে রওনা হলেন

রাণী বিলকীসের একটা মূল্যবান সিংহাসন ছিল। রাণী বিলকীস
দেশ থেকে রওয়ানা হওয়ার পর হযরত সুলাইমান (আ.) নিজ মুজিযা

রাণী বিলকীসের সেই সিংহাসনটি তুলে এনে নিজের দরবারে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য, রাণী বিলকীস এসে তার সিংহাসন এখানে দেখে নবীর মুজিযা বুঝতে পারবে। সাথে সাথে তিনি সিংহাসনের কিছু মণি-মুক্তা একদিক থেকে তুলে অন্যদিকে স্থাপনপূর্বক তাতে সামান্য পরিবর্তনও সাধন করালেন। রাণী বিলকীস পৌছার পর তার বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য বলা হল, দেখ তো! এটা তোমার সিংহাসন কি-না? উত্তরে রাণী বললেন : হ্যাঁ, তেমনই তো মনে হয়! তবে কিছু আকৃতি পরিবর্তন করা হয়েছে। তার উত্তরে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান (আ.)কে যে বাদশাহী ও রাজত্ব দান করেছেন তা রাণী বিলকীসের রাজত্ব ও বাদশাহীর চেয়ে অনেক বড়, রাণীকে তা দেখানোর উদ্দেশ্যে আদেশ করলেন : একটি পানির হাউজ তৈরি করে তার উপর স্বচ্ছ কাঁচের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাই করা হল। তারপর হযরত সুলাইমান (আ.) এমন স্থানে গিয়ে বসলেন যে, সেই কাঁচের উপর দিয়ে ছাড়া তাঁর কাছে পৌছার আর কোন উপায় নেই। আর কাঁচটি ছিল এতই স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম যে, তা কারও দৃষ্টিতেও পড়ত না। রাণী বিলকীসকে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর কাছে যাওয়ার জন্য বলা হল। রাণী যাওয়ার সময় কাঁচ দেখতে পেলেন না। তিনি ভাবলেন আমাকে পানির উপর দিয়েই যেতে হবে। এই ভেবে যে-ই তিনি কাপড় উঠাতে যাবেন, অমনি তাকে বলে দেয়া হল যে, পানির উপর কাঁচ রয়েছে, কাপড় তুলতে হবে না, আপনি সোজা চলে আসুন

রাণী বিলকীস হযরত সুলাইমান (আ.)-এর দরবারে নিজের সিংহাসন দেখে বুঝলেন এটা নবীর মুজিযা। তারপর এত সূক্ষ্ম শিল্প কারিগরী দেখে বুঝলেন সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বের সাথে তাঁর রাজত্বের কোন তুলনা হয় না। এমন মহা রাজত্ব আল্লাহর বিশেষ দান ছাড়া হতে পারে না। এসব কিছু মিলিয়ে তিনি বুঝলেন যে হযরত সুলায়মান (আ.) নিশ্চিতই আল্লাহর নবী। তিনি তৎক্ষণাৎ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। কোন কোন আলেম বলেছেন, তারপর হযরত সুলাইমান (আ.) তাকে বিবাহ করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন : ইয়ামানের এক বাদশাহের সাথে তাকে বিবাহ দিয়ে দেন।[১]

ফায়দা : এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল রাণী বিলকীসের মন কত অহংকার মুক্ত ছিল। একটা রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হওয়া সত্ত্বেও যখন তার সামনে

১. তথ্যসূত্র : معارف القرآن، قصص القرآن ও بہشتی زیور প্রভৃতি।

সত্য প্রকাশ পেল, তখন আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে তা মেনে নিলেন অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন। কোন সম্মানবোধ কিংবা লজ্জাবোধ সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল না। এ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় হল সত্য কথার সন্ধান পাওয়ার পর পুরাতন ভুলকে ধরে বসে না থাকা। আমাদের উচিত কোন সহীহ কথা জানতে পারলে তা মেনে নেয়া। বাপ-দাদারা বা পূর্ব পুরুষরা কী করে আসছে, বা সমাজে কী রছম চলে আসছে, তা না দেখা। অনেক সময় দেখা যায়, বাপ-দাদারা একটা রছম করে আসছে অথচ সেটা ঠিক নয় জানার পরও আমরা সে রছম বর্জন করি না বরং বলে থাকি, বাপ-দাদা এবং মুরব্বীরা করে আসছে, তা ছাড়া যায় না। এরূপ বলা বা এরূপ করে যাওয়া ঠিক নয়। বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে অন্যায় করলে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

হযরত মারইয়ামের-এর মা বিবি হান্নাহ

হযরত মারইয়াম হলেন আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা। মারইয়ামের মাতার নাম ছিল হান্নাহ্। হান্নাহ্র স্বামী অর্থাৎ, মারইয়ামের পিতার নাম ছিল ইমরান। হযরত মারইয়াম যখন গর্ভে তখন তার মা তো আল্লাহ তাআলার কাছে এই বলে মান্নত করেছিলেন যে, হে আল্লাহ ! আমার গর্ভে যে সন্তান, তাকে মসজিদের খেদমতের জন্য মুক্ত করে দিব, অর্থাৎ তাকে দিয়ে দুনিয়ার কোন কাজ করাব না। হান্নাহ্র মনে মনে আশা ছিল ছেলে হবে। কারণ, মসজিদের খেদমত পুরুষ মানুষরাই করতে পারে। সেই আমলে এই জাতীয় মান্নতের রেওয়াজও ছিল, এবং তা বৈধও ছিল। বর্তমানে এধরনের মান্নতের রেওয়াজ নেই এবং তা বৈধও নয়।

কিন্তু যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, দেখা গেল ছেলে হয়নি, হয়েছে মেয়ে। তখন বিবি হান্নাহ আফসোস করে বললেন যে, হে আল্লাহ! এ তো মেয়ে হয়েছে। অর্থাৎ আমিতো তোমার কাছে ছেলের আশা করেছিলাম কিন্তু এ দেখছি মেয়ে হয়েছে! তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ হল, এই মেয়ে পুরুষের চেয়েও উত্তম হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে কবূল করেছেন। যাহোক, শিশুর নাম রাখা হল মারইয়াম। ("মারইয়াম" শব্দের অর্থ ইবাদত-কারিণী।) হযরত মারইয়ামের মা হযরত মারইয়ামের জন্য এই দু'আ করলেন যে, হে আল্লাহ ! তুমি তাকে এবং তার সন্তানদের শয়তান থেকে রক্ষা কর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে

কোন সন্তান জন্মগ্রহণের সময় শয়তান তাকে খোঁচা মারে। কিন্তু হযরত মারইয়াম ও তার সন্তান হযরত ঈসা (আ.)কে শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি। অর্থাৎ তাদের জীবনে শয়তান কোন খারাপ প্রভাব ফেলতে পারেনি।[১]

ফায়দা : এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল হযরত মারইয়ামের মায়ের উত্তম ও পবিত্র নিয়তের বরকতে আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম ও পবিত্র সন্তান দান করেছেন, তার দুআও কবূল করেছেন। এ থেকে আমাদেরও শিক্ষণীয় হল সকল ক্ষেত্রেই আমাদেরও ভাল নিয়ত রাখা চাই, তাহলে আমাদের যিন্দেগীতেও বরকত হবে। যে কোন কাজ খালেস আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া চাই, তাহলে তা আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হবে। আমাদের সন্তানদেরকে দ্বীনের কাজে লাগানোর নিয়ত করা চাই, তাহলে নিজেদের এবং সন্তানদের যিন্দেগীতে বরকত হবে।

হযরত রাবেয়া বসরিয়াহ্ (রহ.)

হযরত রাবেয়া বসরিয়াহ্ (রহ.) এক উঁচু দরজার বুযুর্গ নারী ছিলেন। প্রায় সব মুসলিম মা-বোনের কাছেই তিনি পরিচিত। তিনি আল্লাহর ভয়ে সর্বদা কাঁদতেন। নামাযেও এত কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে সাজদার জায়গা পর্যন্ত ভিজে যেত। তাঁর মধ্যে মৃত্যুর চিন্তা এত বেশী ছিল যে, সর্বদা কাফনের কাপড় সঙ্গে রাখতেন। কখনো জাহান্নামের কথা শুনলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন।

হযরত রাবেয়া বসরিয়াহ্ (রহ.) সারা রাত তাহাজ্জুদের নামাযে কাটাতেন। সুবহে সাদেকের সময় সামান্য একটু ঘুমাতেন। ফর্সা হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি উঠে নিজেকে তিরস্কার করে বলতেন আর কতকাল শয়ন করবে? শীঘ্রই কবরে ঘুমানোর সময় পাবে, সিঙ্গার ফুঁক পর্যন্ত শয়ন করার সময় পাবে। হযরত রাবেয়া বসরিয়াহ্ (রহ.)-এর মধ্যে দুনিয়ার কোন মোহ ছিল না। কেউ তাঁকে কোন কিছু উপহার দিলে এই বলে তা ফেরত দিতেন যে, এই দুনিয়া দিয়ে আমি কী করব? আমার দুনিয়ার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

একবার হযরত রাবেয়া বসরিয়াহ্ (রহ.) কবরস্থানের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে এক ব্যক্তি বলল : আমার জন্যে একটু দু'আ করে দিন।

বললেন : আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন! আগে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত কর। তারপর দু'আ কর। আল্লাহ তাআলা সকল অসহায় ব্যক্তির দু'আই কবূল করেন।

---

১. তথ্যসূত্র : معارف القرآن، قصص القرآن ও بہشتی زیور ও বিভিন্ন তাফসীরের কিতাব।

বুযুর্গ ব্যক্তির কাছে কাছে দু'আ চাওয়ার নীতি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব এটা মুস্তাহাব এবং সুন্নাত। কিন্তু হযরত রাবেয়াহ্ বসরিয়া (রহ.) তার জন্য দুআ না করে তাকে আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগী করার কথা বলে হয়তো লোকটিকে সতর্ক করেছেন যে, শুধু দু'আই যথেষ্ট নয়। বরং দু'আর সাথে সাথে ইবাদত-বন্দেগীও করা চাই। এমন যেন না হয় যে, আমল- বন্দেগীর কোন পরোয়া নেই, শুধু অন্যের দু'আর উপর ভরসা করে থাকা হল। এরূপ করাটা মোটেও উচিত নয়।[১]

ফায়দা : সত্যিই আল্লাহ্র ভয়, পরকালের চিন্তা এবং দুনিয়ার প্রতি মোহ না থাকা এমন সব গুণ, যার দ্বারা মানুষ কামেল মানুষ হয়ে যেতে পারে। হযরত রাবেয়া বসরিয়াহ্ (রহ.)-এর মধ্যে এই গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। সর্বক্ষণ তাঁর মধ্যে আল্লাহ্র ভয় এবং আখেরাতের ফিকির জাগ্রত থাকত। যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বুযুর্গীর মাকাম দান করেছেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

১. তথ্যসূত্র : تنبیه الغافلین، المنجد فی اللغه والاعلام، بہشتی زیور প্রভৃতি।

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বিতীয় অধ্যায়
মহিলাদের খাস নসীহত

নসীহত তথা উপদেশ-বাণী দ্বারা মানুষের উপকার হয়—ঈমান-আমলের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, পাপ বর্জন করার স্পৃহা জাগ্রত হয়, পরকালীন চিন্তা-চেতনা উদ্বেলিত হয়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা তাই ইরশাদ করেছেন :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ হে নবী! তুমি মানুষকে উপদেশ দাও, কেননা উপদেশ দ্বারা মু'মিনদের উপকার হবে। (সূরা যারিয়াত : ৫৫)

ঈমান-আমলের আগ্রহ বৃদ্ধি ও পরকালীন চিন্তা-চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে মহিলাদের খাস কিছু বিষয়ের নসীহত সমৃদ্ধ এই দ্বিতীয় অধ্যায়টি রচনা করা হল।

নসীহত-১ (মাতৃজাতির মর্যাদা)

ইসলাম নারীজাতিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছে। ইসলাম আগমনের পূর্বে তৎকালীন সমাজে এবং অন্যান্য ধর্মে নারীদের প্রতি যে অমানবিক আচরণ করা হত, তার চিত্রটা সামনে রাখলে এবং ইসলাম তার প্রতিকার কীভাবে করেছে, তা অনুধাবন করলেই বুঝে আসবে ইসলাম নারীজাতির প্রতি কত অনুগ্রহ করেছে এবং নারীজাতিকে কতটা সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে।

তৎকালে কন্যা সন্তানকে অপমানজনক মনে করা হত। ফলে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে দেয়া হত। এর বিপরীতে ইসলাম কন্যা সন্তানকে এতটা মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখেছে যে, হাদীছে এসেছে :

مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ اَوْ ثَلَاثُ اَخَوَاتٍ اَوْ اِبْنَتَانِ اَوْ اُخْتَانِ فَاَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ فِيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ۔(ترمذی)

অর্থাৎ যার তিনটা কন্যা সন্তান থাকে বা তিনটা বোন থাকে বা দুটো কন্যা থাকে বা দুটো বোন থাকে, আর সে তাদের সঠিকভাবে লালন-পালন করে ও তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র ভয় রেখে কাজ করে, তার বিনিময়ে সে জান্নাতে পৌছে যাবে। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে এসেছে—হযরত উকবা ইব্নে আমের (রাযি.) বয়ান করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَاَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهٖ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔(ابن ماجة)

অর্থাৎ যার তিনটা কন্যা সন্তান থাকবে আর সে তাদের লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করবে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের ভরণ-পোষণ দিবে, কিয়ামতের দিন ঐ কন্যা সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক তথা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। (ইব্নে মাজাহ)

তৎকালে নারীদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হত। স্বাধীন নারীদের সাথেও দাসীর মত ব্যবহার করা হত। এর বিপরীতে ইসলাম নারীদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে।

নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا۔الحديث۔(بخاری)

অর্থাৎ আমি তোমাদের গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিচ্ছি নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার। তোমরা আমার এই নির্দেশ গ্রহণ কর।

তৎকালে নারীদের শুধু ভোগের সামগ্রী হিসেবে হেয় দৃষ্টিতে দেখা হত, তা যেন না হয়, বরং সম্মানের দৃষ্টিতে যেন তাদের দেখা হয় এ জন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে :

اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ . وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ۔(مسلم)

অর্থাৎ গোটা দুনিয়াই ব্যবহার সামগ্রী। আর নেককার নারী হল সর্বোত্তম ব্যবহারের সামগ্রী।

নারী জাতিকে যেন সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়, এ জন্য ইব্‌নে মাজাহ শরীফের এক হাদীছে নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন :

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ - الحديث

অর্থাৎ মুমিন বান্দা তাকওয়া অর্জন করার পর সবচেয়ে উত্তম যা অর্জন করে তা হল নেককার স্ত্রী। (ইব্‌নে মাজাহ)

ইসলামপূর্ব যুগে যেখানে পিতার মৃত্যুর পর সন্তানরা পিতার অন্যান্য মালের মত মাকেও পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ মনে করে সেভাবে মায়ের সাথে ব্যবহার করত, সেখানে ইসলাম মাতৃজাতিকে এতটা সম্মান প্রদান করেছে যে, মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত বলে সাব্যস্ত করেছে। মাতৃজাতির জন্য এরচেয়ে বড় সম্মানের বিষয় আর কী হতে পারে যে, তাদের পায়ের তলে (অর্থাৎ তাদের আনুগত্য ও তাদের খেদমতের মধ্যে) তাদের সন্তানের জান্নাত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ - (مسلم)

অর্থাৎ জান্নাত জননীদের কদমের তলে।

ইব্‌নে মাজাহ শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে— হযরত আবু উমামা (রাযি.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ - اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ -

অর্থাৎ মুমিন বান্দা তাকওয়া অর্জন করার পর সবচেয়ে উত্তম যা অর্জন করে তা হল নেককার স্ত্রী। নেককার স্ত্রী হল যার গুণ এমন যে, স্বামী তাকে কোন কাজের হুকুম দিলে সে তা মেনে চলে, স্বামী তার দিকে তাকালে আনন্দ পায়, স্বামী তার ব্যাপারে কোন কসম করলে তা পূর্ণ করতে স্বামীকে সহযোগিতা করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের ও স্বামীর সম্পদের হেফাজত করে।

এ হাদীছে একদিকে নেককার নারীকে উত্তম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাথে সাথে নেককার নারী হতে গেলে কী কী গুণ থাকতে হবে তা-ও বলে দেয়া হয়েছে। এ হাদীছে নেককার নারীর ৫ টি গুণের কথা বলা হয়েছে। যথা—

১. স্বামীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।
২. স্বামীকে আনন্দ দান করা।
৩. স্বামীর কসম পূর্ণ করতে সহযোগিতা করা।
৪. স্বামীর সংসারের মালামাল হেফাজত করা। এবং
৫. সতীত্বের হেফাজত করা।

যে নারীর মধ্যে এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, সে নেককার নারী। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিকভাবে বোঝার ও আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন!

নসীহত-২ (নারীদের জান্নাত লাভের সহজ ব্যবস্থা)

আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষ দুই জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। দুই জাতিকে বিভিন্ন দায়িত্বও প্রদান করেছেন। তার মধ্যে নারীজাতিকে আল্লাহ তাআলা পুরুষদের তুলনায় কিছুটা দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। ফলে তাদের দায়িত্বকেও সহজ করে দিয়েছেন। সংসারের জন্য আয়-উপার্জন করার কষ্ট সহ্য করার দায়িত্ব নারীদের উপর চাপানো হয়নি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গনের ঝামেলা পোহানোর দায়িত্ব নারীদের উপর চাপানো হয়নি। এভাবে অনেক কঠিন ও কষ্টকর কাজ থেকে নারীদের অব্যাহতি দান করে তাদের জীবন ও দায়িত্বকে সহজ করে দেয়া হয়েছে। এক হাদীছে নারীদের জন্য জান্নাত লাভ করারও সহজ ব্যবস্থা বলে দেয়া হয়েছে—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে—রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ زَوْجَهَا

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ. (مشكاة نقلا عن احمد)

অর্থাৎ যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমত আদায় করবে, রমযানে ঠিকমত রোযা রাখবে, সতীত্ব রক্ষা করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর। (আহমদ)

এ হাদীছে নারী সমাজের জন্য জান্নাতে যাওয়ার সহজ ব্যবস্থা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নারীগণ যদি চারটা আমল ঠিকমত করেন তাহলে তারা জান্নাত লাভ করতে পারবেন। সে চারটা আমল হল—

২. ঠিকমত রমযানের ফরয রোযা রাখা।

৩. সতীত্ব রক্ষা করা।

৪. স্বামীর আনুগত্য করা। অর্থাৎ স্বামীর কথা মেনে চলা এবং তার খেদমত করা।

অন্য এক হাদীছে নারী-পুরুষ সকলের উদ্দেশে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.(بخاری، ترمذی)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের যবান ও যৌনাঙ্গকে হেফাযত করার দায়িত্ব নিবে, আমি তাকে জান্নাতে পৌছানোর দায়িত্ব নিয়ে নিব। (বুখারী, তিরমিযী)

সুবহানাল্লাহ!

যবান হেফাজত করার অর্থ হল, যবান দ্বারা কোন গোনাহ হবে না, মিথ্যা বলা হবে না, কারও গীবত শেকায়েত করা হবে না, কাউকে গালি-গালাজ করা হবে না, কাউকে কটু কথা বলা হবে না অর্থাৎ যবান দ্বারা যত প্রকার গোনাহ হতে পারে তা হবে না। আর যৌনাঙ্গকে হেফাযত করার অর্থ হল যৌনাঙ্গ দ্বারা কোন গোনাহ হতে পারবে না। অর্থাৎ সতীত্ব রক্ষা করতে হবে। এই যৌনাঙ্গকে হেফাযত তথা সতীত্বকে হেফাজত করার জন্যই গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। এই মেলামেশা থেকেই শেষ পর্যন্ত যেনার চরম গোনাহ সংঘটিত হয়।

এ হাদীছে একটা বিষয় অতিরিক্ত পাওয়া গেল। তা হল যবান হেফাজত করা। পূর্বের হাদীছে বলা হয়েছে চারটি বিষয় আর এ হাদীছে পাওয়া গেল আর একটি বিষয়। সর্বমোট এই পাঁচটি বিষয় হল, জান্নাত লাভের সহজ উপায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই পাঁচটি বিষয় আমল করে জান্নাত লাভ করার তৎফীক দান করুন। আমীন!

নসীহত-৩ (নারীদের পর্দা প্রসঙ্গ)

নারীদের জন্য পর্দা করা ফরয। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে সূরা আহযাবে ইরশাদ করেছেন :

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ.

অর্থাৎ (হে নারীগণ!) তোমরা গৃহের মধ্যে অবস্থান করবে, অজ্ঞ যুগের নারীদের মত নিজেদের প্রদর্শন করবে না। আর নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।

উক্ত সূরার অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ.

অর্থাৎ হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুমিনদের নারীদের বলে দাও তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এই চাদর উড়নার উপর পরিধান করা হত। এবং চেহারার উপর তা ঝুলিয়ে দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে দেয়া হত। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে— এই চাদর মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হত এবং মাথার উপর দিয়ে ছেড়ে দিয়ে চেহারা ঢেকে দেয়া হত।

এ দুই আয়াতসহ আরও কয়েকটি আয়াত ও একাধিক হাদীছের ভিত্তিতে পর্দা ফরয সাব্যস্ত হয়েছে। পর্দার এই ফরয বিধানকে লঙ্ঘন করে নারী সমাজ আজ সব অঙ্গনে অবাধে বিচরণ করা শুরু করেছে। এক শ্রেণীর মানুষ নারী সমাজকে রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিসহ সব অঙ্গনেই টেনে আনছে। সম্প্রতি এমন কোন অঙ্গন অবশিষ্ট থাকছে না, যেখানে নারীদের টেনে আনা না হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীকে সামনের সারিতে টেনে আনা হয়েছে এবং হচ্ছে। অফিস-আদালতের ছোট-খাট পদ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে পর্যন্ত তাদের টেনে আনা হয়েছে এবং হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে চাঙ্গা করার জন্য মডেলিং ও অ্যাডভারটাইজিংয়ের নামে নারীর কমনীয় অভিব্যক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে এবং তার মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এভাবে অর্থনৈতিক অঙ্গনেও তাদের অন্তর্ভুক্তি ঘটানো হচ্ছে। হেন কোন অঙ্গন নেই, যেখানে আজ নারীত্বের অংশিদারিত্বকে খুব একটা খাট করে ভাবা যায়। নারীত্বের পদচারণা আজ সর্বত্র।

আজ সচেতন নারী সমাজকে ভেবে দেখতে হবে। যারা তাদের এভাবে পর্দার বাইরে টেনে আনছে তাদের যৌন চাহিদা পূর্ণ করা ছাড়া ভিন্ন কোন সু-মতলব নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের মডেলিং ও অ্যাডভারটাইজিংয়েও নারীদের ব্যবহারের পেছনে যৌন সুড়সুড়িকে উসকে দিয়ে গ্রাহক ও ভোক্তাদের চেতনাকে অনুকূলে আনা ব্যতীত অন্য কোন সু-মতলব না থাকার বিষয়টি স্পষ্ট। বিংশ শতাব্দী থেকে "নারী প্রগতি", "নারী মুক্তি", "নারীর অধিকার

প্রতিষ্ঠা" নামে যে সব দর্শন ও আন্দোলন চালু করা হয়েছে, তার পেছনেও এমন কোন মতলব কাজ করছে কি না তা ভেবে দেখতে বা বিশ্লেষণ করতে অসুবিধা কোথায়?

"নারী প্রগতি", "নারী মুক্তি", "নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা", "নারী স্বাধীনতা" প্রভৃতি নামে যে সব দর্শন ও আন্দোলন চালু করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য বুঝতে হলে এসবের হোতাদের হাল-চরিত্র ও মতিগতি দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এসব দর্শন ও আন্দোলনের হোতা এবং উসকানী দাতা হল সেই সব মহল, যারা নারীদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টির চোরা গলি আবিষ্কার ও তাদের অবাধে উপভোগ্য বানাতে সদা তৎপর এবং নারীদের দ্বারা মনোস্কামনা পূর্ণ করতে পারাকে যারা ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করে বৈধতার লেবাস পরানোর অপচেষ্টায় তৎপর। বাহ্যিকভাবে এবং মুখের ভাষায় তারা নারীদের প্রতি দরদ দেখিয়ে বলে থাকে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই তাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য। কিন্তু এতটুকুই যদি তাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হয়ে থাকবে, তাহলে ইসলাম নারীদের সতীত্ব রক্ষার প্রধান নিয়ামক হিসেবে যে পর্দা-ব্যবস্থার কথা বলেছে, সেটাকে তারা নারী প্রগতির অন্তরায় বলে আখ্যা দেয় কেন? কেন তারা পর্দা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে? কেন এই সব হোতাদের এজেন্টরা নারীদের এই শ্লোগান শিক্ষা দেয় যে, স্বামীর ঘরে থাকব না, স্বামীর কথা মানব না, আমার দেহ আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব? স্পষ্টতই বোঝা যায় এসব দর্শনের হোতাদের কাছে নারী স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে নারীর সতীত্ব হরণের অবাধ অধিকার।

নারী প্রগতির নামে তারা নারীদের পর্দার বাইরে এবং পারিবারিক শৃংখলার বাইরে নিয়ে আসতে চায়। আর নারীদের পর্দার বাইরে আনতে সক্ষম হলে এবং তাদের পারিবারিক শাসন শৃঙ্খলার বাইরে আনতে সক্ষম হলে তাদের দ্বারা বদ-মতলব সিদ্ধি করা সহজ হয়ে যায়। কতটা সহজ হয়, তা এখন আর কারও অজানা নেই। আজ এটা ওপেন সিক্রেট যে, প্রগতির নামে, সমাধিকার আদায়ের নামে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতির নামে যে সব অঙ্গনে নারীদের পর্দাহীন প্রবেশ ঘটেছে, তার একটা সিংহভাগ কীভাবে যেনার আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। এ বিষয়টা কার অজানা আছে যে, চাকুরীরতা নারীদের চাকুরী রক্ষার স্বার্থে উপরস্থদের কাছে অনেক কিছু বিক্রি করতে হয়? প্রাইভেট সার্ভিসগুলোতে এ বিষয়টা এতটাই উলঙ্গ যে, পার্টির মাধ্যমে কোম্পানীর বিভিন্ন এজেন্টকে মনোরঞ্জনের দায়িত্ব দেয়া হয় নারীর

উপর। অন্যথায় চাকুরী যাওয়ার হুমকী। নারী প্রগতির এক নম্বর হোতা স্বয়ং মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র একবার উল্লেখ করেছিলেন যে, ইউরোপে অবস্থানরত মার্কিন সেনাবাহিনীতে বর্তমানে এক সহস্রাধিক মহিলা সৈন্য রয়েছে। কিন্তু তাদের দায়িত্ব পালনে নানা বিঘ্ন ঘটে। এই বিঘ্নটা যে কোথায় তা বুঝতে কোন বেগ পেতে হয় না।

"নারী প্রগতি", "নারী মুক্তি", "নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা", "নারী স্বাধীনতা" প্রভৃতি দর্শনের হোতা পশ্চিমাদের দেশগুলোতে এসব দর্শন বাস্তবায়নের পরিণতি কী দাঁড়িয়েছে, তার প্রতিও আমাদের চোখ-কান খোলা রাখা উচিত। নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির প্রধান দেশ হিসেবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়, সেসব দেশে এই তথাকথিত নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার পরিণতিতে এখন জারজ সন্তানের সংখ্যা অগণিত।

আমাদের কাছে অনেক বৎসর পূর্বের একটা সমীক্ষা রয়েছে, তাতে দেখা যায় একমাত্র ১৯৭৯ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬ লাখ অবৈধ শিশু জন্ম নিয়েছে। শ্বেতাঙ্গ কুমারীদের এক-তৃতীয়াংশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ কুমারীদের শতকরা ৮৩ জনের অবৈধ সন্তান রয়েছে। 'নারী প্রগতি' ও 'নারী স্বাধীনতার' দ্বিতীয় স্বর্গরাজ্য হল ইংল্যান্ড। সেখানে ১৯৮০ সালে অনূর্ধ্ব ১৬ বৎসরের ৪ হাজার বালিকা গর্ভপাত করেছে। পাঁচজন নবজাতকের মধ্যে তিন জনই সেখানে কিশোরী মাতার সন্তান। আর প্রতি বছরই নাকি শতকরা ৫ ভাগ অবৈধ সন্তান বেড়ে চলেছে। 'নারী প্রগতি' ও 'নারী স্বাধীনতার' আর এক প্রতীকী রাষ্ট্র ফ্রান্সের অবস্থাও এর চেয়ে তেমন ব্যতিক্রম নয়। এ হল বহু পুরাতন একটা সমীক্ষা। এর ক্রমবর্ধমান ধারায় বর্তমানে অবস্থা কতদূর এসে দাঁড়িয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহলে কি "নারী প্রগতি", "নারী মুক্তি", "নারী স্বাধীনতা" ইত্যাদি দর্শনের হোতারা আমাদের দেশেও অনুরূপ পরিণতি দাঁড় করাতে চায়? আর তারা চাইলেই কি আমাদের তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করা সমীচীন হবে? পরিণতি আরও খারাপ হওয়ার পূর্বেই কি বিবেকবান নারী সমাজের এ বিষয়টা ভেবে দেখা উচিত নয়?

যখন "নারী প্রগতি", "নারী মুক্তি", "নারী স্বাধীনতা" ইত্যাদি নামে নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, উলঙ্গপনা ও বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে বলা হয় এবং নারীদের ইসলামী পর্দা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়, তখন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বলে ওঠে এগুলো প্রগতিপরিপন্থি, এগুলো সেকেলে জিনিস,

বিজ্ঞানের যুগে এগুলো অচল। এগুলো দিয়ে উন্নতি করা যাবে না, এভাবে আমাদের সমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, ইত্যাদি। তারা পাশ্চাত্যের উদাহরণ তুলে ধরে থাকে যে, তারা এই সমস্ত সেকেলে আদর্শ ছেড়ে দিয়েছে, তাই তারা উন্নতি করেছে। তারা বলে : নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, উলঙ্গপনা, নারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাওয়া— এসবের ফলেই পাশ্চাত্য সমাজ উন্নতি করেছে। কিন্তু একথা আদৌ ঠিক নয়। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, উলঙ্গপনার দ্বারা আসলে কোন উন্নতি হয় কি? এর দ্বারা অর্থনীতির কী উন্নতি হবে? অফিস-আদালতের অনিয়ম কি এর দ্বারা দূর হবে? এর দ্বারা কি দূর্নীতি দূর হবে? এর দ্বারা কি কর্মদক্ষতা বাড়বে? এর দ্বারা কি কাজের নিষ্ঠা বাড়বে? এর দ্বারা কি দায়িত্ব বোধ বাড়বে? একজন নারীকে অফিস-আদালতে উলঙ্গ করে রাখলে তাতে কি পুরুষদের কাজের চিন্তা বৃদ্ধি পাবে না কুকাজের চিন্তা বৃদ্ধি পাবে? একটু বিবেক দিয়ে মুক্তমনে চিন্তা করে দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায় আসলে উন্নতি হয় নিষ্ঠা, সততা, দায়িত্ববোধ এই সমস্ত গুণের কারণে। এসব গুণের দ্বারাই উন্নতি আসে। এগুলোতো ইসলামের শিক্ষা দেয়া নীতি। পশ্চিমারা এই ইসলামী শিক্ষা ও নীতি গ্রহণ করেছে, ফলে তারা উন্নতি করেছে। অথচ আমরা ভাবছি তারা উন্নত হয়েছে উলঙ্গপনা ও বেহায়া বেলেল্লাপনার কারণে। কিন্তু আদৌ উলঙ্গপনার কারণে, বেহায়া, বেশরম হয়ে যাওয়ার কারণে তারা উন্নত হয়নি। যেগুলো ইসলামের শিক্ষা দেয়া উন্নতির মূলনীতিগুলো অবলম্বন করার ফলেই তারা উন্নতি করেছে। আমরা মুসলমানরা সেসব অবলম্বন করছি না, তাই উন্নতি করতে পারছি না। এ হিসেবে বলা যায় পাশ্চাত্যের লোকেরা উন্নত হয়েছে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামী নীতি গ্রহণ করার ফলে। অথচ আমরা মনে করছি তারা উন্নত হয়েছে ইসলাম বর্জন করার ফলে। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা তা-ই সমাজকে গলাধঃকরণ করানোর চেষ্টা করছে। মানুষকে ইসলাম থেকে সরানোর জন্যই পরিকল্পিতভাবে এরূপ করা হচ্ছে। ইসলামী আদর্শের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্যই এরূপ বলা হচ্ছে। ইসলামী আদর্শে মানুষ উন্নতি করতে পারে না, এগুলো মানুষকে পিছনের দিকে নিয়ে যায়। এসমস্ত কথা বলে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। অথচ খাঁটিভাবে চিন্তা-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উন্নতি হয় ইসলামের নীতিমালা অনুসরণ করলে। যে ক্ষেত্রে ইসলামের যে নীতিমালা রয়েছে, সে

ক্ষেত্রে উন্নতি চাইলে ইসলামের সেই নীতিগুলো অনুসরণ করতে হবে। অথচ মানুষকে বিভ্রান্তিমূলক কথা বলে বোঝানো হয় যে, ইসলাম বর্জন করার মধ্যেই উন্নতি। আর কিছু মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করে তাদের সুরে সুর মিলাচ্ছে। অবলা মুসলিম নারী সমাজ তাদের কথায় সরল বিশ্বাসে নিজেদের অমূল্য সম্পদ সতীত্ব বিসর্জনের পথে পা বাড়াচ্ছে। তারা তাদের নারীত্ব ও সহজাত বৃত্তির বিনাশ সাধনের পথে পা বাড়াচ্ছে। তারা মুসলিম মাতৃজাতির কলঙ্কের পথে পা বাড়াচ্ছে।

আজ মুসলিম নারী সমাজকে ভেবে দেখতে হবে নারী মুক্তির মোহময় শ্লোগানে মোহিত হয়ে বেহায়া বেলেল্লার মত রাস্তা-ঘাট আর ক্লাব-পার্কে চলাফেরার পথ বেছে নিয়ে তথা নৈতিক নিরাপত্তার আশ্রয় ছেড়ে মান-ইজ্জত, সতীত্ব ও সহজাত বৃত্তির সর্বনাশ সাধনের পথে পা বাড়ানো কতটুকু বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে।

নারী সমাজকে মনে রাখতে হবে তাদের সহজাত বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধন ও তাদের সতীত্ব রক্ষার অধিকারকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যেই তাদের জন্য পুরুষ থেকে ভিন্ন কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যেই পর্দাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যেই পুরুষের প্রতি নির্দেশ এসেছে গায়র মাহরাম নারী থেকে দৃষ্টিকে নত রাখার। এ লক্ষ্যেই পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে গায়র মাহরাম নারীদের দিকে নজর দেয়া, যাতে তাদের মনে পর নারীর সতীত্ব হরণের লোভ উদ্বেলিত হতে না পারে। এ লক্ষ্যেই পুরুষদের প্রতি হারাম করা হয়েছে পরনারীর সংসর্গ বা কোন উপপত্নী রাখাকে।

নারী সমাজকে সুস্থ মস্তিষ্কে বুঝতে হবে যে, ইসলাম তাদের কোণঠাসা করার জন্য বহিরাঙ্গন থেকে দূরে রাখতে চায় না। বরং প্রথমতঃ কথা হল তাদের সহজাত বৃত্তির বিকাশ সাধনের স্বার্থেই তাদের জন্য কর্মক্ষেত্র রাখা হয়েছে পর্দার অন্তরালে। বহিরাঙ্গন তাদের সহজাত বৃত্তির অনুকূল নয়। দৈহিক, মানসিক কোনভাবেই বহিরাঙ্গন নারীত্বের অনুকূল নয়। নারীদের ঘরের বাইরে কর্মসংস্থানের পক্ষে এককালে যে সোভিয়েত রাশিয়ার উদাহরণ পেশ করা হত স্বয়ং সেই সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের প্রাক্কালে তদানিন্তন কম্যুনিষ্ট নেতা গরবাচেভ সাহেবও এটা স্বীকার করেছিলেন যে, নারীরা বহিরাঙ্গনকে কর্মক্ষেত্র বানিয়ে তাদের নারীত্ব হারাতে বসেছে, গৃহই তাদের কর্মসংস্থান হওয়া উচিত বলে তিনি মত ব্যক্ত করেছিলেন।

তদুপরি জাতির ভবিষ্যৎ আজকের শিশুকে দৈহিক ও মানসিক সব দিক থেকে গড়ে তোলার গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য পুরুষদের থেকে তাদের কর্মক্ষেত্রকে ভিন্ন রাখা হয়েছে। নারীদের সতীত্ব ও চরিত্র রক্ষার সব ব্যবস্থা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে। কেননা, সন্তানের চরিত্রে মায়ের চরিত্রের বিরাট ভূমিকা থাকে। মায়ের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা যেমন, সন্তানের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনাও তেমনই গড়ে ওঠে। ইতিহাস সৃষ্টিকারী, সুস্থ সমাজ বিনির্মাতা সৎ ও মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের চিন্তা-চেতনা ও চরিত্র গঠনে মায়েদের চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। সুতরাং মায়েরা তাদের চরিত্র ও মন-মানসিকতা সুস্থ রাখার মাধ্যমে সুস্থ সবল ও আদর্শ সমাজ গঠনে অলক্ষ্যে যে অবদান রাখতে পারেন, তা পুরুষদের বহিরাঙ্গনে অবদানের চেয়ে কোন অংশেই খাটো নয়।

নারী সমাজকে আরও মনে রাখতে হবে মানবতার মুক্তি, সর্বোপরি পরকালের মুক্তিই হল প্রকৃত মুক্তি। প্রয়োজন অনুপাতে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়োজনীয়তাও উপেক্ষার নয়, কোন নারী কোন ক্ষেত্রে স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হলে তা থেকেও তাকে মুক্তির সুষ্ঠু পন্থা গ্রহণ করতে হবে বৈকি। তবে এই সব মুক্তির অজুহাতে কোনক্রমেই যেন নারী সমাজ তাদের আসল মুক্তি থেকে বঞ্চনার পথ রচনা করে না বসে।

অনেক মা-বোন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধান পালন করাকে জরুরী মনে করেন, কিন্তু পর্দা মানাকে জরুরী মনে করেন না। অথচ পর্দার বিধান ফরয। পর্দা লঙ্ঘন করা হারাম। পর্দা লঙ্ঘন করলে কবীরা গোনাহ হয়।

অনেক মা-বোন ভাবেন—পর্দা মেনে চলতে গেলে দম আটকে মরে যাব। অথচ তারা কি ভেবে দেখেন না যারা পর্দা মেনে চলছেন তারা কি দম আটকে মরে যাচ্ছেন? আসলে নিজেকে যেভাবে অভ্যস্ত করানো যাবে, তা-ই ভাল লাগবে।

অনেক মা-বোন পর্দাকে খুব কঠিন মনে করেন। তারা ভাবেন পর্দা মেনে চলা সম্ভব নয়। অথচ তারা ভেবে দেখেন না যারা পর্দা মেনে চলছেন তাদের পক্ষে কী করে সম্ভব হচ্ছে? বরং যারা মেনে চলছেন তাদের পক্ষে পর্দা লঙ্ঘন করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। পর্দা মেনে চলতেই তাদের ভাল লাগে, পর্দা লঙ্ঘন করতে তাদের কাছে খারাপ লাগে। বোঝা গেল অভ্যাস করলে পর্দা মানা আর কষ্টকর থাকে না। তাই হিম্মত করে পর্দা শুরু করে দেয়া চাই।

অনেক মা-বোন মনে করেন পর্দা মেনে চলতে গেলে আত্মীয়-স্বজনরা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তারা মনে করে সে বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার মধ্যে কোন আনন্দ নেই। কারণ, সকলের সাথে দেখা সাক্ষাত করা যায় না। কিন্তু ভেবে দেখা উচিত কোন আত্মীয়-স্বজনকে খুশী করা বড় না কি আল্লাহ্‌কে খুশী করা বড়? আল্লাহ্‌র হুকুম মানার কারণে যদি কোন আত্মীয় অখুশী হয়, তাহলে সেই অখুশীর কোন পরওয়া করা চাইনা।

অনেক মা-বোন মনে করেন পর্দা মেনে চলতে গেলে ইচ্ছামত এখানে সেখানে যাওয়া যাবে না, ইচ্ছামত সকলের সাথে মেলামেশা করা যাবে না। ফলে জীবনের আনন্দ ফুর্তি সব শেষ হয়ে যাবে। অথচ তারা ভেবে দেখেন না যারা পর্দা মেনে চলছেন তাদের জীবন কি আনন্দহীন? বরং পর্দা মেনে চললে তাদের পারিবারিক জীবনের আনন্দ অটুট থাকে। পর্দা মেনে না চললে পর পুরুষদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও মেলামেশা করলে অনেক সময় স্বামীর মনে সন্দেহ দেখা দেয় এবং তার থেকে স্বামী স্ত্রীর পারিবারিক জীবনে অশান্তি আসে। আবার অনেক সময় পর্দাহীনভাবে পর পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ, হাসি তামাশা ও অবাধ মেলামেশার ফলে অবৈধ মেলামেশা পর্যন্ত হয়ে যায়। পর্দায় থাকলে এ সমস্ত অঘটন হতে পারে না। পর্দা হল তাই নারীর সতীত্ব রক্ষার সবচেয়ে বড় উপায়। পর্দা পারিবারিক জীবনে সন্দেহ সৃষ্টির পথকে বন্ধ করে দেয়। পর্দা লঙ্ঘন করলে পারিবারিক জীবনে অশান্তি আসে।

পক্ষান্তরে পর্দা রক্ষা করলে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে সন্দেহ আসতে পারে না, স্ত্রীর মন অন্য কোন পুরুষের দিকে যেতে পারে না, স্বামীর দিকেই তার সব দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, স্বামীও শরীয়তসম্মত পর্দার বিধান মেনে চললে এবং পরনারীর প্রতি দৃষ্টি না দিলে তার মনও অন্য নারীর দিকে ঝুকতে পারে না বরং স্ত্রীর দিকেই তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিবদ্ধ থাকে। এভাবে পর্দার বিধান রক্ষা করলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের দৃষ্টি নিজেদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে এবং তাদের ভালবাসা অটুট থাকে, তাদের পারিবারিক জীবন শান্তিময় থাকে। পর্দার বিধান তাই ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের দৃষ্টিতে একটি সুন্দর বিধান।

পর্দার বিধান লঙ্ঘন করার ফলে আজ সমাজে যেনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এক শ্রেণীর লোক যারা নারীদেরকে অবাধে ভোগ করতে চায়, তারাই পর্দার বিপক্ষে অপপ্রচার চালিয়ে নারী সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। তারা বলছে পর্দা-ব্যবস্থা সেকেলে প্রথা, আধুনিক যুগে এই সেকেলে ব্যবস্থা চলতে পারেনা, পর্দা-ব্যবস্থা নারী সমাজকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায় ইত্যাদি।

এভাবে অপপ্রচার চালিয়ে তারা নারী সমাজকে পর্দার বাইরে এনে যেনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরলমতি নারী সমাজের অনেকে তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে অফিস-আদালত, স্কুল কলেজের বহু স্থান আজ যেনার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ সকলকে সুস্থ বিবেক দান করুন। পর্দার ফায়দা বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

কোন কোন বিভ্রান্ত মহিলা বলে থাকে যে, পর্দা হল মনের ব্যাপার; মন ঠিক থাকলে সব ঠিক। এভাবে তারা বুঝাতে চায় যে, মন ঠিক হয়ে গেলে আর বাইরের পর্দার দরকার হয় না। এটা একটা বিভ্রান্তিকর কথা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবি এবং কন্যাদেরকে পর্দা করতে বলতেন, তাহলে কি তাদের মন ঠিক হয়েছিল না? নাউযু বিল্লাহ! এসব বিভ্রান্তিকর কথা বলে মানুষকে হয়তো চুপ করানো যাবে, কিন্তু আল্লাহ্র কাছে পার পাওয়া যাবে না। কুরআন-হাদীছে কোথাও এ কথা নেই যে, মন ঠিক হয়ে গেলে পর্দার দরকার হয় না, মন ঠিক হয়ে গেলে পর্দার হুকুম উঠে যায়।

অতএব সব রকম ওয়াসওয়াসা পরিত্যাগ করে পর্দার ফরয বিধান পালন করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে এবং পর্দার বিস্তারিত মাসায়েল জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। পর্দার বিস্তারিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৫৩৩ পৃষ্ঠা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গভাবে শরীয়তের পর্দার বিধান মান্য করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

নসীহত-৪ (নারীদের সাজ-সজ্জা প্রসঙ্গ)

নারীদের জন্য ইসলাম সাজগোছের বিধান রেখেছে। বিশেষতঃ স্বামীর জন্য স্ত্রী সাজগোছ করবে এটা স্বামীর অধিকার। স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সাজগোছ করা নারীর উপর কর্তব্য। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার হল— স্ত্রী স্বামীর উদ্দেশ্যে ঘরে সাজগোছ করে থাকবে। স্বামীর এই অধিকার খুব শক্ত অধিকার। এমনকি ফেকাহ্র কিতাবে মাসআলা বলা হয়েছে— যত কারণে স্বামী স্ত্রীকে মারধর করতে পারে, তার ভিতরে এটাও একটা। স্ত্রী যদি ঘরে সাজগোছ করে না থাকে, তাহলে স্বামী এর জন্য স্ত্রীকে মার দিতে পারে। স্বামীর মনোরঞ্জন বৈবাহিক জীবনের একটা বড় উদ্দেশ্য। স্ত্রী ঘরে সাজগোছ করে না থাকলে স্বামীর মনোরঞ্জনে ব্যাঘাত ঘটবে, এভাবে বৈবাহিক জীবনের একটা বিরাট ক্ষতি সাধিত হবে। তাই শরীয়ত এ বিষয়টাকে শক্ত করে দেখেছে।

স্ত্রী যেন প্রয়োজনীয় সাজগোছ করতে পারে এ জন্য স্বামী স্ত্রীকে সাজগোছের মত প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় প্রদান করবে। তবে প্রত্যেক ঈদ আসলে নতুন নতুন কাপড়-চোপড় দিতে হবে, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠান আসলে নতুন নতুন কাপড়-চোপড়, নতুন নতুন গয়না-সাজনা দিতে হবে এটা স্বামীর দায়িত্ব নয়। বরং এই মানসিকতাই ভাল নয় যে, নতুন নতুন অনুষ্ঠান আসলেই প্রত্যেকবার নতুন নতুন শাড়ী গয়না চাই। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে গেলে প্রত্যেকবার নতুন নতুন সেট চাই, এই মানসিকতাই ভাল নয়। নারীদের মনোভাব এই থাকতে হবে যে, আমার সাজগোছ যা কিছু করার আমি ঘরে করব, যা কিছু দেখানোর স্বামীকে দেখাব, বাইরের লোককে নয়। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় মহিলাদের মানসিকতা হল এর উল্টো। ঘরে স্বামীর কাছে থাকে বিধবার মত আর বাইরে যাওয়ার সময় সাজগোছের বাহার কে দেখে! যেন বাইরের লোকদেরকে সৌন্দর্য দেখানোর জন্য যাচ্ছে। অথচ কুরআন শরীফে এটা নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى.

অর্থাৎ তোমরা জাহিলী যুগের নারীদের মত সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য বের হয়ো না। (আহ্যাব : ৩৩)

বোঝা গেল বাইরে সাজগোছ করে যাবে না। মহিলাগণ প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে যাবে সাদামাঠা ভাবে। যাতে তার প্রতি পর পুরুষের নজর পড়ে গেলেও পর পুরুষের নজর খারাপ না হয়। কিন্তু মহিলারা চলছে উল্টো। তারা বাইরে খুব সাজগোছ করে যায়, যার ফলে পর পুরুষের নজর খারাপ হয়। আবার ঘরে সাজগোছ না করার কারণে স্বামী ঘরে এসে দেখে বিবির রূপ সৌন্দর্য কিছুই নেই, তখন বাইরে গিয়ে অন্য নারীদের রূপ সৌন্দর্যের প্রতি সে আকর্ষণবোধ করে। এভাবে স্বামীরও নজর খারাপ হয় এবং এক পর্যায়ে এটা তার চরিত্র নষ্টেরও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সাজগোছ হতে হবে বৈধ পন্থায়। অত্র গ্রন্থের ৫৩৭-৫৪১ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান এবং কী কী পন্থায় সাজগোছ করা বৈধ এবং কি কি পন্থায় বৈধ নয়, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

নসীহত-৫ (স্বামীর খেদমত প্রসঙ্গ)

স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের হুকুম মান্য করার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্বামীর খেদমত এবং স্বামীর আনুগত্য করা। স্ত্রীর কাছে স্বামীর সেবা এত বড় জিনিস যে, স্বামীর সেবা করে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে আল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন না। স্ত্রীর কাছে স্বামী এত বড় যে, এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَوْ كُنْتُ اٰمُرُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔(ترمذی)

অর্থাৎ আমি যদি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সাজদা করার জন্য কাউকে নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম সে তার স্বামীকে সাজদা করবে। (তিরমিযী)

স্বামীর খেদমত করে স্বামীকে খুশি করা ব্যতীত কোন নারী জান্নাত লাভ করতে পারবে না, স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে কোন নারী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করা হল:

তিরমিযী শরীফের হাদীছে এসেছে— হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বয়ান করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ۔(ترمذی)

অর্থাৎ যে মহিলা এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অন্য এক হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَا تُؤْذِىْ امْرَاَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا اِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهٗ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ
قَاتَلَكِ اللّٰهُ هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ اَنْ يُفَارِقَكِ اِلَيْنَا۔(ترمذی)

অর্থাৎ যখনই কোন স্ত্রীলোক দুনিয়াতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনই জান্নাতের ঐ স্বামীর জন্য নির্ধারিত হুর বলে হে নারী! তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনিতো তোমার কাছে বিদেশী মেহমানের মত। অচিরেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন।

অন্য এক হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ : اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى مَوَالِيْهِ فَيَضَعَ يَدَهٗ فِيْ اَيْدِيْهِمْ . وَالْمَرْاَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصْحُوَ .(رواه البيهقي في شعب الايمان)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির নামায কবূল হয় না এবং তাদের নেকী আসমানের দিকে উত্তোলিত হয় না।

১. পলাতক গোলাম, যাবত না সে তার মনিবের কাছে ফিরে তার হাতে ধরা দেয়।

২. সেই নারী, যার উপর তার স্বামী নারায, যাবত না সে তার স্বামীকে রাজি করে নেয়।

৩. মাতাল, যাবত না সে হুশে আসে।

অন্য এক হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَلَمْ تَأْتِهٖ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ .(متفق عليه)

অর্থাৎ যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, কিন্তু সে না আসে এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, সেই স্ত্রীর প্রতি সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা অভিশাপ দিতে থাকে। এই রেওয়ায়েতের অন্য এক বর্ণনায় আছে—যে স্ত্রী তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে রাত কাটায়, ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ امْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهَا فَتَاْبٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا .(متفق عليه)

অর্থাৎ সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে, তাহলে স্বামী তার প্রতি খুশি না হওয়া পর্যন্ত আসমানে যিনি আছেন তিনি (অর্থাৎ খোদা) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। (এ হাদীছে স্পষ্টতঃ বোঝা গেল স্বামীকে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায় না।)

নাসায়ী শরীফের এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতের একাংশে এসেছে— রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وَنِسَآءُكُمْ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَلُوْدُ وَالْوَدُوْدُ الَّتِىْ اِذَا غَضِبَ اَوْ غَضِبَتْ جَاءَتْ حَتّٰى تَضَعَ يَدَهَا فِىْ يَدِ زَوْجِهَا ثُمَّ تَقُوْلُ لَا اَذُوْقُ غَمْضًا حَتّٰى تَرْضٰى ـ (نسائى)

অর্থাৎ তোমাদের ঐ নারীগণও জান্নাতী, যে অধিক পরিমাণে সন্তান জন্ম দেয়। অধিকন্তু স্বামীর রাগান্বিত অবস্থায় বা নিজের রাগের অবস্থায় স্বামীর কাছে এসে স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আমি নিদ্রার স্বাদ গ্রহণ করছি না যতক্ষণ না আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। এভাবে সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে নেয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিকভাবে বোঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

নসীহত-৬ (নারীদের বিশেষ দুটি দোষ প্রসঙ্গ)

শোকর আদায় করা ওয়াজেব। আল্লাহ্‌র নেয়ামত বা অনুগ্রহের শোকর আদায় করা ওয়াজেব। এমনিভাবে যে কোন মানুষ এহসান বা অনুগ্রহ করলে তার শোকর আদায় করা ওয়াজেব। কিন্তু নারীদের মধ্যে দেখা যায় না শোকরীর মনোভাব বেশী। বিশেষতঃ তারা স্বামীর না শোকরী বেশী করে থাকে। অথচ স্বামীর প্রতি বেশী শোকরের মনোভাব থাকা উচিত ছিল।

মহিলাদের এই না শোকরীর মনোভাব প্রসঙ্গে বোখারী শরীফের এক হাদীছে এসেছে : একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের এক মজলিসে ওয়াজ করছিলেন। ওয়াজের এক পর্যায়ে মহিলাদের এই বিশেষ দুটি দোষের কথা উল্লেখ করে বললেন :

يَا مَعْشَرَ النِّسَآءِ تَصَدَّقْنَ . فَاِنِّىْ رَاَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ ـ

অর্থাৎ হে মহিলারা! তোমরা বেশী বেশী করে দান-সদকা কর। কারণ জাহান্নামে দেখেছি তোমাদের মহিলাদের সংখ্যা বেশী। দান-সদকার কারণে তোমাদের পাপ মোচন হবে। এভাবে তোমরা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে। তখন এক বুদ্ধিমতী মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা নারীরা জাহান্নামে সংখ্যায় বেশী থাকব, তার কারণ কি? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ ـ (بخارى)

অর্থাৎ তার বিশেষ দুটো কারণ- এক হল তোমরা বেশী বেশী অভিশাপ দাও। আর এক হল তোমরা স্বামীর না শোকরী কর।

বাস্তবেও আমরা দেখতে পাই মহিলাদের মধ্যে এই দুটো বদ-অভ্যাস খুব বেশী। এক হল তারা মানুষকে খুব বেশী অভিশাপ দেয়। কথায় কথায় অভিশাপ দেয়। এমনকি যে সন্তানকে তারা এত বেশী আদর করে, কথায় কথায় তাদেরকেও অভিশাপ দেয়। তুই মর, তোর মওত হয় না? আজরাঈল তোকে চোখে দেখে না? তোর কলেরা হোক, যক্ষ্মা হোক, মরতে পারিস না? এই সব ভাষায় অভিশাপ দিতে থাকে। এরকম অভিশাপ দেয়া মহিলাদের একটা বদ-অভ্যাস। তাদের আর একটা বদ-অভ্যাস হল—স্বামীর না শোকরী করা। একজন স্বামী সারা জীবন তার স্ত্রীকে পছন্দসই কাপড়-চোপড় দিবে, এরপর কোন একবার যদি আর্থিক টানা-টানি বা কোন কারণে এমন কিছু দিল যা স্ত্রীর তেমন পছন্দ হল না, ব্যস! বলে বসবে জীবনে কোন দিন পছন্দসই কিছু দিলে না, সারা জীবন এই রকম বাজে জিনিস দাও, যা কোন মানুষের রুচিতে ধরে না, ইত্যাদি। অথচ সারা জীবন সে বলে এসেছে খুব সুন্দর হয়েছে, খুব পছন্দ হয়েছে! এই একবারের কারণে সবটার না শোকরী করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাদীছে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন:

لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ. ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ خَيْرًا مِنْكَ قَطُّ۔(بخاری)

অর্থাৎ সারা জীবন যদি তাদের কারও প্রতি ভাল সবকিছু কর, তারপর একবার কোন কিছু তার মনঃপূত না হয়, তাহলে বলে বসবে জীবনে কোন দিন তোমার থেকে ভাল কিছু পেলাম না।

এই না শোকরীর মনোভাব থেকে আল্লাহর নেয়ামতের না শোকরী পয়দা হবে। মানুষের না শোকরী করার মনোভাব থেকে আল্লাহ পাকের না শোকরী করার মনোভাব এসে যাবে। আল্লাহর বান্দা আমাকে সারা জীবন কি দিল তা দেখলাম না বরং একবার কি দিল না তাই দেখলাম— এ থেকে এই অভ্যাস আসবে যে, আল্লাহ আমাকে কত নেয়ামত দিয়েছেন, সেগুলো দেখব না, বরং কি দেননি শুধু সেটা দেখব। এর থেকেই আল্লাহর না শোকরী আসবে। এভাবে বান্দার না শোকরী করলে আল্লাহর না শোকরী এসে যায়। হাদীছে এসেছে:

لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ۔(فتح الباری)

অর্থাৎ যে মানুষের শোকর আদায় না করে, সে আল্লাহর শোকরও আদায় করতে পারে না।

না শোকরী করা মারাত্মক গোনাহ, কবীরা গোনাহ্। আল্লাহর না শোকরী করাও কবীরা গোনাহ, বান্দার না শোকরী করাও কবীরা গোনাহ্। যাহোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মহিলাদের ভিতরে দ্বিতীয় দোষ হল তোমাদের ভিতরে না শোকরীর স্বভাব আছে।

আমাদের মহিলাদের এই দুই ধরনের দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার বিশেষ ভাবে প্রচেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন!

নসীহত-৭ (মৃত্যুর স্মরণ প্রসঙ্গ)

আমরা এই দুনিয়ায় চিরস্থায়ী বসবাস করার জন্য আসিনি। দুনিয়া থেকে আমাদের সকলকেই বিদায় নিতে হবে। এই দুনিয়া আমাদের আসল বাড়ি নয়, আমাদের আসল বাড়ি হল পরকালে। তাই আসল বাড়ির জন্য ফিকির করা চাই। দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী বাড়ির জন্য আমাদের কত চিন্তা, কিন্তু আসল বাড়ির জন্য আমাদের তেমন চিন্তা নেই। মনের মধ্যে আসল বাড়ির চিন্তা বৃদ্ধি করার জন্য বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করা চাই। মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করলে পরকালের চিন্তা বৃদ্ধি পাবে, ফলে আমলের চিন্তা বাড়বে। বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করলে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের চিন্তা কমে যাবে, দুনিয়ার আরাম আয়েশের চিন্তা কমে যাবে। বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করলে রিপুর কামনা খুব সহজেই কাবু হয়ে আসবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ-(ترمذی وابن ماجة)

অর্থাৎ বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ কর, তাহলে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও দুনিয়ার স্বাদের চিন্তা মন থেকে মুছে যাবে।

যারা দুনিয়ায় ভোগ-বিলাসের চিন্তায় মত্ত থাকে, তারা আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যায়। আর আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ায় ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকলে তাদেরকে আখেরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই শাস্তি কবর থেকেই শুরু হয়ে যাবে। কবর থেকে নয় বরং মৃত্যুর সময় থেকেই তাদের কষ্ট শুরু হয়ে যাবে।

মৃত্যুর কষ্ট অত্যন্ত ভয়াবহ। মৃত্যুর যন্ত্রণা অত্যন্ত ভয়াবহ। ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী (রহ.) বয়ান করেছেন : হযরত ওমর (রাযি.) হযরত কা'ব (রাযি.)কে বলেছিলেন : মৃত্যুর অবস্থা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। হযরত কা'ব (রাযি.) বললেন : মৃত্যু হল কাঁটাদার বৃক্ষের ন্যায়, যা মানুষের

উদরে প্রবিষ্ট করা হয়, তার প্রতিটি কাঁটা মানুষের শিরায় শিরায় লেগে যায়, অতঃপর তা একজন শক্তিশালী মানুষ উল্টো দিকে সজোরে টেনে বের করে। তখন মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে মনে হয় তার শরীরের গোশ্‌তগুলো যেন সেই কাঁটার সাথে বেরিয়ে আসছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযি.) বলেন : আমার পিতা প্রায়ই বলতেন— ঐ লোককে দেখলে আমার ভীষণ আশ্চর্যবোধ হয়, যার শরীরে মৃত্যুর লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে চেতনাবোধও আছে, সে কথাও বলতে পারে; তারপরও সে কেন আমাদেরকে মৃত্যুর অবস্থাটা বলে না! খোদার কী কুদরত! তারপর আমার পিতার যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল তখন তাঁর অনুভূতি সম্পূর্ণ সচল ছিল, কথাবার্তাও স্পষ্ট বলতে পারছিলেন। আমি তখন বললাম, আব্বাজান! আপনার এই অবস্থাতে মানুষ মৃত্যুর হাকীকত বলতো না বলে আপনি বিস্ময়বোধ করতেন। অথচ আজ আপনি সেই অবস্থায় উপনীত হয়েছেন, আপনার অনুভূতিও সচল আছে, কথাও বলতে পারছেন, তবুও কেন আপনি মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই বলছেন না? আজ আপনি আমাদেরকে মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বলুন।

তখন হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন : বৎস! মৃত্যুর প্রকৃত অবস্থা তো বর্ণনার ঊর্ধ্বে। তার বর্ণনা প্রদান করা সম্ভব নয়; তবুও আমি কিছুটা বলছি—

খোদার কসম! আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার কাঁধের উপর বিশাল পাহাড় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে তার চাপে সুচের ছিদ্র দিয়ে আমার প্রাণ বেরিয়ে আসছে। আমার পেটের ভিতর মনে হচ্ছে কাঁটায় কাঁটায় পূর্ণ। মনে হচ্ছে আকাশ পৃথিবীর সাথে এসে মিলে গেছে। আর আমি তার মাঝখানে চাপা পড়ে পিষ্ট হচ্ছি।

হযরত ঈসা (আ.)-এর এই মুজিযা ছিল যে, তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেখাতে পারতেন। একবার এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে আবেদন করল : আপনি তো সদা মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে থাকেন। একবার অনেক পুরাতন একজন মৃতকে জীবিত করে দেখাবেন কি? তখন তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সামকে আল্লাহ্‌র নির্দেশে জীবিত করলেন। তিনি যখন কবর থেকে উঠলেন তখন তার মাথার চুল এবং দাড়ি ছিল সম্পূর্ণ সাদা। হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন : এগুলো সাদা কেন,

আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে মারা যাননি? তিনি বললেন : আমি যখন মৃত্যুর আহবান শুনেছি তখন মনে করেছি কিয়ামত বুঝি উপস্থিত। আর সেই ভয়েই এগুলো সাদা হয়ে গেছে। হযরত ঈসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন : কত বৎসর পূর্বে আপনার মৃত্যু হয়েছে? তিনি বললেন : চার হাজার বছর পূর্বে, কিন্তু এখনও মৃত্যুর স্বাদ শেষ হয়নি।

আমরা সকলেই জানি এবং মুখেও বলি যে, আমাদেরকে মরতে হবে, কিন্তু আমরা মৃত্যুর জন্য এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি না। বিখ্যাত দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গ হযরত শাকীক ইবনে ইবরাহীম (রহ.) বলতেন : সকলেইতো বলে— মৃত্যু অবশ্যই হবে। অথচ তাদের আমল দেখে মনে হয় না সে কোনদিন মৃত্যুবরণ করবে। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ যর গিফারী (রাযি.) বলেছেন : মানুষ দুনিয়াপাগল, অথচ তার পিছনে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে মৃত্যু দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও সে নফ্স ও খাহেশাতের পিছনে ছুটে চলেছে। মৃত্যুর কথা ভাববারও যেন সুযোগ তার নেই।

যারা মৃত্যুকে স্মরণ করে, তাদের দুনিয়া নিয়ে ভাবনার সময় কোথায়? যারা মৃত্যুকে স্মরণ করে, তাদের গল্প-গুজব হাসি-তামাসার সময় কোথায়? একবার হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)কে এক ব্যক্তি বলল : আপনি যদি আমাদের মজলিসে একটু বসতেন, তাহলে আপনার সাথে কিছু কথাবার্তা বলার সুযোগ পেতাম। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) বললেন : তোমাদের সাথে বসে কথা বলব তার অবসর কোথায়? তিনি বলেছিলেন : চারটি বিষয়ের ভাবনা নিয়ে সর্বদা ডুবে থাকি, তাই কোন অবসর নেই। সেই চারটি বিষয়ের একটি তিনি বলেছিলেন—আযরাঈল জান কব্জ করার সময় আল্লাহ তাআলাকে বলেন : হে আল্লাহ! একে মুসলমানদের সাথে রাখব, না কাফেরদের সাথে? আমি জানি না, আমার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কী নির্দেশ দিবেন? এই চিন্তায় কারও সাথে কথা বলার ফুরসুত অনুভব করি না।

হযরত আবূ যর গিফারী (রাযি.) বিস্ময় প্রকাশ করে বলতেন : কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মানুষ মৃত্যুর প্রস্তুতির কথা কীভাবে ভুলে থাকে? মৃত্যুর পর সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে কিনা তা জানা না থাকা সত্ত্বেও তার কীভাবে হাসি আসতে পারে?

আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে মৃত্যুর ফিকির এবং আখেরাতের ফিকির নসীব করেন। আমীন।

নসীহত-৮ (কবরের আযাব প্রসঙ্গ)

কবর মূলতঃ শুধু নির্দিষ্ট গর্তকে বলা হয় না, কবর বলতে আসলে বুঝায় মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালীন জগতকে। এ জগতকে কবর জগৎ, আলমে বরযখ বা বরযখের জগৎ বলা হয়। মৃত্যুর পর মানুষের মরদেহ যেখানেই যেভাবে থাকুক না কেন সে কবর জগতের অধিবাসী হয়ে যায় এবং বদকার হলে তার উপর আযাব চলতে থাকে। কবরের এ আযাব মূলতঃ হয় রূহের উপর এবং দেহও সে আযাব উপলব্ধি করে থাকে। তাই দেহ যেখানেই যেভাবে থাকুক না কেন, জ্বলে পুড়ে ছাই বা পঁচে গলে মাটি হয়ে যাক না কেন, তার যে অংশ অবশিষ্ট থাকবে সেটুকু আযাব উপলব্ধি করবে। আর মৌলিক ভাবে আযাব যেহেতু রূহের উপর হবে, তাই কবরের আযাব হওয়ার জন্য এই দেহ অবশিষ্ট থাকাও অপরিহার্য নয়।

কবরে অনেক ধরনের আযাবের কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কবরের সাপের কথা বর্ণনা দিয়ে এক হাদীছে বলা হয়েছে:

لَوْاَنَّ تِنِّيْنًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ خَضِرًا۔ (ترمذی. دارمی)

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: পাপীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য কবরে এমন বিষাক্ত সাপ নিযুক্ত করে দেয়া হবে, যে সাপের বিষতো দূরের কথা তার নিঃশ্বাসেও এমন বিষক্রিয়া যে, দুনিয়াতে যদি তার একটা নিঃশ্বাস পড়ত, তাহলে তার বিষক্রিয়ায় সমস্ত সবুজ গাছপালা মরে শুকিয়ে যেত। পৃথিবীর মাটি আর সবুজ গাছপালা উৎপন্ন করতে পারত না।

কবরের আযাব দেখা যায় না, তবুও বিশ্বাস করতে হবে। কবরের আযাব যে সত্য একথা বিশ্বাস করানোর জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুই একটা ঘটনা মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেন। শায়েখ যাকারিয়া (রহ.) ফাযায়েলে আ'মাল কিতাবে একটা ঘটনা লিখেছেন যে, এক জায়গায় কবর দিতে গিয়ে একজনের টাকার থলি কবরের মধ্যে পড়ে যায়। কবর দিয়ে চলে আসার পর তার মনে পড়ে যে, আমার টাকার থলিতো কবরে পড়ে রয়েছে। টাকার থলি আনার জন্য লোকটা আবার গিয়ে কবর খোঁড়ে, খুঁড়ে দেখে কবরের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কবর সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে:

اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ۔ (ترمذی)

অর্থাৎ কবর হয় জান্নাতের একটা বাগান কিংবা জাহান্নামের একটা গর্ত। (কবরবাসী নেককার হলে তার কবরে জান্নাতের সুখ আসতে থাকে। আর বদকার হলে তার কবরে শাস্তি হতে থাকে।)

বোখারী-মুসলিমের হাদীছে এসেছে— কেউ মারা গেলে কবরে সকাল বিকাল তাকে ঐ স্থান দেখানো হয়, কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে যেখানে যাবে। সে জাহান্নামী হলে জাহান্নামের যে স্থানে সে থাকবে সেই স্থান তাকে দেখানো হয় এবং বলা হয় অবশেষে তুমি এখানেই যাবে। এটা করা হয় এজন্য, যাতে করে তার মানসিক যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পায়, তার দুঃখ আরও বাড়তে থাকে। আর সে জান্নাতী হলে জান্নাতের যে স্থানে সে থাকবে, সে স্থান তাকে দেখানো হয় এবং বলা হয় যে, অবশেষে তুমি এখানেই পৌছবে। এতে করে তার আনন্দ আরও বৃদ্ধি পায়।

কবরের আযাব যে সত্য, এ সম্পর্কে কুরআন শরীফের সাতটা আয়াত এবং ১০ খানা হাদীছ রয়েছে। এই সাতটা আয়াত ও দশ খানা হাদীছ থেকে বোঝা যায় যে, কবরের আযাব হবে। এরপরেও আমরা দেখি না এই অজুহাতে কবরের আযাবকে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। দুনিয়াতে অনেক কিছুই আমরা দেখি না, তারপরেও বিশ্বাস করি। তাহলে কবরের আযাব না দেখেও কেন তা বিশ্বাস করতে পারব না?

মানুষ মরে যাওয়ার পর তার লাশ কবরস্থ করা হোক বা যেখানেই যেভাবে থাকুক, পাপী হলে তার আযাব শুরু হবে এবং নেককার হলে তার শান্তি আরম্ভ হবে। যদি লাশ কংকাল বানিয়ে মেডিকেলে রাখা হয়, কিংবা সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়, কিংবা পুড়িয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হয়, তবুও তার কবরের আযাব হবে। কবরের আযাব হওয়ার জন্য এই দেহ থাকা জরুরী নয়। মূলতঃ কবরের আযাব হয় রূহের উপরে, দেহ সেই আযাব টের পায়। দেহ যেখানে যেভাবেই থাকুক, আযাব টের পাবে। যেমন দুনিয়াতে শাস্তি হয় দেহের উপরে, রূহ সেটা টের পায়, আমার দেহে যদি আঘাত করা হয়, তাহলে আমার রূহ বা অন্তর সেটা টের পায়, অন্তর যেখানেই থাকুক তা টের পায়। তদ্রূপ কবরের আযাব হয় রূহের উপরে, দেহ যেখানেই থাকুক সেটা টের পাবে।

কবর আযাবের ব্যাপারে আমাদের মনে কয়েকটা সন্দেহ জাগতে পারে। একটা সন্দেহ হল কবরে আযাব হলে আমরা কবরের পাশে গেলে টের পাই না কেন? এর উত্তরে প্রথম কথা হল কবরের আযাব সবপ্রাণীই টের পায় শুধু

জিন ইনসান টের পায় না। পরীক্ষা স্বরূপ জিন ইনসানকে টের পেতে দেয় না। তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যে, না দেখেও তারা বিশ্বাস করে কিনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ-(متفق عليه)

অর্থাৎ কবরের আযাব এমন বিষয়, যা একমাত্র জিন ও ইনসান ছাড়া আর যারাই কাছে থাকে সবাই শুনতে পায় এবং বুঝতে পারে। এজন্য অনেক সময় দেখা যায় কবরস্থানে জানোয়ার বেঁধে রাখলে তারা চিৎকার শুরু করে এবং ছোটা-ছুটি আরম্ভ করে দেয়। এর বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয় কথা হল কবর একটা আলাদা জগৎ। আমরা যে জগতে আছি সেটাকে বলা হয় দুনিয়ার জগৎ। আর কবরের জগতকে বলা হয় আলমে বরযখ বা বরযাখ জগৎ। আর স্বাভাবিক নিয়ম হল এক জগতের জিনিস আরেক জগতে টের পাওয়া যায় না। যেমন স্বপ্নের জগৎ একটা আলাদা জগৎ। এজন্যই একজন মানুষ স্বপ্নে কত কিছু দেখে। স্বপ্নে আনন্দ ফূর্তি করে, অথবা কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করে, অনেক সময় কান্নাকাটি বা চিৎকার করে, অথচ তার পাশে আরেকজন শুয়ে বা জাগ্রত আছে সে কিছুই টের পায় না। কারণ যে স্বপ্ন দেখছে সে রয়েছে এক আলাদা জগতে, আর অন্যরা রয়েছে আলাদা এক জগতে।

এই স্বপ্ন থেকে আরও প্রমাণ হয় যে, রূহের সাথে যা কিছু সংগঠিত হয় দেহ সেটা টের পায়। মানুষ স্বপ্ন দেখে রূহ দিয়ে অর্থাৎ রূহানী চোখ বা অন্তরের চোখ দিয়ে রূহানী ভাবে সবকিছু দেখে। স্বপ্নের সব কিছু ঘটে রূহানী ভাবে। কিন্তু দেহেও সেটার প্রভাব হয়ে যায়। মানুষ স্বপ্নে ভয়াবহ কিছু দেখে কেঁদে ওঠে, তার দেহেও সেই কাঁদার আছর প্রকাশ পায়। সে দেখছে তার অন্তর দিয়ে কিন্তু দেহেও সেটার আছর প্রকাশ পাচ্ছে। এমনিভাবে কবরের আযাব হবে রূহের উপর, কিন্তু দেহের উপরও তার আছর হবে। এভাবে স্বপ্ন দিয়ে কবরের আযাব বোঝা সহজ হয়।

কবরের আযাবের ব্যাপারে আমাদের মনে আর একটা সন্দেহ এই হতে পারে যে, এই দেহ মাটিতে পঁচেগলে যাবে তখন কোন্ দেহ শাস্তি অনুভব করবে? এই সন্দেহের জওয়াবও স্বপ্ন দিয়ে বোঝা সহজ। আমরা স্বপ্নে বিভিন্ন স্থানে যাই, অনেক কিছু দেখি, ধরি, ছুঁই। কিন্তু সেটা এই দেহে নয়। এই চোখে নয়, এই মৃত হাত-পা দ্বারা নয়। এই দেহ তো ঘুমিয়ে থাকে। বরং

আলাদা একটা দেহ নিয়ে আমরা স্বপ্নে বিচরণ করি, সেই দেহের চোখ দিয়ে দেখি, সেই দেহের হাত দিয়ে ধরি, সেই দেহের পা দিয়ে চলি। সেই দেহকে বলা হয় "জিস্‌মে মিছালী" বা রূপক দেহ। কবরে যে শাস্তি হবে সেটা হবে এরূপ রূপক দেহের উপর। তাই এই জড় দেহ মাটিতে পঁচেগলেও শাস্তি বা শান্তি হতে কোন বাধা নেই। শাস্তি হবে ঐ রূপক দেহে যেরকম দেহ নিয়ে মানুষ স্বপ্নে বিচরণ করে। ওরকম একটা দেহ আল্লাহ পাক তৈরি করে দিবেন। সেই দেহের উপর সবকিছু ঘটবে। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে মানুষের দেহ পঁচেগলে গেলেও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না, তার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র অংশ হলেও থেকে যায়, সেই অংশ শাস্তি বা শান্তি উপলব্ধি করতে পারে।

কবরের আযাব থেকে বাঁচার কয়েকটা আমলের কথা কুরআন-হাদীছে পাওয়া যায়। এক হাদীছে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সূরা মুল্‌ক তেলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

هِيَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - (قرطبى)

অর্থাৎ সূরা মুল্‌ক হল রক্ষাকারী। যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করবে, এ সূরা তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত ঘুমানোর আগে সূরা মুল্‌ক তেলাওয়াত করতেন। বিছানায় শুয়ে শুয়েও তেলাওয়াত করা যেতে পারে। কিংবা ঈশার পর ঘুমানোর আগে যে কোন সময় তেলাওয়াত করে নিলেও এই ফযীলত হাছেল হবে।

কবরের যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার থেকে বাঁচার জন্যও আমল রয়েছে। সেই আমল হল নামায। হাদীছে বলা হয়েছে: اَلصَّلٰوةُ نُوْرٌ . অর্থাৎ নামায হল নূর বা আলো। কবরের অন্ধকার এবং হাশরের ময়দানের অন্ধকারে নামায আলো হয়ে দাঁড়াবে।

এছাড়াও নামাযের অনেক ফায়দা রয়েছে। যদি ভালভাবে যত্ন সহকারে নামায আদায় করা হয়, তাহলে সেই নামায মানুষকে পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ .

অর্থাৎ অবশ্যই নামায পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।

(সূরা আনকাবূত: ৪৫)

আমরা অনেক সময় দেখতে পাই অনেকে নামাযও পড়েন আবার পাপ কাজও করেন। এতে করে সন্দেহ হতে পারে যে, নামায পাপ কাজ থেকে

বিরত রাখে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলে : নামায পড়া সত্ত্বেও যে পাপ কাজ করে, বুঝতে হবে তার নামায সঠিকভাবে হয় না। নামায সঠিকভাবে হলে অবশ্যই সে নামায পাপ থেকে বিরত রাখবে।

নসীহত-৯ (জাহান্নামের আযাব প্রসঙ্গ)

পাপীদেরকে আল্লাহ আগুন ও আগুনের মধ্যে অবস্থিত সাপ, বিচ্ছু, শৃঙ্খল প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্তির উপকরণ দ্বারা আযাব দেয়ার জন্য যে স্থান প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে বলা হয় জাহান্নাম বা দোযখ। দোযখ আল্লাহর সৃষ্ট রূপে বিদ্যমান রয়েছে এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। কাফেররা অনন্তকাল তাতে অবস্থান করবে।

জাহান্নাম বা দোযখ হল পাপীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য তৈরী করা এক অকল্পনীয় আযাবের স্থান।

জান্নাতের নাজ নেয়ামত যেমন অকল্পনীয়, জাহান্নামের শাস্তি এবং সেই শাস্তির উপকরণও অকল্পনীয়। জাহান্নামের মধ্যে রাখা হয়েছে আগুন। সেই আগুনের তেজও অকল্পনীয়। হাদীছে এসেছে জাহান্নামের আগুনের তেজ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশী। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই আগুন থেকে হেফাযত করুন। সেই আগুনের মধ্যে রয়েছে সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি। সেই সাপ বিচ্ছুর বিষও অকল্পনীয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ থেকে হেফাযত করুন।

জাহান্নামে পাপীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য তাদের দেহ এত বড় করে দেয়া হবে যে, হাদীছে এসেছে— তাদের এক একটা দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত, তাদের গায়ের চামড়া পুরু হবে তিন দিন সফর করার মত দূরত্ব পরিমাণ, তাদের এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধ পর্যন্ত দূরত্ব হবে তিন দিন সফর করার মত দূরত্ব পরিমাণ। এত বড় বিশাল দেহের কথাও কেউ কল্পনা করতে পারে না। জাহান্নামের মধ্যে থাকবে এক ধরনের গাছ যার ফল হবে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত। জাহান্নামীরা এই ফল আহার করবে। এই গাছের নাম ঝাক্কুম গাছ। আগুনের মধ্যে গাছ বাঁচতে পারে এটাও কল্পনা করা যায় না। কুরআন শরীফে ঝাক্কুম গাছ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ

অর্থাৎ ঝাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীদের খাবার। (সূরা দুখান : ৪৩-৪৪)

আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে হেফাযত করুন।

জাহান্নাম এখন কোথায়? এ ব্যাপারে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত হল জাহান্নাম যমীনের নীচে অবস্থিত। তবে ঠিক নির্দিষ্ট কোথায় এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না বলে নিশ্চিত করে কিছু না বলে এর জ্ঞান আল্লাহ্র উপরই ন্যস্ত করতে হবে। তবে কোন জায়গায় তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও জাহান্নাম এখন আসমানের নীচে দুনিয়াতেই রয়েছে একথা নিশ্চিত। দুনিয়ার কোন এক জায়গায় ক্ষুদ্র আকারে সংকুচিত অবস্থায় জাহান্নামকে রাখা হয়েছে। কিয়ামতের দিন এটাকে বিস্তৃত করে সপ্তম আসমানের নিচ পর্যন্ত পুরো স্থানকে জাহান্নামে পরিণত করে দেয়া হবে।

জাহান্নামের সাতটি স্তর বা দরজা থাকবে। এটাকেই বলা হয় সাত দোযখ। এই সাত দোযখের মধ্যে একেক স্তরের শাস্তির ধরন হবে একেক রকম। অপরাধ অনুসারে যে যে স্তরের উপযোগী হবে, তাকে সে স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। এ স্তরগুলোর পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। যথা: (১) জাহান্নাম (২) লাযা (৩) হুতামা (৪) সায়ীর (৫) সাকার (৬) জাহীম (৭) হাবিয়া।

ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী (রহ.) "তামবীহুল গাফিলীন" কিতাবে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে এক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে— হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন:

একবার হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এমন সময় আগমন করলেন যে সময় সাধারণতঃ তিনি আগমন করতেন না, তার চেহারা বিবর্ণ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন: আজ আপনার চেহারা এমন বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন? হযরত জিবরাঈল (আ.) আরয করলেন: হে মুহাম্মাদ! আজ আমি আপনার নিকট এমন সময় আগমন করেছি, যখন জাহান্নামের আগুনে ফুৎকার দিয়ে তাকে তেজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি জাহান্নাম, জাহান্নামের আযাব এবং কবরের আযাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তারতো জাহান্নাম থেকে মুক্তির গ্যারান্টি না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি লাভ করার কথা নয়।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: জাহান্নামের অবস্থা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন: তাহলে শুনুন। আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম সৃষ্টি করার পর এক হাজার বছর তার আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করেছেন। আগুন তখন লালবর্ণ হয়ে উঠেছে। তারপর আরও এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করেছেন। তখন আগুন শুভ্রবর্ণ ধারণ

করেছে। তারপর আরও এক হাজার বৎসর প্রজ্বলিত করেছেন। তখন আগুন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। ফলে জাহান্নামের আগুন এখন কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা ও জ্বলন্ত অঙ্গারগুলো কখনও নির্বাপিত হয় না। খোদার কসম! জাহান্নামের একটা সূচের ছিদ্র পরিমাণ জায়গাও খুলে যায়, তাহলে তার তাপে জগতের সমুদয় অধিবাসী জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যদি কোন দোযখী ব্যক্তির পোষাক আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তার দুর্গন্ধে ও তাপে পৃথিবীর সকল প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে। ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, পবিত্র কুরআনে যে জিঞ্জিরের কথা বলা হয়েছে সেখান থেকে যদি এক হাত জিঞ্জিরও কোন পাহাড়ের উপর রেখে দেয়া হয় তাহলে পাহাড় গলে সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে পৌছবে। যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে কোন ব্যক্তিকে জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হয় তাহলে পৃথিবীর পশ্চিম দিগন্তে অবস্থানরত ব্যক্তিও তার তাপে জ্বলে যাবে। জাহান্নামের তেজ খুবই কঠিন, তার গভীরতা অনেক, তার পোষাক হবে আগুনের, তার পানীয় হবে ফুটন্ত পানি ও গলিত পুঁজ। জাহান্নামের সাতটি দরজা হবে। কোন নারী পুরুষ কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সেটা পূর্বে থেকেই নির্ধারণ করা আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন : জাহান্নামের দরজাগুলো কি আমাদের ঘর-বাড়ির দরজার মতই? জিবরাঈল বললেন : না, বরং সে দরজাগুলো উপর নীচে। এক দরজা থেকে আরেক দরজার দূরত্ব সত্তর বছরের পথ এবং প্রতি পরবর্তী দরজা তার পূর্বের দরজার চেয়ে সত্তর গুণ বেশী তপ্ত। আল্লাহর শত্রুদেরকে সেসব দরজার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা দরজা পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে তখন আগুনের বেড়ি ও জিঞ্জির দিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে। মুখ দিয়ে জিঞ্জির প্রবিষ্ট করে তা পায়ুপথ দিয়ে বের করে আনা হবে। বাম হাত গলার সাথে বেড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়া হবে। ডান হাতও জিঞ্জির দিয়ে বেধে দেয়া হবে। প্রত্যেকের সাথেই শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে তার শয়তান। অধমুখী করে তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফেরেশতাগণ লোহার গদা দিয়ে তাদেরকে আঘাত করতে থাকবে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে তখন তাদেরকে পুনরায় জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন : জাহান্নামের সেসব স্তরে কারা কারা থাকবে? জিবরাঈল (আ.) বললেন : সর্বনিম্ন স্তরে

থাকবে ফেরআউনী গোষ্ঠী, আসহাবে মা'য়িদা ও মুনাফিকরা। এই স্তরটির নাম 'হাবিয়া দোযখ'। দ্বিতীয় স্তরের নাম 'জাহীম'। এটা মুশরিকদের নিবাস। তৃতীয় স্তরের নাম 'সাকার'। এখানে থাকবে সা'বিয়ীরা। চতুর্থ স্তরে থাকবে ইবলীস ও তার অনুসারীরা। এই স্তরটির নাম 'লাযা'। পঞ্চম স্তরের নাম 'হুতামা'। এখানে থাকবে ইহুদীরা। ষষ্ঠ স্তরে থাকবে খৃষ্টানরা। এ স্তরটির নাম 'সাঈর'। তারপর হযরত জিবরাঈল (আ.) লজ্জায় নীরব হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নীরব হয়ে গেলেন যে? সপ্তম স্তরে কারা থাকবে? হযরত জিবরাঈল (আ.) অনেকটা লজ্জার সাথে বললেন : এই স্তরে থাকবে আপনার সেই সব উম্মতরা যারা কবীরা গোনাহ করে তওবা করা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করবে। এ কথা শোনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বরদাশত করতে পারলেন না। বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক স্বীয় উরুতে তুলে রাখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন : জিবরাঈল! আমি খুবই কষ্ট অনুভব করছি। আমার উম্মতকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে? আরয করলেন : জ্বী। যদি কেউ গোনাহ কবীরা করে তওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে হযরত জিবরাঈল (আ.)ও কাঁদতে লাগলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে চলে গেলেন। মানুষের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিলেন। একমাত্র নামাযের সময় ছাড়া আর বাইরে আসতেন না। আবার নামায পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে চলে যেতেন। কারও সাথে কোন কথা বলতেন না। অবস্থা এমন ছিল— নামায পড়তেন আর কাঁদতেন। তৃতীয় দিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ঘরের সামনে গিয়ে সালাম দিলেন এবং ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু কোন উত্তর মিলল না। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন। একইভাবে হযরত ওমর (রাযি.)ও প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় ফিরে এলেন। এরই মধ্যে এসে হাজির হলেন হযরত সালমান ফারসী (রাযি.)। সালাম দিয়ে তিনিও অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কোন জবাব না পেয়ে অস্থির অবস্থায় ফিরে এলেন তিনি। সকলেই অস্থির। কখনও দাঁড়িয়ে কখনও বসে। এই অস্থিরতার মধ্যেই হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর ঘরের দরজায় এসে সকলে উপস্থিত। তাঁরা হযরত ফাতিমা

(রাযি.)-কে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। ঘটনা শুনে হযরত ফাতিমা (রাযি.)ও অস্থির হলেন। আবা গায়ে জড়িয়ে ছুটে গেলেন। দরজার সামনে গিয়ে সালামসহ আরয করলেন : আমি ফাতিমা। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় পড়ে উম্মতের জন্য কাঁদছিলেন। মাথা তুলে বললেন : নয়নের প্রশান্তি ফাতিমা! কেন এসেছ? দরজা খোলার অনুমতি দিলেন। হযরত ফাতিমা (রাযি.) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং প্রিয় নবীজীর অবস্থা দেখে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা কেমন বিবর্ণ ফ্যাকাসে। আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত পেরেশান কেন? ইরশাদ করলেন : ফাতিমা! আমার কাছে হযরত জিবরাঈল এসেছিলেন। তিনি আমাকে জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন এবং এ-ও বললেন— জাহান্নামের সর্ব উপরে যে স্তরটি সেখানে প্রবেশ করবে আমার উম্মতের ঐসব লোক যারা গোনাহে কবীরা করেছিল। এই চিন্তায়ই আমার এই দশা। হযরত ফাতেমা (রাযি.) আরয করলেন : হে রাসূল! তাদেরকে কিভাবে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করানো হবে? ইরশাদ করলেন : ফেরেশতারা তাদেরকে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে। তবে তাদের চেহারা কালো হবে না, চোখ নীল বর্ণের হবে না। তারা বোবাও হবে না এবং তাদের সাথে তাদের শয়তানও থাকবে না। তাদেরকে বেড়ি কিংবা জিঞ্জির দিয়েও বেঁধে নেয়া হবে না। হযরত ফাতিমা (রাযি.) আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফেরেশতারা তাহলে কীভাবে তাদেরকে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে? ইরশাদ করলেন : পুরুষদেরকে দাড়ি ধরে এবং নারীদেরকে চুলের বেণী ধরে। নারী-পুরুষ সকলেই তখন চিৎকার করে কাঁদতে থাকবে। তারা জাহান্নামের দরজার কাছে পৌঁছার পর প্রহরী 'মালিক ফিরিশতা' বলবেন : এরা কারা? বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে এদেরকে! এদের চেহারা কালো নয়, চক্ষু নীল নয়, এরা বোবা নয়, সঙ্গে শয়তান নেই, গলায় বেড়ি নেই, জিঞ্জির দিয়ে হাত-পা-ও বাঁধা হয়নি! অন্য ফেরেশতাগণ বলবেন : আমরা কিছুই জানি না। আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। আমরা আদেশ মোতাবেক আপনার কাছে এদেরকে পৌঁছে দিলাম। মালিক দারোগা তখন নিজেই জিজ্ঞেস করবেন : হে দুর্ভাগারা! তোমরাই বল— তোমাদের পরিচয় কী? (একটি বর্ণনায় আছে এসব জাহান্নামীরা সারা পথ হায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে চিৎকার করবে। কিন্তু মালিক দারোগাকে দেখতেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামও ভুলে

যাবে।) তারা বলবে : আমরা সেইসব লোক, যাদের প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছিল। যাদেরকে রমযান মাসে রোযা রাখতে বলা হয়েছিল। দারোগা বলবেন : কুরআন শরীফ তো অবতীর্ণ হয়েছিল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। এ নাম শুনতেই তারা চিৎকার করে উঠবে—আমরা তো হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এরই উম্মত। দারোগা বলবেন : কুরআন কি তোমাদেরকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বারণ করেনি? যখন তাদের জাহান্নামের অগ্নির কাছে এবং দারোগার কাছে অবস্থান করানো হবে, তখন তারা সকলেই মালিক দারোগার কাছে অনুরোধ করবে—আমাদেরকে আমাদের কৃত অপরাধের জন্য খানিকটা কাঁদতে দিন। অতঃপর কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে। অশ্রুর বদলে প্রবাহিত হবে রক্তের ধারা। তারা চরম নৈরাশ্যের সাথে বলবে : আহা, এই কান্নাটা যদি দুনিয়াতে কাঁদতাম! তাহলে আজ আর কাঁদতে হত না। দারোগার নির্দেশে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা তখন সমস্বরে বলে উঠবে : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এই ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ফিরে যাবে। দারোগা আগুনকে নির্দেশ দিবে ওদেরকে গ্রাস কর। আগুন বলবে : কীভাবে এদেরকে গ্রাস করব? ওদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! দারোগা বলবেন : এটাই আল্লাহর নির্দেশ। তখন আগুন তাদের পাকড়াও করবে। আগুন কারও কারও পা পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত, আবার কারও গলা পর্যন্ত গ্রাস করে নেবে। আগুন যখন চেহারার দিকে আসতে চাইবে তখন দারোগা বলবেন : এদের চেহারাগুলোকে জ্বালিও না। কারণ কতবার তারা এই চেহারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজদায় নত করেছে। তাদের অন্তরগুলোকে জ্বালিও না। কারণ রমযানে রোযা রেখে কতবার তারা এই অন্তরকে পিপাসার্ত রেখেছে। এভাবে তারা আল্লাহ যতদিন চাইবেন জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকবে এবং বারবার এই বলে আল্লাহকে ডাকতে থাকবে : ইয়া আরহামার রাহিমীন! ইয়া হান্নান!! ইয়া মান্নান!!!

অবশেষে এক সময় আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈলকে বলবেন : তুমি উম্মতে মুহাম্মাদীর খোঁজ নাও। তারা কেমন আছে? জিবরাঈল ছুটে আসবেন মালিক দারোগার কাছে। দারোগা তখন জাহান্নামের মধ্যবিন্দুতে একটি আগুনের মিম্বরে সমাসীন। জিবরাঈলকে দেখতেই তিনি তা'জীমের সাথে উঠে দাঁড়াবেন এবং এখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করবেন। জিবরাঈল বলবেন : আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য এসেছি। তারা কেমন আছে?

দারোগা বলবেন : তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। সংকীর্ণ স্থানে পড়ে আছে। আগুন তাদের শরীরের গোশ্তগুলো জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। অবশিষ্ট আছে শুধু তাদের চেহারা ও অন্তরগুলো। আর সেখানে ঝলমল করছে ঈমানের নূর। হযরত জিবরাঈল বলবেন : তারা কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও। জিবরাঈলকে দেখতেই পাপী বান্দারা বুঝে ফেলবে ইনি আযাবের ফেরেশতা নন। কারণ তাঁর উজ্জ্বল মুখশ্রীতে রহমতের ঝিলিক খেলতে থাকবে। তারা জিজ্ঞেস করবে : ইনি কে? আমরা আজ অবধি এমন সুন্দর চেহারা কখনও প্রত্যক্ষ করিনি। বলা হবে : ইনি হযরত জিবরাঈল। যিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী নিয়ে আসতেন। এই নাম শুনতেই তারা চিৎকার করে উঠবে। তারা বলে উঠবে : জিবরাঈল! আপনি গিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমাদের সালাম দিবেন। বলবেন : আমাদের পাপ আমাদেরকে তাঁর থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের ধ্বংস করে ফেলেছে। হযরত জিবরাঈল (আ.) ফিরে আসবেন। আল্লাহ তাআলার দরবারে সব ঘটনা খুলে বলবেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তারা তোমাকে কিছু বলেনি? বলবেন : বলেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সালাম পাঠিয়েছে এবং তাদের দুরাবস্থার কথা জানাতে বলেছে। নির্দেশ হবে : যাও, তাদের পয়গাম পৌঁছে দাও! এ কথা শুনতেই হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বেহেশতের এমন একটি মহলে আরামরত থাকবেন যা শুভ্র-মোতির তৈরী। যাতে চার হাজার দরজা রয়েছে। সে দরজা সোনা দিয়ে বাঁধানো। সালাম বা'দ আরয করবেন : আপনার পাপী উম্মতদের কাছ থেকে এসেছি। তারা আপনাকে সালাম বলেছে এবং তাদের ধ্বংস ও দুর্দশার কথা আপনাকে জানাতে বলেছে। একথা শুনতেই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের নিচে গিয়ে সাজদায় পড়ে যাবেন এবং অপূর্ব ভাব ও ভাষায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবেন। আল্লাহ তাআলা আদেশ করবেন : মাথা তুলুন! চাও, কী চাওয়ার আছে। যা চাইবে তা-ই দিব। কারও সম্পর্কে সুপারিশ করলে কবূল করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরয করবেন : ওগো প্রভু! আমার পাপী উম্মতের ওপর আপনার নির্দেশ কার্যকরী হয়েছে, তাদের উপর আপনার শাস্তি নিপতিত হয়েছে। আমি তাদের জন্য সুপারিশ করছি। আপনি কবূল করুন।

আদেশ করা হবে : আপনার সুপারিশ গ্রহণ করলাম। আপনি যান এবং যে ব্যক্তি কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের কাছে পৌছতেই তাঁর সম্মানার্থে দারোগা মালিক দাঁড়িয়ে যাবেন। তিনি তাঁকে বলবেন : মালিক, আমার পাপী উম্মতরা কেমন আছে? মালিক আরয করবেন : খুবই খারাপ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন : জাহান্নামের দরজা খুলে দাও। দরজা খুলে দেয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতেই পাপী উম্মতেরা এই বলে চিৎকার করে উঠবে : হে রাসূল! আগুন আমাদের শরীর-কলিজা জ্বালিয়ে ফেলেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। তাদের শরীরের রং তখন কয়লার মত কালো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বেহেশতের দরজার কাছে অবস্থিত রিযওয়ান নামক নহরে গোসল করতে দিবেন। এখানে গোসল করতেই সকলে আলোকোজ্জ্বল যুবকে পরিণত হয়ে উঠবে। চেহারা হবে চাঁদের মত উজ্জ্বল। তাদের কপালে লেখা থাকবে—

اَلْجَهَنَّمِيُّوْنَ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ۔

অর্থাৎ 'এরা হল আল্লাহ রাহমানুর রাহীম কর্তৃক মুক্তিপ্রদত্ত জাহান্নামী।'

তখন অবশিষ্ট জাহান্নামীরা আক্ষেপের সুরে বলবে : আহা! আমরাও যদি মুসলমান হতাম, তাহলে আজ অন্ততঃ জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পেতাম। এ মর্মেই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ۔

অর্থাৎ 'কত কাফের এই কামনা করবে, তারা যদি মুসলমান হত!'

তারপর মৃত্যুকে একটি দুম্বার আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে যবাই করা হবে। অতঃপর বেহেশতী ও দোযখীদেরকে বলা হবে— আজ থেকে আর কারও মৃত্যু হবে না। তোমরা যে যেখানে আছ, অনন্তকাল সেখানেই থাকবে। (তামবীহুল গাফিলীন, কোহিনূর লাইব্রেরী)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে হেফাযত করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন।

জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য কুরআন-হাদীছে আমাদেরকে বিভিন্ন দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে বেশী বেশী সেই দুআগুলো করা চাই। এরকম কয়েকটি দুআ এই—

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا.

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও, তার শাস্তিতো নিশ্চিত ধ্বংস। (সূরা ফুরকান : ৬৫)

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

অর্থাৎ, হে আমাদের রব! আমাদেরকে তুমি দান কর যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন তুমি আমাদেরকে অপমানিত করো না, নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। (আল ইমরান : ১৯৪)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

অর্থাৎ, হে আমাদের রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সমস্ত মুমিনকে ক্ষমা কর, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (সূরা ইবরাহীম : ৪১)

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতেরই মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি।

নসীহত-১০ (জান্নাত প্রসঙ্গ)

আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের জন্য আল্লাহ এমন সব নেয়ামত তৈরী করে রেখেছেন যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কারও অন্তরে তার পূর্ণ ধারণাও আসতে পারে না। এই সব মহা নেয়ামতের স্থান হল জান্নাত বা বেহেশ্‌ত। জান্নাত কোন কল্পিত বিষয় নয় বরং সৃষ্ট রূপে তা বিদ্যমান আছে এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। মু'মিনগণও অনন্তকাল সেখানে থাকবেন।

জান্নাতের কিছুটা বিবরণ দিয়ে এক হাদীছে কুদছীতে বলা হয়েছে :

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ.

(متفق عليه)

অর্থাৎ, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি এমন সব নাজ-নেয়ামত, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, না কোন মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও আসতে পারে। চিন্তা করে দেখুন মানুষ কত আকাশ কুসুম কল্পনা করতে পারে। তারপরও বলা হচ্ছে জান্নাতের নাজনেয়ামত এত উন্নত মানের যে, মানুষ কল্পনা করেও তার কূল কিনারা করতে পারবে না। কুরআন শরীফেও বলা হয়েছে :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ـ (الٓمٓ السجدة)

অর্থাৎ, কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে।

জান্নাতের সবকিছুই অকল্পনীয়। যেমন জান্নাতের নহর সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে :

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ـ (سورة الدهر ـ ٦)

অর্থাৎ, জান্নাতের নহর এমন হবে যে, মানুষ তা চালনা করতে পারবে। রেওয়ায়েতে এসেছে জান্নাতী মানুষের হাতে ছড়ি থাকবে, সে যেখানে যাবে, তার হাতের সেই ছড়ির ইশারায় নহর সে দিকে চলতে থাকবে। এমন নহরের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, যা হাতের ইশারায় এখানে সেখানে গমন করবে।

জান্নাতের গাছ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا ـ (متفق عليه)

অর্থাৎ, জান্নাতে এমন বৃক্ষ আছে, একজন দ্রুতগামী আরোহী একশত বৎসর ভ্রমণ করেও যার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না।

সুবহানাল্লাহ! এমন মহা বিশাল গাছের কথাও কেউ কল্পনা করতে পারে কি? এই সব গাছ সম্পর্কে এক হাদীছে এসেছে— বান্দা যখন একবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতের একটা গাছ বরাদ্দ হয়ে যায়। অর্থাৎ এত পরিমাণ জায়গাসহ তার জন্য বরাদ্দ হয়ে যায়। আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার পাঠ করলেও এক একটা গাছ তার জন্য বরাদ্দ হয়ে যায়।

জান্নাতের জায়গা যেমন অফুরন্ত, জান্নাতের নাজ নেয়ামতও অফুরন্ত। জান্নাতের নাজ-নেয়ামত ভোগ করার সুযোগও থাকবে অফুরন্ত। জান্নাতে মানুষকে নাজ-নেয়ামত ভোগ করার অফুরন্ত সুযোগ দেয়া হবে, অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হবে। জান্নাতে মানুষের কোন চাওয়া পাওয়া অপূর্ণ থাকবে না। জান্নাতে মানুষ যা চাইবে, তা পাবে। এ মর্মে কুরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে :

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ.

অর্থাৎ জান্নাতে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মনে চায় এবং যা তোমরা দাবি কর। (সূরা হা মীম আস-সাজদা : ৩১)

জান্নাতে একটা পাখি উড়ে যেতে থাকবে, আর কোন জান্নাতী মনে মনে ভাববে— যদি এই পাখিটার গোশত খেতে পারতাম, সাথে সাথে পাখিটা ভুনা হয়ে প্লেটে করে তার সামনে হাজির হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে :

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ.(سورة الواقعة :٢١)

অর্থাৎ, তাদের জন্য থাকবে পাখির গোশত, যা তাদের মনে চাইবে।

এভাবে সে যা চাইবে, তা পাবে। এর চেয়ে আর অবাধ স্বাধীনতা কী হতে পারে যে, সে যা চাইবে তা-ই পাবে? এই অবাধ স্বাধীনতা পাওয়া যাবে কীসের বিনিময়ে? দুনিয়াতে নিজের উপর শরীয়তের নিয়ন্ত্রণ লাগিয়ে চলতে হবে, তাহলে পরকালে নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবাধ স্বাধীনতা পাওয়া যাবে, অবাধ খুশী পাওয়া যাবে। দুনিয়াতে মুমিনের জীবন তাই শরীয়তের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। দুনিয়াতে তারা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে, তাহলে আখেরাতে নিয়ন্ত্রণমুক্ত জীবন লাভ করতে পারবে। তখন যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে। আর দুনিয়াতে যারা শরীয়তের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে, আখেরাতে তাদের উপর চরম কঠিন নিয়ন্ত্রণ আসবে। শিকলে বেঁধে তাদেরকে জাহান্নামের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে। দুনিয়াতে একটু নিয়ন্ত্রণ মেনে চললে আখেরাতে বাঁধাবন্ধনহীন আনন্দ-ফূর্তির সুযোগ পাওয়া যাবে। আল্লাহপাক আমাদেরকে তাওফীক দান করেন। আমরা যেন আল্লাহ্‌র হুকুমের ভিতরে নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে পারি, যেন আখেরাতে অফুরন্ত অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারি, অবাধ সুখ শান্তি লাভ করতে পারি। আমীন!

এক হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ .(مسلم)

অর্থাৎ, দুনিয়া হলো মুমিনের জন্যে কারাগার, আর কাফেরের জন্যে বেহেশত।

এ হাদীছের এক ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, কারাগারে যেমন স্বাধীনতা থাকে না, যেমন ইচ্ছা তেমন চলতে পারে না, বরং কারাগার কর্তৃপক্ষ যেমন

বলে তেমন তাকে চলতে হয়, তদ্রূপ মুমিনও দুনিয়াতে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না, যেমন ইচ্ছা তেমন চলতে পারবে না, বরং তাকে দুনিয়ার মালিকের হুকুম মত চলতে হবে। এ হাদীছের আর এক ব্যাখ্যা এ রকম হতে পারে যে, একজন মুমিন বান্দা দুনিয়াতে যত ভাল অবস্থাতেই থাকুক না কেন যখন তার মৃত্যুর সময় বেহেশতে নির্ধারিত ঠিকানা তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তখন তার নেয়ামতের বাহার দেখে সে এই পৃথিবীকে মনে করবে এটাতো কারাগারই। পক্ষান্তরে একজন কাফেরের সামনে যখন শাস্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তখন পরকালের শাস্তি ও আযাবের তুলনায় তার কাছে এই দুনিয়াকে মনে হবে বেহেশ্ত।

জান্নাত কোন কল্পিত বিষয় নয় বরং তার বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। অস্তিত্বশীল হিসেবেই তা মওজুদ রয়েছে এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। জান্নাত এখনই মওজুদ আছে। মেরাজে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জান্নাত দেখানো হয়েছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত স্বচক্ষে দেখে এসে জান্নাতের বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণনার মধ্যে একটা বর্ণনা এরূপ— রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাকে জান্নাতের এমন সুন্দর ঘরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—

فَإِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ۔ (مسلم)

অর্থাৎ যে ঘরগুলোর গম্বুজ বড় বড় মুক্তা দিয়ে তৈরী। আর সেই জান্নাতের মাটি হল মেশ্‌ক আম্বরের।

আগেই বলা হয়েছে জান্নাতের সবকিছুই কল্পনাতীত। মুক্তার গম্বুজ হতে পারে আর মেশক আম্বারের মাটি হতে পারে, এটাও কল্পনাতীত বিষয়। এমনিভাবে জান্নাতের সব নাজনেয়ামতই অকল্পনীয়।

শুধু জান্নাত লাভের আশা করলেই হবে না, তার জন্য কাজও করতে হবে। বিনা পরিশ্রমে ফসলের আশা করা বোকামী।

ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী (রহ.) "তামবীহুল গাফিলীন" কিতাবে বলেছেন : যে ব্যক্তি জান্নাতের নেয়ামতসমূহ লাভ করতে চায়, সে যেন নিয়মিত পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল করে।

এক. খাহেশাতে নফসানী বর্জন করবে। তাহলে জান্নাত লাভ করা যাবে। কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى۔

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি খাহেশাতে নফসানী থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে জান্নাত হবে তার ঠিকানা।

দুই. দুনিয়া বর্জন করবে। পার্থিব জীবনে যা পাওয়া যায়, তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। কেননা দুনিয়া বর্জন করাই হলো জান্নাতের মূল্য।

তিন. নেক কাজের প্রতি সর্বদাই আগ্রহী থাকবে। কারণ, জান্নাত হলো নেক আমলের প্রতিদান।

চার. আল্লাহ তাআলার নেককার বান্দাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করবে। কারণ, কিয়ামতের দিন তাদের সুপারিশও গ্রহণযোগ্য হবে।

পাঁচ. আল্লাহ তাআলার দরবারে অধিক পরিমাণে দু'আ করবে। বিশেষ করে জান্নাত লাভ এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হওয়ার জন্য দুআ করবে।

ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী (রহ.) উক্ত কিতাবে আরও কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন। তা হল—

এক. পরকালে পাওয়া যাবে এমন সব পুরস্কারের কথা জানার পরও পার্থিব জীবন ও সম্পদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করা এবং তার উপর ভরসা করা একান্তই মূর্খতা।

দুই. আমলের প্রতিদানের কথা জানার পরও তা লাভে সচেষ্ট না হওয়া নির্ঘাত দুর্বলতা।

তিন. বেহেশতের সুখ-শান্তি সে-ই লাভ করবে, যে পার্থিব সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিয়েছে। বেহেশতের বিপুল সম্পদ সে-ই লাভ করবে যে অনর্থক এই পার্থিব সম্পদ বর্জন করেছে এবং অল্পতেই তুষ্ট রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাত নসীব করুন। আমীন!

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তৃতীয় অধ্যায়
বৎসরের বিশেষ কয়েকদিনের আমল

মুহাররম ও আশুরা

মুহাররমের দশ তারিখকে বলা হয় আশুরা। আশুরা-এর শাব্দিক অর্থ দশম। সাধরণতঃ আশুরা বলতে মুহাররমের দশম তারিখকেই বোঝানো হয়। আশুরা কী, আশুরা উপলক্ষ্যে আমাদের কী করণীয়? এসম্পর্কে আমাদের অনেক বিভ্রান্তি আছে, অনেক ভুল বুঝাবুঝি আছে। সাধারণভাবে আশুরা বললে আমাদের মনে হয় যে, এই দিনে হযরত হুসাইন (রাযি.) কারবালার প্রান্তরে মর্মান্তিকভাবে শহীদ হয়েছিলেন। আশুরার তাৎপর্য বোধ হয় এখানেই। আমরা মনে করি কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আশুরার তাৎপর্য। আশুরাকে আমরা কারবালা বানিয়ে ফেলেছি। কিন্তু মূলতঃ আশুরার তাৎপর্য কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়। বরং হাদীছে এসেছে : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিযরত করার পর দেখলেন সেখানকার বনী ইসরাঈলরা অর্থাৎ ইয়াহুদীরা আশুরার দিন অর্থাৎ মুহাররমের দশ তারিখে রোযা রাখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন তারা এই দিনে রোযা রাখে কেন? তাঁকে জানানো হল যে, এই দিনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর কুদরতে বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে নিয়েছেন, আর ফিরআউন ও ফিরআউনের বহিনীকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছেন। এর শোকর আদায় করার জন্য হযরত মূসা (আ.) রোযা রেখেছেন। কারণ, এটা আল্লাহ্‌র কত বড় একটা নেয়ামত ছিল যে, কোন রকম নৌযান ছাড়া এই মহাসমুদ্র তারা পার হতে পারলেন। আল্লাহর কুদরতে পানি ফাঁক হয়ে সমুদ্র গর্ভে রাস্তা বের হয়ে গেল এবং মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীগণ সেই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেলেন। আর ফিরআউন তার

বাহিনীসহ সেখানে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এই মহা নেয়ামতের শোকর আদায় করার জন্য হযরত মূসা (আ.) এই দিনে রোযা রাখতেন এবং তাঁর অনুসারীরা অর্থাৎ বনী ইসরাঈল তথা ইয়াহুদীরা হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসরণে রোযা রেখে আসছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারলেন যে, ইয়াহুদীরা তাদের গোত্রের পূর্বসূরীদের উপর আল্লাহর যে নেয়ামত ঘটেছিল সেই নেয়ামতের শোকর আদায়ের জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসরণে রোযা রেখে আসছে। তখন তিনি বললেন :

نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسٰى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. (رواه ابن ماجة)

অর্থাৎ আমরা মূসা (আ.)-এর অনুসরণ তোমাদের চেয়ে বেশী করব। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখা শুরু করলেন এবং সাহাবীদেরকেও রোযা রাখতে বললেন।

এই হল আশুরার দিনের তাৎপর্য। নেয়ামতের শোকর আদায় করার শিক্ষা গ্রহণ করাই হল এই দিনের শিক্ষা। যদিও এই নেয়ামতটা আল্লাহ্ দান করেছিলেন বনী ইসরাঈল বা ইয়াহুদীদেরকে, তারাই সমুদ্র পার হয়ে গিয়েছিল অলৌকিকভাবে। তবে প্রকারান্তরে এটা আমাদের উপরও আল্লাহর একটা নেয়ামত। সেটা এভাবে যে, হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর অনুসারীরা ছিলেন হকপন্থী, এ হিসাবে তাঁরা হলেন আমাদের পূর্ব পুরুষ বা পূর্বসূরী। আমাদের পূর্বসূরীদের উপর যে নেয়ামত, প্রকারান্তরে আমাদের উপরও তা নেয়ামত। তাঁরা ছিলেন আমাদের এই হক্কানী সিলসিলার মানুষ। অতএব তাঁদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত প্রকারান্তরে আমাদের উপরও নেয়ামত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই শোকর আদায় করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেছেন, তাই আমরাও রাখব। এই হল আশুরার দিনে রোযা রাখার রহস্য।

এই দিনে নেয়ামতের শোকর আদায় করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের প্রতি যত প্রকার আল্লাহর নেয়ামত রয়েছে, সেগুলি স্মরণ করে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। যে নেয়ামতের শোকর যেভাবে আদায় করতে হয়, সেভাবে সে নেয়ামতের শোকর আদায় করতে হবে। আল্লাহ্ সম্পদ দিয়ে থাকলে তার শোকর আদায় করতে হয় আল্লাহর রাস্তায় দান করে, আল্লাহ্র হুকুম মত তা ব্যয় করে। আল্লাহ্ ইল্‌ম বা জ্ঞান দান করলে সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে এবং মানুষকে তা বিতরণ করে তার শোকর আদায় করতে হয়। আল্লাহ্ সুস্থতা দান করে থাকলে, সময় সুযোগ দান করে

থাকলে দ্বীনের কাজে সেটাকে লাগানো হল সেই নেয়ামতের শোকর আদায়। এগুলো হল বিভিন্ন রকমের নেয়ামতের শোকর আদায় করার বিভিন্ন তরীকা। এভাবে আল্লাহ্ আমাদেরকে যত নেয়ামত দান করেছেন, সেই সব নেয়ামতের শোকর আদায় করার মনোভাব সৃষ্টি করাই হল আশুরার দাবী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনে রোযা রেখেছেন এবং রোযা রাখার কথা বলেছেন তাই এই দিনে রোযা রাখাকে মোস্তাহাব বলা হয়েছে। এই দিনে রোযা রাখার ফযীলত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَآءَ اِنِّيْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ ـ (رواه ابن ماجة)

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে, আশুরার দিনে রোযা রাখলে পেছনের এক বছরের গোনাহ্ মোচন হয়ে যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেছিলেন যে, আগামী বছর যদি আল্লাহ্ তাআলা আমাকে যিন্দা রাখেন, তাহলে দশ তারিখের সাথে আর একটা রোযা রাখব। অর্থাৎ, শুধু ১০ তারিখেই নয় বরং তার সাথে আর একটা মিলিয়ে দুইটা রোযা রাখব। তাই উত্তম হল ১০ তারিখের সাথে সাথে আরেকটা রোযা রাখা, নয় তারিখ বা ১১ তারিখ। এভাবে ১০ তারিখের সাথে আগে বা পরে আর একটা মিলিয়ে মোট দুইটা রোযা রাখা উত্তম। যদি কেউ শুধু ১০ তারিখে রোযা রাখে অর্থাৎ, একটা রোযা রাখে, দুইটা না রাখে, সেটা ভাল নয়— মাকরূহ্ তানযীহী।[১] দুটো রোযা রাখাই উত্তম। মোটকথা আশুরার রোযা রাখার সাথে সাথে সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করার মনোভাব সৃষ্টি করাই হচ্ছে আশুরার দিনের কাজ। হ্যাঁ, পরবর্তীতে এই দিনে হযরত হুছাইন (রাযি.) কারবালার ময়দানে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন। উম্মতের জন্য এই ঘটনার স্মৃতি বেদনাদায়ক, হৃদয় বিদারক— একথা সত্য, কিন্তু এই বেদনার স্মৃতি স্মরণ করার মাধ্যমে আশুরা দিবস পালন করতে হবে একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়ে যাননি। এ দিনে যদি আমাদের সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি স্মরণ হয়ে যায়, তাহলে অন্যান্য দিবসে তা স্মরণ হলে যা করণীয়, এদিনেও ততটুকুই করণীয়। যে কোন বিপদ-আপদ আসলে বা বিপদ- আপদের কথা স্মরণ হলে "ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করার শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে। এ হিসেবে

---

১. فتاوی محمودیہ جـ/٣

কারবালার স্মৃতি যেহেতু একটা বড় দুঃখজনক স্মৃতি, বেদনাদায়ক স্মৃতি তাই এটা স্মরণ হলে আমরা "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করতে পারি। তবে তা পাঠ করা জরুরী নয়। কারণ পুরাতন মৃত্যুর স্মৃতি স্মরণ হলে প্রত্যেকবার এটা পাঠ করতে হবে তা জরুরী নয়। কেউ পাঠ করতে চাইলে পাঠ করতে পারেন।

এই হল আশুরার দিনে করণীয় বিষয়। এর বাইরে হযরত হুছাইন (রাযি.)-এর কথা স্মরণ করে, কারবালার কথা স্মরণ করে যা কিছু করা হচ্ছে যেমন : মাতম করা, বুক চাপড়ানো, হায় হুছাইন হায় হুছাইন, ইয়া আলী বলে আবেগ জাহির করা, শোক মিছিল করা, তা'যিয়া বের করা, এগুলো মানুষের সৃষ্টি করা রছম ও কুসংস্কার। কুরআন-হাদীছে এর কোন ভিত্তি নেই। কোন সাহাবী থেকে এ সমস্ত আমল পাওয়া যায়না। বুযুর্গানে দ্বীন এগুলো করেননি। শীয়াগণ—যারা হযরত আলী (রাযি.)-এর অতিভক্ত, তারাই এ সমস্ত শুরু করেছে, আর তাদের দেখাদেখি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এগুলো চালু হয়েছে। হযরত হুছাইন (রাযি.)-এর মৃত্যুর ন্যায় যে কোন পুরাতন মৃত্যুকে স্মরণ করে প্রতি বছরে শোক পালন অনুষ্ঠান করতে হবে—এটা শরীয়তসম্মত নয়। কোন পরিবারের কেউ মৃত্যুবরণ করলে সেই পরিবারের লোকদেরকে অন্যরা সমবেদনা জানাতে পারে সাধারণতঃ তিন দিনের মধ্যে, তার পরে নয়। কিন্তু এই যে, বিভিন্ন লোকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর তার মৃত্যু দিবসে আমরা শোক প্রকাশ বা শোক পালন করি, ইসলাম এ শিক্ষা দেয়নি। যা হোক, আশুরা দিবসে আমরা এই যে নানান ধরনের কুসংস্কার করে যাচ্ছি, তা দেখে আমাদের নতুন প্রজন্ম, প্রজন্মের পর প্রজন্ম মনে করছে আশুরার দিনে এসব করাই বোধ হয় আশুরার প্রকৃত কাজ। তারা ভাবছে আশুরা মানে হল কারবালা। আশুরাকে কারবালা বানানো হয়েছে, অথচ আশুরা মানে কারবালা নয়।

সহীহ রেওয়ায়েত[১] থেকে আরও জানা যায় যে, এই দিনে হযরত আদম (আ.)-এর তওবা কবূল হয়, এই দিনে হযরত নূহ (আ.)-এর কিশতী জূদী পর্বতে অবতরণ করে এবং এই দিনে হযরত ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। এর বাইরে আর যা কিছু বলা হয় যে, আশুরার দিনে এই ঘটেছে সেই ঘটেছে যেমন : বলা হয় এই দিনে আল্লাহ্ লওহে মাহ্ফুজ তৈরী করেছেন, কলম তৈরী

১. الآثار المرفوعة فى الاخبار الموضوعة لعبد الحى اللكنوى.

করেছেন, এই দিনে হযরত আইয়্যুব (আ.) সুস্থতা লাভ করেছেন, ইত্যাদি অনেক ঐতিহাসিক বড় বড় ঘটনা সব এই দিনে ঘটেছে বলা হয়। এসম্পর্কে উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) তাঁর "মা ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্" গ্রন্থে লিখেছেন যে, এর অধিকাংশই ভিত্তিহীন, এর কোন সহীহ্ সনদ নেই।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সব কিছু সহীহ্‌ভাবে বোঝার এবং সঠিকভাবে পর্যালোচনা করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

১২ই রবিউল আউয়াল

সাধারণ ভাবে বলা হয় যে, ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ। তবে ১২ই রবিউল আউয়াল-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ এটা নিশ্চিত নয়। বরং মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম এবং মুহাক্কিক ঐতিহাসিকগণ বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল নয়, ৮ই রবিউল আউয়াল। কেউ কেউ বলেছেন ৯ই রবিউল আউয়াল। বিজ্ঞ ঐতিহাসিকরা বলেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল—এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। অতএব আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে ১২ই রবিউল আউয়াল নিয়ে আমরা যা কিছুই করছি তার মূলই ঠিক নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ নিয়ে এই মতবিরোধ হওয়ার কারণ হল, তাঁর জন্ম তারিখ শুরু থেকে লিখে রাখা হয়নি এবং কেউ গুরুত্ব সহকারে সেটা মনেও রাখেনি। এখন আমরা জন্ম তারিখ লিখে রাখি বিভিন্ন কারণে। যেমন : সার্টিফিকেটে এই তারিখ লাগে, পাসপোর্ট তৈরী করতে গেলে প্রয়োজন হয়। আরও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আমরা জন্ম তারিখ যত্ন সহকারে লিখে রাখি বা মনে রাখি। আবার অনেকে জন্ম দিবসও পালন করি। এ কারণে জন্ম তারিখ মনে থাকে। তখনকার যুগে এসব প্রয়োজন ছিল না। সে যুগে জন্ম দিবসও কেউ পালন করত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবসও সাহাবায়ে কেরাম পালন করতেন না। যদি তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবস পালন করতেন, তাহলে এই জন্ম তারিখ নিয়ে মতবিরোধ হওয়ার কোন অবকাশ থাকত না। কিন্তু কোন সাহাবী তাঁর জন্ম দিবস পালন করেননি।

কারণ, ইসলামে জন্ম দিবস পালনের কোন নিয়ম নেই। এমনিভাবে মৃত্যু দিবস পালনেরও কোন নিয়ম নেই। এসব কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল কি না তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। তবে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়েছে অর্থাৎ, এই তারিখেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন—এ ব্যাপারে কারও কোন মতবিরোধ নেই। তাই ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ কি না তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও এই তারিখটাই যে তাঁর মৃত্যুর তারিখ তা নিশ্চিত। যদি মেনে নেয়া হয় যে, ১২ই রবিউল তারিখ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ, তাহলে এখন প্রশ্ন দেখা দিবে আমরা ১২ই রবিউল আউয়ালকে কোন হিসেবে মূল্যায়ন করব, খুশির দিন হিসেবে না দুঃখের দিন হিসেবে? যদি জন্ম তারিখের দিকে তাকাই, তাহলে এটা খুশির দিন। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আগমন প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই খুশির বিষয়। আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালও যেহেতু এই দিনে; এ হিসেবে এই দিনটা দুঃখেরও দিন। তাহলে এখন আমরা এই দিনকে কোন হিসেবে পালন করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের তারিখ হেতু খুশির দিবস হিসেবে পালন করব? না কি রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের দিন হেতু শোক দিবস হিসেবে পালন করব? এক হিসেব সোজা! তা হল সাহাবায়ে কেরামের আমল, তাবেঈনদের আমল, তাবে তাবেঈনদের আমল অর্থাৎ, আদর্শ যুগের আমল কি ছিল তা আমরা দেখব, তাঁরা কি করেছেন তা আমরা দেখব, তাঁরা যা করেছেন আমরাও তাই-ই করব। কেননা, তাঁরা হলেন আমাদের জন্য আদর্শ। কিন্তু তাঁদের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই? তাঁদের দিকে তাকালে আমরা দেখ তে পাই তাঁরা এ দিবসকে খুশির দিবস হিসেবেও পালন করেননি, শোক দিবস হিসেবেও পালন করেননি। অতএব আমাদেরও অনুরূপই করা উচিত।

আমরা এখন অনেকে পালন করি "ঈদে মীলাদুন্নবী"। ঈদ শব্দের অর্থ খুশি, আর মীলাদুন্নবী শব্দের অর্থ নবীর জন্ম। অতএব "ঈদে মীলাদুন্নবী" কথাটার অর্থ হল নবীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে খুশি বা উৎসব। ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে খুশি উদযাপন করছি। আর এই খুশি উদযাপন করছি এমন এক

দিনে, যে দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিশ্চিত ওফাতের দিন। এ দিনটা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের দিন না হত, তাহলে অন্তত খুশি উদযাপন করার মধ্যে শান্তি বোধ হত। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দ বোধ করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আগমন উপলক্ষ্যে খুশি হওয়া বরকতের বিষয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবূ লাহাব কাফের ছিল। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম হয়, তখন আবূ লাহাবের বান্দী ছুওয়াইবা আবূ লাহাবকে সুসংবাদ জানাল যে, আব্দুল্লাহর ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। সে এই সংবাদে এত খুশি হল যে, খুশিতে ঐ সংবাদ বহনকারিণী বান্দী ছুওয়াইবাকে তৎক্ষণাৎ আযাদ করে দিল। বর্ণিত আছে যে,[১] আবূ লাহাবের মৃত্যুর পর হযরত আব্বাস (রাযি.) তাকে স্বপ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কেমন অবস্থায় আছ? আবূ লাহাব বলেছিল : কঠিন শাস্তির মধ্যে আছি, তবে ভাতিজার জন্মের খুশিতে যে দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বান্দীকে আযাদ করে দিয়েছিলাম, প্রতি সোমবার ঐ আঙ্গুল চুষলে কিছুটা পানি পাই, যার দ্বারা আযাবের কষ্ট কিছুটা কম বোধ হয়। এর থেকে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম উপলক্ষ্যে খুশি হওয়ার কারণে আবূ লাহাবের মত একজন কাফেরের আযাব যদি হালকা বোধ হতে পারে, তাহলে একজন মু'মিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের কথা স্মরণ করে আনন্দ প্রকাশ করলে অবশ্যই তার জন্য অনেক বরকতের কারণ হবে। তবে অনেকে আবূ লাহাবের এই ঘটনা দ্বারা মীলাদের পক্ষে দলীল পেশ করে থাকে, এটা আদৌ ঠিক নয়, এ ঘটনার সাথে মীলাদ অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই। আবূ লাহাব কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের কথা শুনে মীলাদ পাঠ করেছিল? তাহলে কীভাবে এ ঘটনার দ্বারা মীলাদের পক্ষে দলীল পেশ করা যায়? সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের কারণে খুশী হয়েছিল, এতটুকু বিষয়ই শুধু গ্রহণযোগ্য।

নিঃসন্দেহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম আমাদের জন্য খুশির বিষয়। কিন্তু সেই খুশী ব্যক্ত করার তরীকা কী? তার তরীকা হল—

---

১. تواریخ حبیب اله

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে ভালবাসা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের উপর থাকতে আনন্দ বোধ করা কিংবা আবু লাহাব যা করেছিল, তার বান্দীকে আযাদ করে দিয়েছিল, তদ্রূপ আমরা পারলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের প্রতি খুশি প্রকাশ করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করব, তাহলে এর বরকত আমরা লাভ করতে পারব। কিন্তু সেটা ১২ তারিখেই করতে হবে, কিংবা এ মাসেই করতে হবে তা জরুরী নয়। যদিও আমরা মনে করে বসেছি যে, এগুলো এই তারিখে বা এ মাসেই করা জরুরী। শরীয়ত যেটাকে জরুরী বলেনি, সেটাকে জরুরী করে ফেললে তা হবে শরীয়তকে বিকৃত করা; যা হল পাপ। অতএব জোশের সাথে হুঁশও রাখতে হবে। শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করা যাবে না। আবেগের সাথে সাথে শরীয়তও ঠিক রাখতে হবে।

কিছু ভাই আছেন যারা ১২ই রবিউল আউয়ালে এক ধরনের আনন্দ মিছিল বের করেন। যার নাম দেয়া হয় "জশনে জুলূছে ঈদে মিলাদুন্নবী"। এর অর্থ হল নবীর জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য মিছিল। নানান রঙ বেরঙের ব্যানার, ফেস্টুন ও পতাকা নিয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে এই মিছিল বের করা হয়। আমরা তাদের আবেগকে অস্বীকার করছি না, তাদের আনন্দকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু আবেগ আনন্দ প্রকাশ করার এই পদ্ধতি কুরআন-হাদীছে পাওয়া যায় না।

১২ই রবিউল আউয়াল বা এই মাসে কেউ কেউ মীলাদ অনুষ্ঠান করে থাকেন।"মীলাদ" সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। মীলাদ অনুষ্ঠান যদি সহীহ্ভাবে হয়, তাহলে তা অত্যন্ত বরকতের অনুষ্ঠান। আর যদি সহীহ্ভাবে না হয় বরং বর্তমানে সাধারণভাবে যে রকম প্রচলিত আছে এভাবে হয়, তাহলে তা ছওয়াবের হবে না বরং উল্টা হবে। সহীহ্ তরীকায় মীলাদ অনুষ্ঠান হল— যে অনুষ্ঠানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় যে সব অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছিল নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে সেগুলো বর্ণনা করা হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মো'জেযা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শৈশব কাল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এগুলিতো আলোচনা করারই বিষয়। এগুলি আলোচনার দ্বারা আমাদের ঈমান মজবুত

হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হবে। অতএব এরকম মীলাদ মাহ্ফিল নিঃসন্দেহে উত্তম। কিন্তু আফসোস! আমরা এরকম মীলাদ অনুষ্ঠানের এই সহীহ রূপ ছেড়ে দিয়েছি। আমরা এখন এমন মীলাদ মাহ্ফিল করি বা এমন মীলাদ পড়ি, যার মধ্যে এসব বিষয় আলোচনা করা হয় না। আমরাতো মীলাদ পড়ি, মীলাদ করি না। আসলে মীলাদ তো পড়ার বিষয় না, এটা করার বিষয় অর্থাৎ আলোচনা করার বিষয়। কিন্তু আমরা এসব আলোচনাকে মীলাদ মনে করিনা। যদি কেউ কোন হুজুরকে মীলাদের জন্য ডাকেন আর তিনি ঐসব বিষয় আলোচনা করে দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করে দেন, তাহলে সবাই বলবে হুজুর! মীলাদ তো পড়া হলনা। এর অর্থ হল— আমরা ঐসব আলোচনাকে মীলাদই মনে করিনা। বরং আমরা মীলাদ বলতে বুঝি, তাওয়ালুদ অর্থাৎ ওয়ালাম্মা তাম্মা মিন হামলিহী.... পড়া হবে, আরবী বা বাংলায় কিছু কবিতা পাঠ করা হবে, সম্মিলিতভাবে সমস্বরে দুরূদ শরীফ পড়া হবে, ইত্যাদি। এগুলো না হলে মীলাদ হয়েছে বলে আমরা মনে করি না। অথচ এটা মীলাদ অনুষ্ঠানের সহীহ্ রূপ নয়, এই তরীকার মীলাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল না, সাহাবীদের যুগে ছিল না, তাবেয়ীন-তাবে তাবেয়ীনদের আদর্শযুগে ছিল না। বরং ইতিহাসে[1] পাওয়া যায় ৬০৪ হিজরীতে মুসেলের বাদশাহ মুজাফ্ফর উদ্দীন কুক্‌রী[2] -এর নির্দেশে এরূপ মিলাদ অনুষ্ঠান চালু হয়। এ বাদশাহ ছিল মাযহাববিদ্বেষী। ইমামদের শানে এবং পূর্বসূরী উলামায়ে কেরামের শানে চরম বেয়াদবীর পরিচয় দিত সে। আমরা এরূপ একটা লোকের প্রচলন ঘটানো অনুষ্ঠান কেন করতে যাব? তদুপরি আজকালকার মীলাদে যে তাওয়ালুদ বা ওয়ালাম্মা তাম্মা মিন হামলিহী... পাঠ করা হয়, এটা ভিত্তিহীন তথ্যে ভরপুর। তদুপরি অনেকে মীলাদ মাহ্ফিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির হন— এই আকীদায় কেয়াম করে থাকেন যা চরম বিতর্কিত বিষয়। এই সব কিছু মিলিয়ে আজকের প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান চরমভাবে বিতর্কিত অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আসুন আমরা বিতর্কিত অনুষ্ঠান বর্জন করি, এমন অনুষ্ঠান করি যা সমাপ্ত করা হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত আলোচনা দ্বারা। তাহলে আমরা

---

১. [illegible]। ২. মৃতঃ ৬৩০ হিঃ।

নিশ্চিতভাবে মীলাদ অনুষ্ঠানের বরকত হাছেল করতে পারব এবং নিশ্চিত আমাদের মীলাদ মাহফীল সহীহ্ মীলাদ মাহফিল হবে। সহীহ্ মী মাহফিল হলে তাতে যে রহমত ও বরকত হয় তা বুযুর্গানে দ্বীন উপভোগ করতে পারেন। একটা ঘটনা[১] শুনুন। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (রহ.) বলে একবার মক্কা শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থানে এ মীলাদ মাহফিলে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা হচ্ছিল। তখন মজলিসের মধ্যে একটা বড় আকারের নূর দেখতে পেলাম। আমি বুঝলাম মজলিসে রহমত বরকতের ফেরেশতারা হাজির হয়েছে, এটা তাদেরই নূর। বুযুর্গানে দ্বী এমন চোখ আছে, যা দিয়ে তাঁরা এমন অনেক কিছু দেখতে পান যা আম দেখতে পাইনা।

যা হোক, যে কথা বলা হচ্ছিল— রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা সীরাত আলোচনার মাহফিল বা সহীহ্ মীলাদ মাহফিলে যে অনেক রহমত বরকত নাযিল হয়, তা বুযুর্গানে দ্বীনও তাদের চোখে দেখতে পেয়েছে কিন্তু শর্ত হল শুধু নামের মীলাদ মাহফিল হলে চলবে না বরং সহীহ্ মা মীলাদ মাহফিল বলতে যা বোঝায় সেরূপ হতে হবে। যেখানে রাসূল জন্মবৃত্তান্ত এবং সীরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

এরূপ মীলাদ মাহফিল শুধু রবিউল আউয়াল মাসেই বা রবিউল আউয়া মাসের ১২ তারিখেই করতে হবে, এমন নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়। এরূপ অনুষ্ঠা সারা বৎসরের সব সময়ই করা যায়। আমরা অনেক কিছুর জন্যই দিন সম ধার্য করে নিয়েছি, অথচ শরীয়তে তার জন্য এমন দিন সময় ধার্য করে দে হয়নি। যেমন : কেউ মারা গেলে আমরা নির্দিষ্ট করে নিয়েছি যে, ৪ দিনে দিন তার নামে মীলাদ পড়তে হবে বা দুআর অনুষ্ঠান করতে হবে। এটা নাম দিয়েছি কুলখানি। আবার ৪০ দিনের দিন এরূপ করতে হবে। এটা নাম দিয়েছি চল্লিশা। আবার এক বৎসরের মাথায় এরূপ করতে হবে। এটা নাম দিয়েছি মৃত্যুবার্ষিকী পালন। এভাবে দেখা গেল মৃত ব্যক্তির জন্য দি করার দিন, সময় আমরা নির্দিষ্ট করে নিয়েছি। অথচ শরীয়তে এর জন্য কো দিন, সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি, যে কোন দিন মাইয়েতের জন্য দুআ অনুষ্ঠান করা যায়। শরীয়ত যেটাকে নির্দিষ্ট করেনি, সেটাকে নির্দিষ্ট করা হ

১. تواریخ حبیب الہ

তা-ও হবে শরীয়তকে এক ধরনের বিকৃত করা। শরীয়তকে বিকৃত করা পাপ। শরীয়তকে আমরা যে আসল রূপে পেয়েছি, সেভাবেই আসল রূপে তাকে ধরে রাখতে হবে। তাই বলা হল : সীরাত মাহ্ফিল বা সীরাত আলোচনা সারা বছর করার বিষয়। রবিউল আউয়াল মাস আসলে দেখা যায় আমরা কত সীরাত অনুষ্ঠান করি, অথচ বছরের অন্যান্য সময় তার কোন খবর থাকে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত প্রসঙ্গ

এক হিসেবে কুরআন-হাদীছের সমস্ত কথাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত। হযরত আয়েশা (রাযি.)কে এক মহিলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত কী ছিল? অর্থাৎ তাঁর আদর্শ কী ছিল? হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছিলেন : তুমি কি কুরআন পড়নি? মহিলা বলল : হ্যাঁ, কুরআন তো পড়েছি । তখন আয়েশা (রাযি.) বললেন :

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ. (طبقات ابن سعد ج ١/)

অর্থাৎ রাসূলের সীরাততো ছিল কুরআন। কুরআনই ছিল রাসূলের চরিত্র এবং আদর্শ। তাই বলা হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন জীবন্ত কুরআন। কুরআনে যত আদর্শের কথা বলা হয়েছে, তার বাস্তব রূপ ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কুরআনে যত আদর্শের কথা এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা, আচরণ ও সমর্থনের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। যেমন : কুরআনে নামাযের কথা এসেছে, কিন্তু নামায কীভাবে পড়তে হবে, কীভাবে রুকু করতে হবে, কীভাবে সাজদা করতে হবে ইত্যাদি, এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমল করে দেখিয়ে গেছেন। এবং বলেছেন :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ.

অর্থাৎ আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ, এভাবেই তোমরা নামায পড়।

এমনিভাবে কুরআনে যত আদর্শের কথা বলা হয়েছে, সব আদর্শের বাস্তব রূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে আমরা দেখতে পাই। অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন জীবন্ত কুরআন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন হল কুরআনের ব্যাখ্যা। আর কুরআন মানুষের জীবনের সবকিছু বলে দিয়েছে। কোথাও সংক্ষেপে বলে দিয়েছে,

কোথাও নীতি আকারে বলে দিয়েছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন, তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরে দিয়ে গেছেন। যা বিস্তারিতভাবে হাদীছের বিশাল ভাণ্ডারে সংরক্ষিত রয়েছে। হাদীছ হল তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, হাদীছ হল তাই কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই বলা হচ্ছিল : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত সারা বছর আলোচনার বিষয়। বরং বলতে গেলে দ্বীনের যত কথা বয়ান করা হয়, দ্বীনের যত কথা আলোচনা করা হয়, সব সীরাতই আলোচনা করা হয়। এমন কোন বয়ান হতে পারে কি, যা রাসূলের কথা আলোচনা করা ছাড়াই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে? এমন কোন দ্বীনের আলোচনা হতে পারে কি, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের উল্লেখ ছাড়া আলোচনা পূর্ণ হয়ে যায়? তা হতে পারে না। এ হিসেবে দ্বীনী আলোচনার সব মজলিসই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত আলোচনার মজলিস।

তবে সীরাত আলোচনার নামেও স্বতন্ত্র মজলিস হতে পারে। তার একটা ভিন্ন আমেজ, একটা ভিন্ন বরকত রয়ে গেছে। এবং নির্দিষ্ট কোন এক দিনে বা নির্দিষ্ট কোন এক মাসেই নয়, বরং সারা বছর হতে পারে। আমরা নির্দিষ্ট এই এক দিনে বা নির্দিষ্ট এই এক মাসে করার রছমে পড়ে গেছি, তাই বৎসরের অন্যান্য সময় সীরাত মাহফিল করি না। যার ফলে বৎসরের অন্যান্য সময় এর বরকত থেকে বঞ্চিত থাকি। আসুন এই রছমের গণ্ডি থেকে বের হয়ে আসি এবং বৎসরের অন্যান্য সময়ও সীরাত আলোচনার মজলিস করি। সীরাত আলোচনার মজলিস করতে হবে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনবৃত্তান্ত শুনে স্বাদ উপলব্ধি করতে হবে। প্রিয়তমের কথা যতই শোনা হবে, মাহবুবের কথা যতই আলোচনা হবে, ততই তো মজা লাগবে, ততই তো তার স্বাদ সুগন্ধি ছড়াতে থাকবে।

হে আল্লাহ্! তোমার প্রেম ও তোমার মাহবুব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম আমাদের নছীব কর। তোমার রাসূলের প্রেমের সুগন্ধিতে আমাদের দেহ মনকে সুরভিত করে দাও। বুযুর্গানে দ্বীন এ মর্মে দুআ করতেন :

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ نَبِيِّكَ وَحُبَّ بَيْتِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَ سُنَّتِهٖ وَاَحْيِنَا فِىْ مِلَّتِهٖ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ وَاَدْخِلْنَا فِىْ عُشَّاقِهٖ وَخُدَّامِ دِيْنِهٖ .

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার প্রেম ও তোমার রাসূলের প্রেম আমাদের নসীব কর। রাসূলের পরিবার ও রাসূলের সাহাবীদের প্রেম আমাদের নসীব কর। রাসূলের সুন্নাতের এত্তেবা করার তাওফীক নসীব কর। রাসূলের দ্বীনের উপর আমাদের জীবিত রাখ এবং আমাদেরকে রাসূলের প্রেমিক প্রেমিকা ও তাঁর দ্বীনের খাদেমদের তালিকাভুক্ত করে নাও। আমীন!

শবে মে'রাজ

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তা'আলা একদা রাত্রে জাগরিত অবস্থায় স্বশরীরে মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখান থেকে সাত আসমানের উপর এবং সেখান থেকেও আরও উপরে যতদূর আল্লাহর ইচ্ছা নিয়ে যান। সেখানে আল্লাহর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাবার্তা বলেন। তখনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান দেয়া হয় এবং সেই রাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। একে মে'রাজ বলে।

প্রসিদ্ধ আছে যে, ২৭ শে রজব রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মে'রাজ হয়েছিল। "প্রসিদ্ধ" কথাটা এজন্য বলা হল যে, কোন্ মাসে এবং কোন্ তারিখে মে'রাজ হয়েছিল, এ ব্যাপারে প্রচুর মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ হল রজব মাসের ২৭ তারিখেই এটা হয়েছিল। মে'রাজ হয়েছিল একথা কুরআনে এবং হাদীছে আছে, ইতিহাসেও আছে। এটা সত্য ঘটনা। কিন্তু কোন্ তারিখে হয়েছিল এটা নিয়ে মতভেদ আছে। ২৭ শে রজব দিনের সাথে বা এই রাতের সাথে বিশেষ কোন আমল জড়িত না থাকার কারণে এই মতভেদ হয়েছে। ২৭ শে রজব দিনের সাথে বা এই রাতের সাথে বিশেষ কোন আমল জড়িত থাকলে এই মতভেদ হতে পারত না। কারণ, তখন মানুষের মনে থাকত যে, ঐ দিনে বা ঐ রাতে আমাদের ঐ আমলটা করতে হবে। এভাবে সেই তারিখ নিয়ে আর মতভেদ হতে পারত না। কিন্তু মে'রাজের রাতে অর্থাৎ রজবের সাতাশে রাতে বিশেষ কোন আমল বা বিশেষ কোন ইবাদত সহীহ্ হাদীছের ভিতরে আসেনি। কিংবা পরবর্তী দিন রোযা রাখার কথাও সহীহ্ হাদীছে আসেনি। তাই নির্দিষ্ট তারিখ কেউ মনেও রাখেননি। তবে যদি কেউ এ রাতে নফল ইবাদত করেন করতে পারেন, অন্যান্য রাতে নফল ইবাদত করলে যেমন ছওয়াব, সেরকম ছওয়াব পাওয়া

যাবে। পরের দিনে কেউ যদি নফল রোযা রাখেন, রাখতে পারেন। অন্যান্য দিন নফল রোযা রাখলে যেমন ছওয়াব সে রকমই ছওয়াব পাওয়া যাবে।

যাহোক, মে'রাজের ঘটনা হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বোরাকে করে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে যান। সেখান থেকে সপ্তম আসমানের উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবার পর্যন্ত নিয়ে যান। আবার ঐ রাতের ভিতরে তিনি ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি ফজরের নামায আদায় করেন। এই ঘটনা কুরআনেও আছে, সহীহ্ হাদীছেও আছে। কেউ যদি অস্বীকার করে, তাহলে তার ঈমান থাকবে না। কোন যুক্তিতে ধরুক বা না ধরুক, বিজ্ঞান এটাকে স্বীকার করুক আর না করুক, তবুও আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। যেহেতু কুরআন-হাদীছে আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর সাহাবায়ে কেরামকে এই মে'রাজের বর্ণনা শোনালেন যে, দু'জন ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁরা আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে যান। সেখান থেকে সপ্তম আসমানের উপর পর্যন্ত আমি পৌঁছি। আল্লাহ্র দরবার পর্যন্ত পৌঁছি। আল্লাহ্র সাথে কথা হয়েছে। আল্লাহ পাক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। তিনি বিস্তারিত ঘটনা বয়ান করে শোনান। এই ঘটনা যখন বয়ান করলেন, তখন মক্কার কাফের নেতৃবৃন্দ এটা শুনে উপহাস শুরু করল যে, কাল্পনিক ঘটনা! তারা বলল এক রাতের ভিতরে সাত আসমানের উপরে যাওয়া আবার ফিরে আসা সম্ভব নয়।

কাফেররা ছুটে গেল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে। তারা ভাবল মুহাম্মাদের বড় শিষ্যের কাছে গিয়ে দেখি সে কী বলে? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ঐ দিন ফজরের জামাআতে ছিলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মুখ থেকে তখনও ঘটনা তিনি শোনেননি। কাফেররা তাঁর কাছে গেল। গিয়ে বলল : যদি কোন লোক বলে যে, সে রাতের অল্প সময়ের ভিতরে সাত আসমানের উপর পর্যন্ত গিয়েছে, আবার ফজরের আগে দুনিয়ায় ফিরে এসেছে। এরকম যদি কেউ বলে, তুমি কি তা বিশ্বাস করবে? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন : কে বলেছেন? তারা বলল : তোমাদের নবী! হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) সাথে সাথে বলে উঠলেন তাহলে আমি বিশ্বাস করি, তিনি সত্যই বলেছেন। এখান থেকেই আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) কে "সিদ্দীক" বলা হয়।

"সিদ্দীক" অর্থ চরম বিশ্বাসী, পরম বিশ্বাসী। শোনামাত্রই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। কোন যুক্তি তালাশ করেননি, কোন বিজ্ঞান তালাশ করেননি। এটা সম্ভব কি অসম্ভব তা চিন্তায় আনেননি। যেহেতু আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তাই বিনা দ্বিধায়, বিনা বাক্যে বিশ্বাস করেছেন।

কাফেররা দেখল যে এখানে তো কাজ হল না, তাহলে আবার মুহাম্মাদের কাছে যাই। এবার গিয়ে জিজ্ঞাসা শুরু করল, মুহাম্মাদ! তুমি যদি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে থাকবে, তাহলে বল বায়তুল মুকাদ্দাসের কয়টা সিঁড়ি আছে? কয়টা জানালা আছে? কয়টা দরজা আছে, ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিঁড়ি গণনা করতে যাননি। কয়টা দরজা জানালা আছে তা-ও জরিপ করতে যাননি। কিন্তু তারা জিজ্ঞাসা করে বসেছে, এখন যদি জওয়াব না দেয়া যায় তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যুক প্রমাণিত হবেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব পেরেশানী হল যে, আজ যদি এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারি, তাহলে ওরা আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে। হাদীছে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন আমার এত পেরেশানি হল যে, ওরকম পেরেশানী আমার আর কখনো হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন :

فَجَلَّى اللهُ لِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ - (مسلم)

অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ পাক বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার চোখের সামনে তুলে ধরলেন, আর তারা যা জিজ্ঞাসা করছিল আমি দেখে দেখে গণনা করে করে তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। সুবহানাল্লাহ!

এ রকম জাজ্বল্যমান প্রমাণ আসার পরও ঈমান আনা তাদের ভাগ্যে জুটল না, তারা মানল না। ঈমান আনা, এটা আল্লাহ্‌র খাস তাওফীকের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র তাওফীক না হলে ঈমান আনা সম্ভব হয় না। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমান নসীব করেছেন তার জন্য শোকর আদায় করতে হবে। আমাদের মধ্যে কত বড় বড় বুদ্ধিমান, কত বড় বড় জ্ঞানী বিজ্ঞানী রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করার, ঈমান আনার নসীব তাদের হচ্ছে না। ঈমান আনতে পারার জন্য আল্লাহ পাকের খাস তাওফীকের প্রয়োজন। ঈমানের উপর টিকে থাকার জন্যেও তাওফীকের প্রয়োজন। তাই ঈমানের উপর টিকে থাকার জন্যও আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করতে হবে।

মে'রাজের ঘটনা বয়ান করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসলেন, আমি উম্মে হানির ঘরে ঘুমন্ত ছিলাম তারা আমাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে বায়তুল্লাহর কাছে হাতীমের ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে যমযম কূয়ার কাছে আমাকে নেয়া হল। সেখানে আমার সীনা চাক বা বক্ষ বিদারণ করা হল। আমার সীনা ফেড়ে তার মধ্য থেকে কলব বা হার্টটাকে বের করা হল। কলব ফেড়ে তার থেকে কী একটা বস্তু বের করা হল। তারপর যমযমের পানি দিয়ে কলবটাকে ধুয়ে আবার যথাস্থানে কলবটাকে স্থাপন করে দেয়া হল। এটাকে ফার্সীতে বলা হয় সীনা চাক অর্থাৎ বক্ষ বিদারণ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীনা চাক করার ঘটনা তিনবার ঘটেছে। তিনবার তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হয়েছে। প্রথমবার যখন শিশু ছিলেন, যখন হালীমা সা'দিয়ার ঘরে ছিলেন সে সময়। তিনি হালীমা সা'দিয়ার ছেলের সাথে অর্থাৎ দুধ ভাইয়ের সাথে খেলা করতে গিয়েছিলেন। তখন ফেরেশতারা এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীনা চাক করেন। ঐ সময় সীনা চাক করে মানুষের হৃদয়ের ভিতরে শিশু অবস্থায় যত শিশুসুলভ প্রবণতা থাকে, যেমন খেলাধুলা করা, ছুটাছুটি করা ইত্যাদি: এই প্রবণতাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে দূর করে দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়বার সীনা চাক করা হয়েছিল যৌবনের সময়। এবার সীনা চাক করে যৌবনসুলভ যত উচ্ছৃঙ্খলতা, যত পাপের মনোভাব থাকে, সেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূর করে দেয়া হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যৌবনে এরকম কোন কিছু ঘটেনি যা সাধারণতঃ যৌবনকালে মানুষের থেকে ঘটে থাকে। আর তৃতীয়বার সীনা চাক করা হয়েছিল মে'রাজে নেয়ার সময়। উলামায়ে কেরাম এটার হেকমত বলেছেন—মে'রাজে নেয়ার সময় যখন তিনি উর্ধ্বজগতে যাচ্ছেন, আল্লাহ্‌র দরবারে যাচ্ছেন, সেই উর্ধ্বজগতের পরিবেশ সহ্য করার মত যোগ্যতা, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সরাসরি দীদার লাভ করার মত শক্তি, সরাসরি আল্লাহ্‌র কালাম বরদাশ্‌ত করার মত শক্তি—এগুলো তাঁর অন্তরে ভরে দেয়ার জন্য তাঁর সীনা চাক করা হয়েছিল। যেসব বিজ্ঞানীরা চাঁদে যায়, উর্ধ্বআকাশে যায়, তাদেরও বিশেষভাবে প্রস্তুত করে পাঠানো হয়, যাতে তারা উর্ধ্বজগতের পরিবেশ সহ্য করতে পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীনা চাক করা হয়েছিল, এটা কোন কাল্পনিক বিষয় নয়। তার চাক্ষুস দলীলও রয়েছে। হযরত আনাস (রাযি.) বলেছেন :

وَقَدْ كُنْتُ اَرَى اَثَرَ الْمَخِيْطِ فِىْ صَدْرِهِ (صلى الله عليه وسلم)۔ (مسلم)

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সীনা চাক করা হয়েছিল, তাঁর সীনায় সিলাইয়ের দাগও আমি দেখেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের সামনে জামা খুলতেন না, তাই সব সাহাবীর পক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত সীনা দেখা সম্ভব ছিল না। হযরত আনাস (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের খাদেম ছিলেন। দশ বছর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের খেদমত করেছেন। তাই তাঁর পক্ষেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত সীনা দেখা সম্ভব ছিল। সেই আনাস (রাযি.)-ই বলেছেন আমি তাঁর সীনা মুবারকে সেলাইয়ের দাগ দেখেছি। তাই সীনা চাকের বিষয়টা কোন কাল্পনিক গল্প নয়, বাস্তব ঘটনা।

এক যুগে কিছু মানুষ যুক্তির দোহাই দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বশরীরে মে'রাজে যাওয়াকে অস্বীকার করত। তারা বলত : উর্ধ্ব আকাশে রয়েছে কঠিন শীতল স্তর, রয়েছে কঠিন গরমের স্তর, রয়েছে অক্সিজেন ছাড়া স্তর, যেসব স্তরে মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এতসব প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রম করে স্বশরীরে মে'রাজে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এখন যখন বিজ্ঞান বলছে এটাও সম্ভব, তখন তারা চুপসে যাচ্ছে। এখন নাকে খত দিয়ে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, না স্বশরীরে মে'রাজ সম্ভব। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কুরআন-হাদীছের কোন কিছুকে অস্বীকার করলে এভাবেই নাকে খত দিতে হবে। আমরা বিজ্ঞান স্বীকার করুক বা না করুক তা বুঝি না, যুক্তিতে ধরুক বা না ধরুক তা বুঝি না, কুরআন-হাদীছে কিছু বলা হলে তাতেই আমরা বিশ্বাস করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বশরীরে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সপ্তম আসমানের উপরে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তারও উপরে আল্লাহর দরবার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে—আমরা এতে বিশ্বাস করি। কারণ, কুরআন-হাদীছে তা বলা হয়েছে।

আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখানোর জন্য, আল্লাহর রাজত্ব কত বিশাল, আল্লাহর শক্তির পরিধি কত বিশাল, আল্লাহর সৃষ্টি কত বিশাল এবং অদ্ভুত—এসব দেখানোর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মে'রাজে নেয়া হয়েছিল। জান্নাত-জাহান্নাম এই সব কিছু তাঁকে দেখানো হয়েছিল। নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে এগুলো দেখে এসেছেন, যাতে কে
বলতে না পারে এবং সন্দেহ করতে না পারে যে, ঈমানের কথা যা কি
আমরা শুনি যেমন : আল্লাহ্ আছেন, জান্নাত আছে, জাহান্নাম আছে, এ
কিছু আসলে আছে কি-না? কেউ তো কোন দিন দেখেনি! এখন আর এরূ
সন্দেহ করার অবকাশ নেই। কারণ, এগুলো আছে তা এমন একজন দে
এসে বলেছেন, যাকে দুনিয়ার কেউ মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি। ঘোর শ
পর্যন্ত যাকে মিথ্যুক বলতে পারেনি। আমার আপনার মত লক্ষ মানুষকে য
দেখানো হত, আর আমরা দেখে এসে বলতাম, তবুও মানুষ অস্বীকার কর
পারত যে, হয়তো পরিকল্পিতভাবে এরা মিথ্যা বলছে। কিন্তু এমন একজন
দেখানো হয়েছে, যাকে কেউ মিথ্যুক বলতে পারবে না। আমার আপন
দেখার চেয়ে, লক্ষ কোটি মানুষের দেখার চেয়ে তাঁর একার দেখ
বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশী। এই সবকিছু তাঁকে দেখানো হয়েছে রাতে
অল্প সময়ের মধ্যে। মাঝ রাত থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে স
দেখে তিনি ফিরে এসেছেন।

তাঁকে যে বাহনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার নাম হল 'বোরাক'। হাদীস
এসেছে :

دَابَّةٌ اَبْيَضُ طَوِيْلٌ مَا فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفِهٖ-(مسلم)

অর্থাৎ এটা একটা সাদা রংয়ের জানোয়ার, যা গাধার চেয়ে একটু বড়
খচ্চরের চেয়ে একটু ছোট। তার গতি হল— দৃষ্টির শেষ সীমা যতদূরে যা
তত দূরে সে এক এক কদম রাখে।

মানুষের দৃষ্টির শেষ সীমা কত দূর যায় তা কেউ বলতে পারেন? কোটি
কোটি মাইল দূরের গ্রহ-নক্ষত্র আমরা এখান থেকে দেখতে পাই। কোটি
কোটি নয় হাজার কোটি মাইল দূরেরটাও আমরা দেখি। এরকম দৃষ্টির শে
সীমা পর্যন্ত দূরে দূরে এক এক কদম রাখত বোরাক। তাহলে তার গতি কত
ছিল তা কল্পনাও করা যায় না।

কেউ কেউ বোরাকের ছবি তৈরি করেছেন— ঘোড়ার মত দেহ, নারীর
মত মুখ আর ডানা লাগানো। ভেবেছেন বোরাক খচ্চরের চেয়ে ছোট, আর
খচ্চর তো অনেকটা ঘোড়ার মত, তাহলে ঘোড়ার মত আকৃতি দিতে হয়
আর যখন উড়ে চলে তখন ডানাও দরকার, তাই ডানাও লাগানো হয়েছে।
আর বোরাক যেহেতু কথা বলে, তাহলে একটা মুখও দরকার, মুখও বানানো

হয়। আর মুখ যখন বানাবই তখন মহিলার মুখই বানাই। ওটাইতো ভাল লাগে! ব্যস! এই সব কিছু মিলে বোরাক তৈরী হয়ে গেল। অনেকে আবার এই কল্পিত ছবি বরকতের জন্য ঘরে রাখে। একেতো ঘরে ছবি রাখা হারাম, তারপরও কল্পিত ছবি রেখে বরকত লাভের আশা; এটা কত বড় বোকামী।

যাহোক, বোরাকে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যাওয়া হয়। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে আসমানের দিকে আরোহণের সময় একটা চলন্ত সিড়ি আসে। তিনি বোরাকসহ সেই চলন্ত সিড়িতে করে ঊর্ধ্বজগতে আরোহণ করেন। এজন্যই মে'রাজকে "মে'রাজ" বলা হয়। "মে'রাজ" শব্দের অর্থ হল সিড়ি।

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সাত আসমানে আটজন বিশিষ্ট নবীকে রাখা হয়। প্রথম আসমানে হযরত আদম (আ.) তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা (আ.)ও ইয়াহইয়া (আ.), তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ.), চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস (আ.), পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আ.), ষষ্ট আসমানে হযরত মূসা (আ.) এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সপ্তম আসমানে বায়তুল্লাহর মত হুবহু একটা ঘর আছে, যেটাকে বলা হয় বায়তুল মা'মুর। দুনিয়াতে মানুষ যেমন বায়তুল্লাহ-র তাওয়াফ করে, 'বায়তুল মা'মুরে' তেমন সর্বক্ষণ ফেরেশতারা তাওয়াফ করেন। হাদীছে আছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وَاِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ ـ (مسلم)

অর্থাৎ প্রতিদিন সেখানে এমন ৭০ হাজার ফেরেশতা তাওয়াফের জন্য আসেন, যারা ভবিষ্যতে আর কোন দিন এখানে আসবেন না।

তাহলে কত অসংখ্য ফেরেশতা আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন! এই বায়তুল মা'মুরের পাশে আছে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা। 'সিদ্‌রাতুন' অর্থ বরই গাছ, আর 'মুন্‌তাহা' অর্থ সর্বশেষ ষ্টেশন। এটাকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' বা সর্বশেষ ষ্টেশন এজন্য বলা হয় যে, দুনিয়া থেকে যা কিছু উপরের দিকে যায়, তা ঐ পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়, তারপর তা উপরে তুলে নেয়া হয়। এমনিভাবে উপর থেকে যা নাযিল হয়, তা ঐ পর্যন্ত এসে থেমে যায়, অতঃপর সেখান থেকে তা নিচে অবতারিত হয়। এখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আরও উর্ধ্বে আল্লাহর দরবার পর্যন্ত নেয়া হয়।

এই সিদরাতুল মুনতাহার পাশে আছে জান্নাত। রাসূল স আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে জান্নাতের সব স্তর ঘুরিয়ে (হয়েছে। সাধারণ মুসলমানরা কোন স্তরে থাকবেন, বিশেষ বিশেষ মু কোন স্তরে থাকবেন সব দেখানো হয়েছে। একটা ঘর দেখিয়ে জি (আ.) বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনার জন্য হবে এই ঘরটা। রাসূল সা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার সঙ্গী ছিলেন জিবরাঈল (আ. মীকাঈল (আ.)। তিনি বলেন : আমার ঘরটা দেখানোর পর আমি ব আমাকে এই ঘরটায় একটু প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হোক। ফেরেশতা বললেন এখনও আপনার সময় হয়নি, এখনও দুনিয়ায় অ হায়াত বাকী রয়ে গেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কলমের খসখসানি আ শোনানো হয়েছিল। দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে অনন্তকাল পর্যন্ত যা ঘটেছে এবং ঘটবে, এই সবকিছু লওহে মাহফূজে লিখে রাখা হ আল্লাহর হুকুমে বিশেষ একটা কলম এই সবকিছু লিখে রেখেছে। তি শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে আল্লাহপাক সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে কলমকে হুকুম দিয়েছিলেন : اُكْتُبْ অর্থাৎ তুমি লিখে ফেল। কলম বলো مَا اَكْتُبُ অর্থাৎ কী লিখব? আল্লাহ বলেছিলেন :

اُكْتُبِ الْقَدَرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ

অর্থাৎ তাকদীর লেখ। তখন আল্লাহর হুকুমে কলম যা কিছু হয়েছে হবে সবকিছু লিখে ফেলে। "লওহে মাহফূজ" হল বিশেষ একটা সংর ফলক, যাতে আদি-অন্তের সবকিছু লিখে রাখা হয়েছে। রাসূল সাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লওহে মাহফূজে ঐ যে কলম লিখে কলমের সেই লেখার খসখসানী আওয়াজ আমাকে শোনানো হয়ে দুনিয়ার ক্যাসেটে যদি শব্দ ধরে রাখা যায় এবং তা পরে শোনানো তাহলে আল্লাহ কেন লওহে মাহফূজে লেখার শব্দ ধরে রাখতে এবং পরে শোনাতে পারবেন না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিভিন্ন পাপের কী কী হবে তা দেখানো হয়েছে। বোখারী শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে দেখেছেন এক ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। করাত দিয়ে তার গাল দেয়া হচ্ছিল। একবার ডানপাশ আরেকবার বাম পাশ। রাসূল সাল্লা

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গের ফেরেশ্তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন কেন এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে? রাসূল কে বলা হয়েছে এ লোক মিথ্যুক ছিল। মিথ্যার কাজে সে গালকে ব্যবহার করত, তাই ওখানেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে । কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আরও দেখানো হয়েছে এক ব্যক্তি শোয়া অবস্থায় আছে। পাশে একজন ফেরেশ্তা দাঁড়ানো। সেই ফেরেশ্তা বড় পাথর দিয়ে ঐ লোকের মাথার উপর আঘাত করছে। তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পাথরটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ছে। ফেরেশ্তা পাথরটা আনতে আনতে তার মাথা আগের মত ভাল হয়ে যাচ্ছে। আবার সেই পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করছে। এভাবে একের পর এক আঘাত করেই যাওয়া হচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলা হল এই ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক জ্ঞান দিয়েছিলেন, তাকে বুঝ দিয়েছিলেন, কিন্তু সে ঘুমিয়ে থাকত, সে ইবাদত করত না, আমল করত না। দেখা গেল সে মস্তিষ্ককে কাজে লাগাত না, তাই তার মাথায় আঘাত করা হচ্ছে। পাপ যে ধরনের শাস্তির ধরনটাও ওরকম হয়ে থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আরও দেখানো হয়েছে— একদল লোক রক্তের দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তারা কূলে আসার চেষ্টা করছে। যখন কূলের নিকটে চলে আসছে, তখন কূলে দণ্ডায়মান ফেরেশ্তা পাথর দিয়ে তাদের মুখে আঘাত করছে, তারা ছিটকে আবার দূরে চলে যাচ্ছে। আবার আসার চেষ্টা করছে, আবার ওভাবে আঘাত করে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলা হয়েছে এরা ছিল সুদখোর। মানুষ তাদের রক্ত পানি করে টাকা-পয়সা উপার্জন করত, আর এরা সেগুলো অবৈধভাবে গ্রহণ করত। তারা যেন মানুষের রক্ত খেত, তাই রক্তের দরিয়ায় তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আরও দেখানো হয়েছে কিছু লোকের পা উপর দিকে লটকানো, মাথা নিচের দিকে। বলা হয়েছে এরা ইফতার করত সময়ের আগে, কিংবা রোযাই রাখত না। তাই এখন এভাবে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আরও দেখানো হয়েছে একদল লোকের হাতে বড় বড় নখ, তামার নখ, লম্বা লম্বা নখ। এই নখ দিয়ে তারা

নিজেদের চেহারা ছিড়ছে, মুখের মাংস ছিড়ে ছিড়ে নিচ্ছে। রাসূল সাল্লা
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে : এরা মানুষের গীবত করত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখানো হয়েছে যারা যা
আদায় করে না তাদের কেমন শাস্তি হবে। যারা যেনাকারী, তাদের বে
শাস্তি তা-ও দেখানো হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে
আমাকে একটা স্থান এরকম দেখানো হয়েছে যেমন তন্দুর রুটির চুলা।
মধ্যে আগুন উথাল-পাথাল খাচ্ছে। তার ভিতরে কিছু উলঙ্গ নারী-পু
ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদের শরীর ফোলা। সেই শরীর থেকে বিশ্রী রকমের দু
বের হচ্ছে। সাপ-বিচ্ছু তাদের যৌনাঙ্গে কামড়াচ্ছে। রাসূল সাল্লা
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে : এরা হল ঐ সমস্ত লোক, যারা
করত। এভাবে যত রকম অপরাধের, যত রকম পাপের যত রকম শাস্তি,
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখানো হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাকে একটা জান্ন
দেখানো হয়েছে। সেটা খুবই সুন্দর। সেটা হল সাধারণ মানুষের জান্না
আমাকে আরও একটা জান্নাত দেখানো হয়েছে, যেটা পূর্বেরটার চেয়ে আ
উন্নত মানের ছিল। আমাকে বলা হয়েছে এটা হল শহীদদের জন্য। যা
আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে শরীক হয়ে শহীদ হয়ে যায়, তাদের জন্য
মর্যাদার স্তর রাখা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন
আমাকে আরও একটা সুন্দর ঘর দেখিয়ে বলা হয়েছে এটা হল আপনার ঘ
এখানে আপনাকে রাখা হবে। আমি বলেছি আমাকে এখানে ঢুকতে দে
হোক। তখন বলা হয়েছে আপনার দুনিয়ার সময় এখনও রয়ে গেছে। রাসূ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জান্নাতে আমি বেলালের খড়ম
আওয়াজ শুনেছি। বেলাল দুনিয়াতে যে খড়ম নিয়ে চলে, তার যে আওয়া
সেই আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছি। বেলাল (রাযি.) শুনে খুশিতে কেঁ
ফেলেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন : জান্না
আমি এক সুন্দরী মহিলা দেখেছি। জিজ্ঞাসা করেছি এ কার মহিলা? ব
হয়েছে ওমরের মহিলা। আমি ওমরের শরমে তার সাথে কথা বলিনি যে,
আত্মমর্যাদায় আঘাত বোধ করে কি-না। হযরত ওমর (রাযি.) শুনে কেঁ
দিয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ব্যাপারেও আমার আত্মমর্যাদা
আঘাত বোধ হতে পারে? এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ক
জান্নাতের বিভিন্ন স্তর দেখানো হয়েছে।

সর্বশেষ আল্লাহ্‌র দরবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) হাদীছ বয়ান করেছেন। 'মুসনাদে আহমদ' কিতাবে সহীহ্ সনদে হাদীছ এসেছে : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

رَاَيْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ۔

অর্থাৎ আমি আমার রব্ আল্লাহ জাল্লা জালালুহুকে দেখেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌কে দেখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বললেন :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰاتُ وَالطَّيِّبَاتُ۔

এর অর্থ হল : (হে আল্লাহ্‌র) মুখের দ্বারা যত প্রশংসা যত ইবাদত হওয়া সম্ভব, সব প্রশংসা, সব ইবাদত তোমার জন্য নিবেদিত। দেহের দ্বারা যত ইবাদত যত আনুগত্য করা সম্ভব, সব ইবাদত আনুগত্য তোমার জন্য নিবেদিত। ধন-সম্পদ দ্বারা যতভাবে ইবাদত আনুগত্য করা সম্ভব, সব তোমার জন্য নিবেদিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ্‌র প্রশংসায় একথাগুলো বলেছেন, তখন আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

অর্থাৎ হে নবী! তোমার জন্য সব রকম শান্তি, রহমত ও বরকতের ফয়সালা করে দিলাম। আল্লাহ তাআলা "তোমার জন্য" কথাটা বলেছেন, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ۔

অর্থাৎ শুধু আমার জন্য কেন? আমাদের সকলের জন্য শান্তি, রহমত ও বরকতের ফয়সালা করা হোক। তোমার সমস্ত নেক বান্দাদের জন্য এর ফয়সালা করে দেয়া হোক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রথমেই বলে দিতে পারতেন যে, তোমাদের সকলের জন্য শান্তি, রহমত ও বরকতের ফয়সালা করে দিলাম। কিন্তু তিনি তা না বলে প্রথমে শুধু নবীর জন্য এগুলোর ফয়সালার কথা বললেন। তারপর নবীর মুখ থেকে সকলের জন্য আবেদন বের হল, যাতে প্রকাশ পায় উম্মতের জন্য তাঁর চিন্তা-দরদ এতটা যে, আল্লাহ্‌র খাস দরবারে গিয়েও তিনি উম্মতের কথা ভুলেননি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের কথা কখনোই ভুলবে না। হাশরের ময়দানে, যখন সবচেয়ে ভয়াবহ মুহূর্ত হবে, সে সময়ও তি উম্মতের কথা ভুলবেন না। হাদীছে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ دَعَابِهَا فِيْ أُمَّتِهِ وَإِنِّيْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ

مَ الْقِيٰمَةِ-(مسلم)

অর্থাৎ প্রত্যেক নবীকে এমন একটা দুআর ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল যে যখন যেভাবে চাইবেন, তখন সেভাবে সে দুআ কবূল করা হবে। রাসূ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সব নবী দুনিয়াতে তাঁদের সেই দুআ ক্ষমতা প্রয়োগ করে গেছেন, আমি প্রয়োগ করিনি। আমি সেটাকে রিজার্ভ রেখে দিয়েছি। কেয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতের সুপারিশ করার জন্য সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করব।

দেখা গেল কেয়ামতের ভয়াবহ দিনেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের কথা ভুলবেন না। আল্লাহর খাস দরবারে গিয়েও তিনি উম্মতের কথা ভুলেননি। তাই বলেছেন : শান্তি, রহমত, বরকত শুধু আমার জন্য নয় আমাদের সবার জন্য, আমার সব উম্মতের জন্য হোক।

এতক্ষণ কিছু প্রশংসার কথা রাসূলের পক্ষ থেকে বলা হল। কিছু কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হল। তারপর আল্লাহ তাআলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত ফেরেশতাগণ সকলে মিলে একযোগে বললেন কিংবা এক বর্ণনামতে হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন :

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

এ কথাগুলিকেই নামাযের মধ্যে রাখা হয়েছে, যা আমরা পাঠ করি। এটাকে বলে তাশাহ্হুদ। তাই বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন যে, নামায হল মু'মিনের মে'রাজ। নামাযের ভিতরে আমরা একথাগুলো এই ধ্যান করে পাঠ করব যে, আল্লাহ্ আমার সামনে উপস্থিত, আমিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায় আল্লাহর প্রশংসা করছি যে, হে আল্লাহ! আমার মুখের দ্বারা, আমার কথা দ্বারা তোমার যত প্রশংসা হতে পারে ঐ সবকিছু তোমার

জন্য নিবেদিত করে দিলাম। আমার দেহ দ্বারা তোমার যত ধরনের ইবাদত-আনুগত্য হতে পারে, সব তোমার জন্য নিবেদিত করে দিলাম। আমার ধন-সম্পদ সব তোমার জন্য নিবেদিত করে দিলাম। এই ধ্যান উপস্থিত করতে পারলে মে'রাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র সবচেয়ে কাছে গিয়েছিলেন, আর দুনিয়াতে মানুষ নামাযের ভিতরে আল্লাহ্র সবচেয়ে বেশী কাছে এসে যাবে।

মে'রাজে আল্লাহ্র দরবারে আল্লাহ্র সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও অনেক কথা হল। আল্লাহ জানেন আরও কত প্রেমের কথা হয়েছে! সব শেষে আল্লাহ তা'আলা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেয়া হয়েছে। তারপর তাঁকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবেদনক্রমে পঞ্চাশ ওয়াক্তকে শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তে কমিয়ে আনা হয়েছে।

এই হল মে'রাজের ঘটনা। এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পেলাম-যতগুলি বিষয়ে আমরা না দেখে ঈমান রাখি, সে সব বিষয়ে যেন আমাদের কোন সন্দেহ না থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে এসেছেন, অবিশ্বাস করার কিছু নেই। মে'রাজের ঘটনা থেকে আমরা এই বিশ্বাসের মজবুতী অর্জন করতে পারলাম। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পেলাম, সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত পেলাম, যার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহা কুদরত, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহা সৃষ্টিজগত সম্পর্কে কিছুটা ধারণা অর্জন করতে পারলাম।

শবে বরাত

'বরাত' শব্দের অর্থ মুক্তি এবং 'শব'-এর অর্থ রাত। অতএব 'শবে বরাত' এর অর্থ মুক্তির রাত। এই রাতে আল্লাহ তাআলা অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি চাওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান জানান এবং তাঁর নিকট চাইলে তিনি এসব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, তাই এ রাতকে শবে বরাত বা মুক্তির রাত বলা হয়। শাবান মাসের ১৫ই রাত অর্থাৎ ১৪ই শাবান দিবাগত রাতই হল এই শবে বরাত।

এই রাতে কী কী করণীয়—এ সম্পর্কে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا.

অর্থাৎ যখন শা'বান মাসের অর্ধেক হয়ে যায়, যখন ১৪ই তারিখ দিবাগত রাত হয়, তখন তোমরা সেই রাত্র জাগরণ কর আর পরের দিন রোযা রাখ। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا . فَيَقُوْلُ اَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَلَهٗ . اَلَا مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهٗ . اَلَا مِنْ مُبْتَلٍ فَاُعَافِيْهِ . اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. (ما ثبت بالسنة عن ابن ماجة والبيهقى)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এই রাতে প্রথম আসমানে চলে আসেন।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক বান্দার খুব কাছে চলে আসেন এবং মানুষকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন : তোমরা কেউ পাপী আছ, আমার কাছে মাফ চাইবে, আমি তাকে মাফ করে দিব। তোমাদের কেউ রিযিক চাওয়ার আছে, আমার কাছে রিযিক চাইবে, আমি তাকে রিযিক দান করব। তোমাদের কেউ অসুস্থ আছ, রোগ-শোকগ্রস্ত আছ, আমার কাছে রোগ থেকে মুক্তি চাইবে, আমি তাকে মুক্তি দিয়ে দিব। এভাবে আল্লাহ পাক এক একটা বিষয়ের উল্লেখ করে করে বলতে থাকেন : অমুকটা চাওয়ার আছ চাও আমি দিয়ে দিব। অমুকটা চাওয়ার আছ চাও আমি দিয়ে দিব। এভাবে এক একটা বিষয় উল্লেখ করে আল্লাহ পাক চাওয়ার জন্য বলতে থাকেন। সুবহে সাদেক পর্যন্ত অর্থাৎ ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এভাবে আল্লাহ পাক বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করে মানুষকে ডেকে ডেকে চাইতে বলেন, দু'আ করতে বলেন।

এই রাতে আল্লাহ তাআলা যতগুলি বিষয় চাওয়ার বা দু'আ করার কথা বলেছেন, তার মধ্যে প্রথমে বলেছেন ক্ষমা চাওয়ার কথা। কারণ, মানুষের ক্ষমা চাওয়া হল সবচেয়ে বড় চাওয়া, ক্ষমা পাওয়া হল মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। শবে বরাত সবকিছু চাওয়ার রাত, তবে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান চাওয়ার বিষয় হল ক্ষমা চাওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় চাওয়া হল ক্ষমা চাওয়া, সবচেয়ে বড় পাওয়া হল ক্ষমা পাওয়া। এ জন্যই এই রাতে আল্লাহ পাক প্রথমে গোনাহ থেকে মুক্তি চাওয়ার কথা বলেছেন। এর সাথে সাথে অভাব-অনটন থেকে মুক্তি চাওয়া, রোগ-শোক থেকে মুক্তি চাওয়া, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি চাওয়া এই সব কিছু চাওয়ার কথাও বলেছেন।

যাহোক, এই হাদীছের আলোকে বরাতের রাতের একটা আমল হল নফল ইবাদত করা। আর একটা আমল হল পরের দিন রোযা রাখা। আর একটা আমল হল আল্লাহ্র কাছ থেকে সবকিছু চেয়ে নেয়া। বিশেষভাবে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। এই হল শবে বরাত উপলক্ষ্যে আমাদের বিশেষ বিশেষ করণীয় আমল।

এই রাতে যে নফল ইবাদতের কথা বলা হল, সেই নফল ইবাদত বলতে কী বোঝায়? নফল ইবাদত বলতে বিশেষভাবে বোঝায় নফল নামায পড়া। হাদীছে এসেছে :

وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ . إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ ـ (مجمع الزوائد عن احمد)

অর্থাৎ নফল ইবাদত দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করে অর্থাৎ আমার খুব কাছের মানুষ হয়ে যায়। এমনকি আমার ভালবাসার পাত্র হয়ে যায়। তাকে আমি ভালবাসতে শুরু করি। তখন সে যা চায় তাকে তা-ই দেই, যখন আমাকে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দেই।

অতএব যে যত বেশী নফল নামায পড়বে, সে ততবেশী আল্লাহ পাকের ভালবাসা অর্জন করতে পারবে, সে ততবেশী আল্লাহ পাকের কাছের মানুষ হয়ে যাবে। অতএব আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করার জন্য, আল্লাহ্র কাছের মানুষ হওয়ার জন্য বেশী বেশী নফল নামায পড়তে হবে। নফল নামাযের মাধ্যমে আমি যখন আল্লাহ্র কাছের মানুষ হয়ে যাব, তখন আল্লাহ পাকও আমার সব চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ করে দিবেন। আপন মানুষের চাওয়া-পাওয়া অপূর্ণ রাখা হয় না। তাই আল্লাহ্র কাছে চাওয়ার আগে বিশেষভাবে নফল নামাযের কথা বলা হয়েছে। নফল নামাযের সাথে সাথে অন্যান্য নফল ইবাদতও করা যেতে পারে। কুরআন তেলাওয়াত করা যেতে পারে। দু'আ দুরূদ পড়া যেতে পারে। যিকির-আযকার করা যেতে পারে।

নফল নামাযের ব্যাপারে মনে রাখতে হবে ইশার পর থেকে নিয়ে সুব্হে সাদেক পর্যন্ত অর্থাৎ সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত যে সময়, এর ভিতরে যত নফল নামায পড়া হবে সেটাকে বলে তাহাজ্জুদ। তাই আমরা এ রাতে যত নফল নামায পড়ব, তা তাহাজ্জুদের নিয়্যতেও পড়তে পারি, নফলের নিয়্যতেও পড়তে পারি। দুই দুই রাকআত করে পড়া উত্তম। এভাবে নিয়্যত করা যাবে

যে, দুই রাকআত তাহাজ্জুদের নিয়ত করছি, অথবা এভাবেও নিয়ত করা যাবে যে, দুই রাকআত নফল নামাযের নিয়ত করছি। নফল বললেও তাহাজ্জুদই হয়ে যাবে। তাহাজ্জুদ বললেও নফলই হবে। কাজেই নিয়ত সহজ।

অনেক মা-বোন শবে বরাতের নামাযকে খুব কঠিন মনে করে বসে আছেন। তারা মনে করেন শবে বরাতের নামায কী পড়ব? নামাযের নিয়তই তো জানি না! অথচ নিয়তের কোন জটিলতা নেই, দুই দুই রাকআত নফল নামাযের নিয়ত অথবা দুই দুই রাকআত তাহাজ্জুদের নিয়ত করলেই হয়ে যায়। এই রাতের নামায কোন্ কোন্ সূরা দিয়ে পড়ব, তাও খুব সহজ, কোনই জটিলতা নেই। কোন নির্দিষ্ট সূরার বাধ্যবাধকতাই নেই। যে কোন সূরা-কিরাত দিয়ে পড়তে পারি। শরীয়ত কত সহজ, অথচ আমরা শরীয়তকে অজ্ঞতার কারণে বা কুসংস্কারের কারণে কঠিন করে ফেলেছি।

এতক্ষণ সাধারণ নফল নামাযের কথা বলা হল। অনেক মা-বোন সালাতুত তাসবীহ পড়তে চান। সালাতুত তাসবীহও পড়া যায়।

সালাতুত তাসবীহ

সালাতুত তাসবীহ্ কথাটার মধ্যে সালাত শব্দের অর্থ হল নামায, আর তাসবীহ বলতে এখানে سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ সুবহানাল্লাহি ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার) এই নামাযের ভিতরে এই তাস্‌বীহ পড়া হয়, তাই এই নামাযকে সালাতুত তাসবীহ্ বলে।

সালাতুত্তাসবীহ্-এর অনেক ফযীলত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাযি.)কে বলেছিলেন : চাচা, পারলে আপনি প্রতিদিন এই নামায পড়বেন। তা না পারলে সপ্তাহে এক দিন পড়বেন। তা-ও না পারলে মাসে একবার পড়বেন। তা-ও না পারলে বছরে একবার পড়বেন। অন্ততঃ জীবনে একবার হলেও এই নামায পড়বেন। এই নামায দ্বারা জীবনের সগীরা, কবীরা, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, নতুন, পুরাতন, গোপন, প্রকাশ্য সব রকম গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! এ নামাযের কত ফযীলত।

এই নামায হল ৪ রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে এই তাসবীহ ৭৫ বার পড়তে হয়। তাহলে চার রাকআতে ৩০০ বার হয়। সালাতুত তাসবীহ্ নামাযে এই তাসবীহ্গুলো পাঠ করার দুইটা নিয়ম আছে। যথা :

একটা নিয়ম হল : প্রথমে নিয়ত করবেন। আরবীতে না পারলে নিজের ভাষায় এভাবে নিয়ত করবেন—চার রাকআত সালাতুত তাসবীহ নফল নামাযের নিয়ত করলাম। তারপর ছানা অর্থাৎ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা... এটা পড়বেন। অতপর সূরা ফাতিহা পাঠ করতঃ যে কোন একটা সূরা কিরাত পড়বেন। সূরা কিরাত শেষ করে ঐ দাঁড়ানো অবস্থাতেই ১৫ বার ঐ তাসবীহ পাঠ করবেন। এরপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবেন। রুকুর তাসবীহ পড়ার পর আবার ঐ তাসবীহ্ ১০ বার পড়বেন। তারপর রুকু থেকে উঠে রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলার পর আবার ঐ তাসবীহ ১০ বার পড়বেন। তারপর সাজদায় যাবেন। সাজদার তাসবীহ পড়ার পর ঐ তাসবীহ ১০ বার, সাজদা থেকে উঠে দুই সাজদার মাঝখানে ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় সাজদার তাসবীহ পড়ার পর আবার ঐ তাসবীহ্ ১০ বার। এই হল ৬৫ বার। এখন আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে বসে আবার ১০ বার। এই হল এক রাকআতে মোট ৭৫ বার। এবার দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠবেন। এখানে আল্লাহু আকবার বলে উঠতে হবে না। উঠার আল্লাহু আকবার তো আগেই বলা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় রাকআতে ঐ রকম সূরা কিরাতের পর ১৫ বার, রুকুর তাসবীহের পর ১০ বার, রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ-এর পর ১০ বার, প্রথম সাজদায় ১০ বার, দুই সাজদার মাঝখানে ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার। এরপর আল্লাহু আকবার বলে উঠবেন। এখানে আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হবে। এখানে আগে ১০ বার ঐ তাসবীহ পড়ে তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হবে। মনে রাখতে হবে— এই তাসবীহ সব জায়গায় স্থানীয় তাসবীহের পরে, যেমন সূরা কিরাতের পরে, রুকুর তাসবীহের পরে, সাজদার তাসবীহের পরে, রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ-এর পরে, এভাবে এ তাসবীহটি সবকিছুর পরে, শুধু প্রথম বৈঠকে এবং শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য যখন বসা হবে, তখন আত্তাহিয়্যাতু-র আগে ঐ তাসবীহ ১০ বার করে পড়বেন। তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়বেন। শেষ রাকআতেও আগে ১০ বার পড়ে তারপর আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ শরীফ ও দুআয়ে মাছূরা পড়বেন।

এভাবে আমরা চার রাকআত সালাতুত তাসবীহ নামায পড়ব। এই নিয়মটা উত্তম। আর একটি নিয়ম রয়েছে। হতে পারে কেউ সে নিয়মে অভ্যস্ত তাই সে নিয়মটিও উল্লেখ করে দেয়া হল।

দ্বিতীয় নিয়ম হল : নিয়ত বেঁধেই ছানা পড়ার পর সূরা-কিরাত পড়ার আগে ১৫ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে। এরপর সূরা কিরাত শেষ করে ১০ বার। এখানে দাঁড়ানো অবস্থায় দশবার বেশী হয়ে গেল। এই নিয়মে পড়লে দ্বিতীয় সাজদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যাবেন। দ্বিতীয় সাজদাতেই ৭৫ বার হয়ে যাবে। এ নিয়মে প্রথম বৈঠক এবং শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য যখন বসবেন, তখন আর ঐ তাসবীহ পড়তে হবে না।

তাসবীহ মনে রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণনা করা নিষেধ। ভাল মত খেয়াল রাখলে আঙ্গুল টিপার প্রয়োজন হয় না। একান্তই মনে রাখার প্রয়োজনে আঙ্গুল টিপে টিপে মনে রাখা যেতে পারে। কিন্তু আঙ্গুলের কর বা অন্য কোন কিছু দিয়ে গণনা করা যাবে না।

তাসবীহ ৩০০ বার হতে হবে। কম থাকলে চলবে না। তাহলে সালাতুত তাসবীহের ফযীলত পাওয়া যাবে না। তাই খুব এতমিনানের সাথে পড়তে হবে। যদি কেউ কোন এক জায়গায় তাসবীহ পড়তে ভুলে যান বা কম থেকে যায়, তাহলে পরবর্তীতে যে জায়গায় মনে আসবে সেখানে ঐ জায়গারটাও পড়বেন পিছনের ছুটে যাওয়াটাও আদায় করে নিবেন।

সালাতুত তাসবীহ নামায একাকী পড়তে হয়—জামাআতের সাথে এই নামায পড়া দুরস্ত নয়।[১] অনেক স্থানে মা-বোনেরা জামাআতের সাথে এই নামায পড়ে থাকেন, এটা দুরস্ত নয়। অনেক স্থানে দেখা যায় একজন জাননেওয়ালী মহিলা বলে দিতে থাকেন আর অন্যরা তার কথা শুনে শুনে এই নামায পড়তে থাকেন, এটাও ঠিক নয়। এতে নামায হবে না। কোন নামাযের মধ্যেই নামাযী নন, এমন কোন লোকের নির্দেশ মেনে চলা যায় না। তাহলে নামায হয় না।

* মাকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত দিবা-রাত্রির যে কোন সময়ে এই নামায পড়া যায়, তবে সবচেয়ে উত্তম হল সূর্য ঢলার পর পড়া, তারপর দিনে, তারপর রাত্রে।[২]

* যে কোন সূরা দিয়ে এই চার রাকআত নামায পড়া যায়, তবে কেউ কেউ বলেছেন, এই নামাযে সূরা আছর, কাউছার, কাফেরূন ও এখলাছ বা সূরা হাদীদ, হাশর, সফ ও তাগাবুন পড়া উত্তম।[৩]

* এই চার রাকআত নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়-

১. نماز مسنون। ২. فضائل ذکر। ৩. বেহেশতী জেওর, ১ম।

আরবীতে :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَتِ صَلَاتِ التَّسْبِيْحِ

বাংলায় : চার রাকআত সালাতুত্ তাসবীহের নিয়ত করছি।

আমরা সালাতুত তাসবীহও পড়তে পারি। অন্য যে কোন নফল পড়তে পারি। এই রাতের নফল যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যেতে পারে। কোন কোন বই পুস্তকে লেখা আছে শবে বরাতের নামাযে অমুক অমুক সূরা এতবার করে পড়তে হবে; এটা ঠিক নয়। এরকম নির্দিষ্ট কোন সূরার বাধ্যবাধকতা নেই। নফল নামায খুব আছান। শবে বরাতের নামাযও নফল, এটাও খুব আছান— কোন নির্দিষ্ট সূরার বাধ্যবাধকতা নেই। যেকোন সূরা দিয়ে পড়তে পারি। অনেকে অমুক অমুক সূরা দিয়ে পড়তে হয়— এরকম ভুল ধারণার শিকার হয়ে এ রাতের নামাযকে কঠিন মনে করে বসেন। আসলে ওরকম কঠিন নয়।

যাহোক, এ রাতে নফল নামায পড়তে হবে আর আল্লাহ্র কাছে দু'আ চাইতে হবে। বিশেষভাবে ক্ষমার জন্য দু'আ চাইতে হবে।

ক্ষমা পাওয়ার জন্য চারটা বিশেষ শর্ত আছে। ক্ষমা পাওয়ার জন্য খাঁটি তওবা হওয়া জরুরী। খাঁটি তওবা হল চারটি জিনিসের নাম।

১নং : জীবনে যত গোনাহ হয়ে গেছে সেই গোনাহের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হতে হবে।

২নং : এখন ঐ গোনাহ ছেড়ে দিতে হবে।

৩নং : ভবিষ্যতে ঐ গোনাহ আর করব না মনে মনে এরকম প্রতিজ্ঞা নিতে হবে।

৪নং : কোন বান্দার হক নষ্ট করে থাকলে তার হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ কারও প্রতি যুলুম করে থাকলে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। অর্থ-কড়ি হলে ফেরত দিতে হবে। যদি তার কাছে ফেরত দেয়া সম্ভব না হয়, তাকে পাওয়া না যায়, তাহলে তার আপনজনকে ফেরত দিতে হবে। যদি তার আপনজনও খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে ফেকাহর কিতাবে লেখা হয়েছে তার নামে ঐ পরিমাণ অর্থ-সদকা করে দিতে হবে। তাহলে এই পরিমাণ ছওয়াব তার আমলনামায় জমা হবে। কিয়ামতের দিন সে এই ছওয়াব পেয়ে খুশী হয়ে দুনিয়াতে তার যে হক নষ্ট হয়েছিল সেটা মাফ করে দিবে। এভাবে চারটা শর্ত পূর্ণ করা হলে তখন হবে খাঁটি তওবা। খাঁটি তওবা হলে গোনাহ

মাফ হবে। গোনাহ মাফ হওয়ার জন্যও দু'আ করতে হবে, অন্যান্য সর্বা জন্যও দু'আ করতে হবে। দু'আ কবূল হওয়ার যে শর্তগুলি রয়েছে, শর্তগুলি পূরণ করতে হবে।

স্বাভাবিক নিয়ম হল দু'আ কবূল হওয়ার যে শর্ত রয়েছে সেই শর্ত পূর করলে আল্লাহ পাক দু'আ কবূল করেন না। দুনিয়াতেও নিয়ম হল বড় ও আদালতে বা শাহী দরবারে চাওয়ার বা আবেদন করার যে নিয়ম আছে, নিয়ম অনুযায়ী না চাইলে আবেদন মঞ্জুর হয় না। তদ্রূপ আল্লাহ পাকের দু'আ কবূল হওয়ারও শর্ত বা নিয়ম রয়েছে। এই শর্তগুলির মধ্যে এক এবং প্রধান শর্ত হল রিযিক হালাল হওয়া। এই প্রশ্নে আমরা অনেকে আ যাব। আমাদের অনেকের রিযিক হালাল নয়। দুই নম্বর শর্ত হল মা-বা সাথে নাফরমানী না করা। মা-বাপের আনুগত্য করাও দু'আ কবূল হ জন্য শর্ত। আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার করাও শর্ত। যিা আযকার করে দিল তাজা রাখাও শর্ত। আত্মীয়দের সাথে সু-সম্পর্ক ব রাখা, কোন মুসলমানের সাথে অন্যায়ভাবে তিন দিনের বেশী কথা বলা না রাখা, হিংসা না করা, বখীলী বা কৃপণতা না করা ইত্যাদি অনেকগুলো রয়েছে। দুআ কবূল হওয়ার জন্য এই শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।

আল্লাহর কাছে নিজের জন্যেও চাইতে হবে। মাতা-পিতার জ চাইতে হবে। আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও চাইতে হবে। যিন্দা, মুর্দা সক জন্য চাইতে হবে।

দু'আ চাওয়ার নিয়ম হল শুধু নিজের জন্য নয়; বরং সকলের জন্য চা হয়। এতে আল্লাহ বেশী খুশী হন এবং ফেরেশতাদেরও দু'আ পাওয়া য আমি যখন আমার আরেক ভাইয়ের জন্য কোন বিষয়ের দু'আ করব, ফেরেশতারা বলবেন, আল্লাহ তোমার জন্যও ওটা করে দেন। আর আমি শুধু নিজের জন্য দু'আ করি, তাহলে ফেরেশতার দু'আ পেলাম না। আ দু'আর চেয়ে ফেরেশতার দু'আ কবূল হওয়ার বেশী আশা রাখা যায়। কেন ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ, তাই তাদের দুআ বেশী কবূল হয়। অতএব নিজের জন্য নয় সকলের জন্য দু'আ করতে হবে।[১]

আল্লাহ পাক সহীহভাবে আমাদের এই রাতের হক আদায় করার এই রাতের ফযীলত ও মর্তবা অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

১. শবে বরাত-এর উপরোক্ত আমলসমূহ সম্পর্কিত হাদীসগুলো ما ثبت بالسنة গ্রন্থে ابن ماجه প্রভৃতি এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ।

শবে ক্বদর

'শবে কদর' কথাটি ফারসী। এর আরবী হল 'লাইলাতুল কদর'। 'শব' ও 'লাইলাত' শব্দের অর্থ রাত। আর কদর শব্দের অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। এ রাতের মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণেই একে শবে কদর বা লাইলাতুল কদর বলা হয়। কিংবা কদর শব্দের অর্থ তাকদীর ও আদেশ। এ রাতে যেহেতু পরবর্তী এক বৎসরের হায়াত, মওত, রিযিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের তাকদীর লেখা হয় (অর্থাৎ লওহে মাহফূজ থেকে তা নকল করে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের কাছে সোপর্দ করা হয়) তাই এ রাতকে শবে কদর বা লাইলাতুল কদর বলা হয়।

* লাইলাতুল কদর-এর ইবাদত হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। (আল-কুরআন)

* রমযান মাসের শেষ দশকের মধ্যে যে কোন বেজোড় রাতে শবে কদর হতে পারে, যেমন : ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত। ২৭শে রাতের কথা বিশেষভাবে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

২৭শে রাতই শবে কদর হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

تَحَرَّوْا اللَّيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ-(بخاری)

অর্থাৎ তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলোতে শবে কদর তালাশ কর।

তাই রমযানের শেষ দশকের যেকোন বেজোড় রাতেই শবে কদর হতে পারে। বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে ২৭শে রাতও একটা বেজোড় রাত। তাই ২৭ শে রাতও শবে কদর হওয়ার একটা বিশেষ সম্ভাবনাময়ী রাত।

কোন্ রাত শবে কদর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নির্দিষ্ট করে বলার জন্য নিজের হুজরা থেকে মসজিদে আসছিলেন, মাঝখানে তাঁকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। মসজিদে যখন এসেছেন, তখন আর মনে নেই কোন্ রাত শবে কদর। আল্লাহ পাকের হয়তো আমাদের আগ্রহ, জযবা দেখার ইচ্ছা যে, এত বড় একটা ফযীলতের রাত পাওয়ার জন্য আমরা একটু মেহনত করতে প্রস্তুত কি-না। তাই কয়েকটা রাতের ভিতরে শবে কদরকে ঘোরানো হয়েছে, যে কোন রাত হতে পারে, ২১শে রাতেও হতে পারে, ২৩শে রাতেও হতে পারে ২৫শে, ২৭শে বা ২৯শে রাতেও হতে পারে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, সব বেজোড় রাতগুলোতেই

তোমরা শবে কদর তালাশ কর। তালাশ কর অর্থাৎ এই সব বেজে রাতগুলোতেই তোমরা শবে কদর পাওয়ার জন্য ইবাদত-বন্দেগী ও দু'আ করণীয় আছে তা কর। শবে কদরের ফযীলত পাওয়ার জন্য যতটুকু যা ব দরকার, সব রাতগুলোতেই সমানভাবে করতে বলা হয়েছে।

শবে কদরের তিনটা ফযীলত রয়েছে। একটা ফযীলত কুরআনে আয়াতে বলা হয়েছে :

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

অর্থাৎ শবে কদর হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

হাজার মাসে ইবাদত করলে যত ছওয়াব ও যত মর্যাদা পাওয়া যায়, এ এক রাতে ইবাদত করলে তার চেয়ে বেশী ছওয়াব ও মর্যাদা পাওয়া যায় এভাবে আল্লাহ পাক যিন্দেগীতে আগে বাড়ার কত সুযোগ করে দিয়েছেন আগের উম্মতরা ৫০০ বছর, হাজার বছর হায়াত পেত। রাসূল সাল্লাল্লা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবাদের সামনে বয়ান করলেন যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ৫০০ বছর জেহাদে কাটিয়েছেন, কেউ এক হাজা বছর আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছেন। এগুলো শুনে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তড়পানি শুরু হল, তাদের ভিতরে একটা ব্যথা সৃষ্টি হল যে, তাহলে আমরাতো এত হায়াতও পাব না, এত ইবাদত করারও সুযোগ পাব না আমরা তাহলে অন্য উম্মতের চেয়ে পিছে পড়ে যাব। তখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে প্রতি বছর রমযানে একটা রাত্র দান করলেন, যে এক রাতে ইবাদত করলে হাজার মাসের চেয়েও বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়। হাজার মাসে ৮৩ বছর ৪ মাস হয়। এভাবে কেউ যদি যিন্দেগীতে ১২টা শবে কদর পায়, তাহলে এক হাজার বছরের সমান ইবাদত হয়ে যাবে বরং তার চেয়ে বেশী হয়ে যাবে। এভাবে আমাদের অল্প মেহনতে আগের যুগের মানুষের চেয়েও আগে বেড়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এই হল শবে কদরের একটা ফযীলত।

শবে কদরের আরেকটা ফযীলত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. (متفق عليه)

অর্থাৎ শবে কদরে ঈমানের সাথে ও ছওয়াব অর্জন করার নিয়তে যে ব্যক্তি ইবাদত করবে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

এটা অনেক বড় ফযীলতের কথা। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা পেয়ে যাওয়া জীবনের অনেক বড় পাওয়া।

শবে কদরের আর একটা ফযীলত হাদীছে বলা হয়েছে :

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ فِيْ كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ۔ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

অর্থাৎ যখন শবে কদর হয়, তখন জিবরাঈল (আ.) স্বীয় বাহিনীসহ অর্থাৎ তার অধীনস্ত ফেরেশতাসহ দলবলে সারা দুনিয়ায় ঘুরতে থাকেন। আর যারা এই রাতে ইবাদত করে ও যিকির-আযকার করে তাদের জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন।

বোঝা গেল এই রাতে ইবাদত করলে আল্লাহ্র রহমতের ফয়সালা হয়। এই তিনটা ফযীলতের জন্য আমাদের তিনটা আমল করতে বলা হয়েছে। দুইটা আমল হল যা এই হাদীছেই বলা হল অর্থাৎ নামায পড়া এবং যিকির-আযকার করা।

নামায বলতে বিশেষভাবে নফল নামাযের কথা বোঝানো হয়েছে। তাই কদরের ফযীলত পাওয়ার জন্য নফল নামায পড়তে হবে। ইশার পর থেকে নিয়ে সুব্‌হে সাদেক পর্যন্ত যত নফল পড়া হবে, সেটাকে নফলও বলা যায়, তাহাজ্জুদও বলা যায়। কাজেই এই রাতের ফযীলত পাওয়ার জন্য আমরা যে নামায পড়ব তা কী নিয়তে পড়ব? নফলের নিয়তেও পড়তে পারি, তাহাজ্জুদের নিয়তেও পড়তে পারি। কদরের নামায—এ কথা বলা জরুরী নয়।

দুই দুই রাকআত করে নফল পড়া উত্তম। তাই দুই দুই রাকআত করে নফল বা তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়তে থাকব। যে কোন সূরা দিয়ে পড়তে পারি, কোন সূরার বাধ্যবাধকতা নেই। এই রাতে যত নফল পড়ি, তাতে নির্দিষ্ট কোন সূরার বাধ্যবাধকতা নেই। নফল নামায খুব আছান। শবে কদরের নামাযও নফল, এটাও খুব আছান—কোন নির্দিষ্ট সূরার বাধ্যবাধকতা নেই। যে কোন সূরা দিয়ে পড়তে পারি। আমাদের সমাজে এক সময়ে মাসআলা-মাসায়েল-এর নির্ভরযোগ্য কিতাবের অভাব ছিল। তখন 'মকসূদুল মু'মিনীন', 'নেয়ামুল কুরআন' বের হয়েছে, তাই মাসায়েলের কিতাব হিসেবে এগুলো জনসমাজে পরিচিত হয়ে যায়। কিন্তু এ বইগুলোতে অনেক গলদ মাসআলা রয়েছে। এ জাতীয় কিতাবের ভিতরেই এরকম বলা হয়েছে যে, কদরের নামায পড়তে হবে, এত এত রাকআত পড়তে হবে এবং অমুক

অমুক সূরা দিয়ে পড়তে হবে। এগুলো ভুল মাসআলা। এসব ভুল মাসআলা দিয়ে মানুষের কাছে দ্বীনকে জটিল করে ফেলা হয়েছে। মা-বোনেরা অনেকে এত জটিল মনে করেন যে, কদরের নামায কী নিয়তে পড়ব, কোন্ কোন্ সূরা কতবার পড়তে হবে, কত রাকআত পড়তে হবে? এগুলি কিছুই জানি না! এভাবে তারা কদরের নামাযকে জটিল মনে করে বসেছেন। অথচ বিষয়টা জটিল নয় বরং আছান। নফল নামায পড়বেন, যে কোন সূরা দিয়ে পড়বেন, যত রাকআত ইচ্ছা পড়বেন। কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

যাহোক, শবে কদর উপলক্ষ্যে একটা আমল হল নফল নামায। আর একটা হল যিকির করা। যা উপরোক্ত এক হাদীছ থেকেই বোঝা যায়। যিকির কী? যিকির হল সুবহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ইত্যাদি পড়া।

কুরআন তেলাওয়াতও একটা যিকির। আর কদরের রাতের সাথে কুরআনের একটা বিশেষ সম্পর্কও আছে। কারণ, কুরআন শরীফ প্রথম নাযিল হয়েছিল কদরের রাতে। তাই এই রাতে যে যিকির-আযকার হবে তার মধ্যে বিশেষভাবে কুরআন তেলাওয়াতও রাখা যায়।

শবে কদরের তৃতীয় আমল হল দু'আ করা। দু'আর মধ্যে বিশেষভাবে ক্ষমার দু'আ চাইতে হবে। হযরত আয়েশা (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

اَرَاَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَىُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَاذَا اَقُوْلُ فِيْهَا؟

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে বলুন যদি আমি জানতে পারি শবে কদর কোন্ রাত, তাহলে আমি কী বলব অর্থাৎ কী দু'আ চাইব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তুমি বলবে :

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ـ (ابن ماجة . ترمذى)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে তুমি ভালবাস, তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও।

এটা হল এই রাতের বিশেষ আমল, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিলেন— সেটা হল আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

ইসলামে যতগুলি ফযীলতের সময় রয়েছে এবং যতগুলি দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে, দেখা যায় শরীয়তে এই সব সময় এবং এই সব

মুহূর্তে ক্ষমার দু'আ চাইতে বলা হয়েছে। কারণ, ক্ষমা পাওয়াটাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া। আমি কিছুই যদি না পাই, শুধু আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা পেয়ে যাই, তাহলে আমি কামিয়াব। পক্ষান্তরে অনেক কিছু পেলাম, স্বাস্থ্য পেলাম, চেহারা পেলাম, গাড়ি-বাড়ি পেলাম, ধন-দৌলত পেলাম, নামী দামী আত্মীয়-স্বজন পেলাম, মান-সম্মান, পদমর্যাদা অনেক কিছু পেলাম, কিন্তু আমার ক্ষমা হল না, তাহলে আমার কিছুই হল না; তাহলে আমি ব্যর্থ, আমার জীবন ব্যর্থ। অতএব ক্ষমা পাওয়া হল সবচেয়ে বড় পাওয়া। ক্ষমা চাওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চাওয়া। তাই বড় বড় রাত্রগুলোতে, বড় বড় সময়ে এই বড় দু'আ করতে বলা হয়েছে।

অন্য যে কোন কিছু আমরা চাইতে পারি, আল্লাহ্র কাছে তো সবকিছুই চেয়ে নিতে হয়। হাদীছে এসেছে যে, তুমি আল্লাহ্র কাছে সবকিছু চেয়ে নাও। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তা-ও আল্লাহ্র কাছে চেয়ে নাও। এভাবে সবকিছু আল্লাহ্র কাছে চেয়ে নিতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তো চাওয়াটাই পছন্দ করেন। তাই যত আল্লাহ্র কাছে চাওয়া হয় তত আল্লাহ বেশী খুশী হন। তিনি দুনিয়ার মানুষের মত নন, আমাদের কাছে চাইলেই আমাদের বিরক্তি লাগে, আমাদের কাছে মানুষ যত চায়, তত আমাদের বিরক্তি লাগে। আর আল্লাহ্র কাছে যত চাওয়া হয়, ততই আল্লাহ বেশী পছন্দ করেন।

যাহোক, এই রাতের তিনটা আমল-

(১) নামায পড়া,

(২) যিকির করা, তার মধ্যে বিশেষভাবে তেলাওয়াত করা,

(৩) আল্লাহ্র কাছে দু'আ করা, বিশেষভাবে ক্ষমার জন্য দু'আ করা। নিজের ক্ষমার জন্য, সমস্ত মানুষের জন্য, যারা দুনিয়ায় বেঁচে আছেন তাদের জন্যেও, যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, বিশেষভাবে আপনজন যারা চলে গেছেন, যেমন : মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, তাদের ক্ষমার জন্য, সবার ক্ষমার জন্য দু'আ করতে হবে।

শবে কদরের তিনটা ফযীলত পাওয়ার জন্য আমরা উপরোক্ত তিনটা আমল করতে থাকি।

নফল নামায সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত আমরা পড়তে পারি। অনেক মা-বোন সালাতুত তাসবীহ পড়তে চান। সালাতুত তাসবীহও পড়া যায়।

সালাতুত তাসবীহ্ সম্পর্কে "শবে বরাত" শীর্ষক শিরোনামের আলো মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

এভাবে যে কোন নফল ইবাদত করব, যিকির-আযকার ব তেলাওয়াত করব, দু'আ করব। এই আমলগুলি ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও সব রাতেই করব। আল্লাহ পাক যেন আমাদের শবে কদরের ফযীলত ন করেন। কদরের ফযীলত থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই।

দুই ঈদের রাতে করণীয়

* হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত্রে জাগ থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে, তাহলে যে দিন অন দিল মরে যাবে সেদিন তার দিল মরবে না অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। কেয়াম আতঙ্কের কারণে অন্যান্য লোকের অন্তর ঘাবড়ে গিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যা কিন্তু দুই ঈদের রাত্রে জাগরণকারীর অন্তর তখন ঠিক থাকবে— ঘাবড়াবে না

কিয়ামতের ভয়াবহতা এমন হবে যে, কুরআনে বলা হয়েছে :

وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ

عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ۔(سورة الحج)

অর্থাৎ যদি কোন মহিলার গর্ভ থাকে, তাহলে তার গর্ভপাত হয়ে যাবে মানুষকে দেখাবে সবাই যেন মাতাল অবস্থায় আছে, বেহুঁশ অবস্থায় আছে কিন্তু আসলে তারা মাতাল নয়। (হয়রানি, পেরেশানী, ভয়াবহতা, বিভীষিকা এমন অবস্থা হবে যে, সকলকে তখন অস্বাভাবিক মনে হবে।)

দুই ঈদের রাত খুশির দুই রাত, আনন্দের রাত। এ সময়ে যদি আমর আল্লাহ্‌কে স্মরণ করি, তাহলে আল্লাহ পাক সবচেয়ে পেরেশানীর দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমাদের পেরেশানী থেকে মুক্ত রাখবেন এবং আনন্দিত রাখবেন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে ঈদের দুই রাত অনেক ফযীলতের রাত। তাই ঈদের রাতেও আমরা ইবাদত করব, এই নিয়তে যেন আল্লাহ পাক কিয়ামতের ময়দানের ভয়াবহতা থেকে আমাদের মুক্তি দেন।

ফাতেহা ইয়াযদহম

'ফাতেহা' বলতে বুঝানো হয় কোন মৃতের জন্য দুআ করা, ঈছালে ছওয়াব করা। 'ইয়াযদহম' ফার্সী শব্দটির অর্থ 'একাদশ'। ৫৬১ হিজরী মোতাবেক

১. বেহেশতী জেওর-তাবরানী।

১১৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই রবিউছ্ ছানী তারিখে বড়পীর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষ্যে রবিউছ্ ছানীর ১১ই তারিখে যে মৃত্যুবার্ষিকী পালন, উরস ও ফাতেহাখানী হয় তাকে বলা হয় ফাতেহা ইয়াযদহম।

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামে জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কোন নিয়ম রাখা হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা ও তাবিয়ীনদের যুগে তথা আদর্শ যুগে জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, ওরস ইত্যাদি পালন করা হত না। এগুলো পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়েছে। অতএব ইসলামের নামে এসব অনুষ্ঠান একটা রছম ও বিদআত। তাই ফাতেহা ইয়াযদহম নামে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও ওরস করা শরী'আত সমর্থিত অনুষ্ঠান নয়।

৯ই জিলহজ্জ থেকে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত

তাকবীরে তাশরীকের বিধান :

* ৯ই জিলহজ্জের ফজর থেকে ১৩ই জিলহজ্জের আসর নামায পর্যন্ত সর্বমোট ২৩ ওয়াক্তে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। জামা'আতে নামায হোক বা একাকী সর্বাবস্থায় বলতে হবে। পুরুষ হোক বা নারী— সকলকে বলতে হবে।

* তাকবীরে তাশরীক এই—

اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

* এই তাকবীর মহিলাগণ আস্তে আস্তে বলবেন।

* নামাযের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে এই তাকবীর বলতে হবে।

* তাকবীরে তাশরীক একবার বলা ওয়াজিব। তিনবার বলা সুন্নাত নয়।[১]

ঈদের দিনগুলোর আমল

* ঈদুল ফিতরের দিন ঈদুল আযহার দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন, সর্বমোট এই ৫ দিন যে কোন প্রকারের রোযা রাখা হারাম।

* উপরোক্ত ৫ দিন পানাহারের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত জাঁকজমক করার অবকাশ রয়েছে এবং তা শরীয়তের কাম্য।

---

১. فتاوی رحیمیہ ۳/ ।

* ঈদুল ফিতরে মহিলাদের জন্য ৭ টা জিনিস সুন্নাত ।

১. ভোরে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা ।

২. মেসওয়াক করা ।

৩. গোসল করা ।

৪. যথাসাধ্য উত্তম পোশাক পরিধান করা ।

৫. শরীয়ত সম্মতভাবে সাজ-সজ্জা করা ।

৬. খুশবূ লাগানো ।

৭. পুরুষদের ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতির (ফিতরা) না দিয়ে থাকলে দিয়ে দেয়া ।

* ঈদুল আযহার দিনও উপরোক্ত বিষয়গুলো সুন্নাত । পার্থক্য হল ঈদুল আযহায় ফিতরার বিধান নেই বরং এখানে নামাযের পর কুরবানী রয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

بسم الله الرحمن الرحيم

চতুর্থ অধ্যায়

ইল্‌মে দ্বীন বিষয়ক

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ঈমান এবং আমলের দায়িত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে ঈমান হল প্রথম পর্যায়ের এবং বুনিয়াদী বিষয়। আমরা গ্রন্থে প্রথমে ঈমান ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট আমল-আখলাকের বিষয়ে আলোচনা পেশ করব, তারপর আমল ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট ফাযায়েল-মাসায়েল আলোচনা করব।

ঈমান ও আমল উভয় বিষয়ে জানতে হলে ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করতে হবে। তাই এই ইল্‌মে দ্বীন কীভাবে হাছেল করা যাবে এবং ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করলে কী ফযীলত পাওয়া এ প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা পেশ করা হল।

ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার গুরুত্ব

ইল্‌ম বলা হয় কুরআন-হাদীছের কথা এবং মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত জ্ঞানকে। ইল্‌ম বা এই জ্ঞান না হলে আমল আসে না। সহীহভাবে মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা না করলে সহীহ-শুদ্ধভাবে আমল করা যায় না। আর আমল সহীহ-শুদ্ধভাবে না হলে তা আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। এজন্যই আবশ্যক পরিমাণ ইল্‌ম হাছেল করা অর্থাৎ প্রয়োজন পরিমাণ মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর উপর ফরযে আইন। আর ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ।

প্রয়োজন পরিমাণ ইল্‌ম বলতে বোঝায় নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির যেসব লেনদেন ও কায়-কারবার করতে হয়, সেসব বিষয়ের মাসআলা মাসায়েল, হুকুম-আহকাম ও নিয়ম-কানুন জানা। আমরা যদি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, উযু, গোসল ইত্যাদি বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা না করি, তাহলে আমাদের ফরয তরক করার গোনাহ হতে থাকবে।

Scanned by CamScanner

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ـ (ابن ماجة)

অর্থাৎ সমস্ত মুসলমান নর-নারীর উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয।

দ্বীনের উপর চলতে যতটুকু জ্ঞান দরকার তা শিক্ষা করা প্রত্যেকের উপর ফরয। যেমন : ঈমান-আকীদা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা সকলেরই ফরয। সেই সাথে সাথে যে ব্যক্তি ব্যবসায়ী তার উপর ব্যবসার মাসআলা-মাসায়েল জানা ফরয। যে চাকুরিজীবী তার উপর চাকুরী সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল জানা ফরয। যিনি গৃহিণী তার উপর ছেলে-মেয়ে লালন-পালন, স্বামীর খেদমত ইত্যাদি বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল জানা ফরয। এমনিভাবে যে যে লাইনে বা যে যে পেশা নিয়ে চলছে, সেই লাইনে চলতে গেলে তার জীবনে যা যা করতে হবে সেসব বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল জানা তার উপর ফরয। এই ফরয পরিত্যাগ করার পাপে আমরা অনেকেই জর্জরিত আছি। আমরা অনেকেই যা যা জানার প্রয়োজন তা জানি না, অথচ সেটা জানা ফরয।

ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার ফযীলত

কুরআন-হাদীছের কথা এবং মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করার অনেক ফযীলত রয়েছে। অর্থাৎ ইল্‌ম শিক্ষা করার ছওয়াব অনেক বেশী। নফল ইবাদতের চেয়ে ইল্‌ম শিক্ষা করার ফযীলত বেশী। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হাদীছ বয়ান করেছেন যে, মাসায়েলের একটা অধ্যায় শিক্ষা করা, দ্বীনী ইলমের একটা অধ্যায় শিক্ষা করা এক হাজার রাকআত নফল নামায পড়ার চেয়েও বেশী ফযীলত রাখে। এক হাজার রাকআত নফল নামাযে যে ছওয়াব, একটা বিষয়ের মাসায়েল শিক্ষা করায় তার চেয়ে বেশী ছওয়াব। যিনি শিখলেন তার এই ছওয়াব, যিনি শিখাবেন তারও ছওয়াব। তবে তার ছওয়াব একটু কম। যিনি একটা অধ্যায় শিখাবেন তিনি ছওয়াব পাবেন একশত রাকআত নফল নামাযের, আর যিনি শিখবেন তিনি পাবেন এক হাজার রাকআত নফল নামযের ছওয়াব। কারণ, একজনকে শিখালে আমল নিজের মধ্যে না-ও আসতে পারে, কিন্তু যিনি শিখছেন তিনি তো আমল করার জন্যই শিখছেন, আর মূলতঃ ইল্‌মের ফযীলত আমলেরই কারণে। এক হাদীছে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ওমর (রাযি.) ইল্‌মের ফযীলত বয়ান করে বলেছেন :

مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً۔

অর্থাৎ দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েল এবং দ্বীনী কথা শিক্ষা করার একটা মজলিস ৬০ বছর নফল ইবাদত করার চেয়েও বেশী ফযীলত রাখে।

সুবহানাল্লাহ! ইল্ম শিক্ষা করার একটা মজলিসকে ৬০ বছর নফল ইবাদত করার চেয়েও বেশী ফযীলতপূর্ণ বলা হয়েছে। কারণ, ইল্ম ছাড়া ইবাদত হলে ৬০ বছর কেন ৬০ হাজার বছর করলেও তাতে কোন ফযীলত নেই। কারণ, সেই ইবাদতের কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না। গলত আমলের কোন মূল্য নেই।

হযরত আবুদ্দারদা (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ۔الحديث

অর্থাৎ ইল্ম সন্ধানের উদ্দেশ্যে বের হলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (ইব্নে মাজা)

এ হাদীছ থেকে বোঝা যায় ইল্ম জান্নাতের পথ দেখায়।

তবে ইল্ম শুধু শিখলে হবে না, ইল্ম অনুযায়ী আমলও থাকতে হবে। নতুবা ঐ ইলমেরও কোন দাম থাকবে না। ইল্ম শেখার এত ফযীলত তো এজন্যই যে, সেই অনুযায়ী ইবাদত করা হবে, সেই অনুযায়ী আমল করা হবে। ইল্ম অনুযায়ী আমল না করলে সেই ইলমের কোন ফযীলত থাকে না। যাদের ইল্ম আছে আমল নেই, তাদের উদাহরণ দিয়ে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا۔(سورة الجمعة ٥)

অর্থাৎ তারা হল ঐ গাধার মত, যাদের পিঠে এক বোঝা কিতাব রয়েছে।

অতএব ইল্ম শিখে আমল করাই মূল উদ্দেশ্য। ইল্ম ছাড়া ইবাদত আর ইল্মসহ ইবাদত, এ দুটোর মধ্যে এত পার্থক্য যে, এক হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ۔(رواه الترمذي وحسنه)

অর্থাৎ একজন মানুষ ইল্ম ছাড়া ইবাদত করে, অর্থাৎ মাসআলা-মাসায়েল তরীকা-পদ্ধতি না জেনে ইবাদত করে, আরেকজন মাসআলা-

মাসায়েল জেনে ইল্‌ম সহকারে ইবাদত করে, এই দুই জনের মধ্যে প্রথম জনের চেয়ে দ্বিতীয় জনের ফযীলত এত বেশী, যেমন আমার উম্মতের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তির চেয়ে আমার ফযীলত বেশী। সুবহানাল্লাহ!

তাই ইল্‌ম সহকারে জেনে আমল করা আর ইল্‌ম ছাড়া আমল করা, এ দুটোর মধ্যে ছওয়াবের কোন তুলনাই হয় না। আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি, হজ্জ করি, যাকাত দেই এবং অন্যান্য যত দ্বীনী কাজ করি এসব আমল করার জযবা তো আমাদের মধ্যে আসে, কিন্তু ইল্‌ম অর্জন করার জযবা আসে না। ইবাদত করার গুরুত্ব আমাদের মনে জাগে, কিন্তু সেই ইবাদত সম্পর্কে ইল্‌ম অর্জন করা এবং তার মাসআলা-মাসায়েল জানার গুরুত্ব মনে জাগে না। এজন্যই আমরা অনেকে ইবাদতকারী হতে চাই, কিন্তু আলেম হতে চাই না। নিজেদের সন্তানকে ইবাদতকারী বানাতে চাই, কিন্তু আলেম বানাতে চাই না। অথচ একজন নিরেট ইবাদতকারীর চেয়ে একজন আলেমের ফযীলত এত বেশী এত বেশী যে, একজন নিরেট ইবাদতকারী ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তারপরে ঘুমাবে, সে যতক্ষণ ইবাদত করবে, শুধু ততক্ষণ ইবাদতের ছওয়াব পাবে, আর একজন আলেম ইবাদত করে যখন ঘুমাবে, সেই ঘুমের সময়টুকুও সে ইবাদতের ছওয়াব পেতে থাকবে। এ হিসেবে আলেমের ঘুমও ইবাদত।

আল্লাহ্‌র কাছে আলেমের মর্যাদা অনেক বেশী। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন :

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ۔(سورة المجادلة : ١١)

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের (কুরআন-হাদীছের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা অনেক উঁচু করে দেন।

কত উঁচু করে দেন আল্লাহ পাক সেটা বলেননি। হতে পারে তাঁদের মর্যাদা এত উঁচু করে দেন যা আমাদের কল্পনায়ও আসবে না, তাই সীমানা নির্ধারণ না করেই বলা হয়েছে অনেক উঁচু করে দেন। এই ইল্‌মের কারণেই তো কিয়ামতের দিন আলেমদের সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে। যে পাপী মুসলমানরা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার কারণে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে, তাদের ব্যাপারে আলেম ব্যক্তি সুপারিশ করবেন। আল্লাহ পাক তাঁর সুপারিশে ঐ পাপীদের জন্য নাজাতের ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ্‌র কাছে আলেমের মর্যাদা থাকবে বলেই তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।

আল্লাহর কাছে আলেমের মর্যাদা কিসের কারণে? তার ইল্‌মের কারণে। কুরআন-হাদীছের ইল্‌মের কারণে।

ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা

কুরআন-হাদীছের ইল্‌মের এত মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও আমরা এই ইল্‌ম শিক্ষা করার ব্যাপারে উদাসীন। মাসআলা-মাসায়েল শেখার এত গুরুত্ব এবং ফযীলত থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আমরা উদাসীন। সারা জীবন নামায পড়েই যাচ্ছি, কিন্তু নামাযের মাসআলা-মাসায়েলের কোন খবর নেই। শুধু নামায নয় প্রত্যেকটা বিষয়ের মাসায়েল জেনে জেনে আমল করতে হবে। নতুবা এক সময় বুঝে আসবে যে, সারা যিন্দেগীর মেহনত মোজাহাদা বেকার সাব্যস্ত হয়েছে।

যাহোক, দ্বীনী ইল্‌ম অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যদাবান ইল্‌ম, তাই দ্বীনী ইল্‌মের প্রতি অন্তরে আযমত এবং সম্মানবোধ রাখতে হবে। এই ইল্‌ম শিক্ষা করে কী হবে এরূপ হীনমন্যতা পরিহার করতে হবে। সাথে সাথে ইল্‌ম শেখার এই ফযীলত হাছেল করতে হলে ইল্‌ম শেখার নিয়তও সহীহ্ থাকতে হবে। নিম্নে ইল্‌ম হাছেল করার সহীহ্ নিয়ত সম্পর্কে বিবরণ পেশ করা হল।

ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার সহীহ্ নিয়ত

ইল্‌ম হাছেল করার সহীহ্ নিয়ত হল ইল্‌ম শিখতে হবে আমল করা এবং আমল করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার নিয়তে। এ ছাড়া অন্য কোন নিয়তে ইল্‌ম হাছেল করলে সেটা হবে গলত নিয়ত। যেমন কেউ যদি এই নিয়তে ইল্‌ম হাছেল করে বা জ্ঞান অর্জন করে যে, জ্ঞান অর্জন করলে মানুষের সঙ্গে তর্কে বিজয়ী হতে পারব বা জ্ঞানের জন্য বড়াই দেখাতে পারব কিংবা জ্ঞানী হলে মানুষের কাছে সম্মান অর্জন করা যাবে প্রভৃতি। এসব হল গলত নিয়ত। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رواه ابن ماجة)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মূর্খদের সাথে তর্ক করার উদ্দেশ্যে কিংবা আলেমদের সাথে অহংকার করার জন্য বা তার দিকে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করার নিয়তে ইল্‌ম শিক্ষা করবে সে জাহান্নামে যাবে।

ইল্‌ম হাছেল করার সময় এই নিয়তও থাকবে যে, ইল্‌ম অর্জন করে এই ইল্‌ম অন্যকে শিক্ষা দিব এবং এই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার জন্য অন্যকে দাওয়াত দিব।

ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার তরীকা

সাধারণতঃ তিন তরীকায় ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করা যায়।

(এক) ইল্‌ম হাছেল করার এক নম্বর এবং সবচেয়ে উত্তম তরীকা হল কোন উস্তাদ থেকে ইল্‌ম শিক্ষা করা। মেয়েমানুষ বালেগা হলে কোন গায়ের মাহরাম পুরুষ অর্থাৎ যার সাথে দেখা দেয়া জায়েয নয়—এরকম কোন পুরুষের সামনে গিয়ে ইল্‌ম হাছেল করা যাবে না। তাতে ইল্‌ম হাছেল করার ছওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হবে। বালেগা নারী কোন মাসআলা-মাসায়েল শিখতে হলে ভাই, পিতা বা স্বামী প্রমুখ মাহরাম পুরুষ থেকে জেনে নিবে। তাদের জানা না থাকলে তারা কোন আলেম থেকে শিখে এসে তাদের শিখাবে। কোন বিজ্ঞ আলেমা বা মহিলা আলেম পাওয়া গেলে তাদের থেকেও ইল্‌ম শিক্ষা করা যাবে।

উস্তাদ থেকে ইল্‌ম শিক্ষা করতে হলে এবং সেই ইল্‌মের দ্বারা ফায়দা পেতে হলে উস্তাদের হক আদায় করতে হবে। উস্তাদের হক আদায় না করলে সহীহভাবে ইল্‌ম আসে না এবং সেই ইল্‌ম দ্বারা ফায়দা পাওয়া যায় না। নিম্নে উস্তাদের কতিপয় হক বর্ণনা করা হল ঃ

উস্তাদ-ছাত্র ও গুরুজন-অধীনস্থ বিষয়ক

উস্তাদের হক[১]

* উস্তাদের সাথে কথা-বার্তা, শব্দ প্রয়োগ, আচার-আচরণ, উঠা-বসা, চলা-ফেরা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই আদব রক্ষা করতে হবে।

* কথা-বার্তা, হাবভাবে উস্তাদের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করতে হবে।

* উস্তাদকে আযমত ও শ্রদ্ধা করতে হবে।

* উস্তাদের সাথে কথা-বার্তা ও আচার-আচরণ সব কিছুতেই বিনয় থাকতে হবে।

* উস্তাদের খেদমত করতে হবে। উস্তাদ অভাবী এবং ছাত্রী স্বচ্ছল হলে টাকা-পয়সা দিয়ে যথাসম্ভব উস্তাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং মাঝে মধ্যে তাঁদের হাদিয়া-তোহফা প্রদান করতে হবে। তবে টাকা-পয়সা দেয়ার বিষয়টি স্বামী থাকলে নিজের টাকা-পয়সা দিতেও স্বামীকে জানিয়ে দেয়া উত্তম।

* উস্তাদের মৃত্যুর পরেও সর্বদা তাঁর জন্যে দু'আ করা কর্তব্য।

* কোন কারণে উস্তাদ অসন্তুষ্ট হলে বা উস্তাদের মেজাযের পরিপন্থী কোন কথা বলে ফেললে সাথে সাথে নিজের ত্রুটির জন্য ওযরখাহী করে, মাফ চেয়ে নিয়ে উস্তাদকে সন্তুষ্ট করতে হবে।

* ছাত্রীর কোন অসংগত প্রশ্ন বা অসংগত আচরণের কারণে উস্তাদ রাগ করলে বা বকুনি দিলে বা মারধর করলে ছাত্রীর কর্তব্য সেটা সহ্য করা।

* মনোযোগের সাথে উস্তাদের বক্তব্য ও বয়ান শ্রবণ করতে হবে।

* উস্তাদ যদি কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করেন, তাহলে তা মান্য করা উচিত এবং কখনো কোন প্রশ্ন করে উস্তাদকে অসুবিধায় ফেলতে চেষ্টা করা উচিত নয়। উস্তাদের চেয়ে ভাল বুঝি এরকম মনোভাব না রাখা চাই। বরং আমি কিছুই বুঝিনা—এরকম মনোভাব নিয়ে উস্তাদের কথা শোনা চাই।

* উস্তাদের কোন কথা ভালভাবে বুঝতে না পারলে উস্তাদের প্রতি এরকম কুধারণা করা ঠিক নয় যে, উস্তাদের মধ্যে বোঝানোর যোগ্যতা নেই বরং বুঝতে না পারাকে নিজের বোধশক্তির ত্রুটি মনে করতে হবে।

---

১. উস্তাদের হক সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য آداب المعاشرت، اصلاح انقلاب امت، اروح الایمان এবং ادب الدنیا والدین প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।।

* উস্তাদ কোন বিশেষ কিতাব বা কোন বিশেষ বই-পত্র পাঠ ক্ষ ক্ষতিকর মনে করে নিষেধ করলে তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

এখানে মনে রাখতে হবে উস্তাদের যেমন হক রয়েছে, ছাত্র/ছাত্রীরও হক রয়েছে। নিম্নে ছাত্র/ছাত্রীর কতিপয় হক তথা ছাত্র/ছাত্রীর সাথে উস্তাদের কী করণীয় সে সম্পর্কে কিছুটা বর্ণনা পেশ করা হল :

ছাত্র-ছাত্রীর হক[১]

* উস্তাদ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কল্যাণকর ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করবেন।

* উস্তাদ ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল পড়াবেন না; ভুল পড়ানো সম্পূর্ণ হারাম।

* উস্তাদ ছাত্র-ছাত্রীদের রুচি, যোগ্যতা, মেধা এবং মেজাযের প্রতি লক্ষ রেখে কথা বলবেন।

* উস্তাদ ছাত্র-ছাত্রীদের দেহ-মনে সজীবতা ও অনুপ্রেরণা বহাল রাখার জন্য বৈধ পন্থায় তাদের কিছু সময় আনন্দ-ফূর্তির সুযোগ দিবেন এবং তাদের পানাহার ও আরাম-বিশ্রামের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

* উস্তাদকে ছাত্র-ছাত্রীদের আমল আখলাকের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

* একবারে ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝতে না পারলে দ্বিতীয়বার বা বারবার ব্যাখ্যা করে পড়ানো উস্তাদের কর্তব্য।

* উস্তাদ ছাত্র-ছাত্রীদের সহীহ ইল্‌মের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন।

* উস্তাদ এক জনের উপর রাগান্বিত হলে সকলের উপর সে রাগ ঝাড়বেন না।

* ছাত্র-ছাত্রী কোন প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করলে যথাসম্ভব তার জওয়াব দিবে এবং জওয়াবের সাথে আনুষঙ্গিক কোন জরুরী বিষয় থাকলে সেগুলোও বলে দিবেন।

* অযোগ্য, বদমেজাযী বা স্নেহশীল নয়—এমন ব্যক্তির উস্তাদ হওয়া বা এমন ব্যক্তিকে উস্তাদ বানানো উচিত নয়।

* উস্তাদের মধ্যেও আদব ও আমল আখলাক থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, তার আদব ও আমল আখলাকের প্রভাব ছাত্র-ছাত্রীর উপর পড়বে।

* ছাত্র-ছাত্রীকে পড়ানোর পূর্বে উস্তাদ নিজে ভালভাবে পড়ে যাবেন।

---

১. ছাত্র-ছাত্রীদের হক সম্পর্কিত তথ্যসমূহ اصلاح انقلاب امت، آداب المعاشرت প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

(দুই) ইল্‌ম হাছেল করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হল দ্বীনী কিতাব-পত্র পাঠ করে ইল্‌ম হাছেল করা। কিতাব বা বই-পত্র পাঠ করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে :

* কোন দ্বীনী বিষয় শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোন কিতাব পাঠ করতে হলে যে কোন কিতাব পেলেই বা যে কোন কিতাবের নাম শুনেই তা পাঠ করা যাবে না। বাজারে অনেক নামে অনেক ধরনের ধর্মীয় কিতাব পাওয়া যায়। সব কিতাবই নির্ভরযোগ্য নয়। তাই যে কোন কিতাব পাঠ করতে হলে সর্বপ্রথম জেনে নিতে হবে সেই কিতাবখানার লেখক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কি-না, তিনি ভাল জাননেওয়ালা ব্যক্তি কি-না, তিনি হক্কানী বা খাঁটি লোক কি-না। কোন অভিজ্ঞ আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে সেই কিতাবখানা পাঠ করা যাবে কি-না। নির্ভরযোগ্য নয়—এরকম কিতাব-পত্র পাঠ করলে হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী আসতে পারে।

* দুনিয়াতে ইসলাম ধর্ম ছাড়াও আরও অনেক ধর্ম রয়েছে। সে সব ধর্ম আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণ মানুষের জন্য এসব ধর্মের কিতাব-পত্র পাঠ করা জায়েয নয়। যেমন ইয়াহুদীদের তাওরাত, খৃষ্টানদের ইঞ্জীল বা বাইবেল, হিন্দুদের বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, গীতা ইত্যাদি। এসব বই-পত্র পাঠ করা জায়েয নয়। এতে হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী আসতে পারে।

* দুনিয়াতে অনেক ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। তাদের লিখিত বই-পত্রও পাঠ করা ঠিক নয়। এতেও হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী আসতে পারে। অনেকে এসব বই-পত্র পাঠ করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলে থাকেন যে, আমরা পাঠ করে দেখি। পাঠ করার পর ভালটা গ্রহণ করব মন্দটা গ্রহণ করব না, তাহলে কী অসুবিধা ? এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তা সঠিকভাবে বিচার করার মত পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় হয়ত মন্দটাকেই তারা ভাল ভেবে গ্রহণ করে গোমরাহীর শিকার হয়ে যেতে পারেন। তাই বিজ্ঞ আলেমা নয়-এরকম সাধারণ মহিলাদের জন্য এ জাতীয় বই-পত্র পাঠ করা জায়েয নয়।

* কোন কিতাব-পত্র পাঠ করে কোন বিষয় সন্দেহযুক্ত মনে হলে বা অস্পষ্ট মনে হলে কিংবা ভালভাবে বুঝতে না পারলে বারবার পড়ে সেটা পরিষ্কার করে নিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত বার বার সেটা পড়তে থাকতে হবে। উস্তাদ থাকলে

উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। তারপর সেটা বুঝে না আসলে দ্বীনী ইল্‌ম সম্বন্ধে বিজ্ঞ আলেম-আলেমা ব্যক্তি থেকে সেটা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। ভালভাবে না বুঝে সেটা অন্য কারও কাছে বর্ণনা করা যাবে না। ভালভাবে না বুঝে সেটার উপর আমল করা যাবে না।

ভালভাবে বুঝে আসার জন্য এবং ইল্‌ম বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করতে হবে। কুরআন শরীফে এ জন্য নিম্নোক্ত দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে :

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.

ভালভাবে বুঝে আসার জন্য গোনাহ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কেননা, পাপীদের অন্তরে সঠিক ইল্‌ম প্রবেশ করে না। কারণ, ইল্‌ম হল নূর। আর পাপ করলে অন্তরে নূর প্রবেশ করে না। পাপের কারণে অন্তরে পর্দা পড়ে যায়। সেই পর্দা ভেদ করে অন্তরে নূর অর্থাৎ ইল্‌ম প্রবেশ করে না। যারা যত বেশী পাপ করবে, তাদের অন্তরে তত মোটা পর্দা পড়বে। ফলে তারা দ্বীনী কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। দ্বীনের সহীহ্ জ্ঞান, দ্বীনের সহীহ্ সমঝ তাদের মধ্যে আসবে না। এ প্রসঙ্গে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.)- এর ঘটনা স্মরণ করা যায়। তিনি বলেন :

شَكَوْتُ إِلٰى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ ... فَأَوْصَانِيْ إِلٰى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ

فَإِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِنَ الْإِلٰهِ ... وَنُوْرُ اللّٰهِ لَا يُعْطٰى لِعَاصِيْ

অর্থাৎ আমি একবার আমার উস্তাদ ওকী' (রহ.)-এর কাছে বললাম হুজুর! আমি যা পাঠ করি তা ভুলে যাই কেন? তিনি আমাকে বললেন, পাপ ছেড়ে দাও। কারণ, ইল্‌ম হল আল্লাহর নূর, পাপীকে এই নূর দেয়া হয় না।

যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা পড়া ভুলে যায়, পড়া মুখস্থ রাখতে পারে না, তাদের একথা ভালভাবে মনে রাখা দরকার। তারা পাপ করা ছেড়ে দিবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে উপরোক্ত দুআ করতে থাকবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ তাদের যেহেন খুলে যাবে এবং যা পড়বে তা মনে থাকবে।

* অনেক যুবতী অশ্লীল উপন্যাস, নভেল, নাটক, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠের বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত। এ জাতীয় বই-পত্র পাঠ করা নিষিদ্ধ। এ সব বই-পত্র পাঠ করলে সময়ের অপচয় হয়। এতে আল্লাহ্‌র দেয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করার গোনাহ হয়। এসব বই-পত্র পাঠ করলে চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

যদি কারও এসব বই পড়ার নেশা হয়ে গিয়ে থাকে এবং পড়তে খুব মনে চায়, তাহলে মনের চাওয়ার বিরুদ্ধে কিছুদিন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ জাতীয় বই-পত্র কাছেও রাখবে না। কাছে থাকলে তা দূরে সরিয়ে দিবে। কিছুদিন এভাবে বিরত থাকলেই মন থেকে এসব বই পাঠ করার চাহিদা দূর হয়ে যাবে।

* বর্তমান যুগের পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, প্রকৌশল-বিজ্ঞান, অর্থ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি শিক্ষা করা বৈধ কি বৈধ না তা নির্ভর করে নিয়তের উপর। যদি এগুলো ইসলামের উৎকর্ষ সাধন, মানব সেবা ও মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় তাহলে তা বৈধ। আর যদি অসততা করে, শোষণ করে অর্থ উপার্জন করা উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটা কুরআন হাদীছের সাধারণ সূত্র অনুসারে হারাম হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।[১]

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান প্রচলিত সহশিক্ষা ব্যবস্থায় মেডিকেল সাইন্স পড়ে ডাক্তার হতে গেলে বা ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হতে গেলে মেয়েদের পক্ষে পর-পুরুষের সাথে পর্দাহীনভাবে উঠা-বসা ছাড়া তা সম্ভব হয় না। অথচ পর্দা রক্ষা করা ফরয। পর্দা রক্ষা না করে কোন রকম শিক্ষা অর্জন করার অনুমতি শরীয়তে নেই।

(তিন) ইল্‌ম হাছেল করার তৃতীয় পদ্ধতি হল ওয়াজ-নসীহত বা দ্বীনী আলোচনা শুনে ইল্‌ম হাছেল করা। তবে কোন ওয়াজ-মাহফিলে বা তা'লীমের মজলিসে যেতে গিয়ে যদি পর্দার ব্যাঘাত ঘটে, বা কোন রকম ফেতনার আশংকা থাকে, তাহলে সেরূপ ওয়াজের মাহফিলে বা তা'লীমের মজলিসে যাওয়া জায়েয হবে না। মেয়েদের দ্বীনী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের মাধ্যমে তা'লীমের মজলিস পরিচালিত হয়ে থাকে। ভাল জ্ঞানেওয়ালী নেককার পরহেযগার মহিলার মাধ্যমে পরিচালিত এরূপ মজলিসে পর্দা রক্ষা করে তা'লীম গ্রহণ করতে পারলে অনেক উত্তম। তা'লীম দেনেওয়ালী মহিলা ভাল জ্ঞানেওয়ালী না হলে সেখানে না যাওয়া চাই।

ওয়াজ-নসীহতের মজলিস এবং তা'লীমের মজলিস দ্বীনী মজলিস। তাই এরূপ মজলিসে গেলে দ্বীনী মজলিসের আদব রক্ষা করতে হবে। এ সম্পর্কে জানার জন্য নিম্নে মজলিসের আদব এবং কথা-বার্তা শোনা ও বলার সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।

১. ইংরেজী পড়িবনা কেন ও তার পরিশিষ্ট মূল- হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, অনুবাদ- হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী।

মুলাকাত, সালাম, মুসাফাহা ও মুআনাকা

মজলিসের সুন্নাত ও আদবসমূহ

* কোন পাপের মজলিস হলে সেখানে যাবে না। অনন্যোপায় অবস্থায় গেলে কিংবা যাওয়ার পর জানতে পারলে বা যাওয়ার পর পাপ কাজ শুরু হলে চলে আসবে। সম্ভব না হলে মনে মনে যিকির-আযকারে লিপ্ত হবে- উক্ত পাপ কাজে বা কথায় মনোযোগ দিবে না। এ নিয়ম ঐ সময় প্রযোজ্য যখন পাপ কথা বা কাজ খাস ঐ মজলিসে হয়। আর যদি পাপ কাজ খাস ঐ মজলিসে না হয়, দূরে হয়, তবুও অনুসরণীয় ব্যক্তি তথা উস্তাদ ও মুরব্বীদের পক্ষে সেখান থেকে চলে আসা উত্তম। কেননা, তাদের অন্যরা অনুসরণ করে থাকে। এমতাবস্থায় তারা কোন পাপ কাজ করলে একদিকে তারা নিজেদের পাপের জন্যও দায়ী হবেন, অন্যদিকে যারা তাদের অনুসরণে পাপ করবে, তাদের পাপের জন্যও তারা দায়ী হবেন। তাই উস্তাদ ও মুরব্বীদের পদে পদে সাবধান থাকতে হবে।

* যদি মজলিসের লোকেরা দ্বীনী তা'লীম ও যিকির-তেলাওয়াতে লিপ্ত না থাকেন কিংবা এমন কথা ও কাজে লিপ্ত না থাকেন যে সময় সালাম দিলে ব্যাঘাত ঘটবে, তাহলে মজলিসে পৌঁছে সালাম করবে।

* বয়স, ইল্‌ম ও বুযুর্গীতে যারা অগ্রসর তাদের মজলিসে সামনে বসতে দেয়া সুন্নাত।

* বয়স ও ইল্‌মে কম— এরূপ লোকেরা আগে বেড়ে মজলিসে কথা বলবে না।

* মজলিসে পৌঁছে যেখানেই স্থান হয়, সেখানেই বসে যাবে। লোকদের ঠেলে মধ্যে বা সামনে গিয়ে বসা কিংবা অপরকে তার স্থান থেকে সরিয়ে সেখানে বসা মাকরূহ। অবশ্য মজলিসের লোকেরা যদি তাকে এরূপ আগে বাড়িয়ে দেন তাহলে তা মাকরূহ হবে না।

* অনুমতি ব্যতীত দু'জন ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের মাঝখানে বসবে না। কেননা, তাদের মধ্যে বিশেষ আন্তরিকতা বা কোন গোপন কথা থাকতে পারে।

* যখন মজলিসে কোন ব্যক্তি আগমন করেন এবং তার বসার স্থান সংকুলান না হয়, তখন সেখানে বসা লোকদের উচিত একটু চেপে বসে জায়গা প্রশস্ত করে আগন্তুকের জন্য স্থান করে দেয়া।

Scanned by CamScanner

* আগন্তুক ব্যক্তি প্রকৃত সম্মানী ব্যক্তি হলে তার সম্মানার্থে কিংবা আগন্তুকের উদ্দেশ্যে না দাঁড়ালে কোন ক্ষতি হওয়ার বা হাজত পূর্ণ না হওয়ার আশংকা থাকে এরূপ প্রয়োজনে দাঁড়ানোর অনুমতি আছে। আগন্তুক স্নেহভাজন ব্যক্তি হলেও স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানো যায়।

* কেউ মজলিস থেকে উঠে গেলে এবং পুনরায় তার উক্ত স্থানে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে তার স্থানে অন্য কেউ বসবে না।

* ওয়াজ-নসীহত ও বয়ানের মজলিস হলে সকলে খুব মিলেমিশে বসবে।

* কোন মজলিসে তিনজন লোক থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে অপর দুজনে একান্তে কোন কথা বলবে না, কেননা, এতে তৃতীয়জন মনে ব্যথা পেতে পারেন। তিনি মনে করতে পারেন যে, আমাকে কোন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না, তাই আমার কাছে কথাটা গোপন রাখা হচ্ছে।

* মজলিসে কারও দিকে পা বাড়িয়ে বসা বে-আদবী।

* মশওয়ারার মজলিস হলে প্রথমে এই দুআ পড়ে নিবে—

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنَا مَرَاشِدَ اُمُوْرِنَا وَاَعِذْنَا مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য সঠিক বিষয়টি আমাদের অন্তরে উদিত করে দাও এবং নফ্সের ধোঁকা হতে ও কুকর্ম হতে আমাদের রক্ষা কর।

* মজলিস শেষে নিম্নোক্ত দুআ পড়ে নিলে উক্ত মজলিসে সংঘটিত পাপ-ত্রুটির কাফ্ফারা (গোনাহ মোচন) হয়ে যায়।[১]

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

মজলিসে একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাই এ প্রসঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ এবং মুলাকাতের নিয়ম কানুন ও আদব-কায়দা জেনে নেয়া ভাল। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।

সাক্ষাৎ ও মুলাকাতের সুন্নাত এবং আদবসমূহ

* কারও নিকট সাক্ষাতের জন্য এমন সময় যাবে না, যখন গেলে তার ঘুম, ওযীফা কিংবা বিশেষ কোন কাজ বা আমলের ব্যাঘাত ঘটবে।

---

১. মজলিসের সুন্নাত ও আদব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য آداب المعاشرت، اسلامی تہذیب، تعلیم الدین وغیرہ থেকে গৃহীত। ॥

* কারও কাছে যেতে হলে পূর্বে তাকে না জানিয়ে নাস্তা বা খাওয়ার ওয়াক্তে যাবে না। গেলে খেয়ে যাবে এবং গিয়েই একথা জানিয়ে দিবে যে আমি খেয়ে এসেছি।

* অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি চাওয়ার নিয়ম সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

* অনুমতি না হলে বা বিশেষ কোন কাজে তিনি লিপ্ত রয়েছেন, ফলে এ মুহূর্তে সাক্ষাৎ প্রদান করতে গেলে তার কষ্ট বা ক্ষতি হবে— এরূপ অবস্থা হলে চলে আসা বাঞ্ছনীয় কিংবা এমন স্থানে বসে তার অপেক্ষা করতে থাকবে যেন তিনি জানতে না পারেন। অতঃপর স্বাধীনভাবে যখন তিনি কাজ থেকে ফারেগ হবেন, তখন সাক্ষাৎ প্রার্থনা করবে। এমন স্থানে অপেক্ষায় থাকবে না যেন তিনি বুঝতে পারেন এবং ব্যস্ততার কারণে সাক্ষাৎ প্রদান করতে না পেরে বা সময় দিতে না পেরে মনে মনে লজ্জিত হন।

* দেখা হওয়ার পর সালাম দিবে। গায়র মাহরাম পুরুষ হলে এবং ফেতনার আশংকা থাকলে সালাম দিবে না।

* যদি তার সাথে পরিচয় অনেক পুরাতন হয় কিংবা এত হালকা পরিচয় হয় যে, তার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে নিজের পরিচয় বলে দিয়ে তার দ্বিধা দূর করবে। এ কথা বলে তাকে লজ্জা দিবে না যে, আমাকে চিনতে পারেননি? ... ইত্যাদি।

* দীর্ঘ কথা বলতে হলে তার এত কথা শোনার সময় হবে কি-না তা জেনে নিতে হবে। তার ইচ্ছার বাইরে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে বা দীর্ঘ কথা বলে তাকে বিব্রত করবে না।

* মুরব্বী ও গুরুজনদের নিকট সাক্ষাতের জন্য যেতে হলে যদি তাদের সাক্ষাতের জন্য সময় নির্ধারিত থাকে, তাহলে সেই নির্ধারিত সময়ে যাবে।

* যার কাছে কেউ সাক্ষাৎ করতে আসে তার উচিত কোন বিশেষ ওযর বা একান্ত অসুবিধা না থাকলে সাক্ষাৎ প্রদান করা।

* সাক্ষাৎ প্রার্থী বিশেষ কোন ব্যক্তি হলে পরিপাটি হয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ প্রদান করা উত্তম।[১]

* সাক্ষাৎ প্রার্থীর জন্য বসা বা স্থান গ্রহণের জায়গা করে দিবে বা মজলিসে স্থান না থাকলে অন্তত একটু নড়ে-চড়ে বসে তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে, এতে সাক্ষাৎ প্রার্থী প্রীত হবে।

---

১. شرح الاسلام ২. اسلامی تہذیب ।

* সাক্ষাৎ প্রার্থী অপরিচিত হলে তার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চেয়ে তার দ্বিধা-সংকোচকে দূর করবে।

সাক্ষাৎকালে একে অপরের সাথে সালাম ও মুসাফাহা করার যে নিয়ম রয়েছে সে প্রসঙ্গে জানার জন্য নিম্নে সালাম ও মুসাফাহা সম্পর্কিত মাসায়েল বয়ান করা হল :

সালাম প্রদানের মাসায়েল

* আগে সালাম দিবে। এটাই উত্তম। কেননা, যে প্রথমে সালাম প্রদান করবে সে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবে।

* পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকে সালাম দিবে। মাতা-পিতা, স্বামী, ছেলে-মেয়ে সকলকেই সালাম করবে। অনেকে মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে বা স্বামীকে সালাম দিতে লজ্জা বোধ করে। অথচ এই লজ্জা ঠিক নয়। কয়েক দিন সালাম দিলেই এ লজ্জা কেটে যাবে। লজ্জা করে সালামের মত একটি ফযীলতের আমল থেকে বঞ্চিত হওয়া বোকামী।

* সওয়ারী ব্যক্তি পায়ে চলা ব্যক্তিকে, চলনেওয়ালা বসা বা দাঁড়ানো ব্যক্তিকে, আগন্তুক অবস্থানকারীকে, কমসংখ্যক লোক অধিকসংখ্যক লোককে এবং কম বয়সী ব্যক্তি অধিক বয়সীকে আগে সালাম করবে। এটাই উত্তম। জামা'আতের মধ্য থেকে একজন সালাম করলে সকলের পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে।

* সালামের সময় হাত দিয়ে ইশারা করবে না বা হাত কপালে ঠেকাবে না কিংবা মাথা ঝুঁকাবে না। তবে দূরবর্তী লোককে সালাম করলে-যার পর্যন্ত আওয়াজ না পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে—সেরূপ ক্ষেত্রে শুধু বোঝানোর জন্য হাত দিয়ে ইশারা করা যেতে পারে।[১] আমাদের অভ্যাস হল প্রয়োজন না থাকলেও আমরা সালাম প্রদান করার সময় হাত উঠাই, এটা ঠিক নয়।

* হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইয়াহুদী প্রমুখ অমুসলিমকে সালাম করবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে নিজের ক্ষতির আশংকা থেকে বাঁচার জন্য একান্তই কিছু বলে যদি তাকে অভিবাদন জানাতেই হয়, তাহলে 'গুডমর্নিং', 'গুডইভিনিং' বা 'শুভ-সকাল' 'শুভ সন্ধ্যা' ইত্যাদি কিছু বলে অভিবাদন করা যায়।[২]

১. شرح الاسلام । ২. کتاب الاذکار ।

* কোন মজলিসে মুসলিম-অমুসলিম উভয় প্রকারের লোক থাকলে মুসলমানদের নিয়তে সালাম দিবে কিংবা নিম্নরূপ বাক্যেও সালাম দেয়া যায়—

اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

অর্থাৎ যারা হেদায়েত তথা ইসলামের অনুসরণ করেছে, তাদের প্রতি সালাম।

* নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সালাম দেয়া নিষিদ্ধ অর্থাৎ মাকরূহ। এরূপ ব্যক্তিদের কেউ সালাম প্রদান করলে সে সালামের উত্তর পাওয়ার হকদার হয় না।

ক. কোন পাপ কাজে রত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে; যেমন জুয়া বা দাবা খেলায় রত ব্যক্তিকে।

খ. পেশাব-পায়খানায় রত লোককে।

গ. পানাহার রত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ তার মুখে খাদ্য/পানীয় থাকা অবস্থায়।)

ঘ. ইবাদত, যেমন : নামায, তেলাওয়াত, আযান ও ইকামত প্রদানে এবং দ্বীনী কিতাব আলোচনায় রত ব্যক্তি বা যিকির ওযীফায় রতদের।

ঙ. কোন মজলিসে বিশেষ কথা-বার্তা বলার মুহূর্তে কথা-বার্তায় ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা থাকলেও সালাম করা উচিত নয়।

চ. গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে ফেতনার আশংকা থাকে সেখানে সালাম আদান-প্রদান নিষিদ্ধ।[১]

* কোন খালি ঘরে প্রবেশ করলে সেখানেও সালাম দিবে। তবে নিম্নোক্ত বাক্যে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ الصَّالِحِيْنَ অথবা اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ

* ছাত্রদেরকে কুরআন বা দ্বীনী কিতাব তা'লীম দানে রত উস্তাদকে কেউ সালাম করলে তিনি জওয়াব দেয়া বা না দেয়া উভয়টার অবকাশ রাখেন।[২]

সালামের জওয়াব প্রদানের মাসায়েল

* সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব। জামাআতের মধ্য থেকে একজন জওয়াব দিলে সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

* সালামের জওয়াব শুনিয়ে দেয়া জরুরী। (যদি সালাম দাতা নিকটে থাকেন) আর যদি সালামদাতা দূরে থাকেন, তাহলে মুখে জওয়াব দেয়ার সাথে সাথে ইশারা দ্বারাও তাকে অবহিত করবে, বিনা প্রয়োজনে ইশারা করবে না। এমনিভাবে সালামের সময় মাথা ঝুকাবে না।

---

১. كتاب الاذكار ۱

* সালাম দাতা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আসসালামু আলাইকুম) বললে তার জওয়াবে "ওয়া লাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলা উত্তম। বরং "ওয়া বারাকাতুহ" বৃদ্ধি করে দিলে আরও উত্তম। আর সালামদাতা ওয়া রহমাতুল্লাহ্ সহ সালাম দিলে তার জওয়াবে ওয়া বারাকাতুহু শব্দটুকু বৃদ্ধি করে জওয়াব দেয়া উত্তম।

* কেউ অন্য কারও সালাম পৌঁছালে -অর্থাৎ এমন বললে যে, অমুকে আপনাকে সালাম বলেছেন- তার জওয়াবে সালাম পৌছানেওয়ালী মহিলা হলে বলবেঃ

وَعَلَيْكِ وَعَلَيْهَا السَّلَامُ অথবা وَعَلَيْكُنَّ وَعَلَيْهِنَّ السَّلَامُ.

* কোন অমুসলিম কোন মুসলমানকে আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিলে মুসলমান তার জওয়াবে শুধু বলবে "ওয়া আলাইকুম" অথবা মুখে কিছু না বলে শুধু ইশারা করে দিলেও যথেষ্ট। মুসলমানদেরকে যেভাবে "ওয়া আলাইকুমুস সালাম" বলে জওয়াব দেয়া হয় সেভাবে জওয়াব দিবে না।

* একই সঙ্গে দুই জন একে অপরকে সালাম দিলে প্রত্যেকেকই আবার জওয়াব দিতে হবে। তবে দুই জনের সালাম আগে পরে হলে পরে যিনি বলেছেন তারটা জওয়াব এবং আগে যিনি বলেছেন তারটা সালাম বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় কাউকেই আর জওয়াব দিতে হবে না।[১]

মুসাফাহার মাসায়েল

* মুসাফাহা করা সুন্নাত। সাক্ষাতের প্রাক্কালে মুসাফাহা করতে হয়। বিদায়ের সময়ও মুসাফাহা হতে পারে।

* উভয় হাত যোগে মুসাফাহা করা সুন্নাত। অনন্যোপায় অবস্থা ব্যতীত এক হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাতের খেলাফ এবং তাকাব্বুরের আলামত।

* মুসাফাহার পর নিজের হাতে চুমু দেয়া বা নিজের হাত বুকের উপর ফিরানো সুন্নাতের খেলাফ ও বিদআত।

* কারও সঙ্গে এমন সময় মুসাফাহার জন্য হাত বাড়াবে না, যখন তার কোন ব্যস্ততা বা লিপ্ততার কারণে মুসাফাহার জন্য হাত অগ্রসর করতে সে বিব্রতবোধ করতে পারে।

---

১. شرح السلام । شامی، اسلامی تہذیب، رد المحتار، کتاب الاذکار، معارف القرآن প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

* কোন নারী তার কোন গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে মুসাফাহা ক পারবে না ।[১]

মুরব্বী ও গুরুজনের কদমবুছীর মাসায়েল

* কারও পা ছুঁয়ে সেই হাতে চুমু দেয়া মাকরূহ । আর যদি পা ছুঁয়ে হাতে চুমু দেয়া না হয় বরং শুধু চেহারার উপর মর্দন করা হয় তাহলে মুত্তাকী, পরহেযগার ও বরকতময় ব্যক্তির পা ছুঁয়ে এরূপ করার অনু রয়েছে, যদি এরূপ করনেওয়ালা ব্যক্তি সুন্নাতের পাবন্দ এবং স আকীদাসম্পন্ন হয়ে থাকে । অন্যথায় এরূপ করা জায়েয হবে না ।[২]

* কদমবুছী মাঝে-মধ্যে ঘটনাক্রমে জায়েয স্থানে করা যেতে পারে, এটাকে নিয়ম বানানো ঠিক নয় ।[৩]

* শ্বশুর-শাশুড়ী বা গুরুজনের পায়ে হাত দিয়ে সালাম না করলে বেআ হয়—এটা মনগড়া ধারণা । সালাম করলে শুধু মুখে সালাম করবে ।

অনুমতি গ্রহণের মাসায়েল

ঘরে প্রবেশের পূর্বে ঘরবাসীর অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব । এমন পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও পুত্র-কন্যার ঘর হলেও অনুমতি গ্রহণ করা জরু একমাত্র যে ঘরে শুধু প্রবেশকারীর স্ত্রী বা স্বামী থাকে সেখানে প্রবেশকারীর জন্য অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়, তবে সেখানেও ক দিয়ে, জুতার শব্দ করে বা যে কোনভাবে সাড়া দিয়ে প্রবেশ করা মোস্তাহাব উত্তম । আবার স্ত্রীর সাথে অন্য কেউ রয়েছে বলে নিশ্চিত জানা থাকলে বা প্রবল ধারণা হলেও অনুমতি নেয়া জরুরী ।

*** অনুমতি গ্রহণের সুন্নাত-তরীকা হল :** দরজার বাইরে থেকে সাল দিবে কিংবা সালাম দিয়ে বলবে আসতে পারি? ভিতর থেকে সাড়া না পে আবার সালাম দিবে । এভাবে তিনবার করবে । তারপরও যদি ভিতর থে কোন সাড়া না আসে, তাহলে সেখান থেকে চলে আসবে । উল্লেখ্য যে, সালামের উত্তর ওয়ালাইকুমুস সালাম নয় বরং এর উত্তর হল প্রবে অনুমতি দেয়া বা না দেয়া । প্রবেশের অনুমতি দিলে দেখা সাক্ষাৎ হওয় সময় স্বাভাবিক সালাম জওয়াব আদান-প্রদান করতে হবে ।

* অনুমতি চাওয়ার জন্য দরজায় করাঘাত করা, কড়া নাড়ানো কিংবা বর্তমানে প্রচলিত কলিং বেল বাজানো দ্বারাও অনুমতি চাওয়ার হুকুম আদায় হয়ে যাবে।

* অনুমতি চেয়ে এমন স্থানে দাঁড়াবে, যাতে গায়রে মাহরাম কেউ দরজা/জানালা খুললে বা পর্দা সরালে নযরে না পড়ে কিংবা কোনভাবে গোপন কিছু নযরে না আসে।

* ভিতর থেকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় 'কে'? তাহলে এরূপ বলবে না যে, "আমি" বরং পরিষ্কারভাবে নিজের নাম বলবে যে, আমি অমুক বরং প্রয়োজনে নিজের পরিচয়ও বলবে।

কথা-বার্তা, হাসি-ফূর্তি ও তর্ক-বির্তক

কথা বলার মাসায়েল

মজলিসে যে সব কথাবার্তা হবে, সে ক্ষেত্রে কথা-বার্তা বলার নিয়ম-কানুন ও আদব রক্ষা করতে হবে। শুধু মজলিসে নয় সব ক্ষেত্রেই কথা বলার সময় এ নিয়ম-কানুন ও আদব তথা কথা বলার মাসায়েল মান্য করতে হবে।

* কথা কম বলা উত্তম।

* যা বলবে সত্য বলা ওয়াজিব, মিথ্যা বলা হারাম।

* সাধারণভাবে আস্তে কথা বলাই উত্তম। তবে বড় মজলিসের প্রয়োজনে প্রয়োজন অনুপাতে জোরে কথা বলতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে বলা ভাল নয়।

* নিজের চেয়ে অধিক বয়স এবং অধিক ইল্‌মসম্পন্ন লোকদের কথা বলতে অগ্রাধিকার দেয়া আদব।

* তাহকীক-তদন্ত ব্যতীত কথা বলা অন্যায়। যে কোন কথা শুনেই তাহ্‌কীক-তদন্ত ব্যতীত তা বর্ণনা করা মিথ্যার শামিল। তবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে কিছু জানলে তা তাহ্‌কীক ছাড়াই বলা যায়।

* যে কথায় ঝগড়া এবং তর্ক সৃষ্টি হয়, তা বলা অন্যায়।

* নিজের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোন খবর বা প্রতিশ্রুতিমূলক কথা বললে "ইনশাআল্লাহ" বলবে। যেমন : বলবে ইনশাআল্লাহ আমি এটা করব, বা ইনশাআল্লাহ আমি ওটা দিব ইত্যাদি।

* বড়দের আদব রক্ষা করে কথা বলা আদব।

* বড় লোকদেরকে সম্মানজনক সম্বোধনপূর্বক কথা বলা আদব।

* কাউকে কাফের, ফাসেক, মালউন, আল্লাহর দুশমন, বেঈমান ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা নিষেধ।

* নিজের ভাঙ্গা ভাঙ্গা অভিজ্ঞতার কথা বলবে না, এতে শ্রোতাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়।

* কথা বলতে গিয়ে আত্মপ্রশংসা না করা অর্থাৎ নিজের প্রশংসা নিজে না করা। আত্মপ্রশংসা করা অর্থাৎ নিজের প্রশংসা নিজে করা নিষেধ। এটা গোনাহে কবীরা।

* অতিরিক্ত ঠাট্টা মজাক না করা। এতে প্রভাব, লজ্জা-শরম ও পরহেযগারী কমে যায়।

* যে শব্দ বা যে ভাষা বাতিলপন্থীরা খারাপ উদ্দেশ্যে এবং খারাপ অর্থে ব্যবহার করে থাকে সেটা পরিহার করা কর্তব্য। যেমন : বর্তমানে কেউ কেউ আলেমদের মৌলবাদী বলে, ইত্যাদি।

* চিন্তা করে কথা বলবে। বিনা চিন্তায় যা মনে আসে তা বলবে না। বিনা চিন্তায় কথা বললে অনেক সময় কথা মিথ্যা হয়ে যায় বা এমন কথা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে যে পরে লজ্জিত বা অনুতপ্ত হতে হয়।

* কথা এত সংক্ষেপ করবে না যাতে বক্তব্য অস্পষ্ট থাকে, আবার এত দীর্ঘ করবে না যাতে শ্রোতার মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি হয়। বরং যতটুকু কথা বললে মোটামুটি প্রয়োজন সারে ততটুকু বলেই ক্ষান্ত হবে।

* চাটুকারিতামূলক কথা অর্থাৎ কারও তোষামোদ করে কথা বলবে না।

* কোন প্রয়োজনের কথা কারও নিকট পূর্বে বলে থাকলে আবার সেটা পুনরাবৃত্তি করার ক্ষেত্রে পূর্ণ কথা বলবে। কারণ, হতে পারে তিনি পূর্বের কথা ভুলে গিয়ে থাকবেন এবং এক্ষণে পূর্ণ কথা না হওয়ায় তিনি বিভ্রান্তির শিকার হবেন।

* কারও বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই তার কথা কেটে মাঝখানে কথা না বলা আদব। দু'জনে কথা বলতে থাকলে তাদের সম্মতি ব্যতীত তাদের কথায় ফোড়ন কাটবে না।

* নিজের কথায় ভুল হলে সেটা স্বীকার করে নেয়া, অপব্যাখ্যায় না যাওয়া। অনেকের মধ্যে এই রোগ দেখা যায় যে, নিজের ভুল হলেও কোন-ভাবেই তা স্বীকার করতে চায় না, বরং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের কথাকেই ঠিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এটা বড়ই খারাপ অভ্যাস।

ফোনে কথা বলার মাসায়েল

সাক্ষাৎ-মুলাকাতের সুন্নাত ও আদব সমূহে যা যা উল্লেখ করা হয়েছে, কারও সাথে ফোনে যোগাযোগ ও কথা-বার্তার ক্ষেত্রেও সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ :

১. এমন সময় কারও কাছে টেলিফোন করবে না যখন তার ঘুম, ওযীফা কিংবা বিশেষ কোন কাজ বা আমলের ব্যাঘাত ঘটবে।

২. টেলিফোন করার সময় নির্ধারিত থাকলে তখনই করবে।

৩. টেলিফোন রিসিভ করার পর প্রথমেই সালাম দিতে হবে। সালাম যে কোন কথা বলার পূর্বেই হওয়া নিয়ম।

৪. তার সাথে পরিচয় না থাকলে কিংবা আওয়াজে সে টের না পেলে বা অনেক পুরাতন বা এত হালকা পরিচয় যে, তার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা—এরূপ ক্ষেত্রে নিজের পরিচয় বলে দিয়ে তার দ্বিধা দূর করবে। এ কথা বলে তাকে লজ্জা দিবে না যে, আমাকে চিনতে পারেননি? বা বলুনতো আমি কে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

৫. দীর্ঘ কথা বলতে হলে তার এত কথা শোনার সময় আছে কি-না জেনে নিতে হবে, তার সম্মতির বাইরে দীর্ঘ কথা বলে তাকে বিব্রত করবে না।

৬. কথা বলার সময় কথা বলার সুন্নাত ও আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

কথা শ্রবণ করার মাসায়েল

কথাবার্তা বলার যেমন নিয়মকানুন ও আদব রয়েছে, কথাবার্তা শ্রবণ করারও নিয়মকানুন ও আদব তথা মাসায়েল রয়েছে। তাই নিম্নে কথাবার্তা শ্রবণ করার আদব ও নিয়মকানুন বর্ণনা করা হল। কথাবার্তা বলার সময় সাধারণতঃ আমরা এ বিষয়গুলি খেয়াল রাখি না। অথচ এসব বিষয় খেয়াল রাখা চাই। তাহলেই আমাদের পারস্পরিক মহব্বত ও সৌহার্দ গড়ে উঠবে।

* প্রত্যেকের কথা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনতে হয়। কোন কথা বোধগম্য না হলে জিজ্ঞেস করার পরিবেশ থাকলে বক্তার নিকট জিজ্ঞেস করে ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

* কেউ আড়াল থেকে ডাকলে তার ডাকে সাড়া দিতে হবে। শুধু নীরবে তার আহ্বানে চলে আসা যথেষ্ট নয়।

* কেউ কোন কাজের কথা বললে হ্যাঁ বা না স্পষ্ট উত্তর দিতে হবে, যেন বক্তা নিশ্চিন্ত হতে পারে। কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে শুধু নীরবে কাজ সম্পন্ন করে দেয়াই যথেষ্ট নয়। কেউ কোন কাজের কথা বললে ভালভাবে বুঝে তারপর যাবে। অনেককে দেখা যায় গুরুজন কোন হুকুম দিল আর ভালভাবে না বুঝেই দৌড় দিল। পরে দেখা কাজ ওলট-পালট করে এসেছে। এমন না হওয়া চাই।

* উস্তাদের কথা, এমনিভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ কোন কথা বললে কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে সরে যাওয়া বে-আদবী।

* কোন মজলিসে কথা চলতে থাকলে সেদিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে—অন্য কারও সাথে কথা বলা বে-তমীজী।

* মুরব্বী বা উস্তাদ কোন কথা বলার পর বুঝে এসেছে কি না জিজ্ঞেস করলে স্পষ্টভাবে হ্যাঁ বা না বলা উচিৎ, নীরব থাকা ঠিক নয়; এতে উস্তাদ বা মুরব্বীর পেরেশানী হয়। কথার জওয়াব না দেয়া বে-আদবী।[১]

তর্ক-বিতর্ক সম্বন্ধে মাসায়েল

কয়েকজন ব্যক্তি এক মজলিসে একত্রিত হলে কথায় কথায় কোন তর্ক-বিতর্কও সৃষ্টি হতে পারে। তাই তর্ক-বিতর্ক সম্পর্কে মাসায়েল জেনে নেয়া ভাল।

তর্ক-বিতর্ক দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা : (এক) পারস্পরিক কথা-বার্তার সময় ঘটনাক্রমে লেগে যাওয়া তর্ক-বিতর্ক। (দুই) দ্বীনী দাওয়াতের কাজে যে বাহাছ মোবাহাছা বা তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে। এই উভয় প্রকার তর্ক-বিতর্কের সময় যে নিয়ম নীতিগুলো মেনে চলা আবশ্যক তা হল :

১. কথা-বার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করা।

২. রাগ হয়ে কোন কটুকথা না বলা।

৩. এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়।

৪. বহুল প্রচলিত, প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ব্যাখ্যাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দেয়া, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সে হটকারিতার পথ পরিহার করে।

৫. প্রতিপক্ষ হক-কথা মানে না, বা বুঝে না, কিংবা বুঝতে চায় না—এরূপ হলে নিজেই চুপ হয়ে যাওয়া নিয়ম।

৬. ভুল সমর্থনের জন্য দলীল-প্রমাণ পেশ না করা।

---

১. مفاتیح الجنان، اصلاح انقلاب امت، آداب المعاشرت প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

৭. নিজের কথার মধ্যে কোন ভুল বুঝে আসলে তৎক্ষণাৎ তা স্বীকার করে নেয়া উচিত। ভুল স্বীকার না করা গুরুতর অপরাধ।[১]

হাসি-ফূর্তি ও রসিকতা সম্পর্কে মাসায়েল

কয়েকজন ব্যক্তি এক মজলিসে একত্রিত হলে কথায় কথায় হাসি-ফূর্তি এবং রসিকতাও হতে পারে। তাই হাসি-ফূর্তি এবং রসিকতা সম্পর্কে মাসায়েল জেনে নেয়া ভাল।

* শরীয়তের সীমানা লঙ্ঘন করে হাসি-ঠাট্টা করলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়, গাম্ভীর্য হ্রাস পায়, আল্লাহর যিকির ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে গাফলত পয়দা হয়, লজ্জা-শরম ও পরহেযগারী কমে যায়।

* কোন শোকাতুর বা বিপদগ্রস্তের দিল খোশ করার জন্য হাসি-ফূর্তির কথা বলা জায়েয বরং উত্তম। এমনিভাবে দ্বীনের কাজ ও ইবাদতের জন্য মনকে সতেজ করার উদ্দেশ্যে এবং মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য হাসি-ফূর্তি ও রসিকতা করা হলে তা-ও উত্তম।

* হাসি-ঠাট্টা ও রসিকতার সময় নিম্নোক্ত বিষয়াবলী লক্ষ্য রাখতে হবে :

(১) মিথ্যা না হয়।

(২) কারও মনে বা ইজ্জতে আঘাত না লাগে।

(৩) অতিরিক্ত না হয়।

(৪) সারাক্ষণ যেন এতে লেগে থাকা না হয়।

এ শর্তগুলো না পাওয়া গেলে তখনই সে হাসি-ঠাট্টা শরীয়তের সীমানা লঙ্ঘন করেছে বলে আখ্যায়িত হবে।

প্রশংসা বিষয়ক মাসায়েল

কয়েকজন ব্যক্তি এক মজলিসে একত্রিত হলে কথায় কথায় একজন আর একজনের প্রশংসায় লিপ্ত হতে পারে। তাই অন্যের প্রশংসা করা সম্পর্কে শরীয়তের নিয়ম-নীতি কী সে সম্বন্ধে জেনে নেয়া ভাল।

* কারও সম্মুখে তার প্রশংসা করা নিষেধ। এতে তার মধ্যে অহংকার বা আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হতে পারে। তবে কারও ব্যাপারে যদি বোঝা যায় যে, তার মধ্যে অহংকার আসবে না, তাহলে তার উৎসাহ বৃদ্ধি এবং গুণাগুণের স্বীকৃতিস্বরূপ তার কিছুটা প্রশংসা তার সম্মুখেও করে দেয়া যেতে পারে।

---

১. ماخوذ از معارف القرآن و تعلیم الدین ؛

* কারও প্রশংসা করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে :

১. গুণ যতটুকু তার থেকে বাড়িয়ে বলা যাবে না। অর্থাৎ প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা যাবে না।

২. যে বিষয় নিশ্চিত করে জানা নেই তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। যেমন এরূপ বলা যাবে না যে, অমুক নিশ্চিত আল্লাহর অলী। কারণ, কে আল্লাহর অলী তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। তবে হ্যাঁ, এভাবে বলা যাবে যে, আমার জানামতে তিনি আল্লাহর অলী, বা আমি তাকে আল্লাহর অলী মনে করি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩. প্রকৃত প্রস্তাবে সে যেমন, মুখে তার অন্য রকম বলা যাবে না।

* কোন ফাসেক বে-দ্বীনের প্রশংসা করা নিষেধ। তবে প্রকৃত যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয়া ভিন্ন কথা।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পঞ্চম অধ্যায়

ঈমান ও তৎসংশ্লিষ্ট আমল-আখলাক বিষয়ক

ঈমান ও আকীদা শব্দের ব্যাখ্যা

"ঈমান" শব্দের অর্থ বিশ্বাস করা ও স্বীকার করা। কুরআন-হাদীছে যে বিষয়কে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে সেগুলোকে অন্তরে বিশ্বাস করা এবং মুখে তা স্বীকার করাই হল ঈমান। এক কথায় ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসকে বলা হয় ঈমান।

"আকীদা" শব্দের অর্থ কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। কুরআন-হাদীছের মাধ্যমে অকাট্যভাবে যে সব বিষয় প্রমাণিত আছে, সেগুলোর প্রতি মনের দৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় আকীদা। "ঈমান" ও "আকীদা" শব্দের অর্থ প্রায় কাছাকাছি।

ঈমানের গুরুত্ব

ঈমান হচ্ছে সমস্ত আমলের বুনিয়াদ। যার ঈমান নেই তার কোন আমল কবূল হয় না। যার ঈমান সহীহ নয়, তার আমল গ্রহণযোগ্য হয় না। রূহ ছাড়া অর্থাৎ প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন, ঈমান ছাড়া আমলও সেরকম। ঈমান না থাকলে আমল রূহ ছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে তারও কোন ধর্তব্য থাকে না।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ۔ الاية

অর্থাৎ যারা কাফের (অর্থাৎ যাদের ঈমান ঠিক নেই) তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচিকার ন্যায়। (সূরা নূর : ৩৯)

মরুভূমির ভিতরে দূরের থেকে মনে হয় ঐ যে অনেক পানি, কিন্তু নিকটে গেলে দেখা যায় পানির কোন নাম নিশানা নেই। অর্থাৎ দূরের থেকে মনে হয়

Scanned by CamScanner

অনেক কিছু কিন্তু আসলে কিছুই নয়। যাদের ঈমান নেই, তাদের আমলও অনুরূপ—মনে হবে অনেক আমল করছে, কিন্তু আসলে কিছুই হচ্ছে না। আসল সময়ে অর্থাৎ পরকালে দেখা যাবে আমলের কিছুই নেই। তাই ঈমান দুরস্ত করা মানুষের বুনিয়াদী ফরয। যার ঈমান নেই তার কোন আমল কবুল হয় না। যার ঈমান নেই পরকালে সে কোন আমলের সওয়াব পাবে না। ঈমান-আকীদা দোরস্ত না থাকলে যতই আমল করা হোক সে সব আমলের কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই ঈমান দোরস্ত করা মানুষের বুনিয়াদী বা মৌলিক ফরয। যারা শুধু আমলের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, ঈমান-আকীদা দোরস্ত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে না, তারা বড়ই ভুলের মধ্যে রয়েছে।

ঈমানের ফযীলত

ঈমানের অনেক ফযীলত রয়েছে। ঈমান দ্বারা দুনিয়া আখেরাত সব জগতের শান্তি লাভ করা যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারার শুরুতে পরহেযগার মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে ঈমান আমলের কথা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ তিনি বুঝিয়েছেন যারা ঈমান-আমলের উপর থাকে তারাই পরহেযগার। তারপর বলেছেন :

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔(سورة البقرة)

অর্থাৎ যারা এরকম ঈমান-আমলের উপর থাকে, তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত, আর তারাই কামিয়াব বা সফলকাম। অর্থাৎ ঈমানদারগণ দুনিয়াতেও সফলকাম, আখেরাতেও সফলকাম। ঈমান দ্বারা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে কামিয়াব তথা সফল হওয়া যায়।

হযরত আবূ যর (রাযি.) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔

অর্থাৎ যে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, আর এর উপর তার মৃত্যু হবে সে জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। যদি তার পাপও থাকে, তবুও পাপ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর এক সময় সে জান্নাতে যেতে পারবে। কিন্তু যার ঈমান নেই সে কোন দিনই জান্নাতে যেতে পারবে না। সে অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। (মুসলিম)

নিম্নে যে সব বিষয়ে ঈমান রাখা জরুরী, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

Scanned by CamScanner

যে সব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়

মৌলিকভাবে ৬ টি বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখতে হয়। সে ৬ টি বিষয় হল :

১. আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান।
২. ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমান।
৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান।
৪. নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান।
৫. পরকালের প্রতি ঈমান।
৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান।

নিম্নে উপরোক্ত ৬টি বিষয় সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল :

আল্লাহ-এর উপর ঈমান

আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান বলতে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয় বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়াকে বুঝায়। যথা—

(ক) আল্লাহ্‌র সত্তা ও তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা।
(খ) আল্লাহর সিফাত অর্থাৎ তাঁর গুণাবলীতে বিশ্বাস করা
(গ) তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ্‌র সত্তা ও তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার অর্থ আল্লাহ আছেন, যিনি সারা বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সমগ্র জগতকে পরিচালনা করেন, যার হাতে সবকিছুর ক্ষমতা। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তারা নাস্তিক। তারা কাফের। যেমন : কম্যুনিষ্টগণ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তারা কাফের।

আল্লাহ আছেন তার বহু প্রমাণ রয়েছে। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজে গিয়ে সপ্তম আসমানের উপরে আল্লাহ্‌র কাছে গিয়েছেন এবং নিজ চোখে তাঁকে দেখে এসেছেন।

আল্লাহ আছেন এ সম্পর্কে কয়েকটি যুক্তি পেশ করা হল :

* একবার কতিপয় নাস্তিক গোছের লোক হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.)-এর কাছে এসে বলল, আল্লাহ আছেন তার প্রমাণ দেখান। তখন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, তোমরা আমাকে একটা বিষয় একটু ভাবতে দাও। কতিপয় লোক আমাকে এই মর্মে একটা সংবাদ দিল যে, একটা সমুদ্রে ব্যবসার মালামাল বোঝাই একটা নৌকা কোন মাঝি ছাড়াই আপনা-আপনি চলছে। নৌকাটি সমুদ্রের ঢেউ চিরে সম্মুখে অগ্রসর

হচ্ছে। নৌকাটির কোন মাঝি নেই। তারপরও সেটি আপনা-আপনি চলে তার গন্তব্যে পৌছে যাচ্ছে। একথা শুনে তারা ইমাম সাহেবকে বলল কোন বদ্ধ পাগল ছাড়া এমন কথা কেউ বলতে পারে না। কোন মাঝি ছাড়া নৌকা আপনা-আপনি চলতে পারে না। এটা অসম্ভব। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন : তাহলে এই মহা উর্ধ্বজগত ও অধঃজগত এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী এই বিশাল আসমান যমীন ও বিশাল সৃষ্টিরাজি এমনি-এমনি চলছে, তার কোন সৃষ্টিকর্তা নেই তা কী করে সম্ভব? তখন লোকগুলো লা-জওয়াব হয়ে ফিরে গেল। (فتح الملهم ج ۱)

* হযরত ইমাম শাফিই (রহ.) কে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এই দেখ তুত গাছের পাতা। এর প্রত্যেকটা পাতার স্বাদ ও গুণ একরকম। কিন্তু এই তুত গাছের পাতা রেশম পোকা আহার করলে সে পাতা রেশম হয়ে বের হয়, মধু পোকায় আহার করলে তা মধু হয়ে বের হয়ে আসে, গরু-ছাগলে আহার করলে গোবর হয়ে বের হয়, আর হরিণে আহার করলে মৃগনাভী কস্তুরী হয়ে বের হয়। অথচ বস্তু এক। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই সূক্ষ্ম কারিগরি কার? নিশ্চয়ই এর পেছনে একজন কারিগর রয়েছেন। তিনিই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। (فتح الملهم ج ۱)

* হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কী প্রমাণ আছে বলুন। তখন তিনি বলেন, আমি একটি ক্ষুদ্র আকারের মসৃণ দুর্গ দেখতে পাই, যা-তে আসা-যাওয়ার কোন পথ এমনকি কোন ছিদ্র পর্যন্ত ছিল না। তার উপরটা দেখতে রূপার ন্যায় শুভ্র আর ভিতরটা স্বর্ণের ন্যায়। তারপর এক সময় সে দুর্গটি বিদীর্ণ হয় এবং তার দেয়াল ফেটে ফুটফুটে একটি বাচ্চা বের হয়ে আসে। অর্থাৎ ডিমের ভিতর থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসে। (فتح الملهم ج ۱)

ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (রহ.) বোঝাতে চেয়েছেন যে, এমন একটি দুর্গ সদৃশ ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে সে তার শত্রু-মিত্রকে চিনতে সক্ষম হয়। তাই সে চিল-কাকের উপদ্রবকালে মায়ের ডানায় আশ্রয় নেয়। যে বাচ্চা ডিমের ভিতর কোন দানা-পানি দেখেনি, সে বের হয়ে এসেই নিজের খাদ্য চিনতে পারে। ডিমের ছিদ্রহীন বদ্ধ ঘরে এই বাচ্চাটিকে এতসব কে শিখালো? যিনি শিখিয়েছেন তিনিই আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টিকর্তা।

আল্লাহ্‌র সিফাত অর্থাৎ গুণাবলীতে বিশ্বাস করার অর্থ হল আল্লাহ্‌র যত গুণাবলী রয়েছে, কুরআন-হাদীছে যে সব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো

Scanned by CamScanner

সত্য। আল্লাহ্‌র গুণাবলী তাঁর গুণবাচক নামসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌র ৯৯টি সিফাত বা গুণবাচক নাম রয়েছে। আমরা পরে সেই সব সিফাত উল্লেখ করছি।

তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাস করার অর্থ হল আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তার ক্ষেত্রেও একক অর্থাৎ তাঁর সত্তায় কেউ শরীক নেই। তিনি তাঁর গুণাবলীর ক্ষেত্রেও একক অর্থাৎ তাঁর গুণাবলীতেও কেউ শরীক নেই। ইবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি একক, অর্থাৎ ইবাদতেও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না।

তাওহীদের বিপরীত হল শির্‌ক। অতএব একাধিক মা'বুদে বিশ্বাস করা শির্‌ক। যেমন খৃষ্টানগণ ত্রিত্ববাদ তথা তিন খোদায় বিশ্বাস করে। হিন্দুগণ ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুকে পালনকর্তা এবং মহাদেবকে সংহারকর্তা বলে বিশ্বাস করে। এভাবে তারা একাধিক ভগবানে বিশ্বাসী। হিন্দুগণ এ ছাড়াও আরও বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করে। তারা প্রায় ৩৩ কোটি দেবতায় বিশ্বাস করে। এ হল আল্লাহ্‌র সত্তায় শরীক করার উদাহরণ। আল্লাহ্‌র সত্তায় শরীক করা শির্‌ক।

এমনিভাবে আল্লাহর গুণাবলীতে কোন সৃষ্টিকে শরীক করাও শির্‌ক। যেমন : আল্লাহ্‌র একটি গুণ হল তিনি "রাজ্জাক" অর্থাৎ রিযিকদাতা। আর একটি গুণ হল তিনি "আল-মু'মিনু" অর্থাৎ নিরাপত্তা বিধায়ক ও বিপদ আপদ থেকে উদ্ধারকর্তা। এখন যদি কেউ কোন মানুষকে রিযিকদাতা বলে মনে করে বা কোন মানুষ সম্পর্কে মনে করে যে, তিনি বিপদ মোচন করতে পারেন, তাহলে সেটা হবে আল্লাহ্‌র গুণে শরীক করা। সেটা হবে শির্‌ক। যেমন : অনেক অজ্ঞ মানুষ মনে করে থাকে যে, অমুক পীর সাহেবের কাছে চাইলে তিনি আয়-ইনকামে বরকত দিতে পারেন বা অমুক পীর সাহেব হলেন মুশকিল কুশা বা বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারকারী, এরূপ মনে করলে সেটা হবে আল্লাহ্‌র গুণে শরীক করা। সেটা হবে শির্‌ক।

এমনিভাবে আল্লাহ্‌র সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করাও শির্‌ক। যেমন : হিন্দুগণ জলের অর্থাৎ গঙ্গার পূজা করে, রামের পূজা করে, কালি, দূর্গা ও স্বরস্বতী প্রভৃতির পূজা করে। খৃষ্টানগণ যীশুর পূজা করে। এটা শির্‌ক।

শির্‌ক এত জঘন্য গোনাহ যে, আল্লাহ তাআলা শির্‌কের গোনাহ মোটেই ক্ষমা করেন না। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ.

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শরীক করাকে কখনও ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্য গোনাহ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা : ৪৮)

আল্লাহ্র গুণবাচক ৯৯ টি নাম :

হাদীছে এসেছে :

اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اسْمًا (مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ) مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এই নামগুলি সংরক্ষণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

সংরক্ষণ করার অর্থ হল এই নামগুলি মুখস্থ রাখা ও মনে-প্রাণে এগুলি পাঠ করা এবং এই নামগুলির আলোকে নিজের মধ্যে চরিত্র গড়ে তোলা। নামগুলি নিম্নরূপ :

১. اَلْحَيُّ (আল-হাইয়ু)- চিরঞ্জীব;
২. اَلْقَيُّوْمُ (আল-কাইয়ুম)-স্বপ্রতিষ্ঠ, সংরক্ষণকারী;
৩. اَلْحَقُّ (আল-হাক্কু)- সত্য;
৪. اَلْاَوَّلُ (আল-আওয়ালু)-প্রথম অর্থাৎ অনাদি;
৫. اَلْاٰخِرُ (আল-আখিরু)-শেষ অর্থাৎ অনন্ত,
৬. اَلْبَاقِيْ (আল-বাকী)-চিরস্থায়ী;
৭. اَلظَّاهِرُ (আয্ যাহিরু)-প্রকাশ্য;
৮. اَلْبَاطِنُ (আল-বাতিনু)-গুপ্ত;
৯. اَلْعَلِيْمُ (আল-আলীমু)-মহাজ্ঞানী;
১০. اَلْخَبِيْرُ (আল-খবীরু)-সর্বজ্ঞ;
১১. اَللَّطِيْفُ (আল-লাতীফু)-সূক্ষ্ম;
১২. اَلْحَكِيْمُ (আল-হাকীমু) প্রজ্ঞাময়;
১৩. اَلْوَاسِعُ (আল-ওয়াছিউ)-সর্বব্যাপী;
১৪. اَلْمَالِكُ (আল-মালিকু)-অধিপতি, সম্রাট,
১৫. مَالِكُ الْمُلْكِ (মালিকুল মুল্ক)-সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক;
১৬. اَلْمُعِزُّ (আল-মুইয্যু) সম্মানদাতা;

১৭. اَلْمُذِلُّ (আল-মুযিল্লু)-অপমানকারী বা সম্মানহরণকারী;
১৮. اَلْخَافِضُ (আল-খাফিযু)-অবনতকারী;
১৯. اَلرَّافِعُ (আর্-রাফিউ)-উন্নয়নকারী;
২০. اَلْقَادِرُ (আল-ক্বাদিরু)-শক্তিশালী;
২১. اَلْمُقْتَدِرُ (আল-মুকতাদিরু)-পূর্ণ ও স্বয়ংক্রীয় শক্তির অধিকারী;
২২. اَلْقَوِيُّ (আল-কাবিয়্যু)-অসীম ও অটুট ক্ষমতার অধিকারী;
২৩. اَلْمَتِيْنُ (আল-মাতীনু)-সুস্থিত এবং অসম ক্ষমতার অধিকারী;
২৪. اَلْعَزِيْزُ (আল-আযীযু)-পরাক্রমশালী;
২৫. اَلْمَانِعُ (আল-মানিউ)-প্রতিরোধকারী;
২৬. اَلْقَهَّارُ (আল-কাহ্হারু)-মহাপরাক্রান্ত;
২৭. اَلْجَبَّارُ (আল-জাব্বারু)-প্রবলবিক্রমশালী;
২৮. اَلسَّمِيْعُ (আস্ সামীউ)-সর্বশ্রোতা;
২৯. اَلْبَصِيْرُ (আল-বাছীরু)-সম্যক দ্রষ্টা;
৩০. اَلْخَالِقُ(আল-খালিকু)- স্রষ্টা;
৩১. اَلْمُبْدِئُ (আল-মুবদিউ)- আদি স্রষ্টা;
৩২. اَلْبَارِئُ (আল-বারিউ)- উদ্ভাবনকর্তা;
৩৩. اَلْمُصَوِّرُ (আল-মুসাওবিরু)- আকৃতিদাতা;
৩৪. اَلْبَدِيْعُ (আল-বাদীউ)-নমুনাবিহীন সৃষ্টিকারী;
৩৫. اَلنُّوْرُ (আন্ নূরু)- জ্যোতির্ময়;
৩৬. اَلْهَادِيُّ (আল-হাদীউ)-পথ প্রদর্শক;
৩৭. اَلرَّشِيْدُ (আর-রাশীদু)- সত্যদর্শী;
৩৮. اَلْمُحْيِيُّ (আল-মুহ্য়ী)-জীবনদাতা;
৩৯. اَلْوَاحِدُ (আল-ওয়াহিদু)-একক;
৪০. اَلْاَحَدُ (আল-আহাদু)-এক অদ্বিতীয়;
৪১. اَلْمُقِيْتُ (আল-মুকীতু)-আহার্যদাতা;
৪২. اَلرَّزَّاقُ (আল-আর্‌রায্যাকু)- রিযিক্‌দাতা;
৪৩. اَلْبَاسِطُ (আল-বাসিতু)-সম্প্রসারণকারী;
৪৪. اَلْقَابِضُ (আল-কাবিযু)- সংকোচনকারী;

৪৫. اَلْفَتَّاحُ (আল-ফাত্তাহ্)- উন্মুক্তকারী:
৪৬. اَلْحَفِيْظُ (আল-হাফীয্)-সংরক্ষণকারী:
৪৭. اَلْمُؤْمِنُ (আল-মু'মিন্)-নিরাপত্তা বিধায়ক:
৪৮. اَلسَّلَامُ (আস্-সালাম্) নিরাপদ, শান্তিময়:
৪৯. اَلْمُهَيْمِنُ (আল-মুহাইমিন্)-রক্ষক:
৫০. اَلْوَالِيْ (আল-ওয়ালী)-অধিপতি; অভিভাবক;
৫১. اَلْوَكِيْلُ (আল-ওয়াকীল্)- কর্মবিধায়ক;
৫২. اَلْوَهَّابُ (আল-ওয়াহ্হাব্)- মহানুভবদাতা;
৫৩. اَلْكَرِيْمُ (আল-কারীম্)-উদারদাতা:
৫৪. اَلْغَنِيُّ (আল-গানিয়্যু)- অভাবমুক্ত: অমুখাপেক্ষী;
৫৫. اَلْمُغْنِيُّ (আল-মুগ্নীয়্)-অভাব মোচনকারী:
৫৬. اَلْوَاجِدُ (আল-ওয়াজিদ্)-প্রাপক:
৫৭. اَلنَّافِعُ (আন্নাফিউ')-কল্যাণকারী:
৫৮. اَلضَّارُّ (আয্যাররু)-অকল্যাণের মালিক:
৫৯ اَلْبَرُّ (আল-বার্রু)-নেকময়:
৬০. اَلْمُمِيْتُ (আল-মুমীত্)-মৃত্যুদাতা:
৬১. اَلْوَارِثُ (আল-ওয়ারিস্)-স্বত্বাধিকারী:
৬২. اَلْمُعِيْدُ (আল-মুঈদ্)-পুনঃসৃষ্টিকারী;
৬৩. اَلْبَاعِثُ (আল-বা'ইছু)- পুনরুত্থানকারী:
৬৪. اَلْجَامِعُ (আল-জামিউ)-একত্রীকরণকারী:
৬৫. اَلْحَسِيْبُ (আল-হাসীব্)-হিসাব গ্রহণকারী;
৬৬. اَلْمُحْصِيْ (আল-মুহ্সী)-পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণকারী;
৬৭. اَلشَّهِيْدُ (আশ-শাহীদ্)- প্রত্যক্ষকারী;
৬৮. اَلرَّقِيْبُ (আর্ রাকীব্)-পর্যবেক্ষণকারী;
৬৯. اَلْحَكَمُ (আল-হাকাম্)-মীমাংসাকারী;
৭০. اَلْعَدْلُ (আল-আদ্ল্)-ন্যায়নিষ্ঠ;
৭১. اَلْمُقْسِطُ (আল-মুক্সিত্)- ন্যায়পরায়ণ;
৭২. اَلشَّكُوْرُ (আশ্ শাকূর)- গুণগ্রাহী;

৭৩. اَلْوَلِيُّ (আল-ওয়ালিয়্যু)-সাহায্যকারী, বন্ধু, অভিভাবক;

৭৪. ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ (যুল জালালি ওয়াল ইক্রাম) আযমত ও জালালের অধিকারী, একরাম করনেওয়ালা ;

৭৫. اَلْوَدُوْدُ (আল-ওয়াদূদ্)-প্রেমময়;

৭৬. اَلْمُقَدِّمُ (আল-মুকাদ্দিমু)-অগ্রবর্তীকারী;

৭৭. اَلْمُؤَخِّرُ (আল-মুআখ্খিরু)-পশ্চাদবর্তীকারী;

৭৮. اَلْمُنْتَقِمُ (আল-মুন্তাকিমু)-শাস্তিদাতা;

৭৯. اَلصَّبُوْرُ (আস্ সাবূরু)- ধৈর্যশীল;

৮০. اَلْحَلِيْمُ (আল-হালীমু)-সহিষ্ণু;

৮১. اَلْعَفُوُّ (আল- 'আফুউ)- ক্ষমাকারী;

৮২. اَلْغَفَّارُ (আল-গাফ্ফারু) পরম ক্ষমাশীল;

৮৩. اَلْغَفُوْرُ (আল-গাফূরু)- পরম ক্ষমাকারী;

৮৪. اَلتَّوَّابُ (আত্-তাওয়াবু)-তওবা কবূলকারী;

৮৫. اَلْمُجِيْبُ (আল-মুজীবু)- কবূলকারী;

৮৬. اَلرَّحِيْمُ (আর রাহীমু)- অতি দয়ালু;

৮৭. اَلرَّحْمٰنُ (আর রাহ্মানু)-অত্যন্ত দয়াময়;

৮৮. اَلرَّءُوْفُ (আর্-রাউফু)-সীমাহীন দয়ালু ;

৮৯. اَلْقُدُّوْسُ (আল-কুদ্দূসু)-পবিত্র;

৯০. اَلْجَلِيْلُ (আল-জালীলু)-পূর্ণাঙ্গ মহিমাময় ;

৯১. اَلْمَجِيْدُ (আল-মাজীদু)-গৌরবময়;

৯২. اَلْمُتَكَبِّرُ (আল-মুতাকাব্বিরু)-সুউচ্চ, সমুচ্চ গৌরবময়তার অধিকারী;

৯৩. اَلْمُتَعَالِي (আল-মুতা'আলী)-সর্বোচ্চ মর্যাদাবান;

৯৪. اَلْمَاجِدُ (আল-মাজিদু)- এককতম মহান;

৯৫. اَلصَّمَدُ (আস্ সামাদু)-অনপেক্ষ;

৯৬. اَلْحَمِيْدُ (আল-হামীদু)-প্রশংসিত;

৯৭. اَلْكَبِيْرُ (আল-কাবীরু)-সর্বাধিক বড়ত্বের অধিকারী;

৯৮. اَلْعَلِيُّ (আল-আলিয়্যু)-সর্বোচ্চ মর্যাদাবান;

৯৯. اَلْعَظِيْمُ (আল-আযীমু)-সর্বোচ্চ মাহাত্মের অধিকারী;

আল্লাহ তা'আলার এই সব গুণবাচক নামসমূহ দ্বারা আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়।

পবিত্র কুরআন-হাদীছে উপরোক্ত ৯৯ টি নাম ছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলার আরও কিছু গুণবাচক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—

১. اَلرَّبُّ (আর রাব্বু)- প্রতিপালক; ২. اَلْمُنْعِمُ (আল মুন্‌ইমু)- নিয়ামত দানকারী ; ৩. اَلْمُعْطِي (আল্ মু'তী) দাতা ; ৪. اَلصَّادِقُ (আস্ সাদিকু)- সত্যবাদী ; ৫. اَلسَّتَّارُ (আস্ সাত্তারু)- গোপনকারী।

ফেরেশ্‌তা সম্বন্ধে ঈমান

মৌলিকভাবে যে ৬ টি বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখতে হয়, তার মধ্যে দ্বিতীয় বিষয় হল ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান রাখা।

ফেরেশতা সম্বন্ধে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা এক প্রকার নূরের মাখলূক সৃষ্টি করেছেন যারা পুরুষও নয় নারীও নয়। তারা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু থেকে মুক্ত। তারা নিষ্পাপ। তারা আল্লাহর আদেশের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করেন না। তারা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারেন। তারা সংখ্যায় অনেক। আল্লাহ তাআলা তাদের বিপুল শক্তির অধিকারী বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সৃষ্টি করে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। কতিপয় ফেরেশতা আযাবের কাজে নিযুক্ত আছেন। কতিপয় ফেরেশতা রহমতের কাজে নিযুক্ত আছেন। কতিপয় ফেরেশতা আমলনামা লেখার কাজে নিযুক্ত আছেন। তাদের "কিরামান কাতিবীন" বলা হয়। এমনিভাবে সৃষ্টির বিভিন্ন কাজে আল্লাহ তাআলা ফেরেশ্‌তাদের নিয়োজিত করে রেখেছেন।

ফেরেশতা আছেন তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতা দেখেছেন। বহু সাহাবী ফেরেশতা দেখেছেন। একটা ঘটনা শুনুন। আল্লাহ তা'আলার একটা পরিচয় হল তিনি আরহামুর রাহিমীন। অর্থাৎ সব দয়ালুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দয়ালু। আল্লাহ পাক এই নামের সাথে এক ফিরিশতা যুক্ত করে রেখেছেন। যখন কেউ বিপদাপদে পড়ে এই নামে আল্লাহকে ডাকবে তখন এই ফিরিশতা আসমানের উপর থেকে সরাসরি তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযি.) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি একবার তায়েফ সফরে গিয়েছিলেন। তায়েফ থেকে যখন ফিরে আসেন, তখন এক ডাকুর কবলে পড়েন। ডাকু

তাকে বলে আমি তোমার মালও নিয়ে নিব, তোমাকে হত্যাও করব। তখন ঐ সাহাবী আল্লাহকে ডাক দেন- –ইয়া আরহামার রাহিমীন! হে দয়ালুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দয়ালু! সাথে সাথে জোর আওয়াজে একটা চিৎকার ভেসে আসল لا تقتله অর্থাৎ তাঁকে হত্যা কর না! ভয়ংকর এই চিৎকার শুনে ডাকু ভয় পেয়ে যায়। সে চতুর্দিকে চেয়ে দেখে কেউ নেই। আবার সে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। সাহাবী আবার ঐ নামে আল্লাহকে ডাক দেন—ইয়া আরহামার রাহিমীন! আবার ঐ আওয়াজ ভেসে আসে—পূর্বের চেয়ে আরও জোরে শোনা যায়—তাকে হত্যা কর না। আবার ডাকু চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই। সে আবার তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। সাহাবী তৃতীয়বার ইয়া আরহামার রাহিমীন বলে আল্লাহ্কে ডাক দেন। তখন স্বশরীরে এক ব্যক্তি নেমে আসেন। ভয়ংকর তার আকৃতি, হাতে আগুনের বল্লম। সে ঐ বল্লম ডাকুর গায়ে নিক্ষেপ করে। বল্লমটি ডাকুর শরীর ভেদ করে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়। তখন সাহাবী সেই লোকটাকে জিজ্ঞেস করেন—আপনি কে? আপনার পরিচয় জানতে চাই। তখন তিনি বলেন, তুমি আল্লাহ্র যে নাম উচ্চারণ করেছ, আমি ঐ নামের সাথে নিয়োজিত ফিরিশতা। যখন কেউ বিপদে পড়ে এই নামে আল্লাহকে ডাকে, আমি তার সাহায্যে চলে আসি। প্রথমবার তুমি যখন ডাক দিয়েছিলে, তখন আমি সপ্তম আসমানের উপর ছিলাম। দ্বিতীয় বার যখন ডাক দিয়েছ, তখন আমি প্রথম আসমানে চলে এসেছি। তৃতীয়বার যখন তুমি ডাক দিয়েছ, তখন আমি দুনিয়াতে চলে এসেছি। (سیرت المصطفیٰ)

সাহাবায়ে কেরাম ফিরিশতাদের যুদ্ধে শরীক হওয়া স্বচক্ষে দেখেছেন। হযরত সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাযি.) বলেছেন : আমরা দেখেছি বদরের যুদ্ধের দিন আমাদের একজন সাহাবী কোন কাফেরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তার তলোয়ার ঐ কাফের পর্যন্ত পৌঁছার আগেই সেই কাফেরের কল্লা কেটে পড়ে গেছে। (سیرت المصطفیٰ)

ফেরেশ্তাদের মধ্যে চারজন প্রধান। যথা :

(এক) জিবরাইল ফেরেশ্তা : তিনি ওহী ও আল্লাহর আদেশ বহন করে নবীদের নিকট আসতেন। এছাড়া আল্লাহ তাআলা যখন তাকে যে নির্দেশ প্রদান করেন তিনি তা কর্তব্যরত ফেরেশ্তার নিকট পৌঁছে দেন।

(দুই) মীকাঈল ফেরেশ্তা : তিনি মেঘ প্রস্তুত করা, বৃষ্টি বর্ষানো এবং আল্লাহর নির্দেশে মাখলূকের জীবিকা সরবরাহের দায়িত্বে নিযুক্ত আছেন।

(তিন) ইসরাফীল ফেরেশ্তা : তিনি রূহ সংরক্ষণ ও সিঙ্গায় ফুৎকার দিয়ে দুনিয়াকে ভাঙ্গা ও গড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন।

(চার) আযরাঈল ফেরেশ্তা : জীবের প্রাণ হরণের কাজে নিযুক্ত তিনি। তাকে 'মালাকুল মউত'ও বলা হয়। রূহ কব্য করার সময় তাকে কারও কাছে আসতে হয়না বরং সারা পৃথিবী একটি গ্লোবের মত তার সামনে অবস্থিত, যার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায়, নিজ স্থানে থেকেই তিনি তার রূহ কব্য করে নেন। তবে মৃত ব্যক্তি নেককার হলে রহমতের ফেরেশ্তা আর বদকার হলে আযাবের ফেরেশ্তা মৃতের নিকট এসে থাকেন এবং মৃত ব্যক্তির রূহ নিয়ে যান।

নবী ও রাসূল সম্বন্ধে ঈমান

মৌলিকভাবে যে ৬ টি বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখতে হয়, তার মধ্যে তৃতীয় বিষয় হল নবী রসূলগণের প্রতি ঈমান রাখা।

জিন ও ইনছানের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে যে কিতাব প্রেরণ করেন, সেই কিতাবের ধারক বাহক বানিয়ে, সেই কিতাব বুঝানো ও ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য তথা আল্লাহর বাণী হুবহু পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং আমল করে আদর্শ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্টসংখ্যক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং জিন ও মানব জাতির নিকট তাঁদের প্রেরণ করেছেন। তাঁদের বলা হয় নবী ও রাসূল বা পয়গম্বর।

নবী ও রাসূলদের প্রতি প্রধানতঃ নিম্নোক্ত বিশ্বাস রাখতে হবে :

* নবীগণ মা'সূম অর্থাৎ নিষ্পাপ। তাঁদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হয় না। কেউ যদি কোন নবীর কোন দোষ বদনাম বলে বা তাঁদের সমালোচনা করে, তাহলে সে গোমরাহ।

* নবীগণ মানুষ, তাঁরা খোদা নন বা খোদার পুত্র নন বা খোদার রূপান্তর (অবতার) নন। কেউ যদি কোন নবী সম্পর্কে বলে যে, তিনি আল্লাহ্র পুত্র, তাহলে সে কাফের। যেমন খৃষ্টানরা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) বা যীশু আল্লাহ্র পুত্র। এটা কুফ্রী কথা।

* নবীগণ আল্লাহ তা'আলার বাণী হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন। এমন হয়নি যে, তাদের কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন বাণী এসেছে আর তাঁরা তা প্রকাশ না করে গোপন করে গেছেন। একশ্রেণীর ভণ্ড ফকীর আছে, তারা বলে কুরআনের ৩০ পারা জাহেরী আর ৩০ পারা বাতেনী। সাধারণ আলেমগণ এই বাতেনী ত্রিশ পারা সম্পর্কে কিছুই জানেন না, একমাত্র

Scanned by CamScanner

মারেফাতী ফকীররাই সেই ৩০ পারা সম্বন্ধে জানেন। এটা গোমরাহী কথা। এই শ্রেণীর মারেফাতী ফকীরগণ গোমরাহ এবং মূর্খ।

* নবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ.) এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী—আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তিনি খাতামুন্নাবী অর্থাৎ তাঁর পর আর কোন নবী আসবে না। তিনি শেষ নবী, কিয়ামত পর্যন্ত সকল দেশের সকল মানুষের নবী। অন্য কেউ নবী হওয়ার দাবী করলে সে ভণ্ড এবং কাফের। যেমন : কাদিয়ানী সম্প্রদায় বলে যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হল নবী। এ কারণে কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমান নয়, তারা কাফের।

* নবীগণ কবরে জীবিত। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কবরে জীবিত আছেন। তাঁর রওযার কাছে গিয়ে সালাম দেয়া হলে তিনি শুনতে পান এবং উত্তর প্রদান করে থাকেন। অন্য কোন স্থানে থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ সালাম পাঠ করা হলে নির্ধারিত ফেরেশ্তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তা পৌঁছে দেন।

* হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত পয়গম্বর এসেছেন, তাঁদের সকলেই হক ও সত্য পয়গম্বর ছিলেন, সকলের প্রতিই ঈমান রাখতে হবে। তবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর অন্য নবীর শরীয়ত রহিত হয়ে গিয়েছে, এখন শুধু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়ত ও তাঁর আনুগত্যই চলবে।

আমরা মুসলমানরা সব নবী-রাসূলকেই আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করি। তবে হ্যাঁ, সব নবী-রাসূলকে বিশ্বাস করার অর্থ এই নয় যে, আমরা সব নবী-রাসূলের আনীত কিতাবের অনুসরণ করব। আমাদের নবী হলেন শেষ নবী। আর নিয়ম হল যখন কোন পরবর্তী নবী নতুন কিতাব নিয়ে আগমন করেন তখন আগের নবীর কিতাবের বিধান রহিত হয়ে যায়। দুনিয়াতেও নিয়ম হল যখন কোন একটা পদে পরবর্তী কর্মকর্তা আসেন তখন তার কথাই চলে। পূর্ববর্তী জনের কথা চলে না। হ্যাঁ, পরবর্তী জন যদি আগের জনের চালু করা কথা বা কোন নিয়ম নীতি বহাল রাখেন, তাহলে সেটা চালু থাকে নতুবা চালু থাকে না। তাই সর্বশেষ নবী অর্থাৎ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর তার

অর্থাৎ কিতাব কুরআনের বিধানই চলবে। তাওরাত-ইঞ্জীল ইত্যাদি পূর্বের কোন কিতাবের বিধান এখন চলবে না। তাওরাত-ইঞ্জীল ইত্যাদি কিতাব নিজ নিজ যুগে কার্যকরী ছিল, কিন্তু কুরআন আসার পর সেগুলির কার্যকারিতা রহিত হয়ে গেছে। তদুপরি বর্তমানের তাওরাত-ইঞ্জীল বিকৃত। আসল তাওরাত-ইঞ্জীল দুনিয়ার কোথাও নেই।

* নবীদের সত্যতা প্রমাণিত করার জন্য অনেক সময় তাঁদের দ্বারা অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এসব অলৌকিক ঘটনাকে 'মু'জিযা' বলে। মু'জিযায় বিশ্বাস রাখতে হবে। এটাও ঈমানের অঙ্গীভূত।

যুগে যুগে নবীদের দ্বারা বহু মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন : বাদশাহ নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ.) কে নির্মমভাবে হত্যা করার জন্য সুদীর্ঘ ছয় মাস ধরে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে সেই আগুনে তাঁকে নিক্ষেপ করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) দীর্ঘ চল্লিশ দিন সেই আগুনে ছিলেন। কিন্তু আগুনে তিনি মারা যাননি বরং আগুন তাঁর জন্য ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মু'জিযা। হযরত মূসা (আ.) ফিরআউনের নির্যাতন থেকে বনী ইসরাঈলকে বাঁচানোর জন্য রাতের বেলায় সমস্ত বনী ইসরাঈলের লোকজনকে নিয়ে মিসর থেকে রওনা দিয়েছিলেন। পথিমধ্যে লোহিত সাগর সামনে এসে গিয়েছিল। তারা সাগরের কাছে এসে পৌঁছেছেন এরই মধ্যে টের পেয়ে ফিরআউন তার লোক-লশকরসহ সেখানে এসে পৌঁছেছে। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করলেন। সমুদ্রের পানি ফাঁক হয়ে মাঝখানে রাস্তা বের হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের লোকজনসহ সেই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেলেন। ফিরআউন তার লোকজনসহ সেই রাস্তা দিয়ে পার হতে চাইল। তারা মাঝখানে যাওয়ার পর সাগরের পানি মিলে গেল। ফিরআউন তার লোক লশকরসহ ডুবে মারা গেল। এটা ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা।

নবীগণের কয়েকটি মু'জিযা

হযরত মূসা (আ.)-এর হাতের লাঠি ছেড়ে দিলে সাপ হয়ে যেত। এটাও ছিল তার মু'জিযা। হযরত ঈসা (আ.)-এর দু'আয় মৃত জীবিত হয়ে যেত। তিনি কুষ্ঠরোগীর গায়ে হাত বুলালে সেই রোগী ভাল হয়ে যেত। জন্মান্ধের চোখে হাত বুলিয়ে দিলে তার চোখ ভাল হয়ে যেত। এগুলো ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর মু'জিযা। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। এক সফরে নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গীদের কাছে পানি ছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য একটু পানি একটা পাত্রে রেখে সেই পাত্রে হাত রাখলেন। তাঁর হাত মুবারকের আঙ্গুলের ফাঁক থেকে ঝর্ণার মত পানি ফুটে বের হতে থাকল। সফরসঙ্গী সকলে সেই পানি দিয়ে তাদের প্রয়োজন সেরে নিলেন। সেই সফরে প্রায় ১৪ শত লোক ছিলেন। এরকম বহু মু'জিযা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মে'রাজের ঘটনা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক বিরাট মু'জিযা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কারও থেকে একটা অক্ষর পর্যন্ত শিক্ষা করেননি, তা সত্ত্বেও তার জবান থেকে কুরআনের মত এক মহা জ্ঞানভাণ্ডার প্রকাশিত হয়েছে। এটা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযা। এই এক কুরআনই তাঁর সত্য নবী হওয়ার দলীলের জন্য যথেষ্ট। এছাড়াও তাঁর নবুওয়াত সত্য-এর পক্ষে হাজার হাজার দলীল প্রমাণ রয়েছে। উলামায়ে কেরাম এসব প্রমাণগুলোকে একত্রিত করে দেখিয়েছেন, যার সংখ্যা প্রায় তিন হাজারের মত দাঁড়ায়। এই সবগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, সাধারণ মানুষ নন। যাহোক, নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস রাখার মধ্যে তাঁদের মু'জিযাকে বিশ্বাস করাও অন্তর্ভুক্ত। যারা কুরআন-হাদীছের সুস্পষ্ট বর্ণনায় প্রমাণিত মু'জিযাকে অস্বীকার করে তাদের ঈমান থাকে না।

আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে ঈমান

মৌলিকভাবে যে ৬টি বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখতে হয়, তার মধ্যে চতুর্থ বিষয় হল আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের প্রতি ঈমান রাখা।

আল্লাহ তা'আলা মানব ও জিন জাতির হেদায়েত এবং দিক-নির্দেশনার জন্য নবীদের মাধ্যমে তাঁর বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়ে থাকেন। এই বাণী ও আদেশ-নিষেধের সমষ্টিকে বলা হয় কিতাব। আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার মধ্যে অনেকগুলো ছিল সহীফা অর্থাৎ কয়েক পাতার কিতাব—ছোট পুস্তিকা। এক বর্ণনামতে সর্বমোট ১০৪ খানা কিতাব প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে চারখানা হল বড় কিতাব। যথা :

(এক) তাওরাত বা তৌরীত : যা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর নাযিল হয়।

(দুই) যবূর : যা হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর নাযেল হয়।

(তিন) ইঞ্জীল : যা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর নাযিল হয়।

উল্লেখ্য, আল্লাহর প্রেরিত আসল ইঞ্জীল দুনিয়ার কোথ
ইঞ্জীল বা বাইবেল নামে যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তা মূলত
আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্ব আকাশে উঠিয়ে নেয়ার বহু বৎস
রচনা ও সংকলন করেছিল। তারপর যুগে যুগে বিভিন্ন পাদ্রী
তাতে বহু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করেছে। ফলে
আর আসমানী ইঞ্জীল বলে মেনে নেয়া যায় না বরং এ হ
বিকৃত এবং মানবরচিত ইঞ্জীল-আসমানী ইঞ্জীল নয়।
কেরাম বহুবার ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে,
ভাষায় তাওরাত-ইঞ্জীল নাযেল হয়েছিল তার একটা
তাওরাত ইঞ্জীলের একটা কপি দেখাও, কিন্তু তারা তা দেখ

(চার) কুরআন : যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ
ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়। কুরআনকে আল-কুর
ফুরকান এবং আল-ফুরকানও বলা হয়।

* আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন হল সর্বশ্রে
সর্বশেষ কিতাব—এর পর আর কোন কিতাব নাযিল হ
হিফাযতের জন্য আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন, কা
কেউ করতে পারবে না। কুরআন সর্বদা অবিকৃত এ
হবে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি
হয়েছিল এখনও সেই কুরআনই অবশিষ্ট আছে এবং কেয়া

আখেরাত সম্বন্ধে ঈমান

মৌলিকভাবে যে ৬টি বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখতে হ
বিষয় হল আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখা।

আখেরাত বা পরকালে বিশ্বাস করার অর্থ হল মৃত্যুর
কবর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, হাশর-নশর ও তার
এবং জান্নাত-জাহান্নাম ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়—যেগু
আনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে তার সবকিছুতেই বিশ্বাস করা।
মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে বিশ্বাস রাখতে হবে।

(এক) কবরের সওয়াল-জওয়াব সত্য

কবরে প্রত্যেক মানুষের সংক্ষেপে কিছু পরীক্ষা হ
হয়েছে—প্রথম যখন মাইয়্যেতকে কবরে রাখা হয়, ত

নামক দুইজন ফেরেশতা কবরে আসেন। 'মুনকার-নাকীর' শব্দের অর্থ হল অপরিচিত, অদ্ভুত ও বিকট আকৃতির। এই ফেরেশতারা এসে শোয়া থেকে তাকে উঠাবে, উঠিয়ে তাকে তিনটা প্রশ্ন করবে। এক নং প্রশ্ন مَنْ رَّبُّكَ অর্থাৎ তোমার রব কে? দুই নং প্রশ্ন مَا دِيْنُكَ অর্থাৎ তোমার দ্বীন ধর্ম কী? তিন নং প্রশ্ন হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে বলা হবে مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ অর্থাৎ এ ব্যক্তি কে? যদি সে নেককার হয়, তাহলে ঐ ফেরেশতারা যত ভয়াবহ আকৃতির হোক না কেন তাতে সে ঘাবড়াবে না। সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। সে উত্তর দিবে আমার রব হলেন আল্লাহ, আমার দ্বীন হল ইসলাম আর এই ব্যক্তি, যাকে দেখানো হয়েছে, ইনি হলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই জওয়াব দেয়া তার জন্য আসান হয়ে যাবে। কাফের-মুনাফিকরা মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তাদের উপর কবরের আযাব শুরু হবে। জাহান্নামের সাথে তাদের কবরের যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়া হবে। জাহান্নামের আগুনের তাপ এবং দুর্গন্ধ তাদের কবরে আসতে থাকবে। এর বিপরীত যারা নেককার মানুষ তারা মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার পর জান্নাতের সাথে তাদের কবরের যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়া হবে। জান্নাতের হাওয়া এবং ঘ্রাণ তাদের কবরে আসতে থাকবে। তাদের বলা হবে :

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لَا يُوْقِظُهٗ اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهٖ اِلَيْهِ۔ (مشكاة عن الترمذى)

অর্থাৎ এখন তুমি আরামে ঘুমাও। নতুন বিবাহ করলে নতুন দম্পতি যেমন মনের সুখ নিয়ে ঘুমায় ওরকম সুখ নিয়ে তুমি ঘুমাও। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এক ঘুমে তাদের সময় পার হয়ে যাবে। যখন কবর থেকে উঠানো হবে তখন তাদের কাছে মনে হবে এইতো কেবল মাত্র নিদ্রা গেলাম আর সাথে সাথে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হল? যদিও ইতিমধ্যে হাজার হাজার বৎসরও অতিবাহিত হয়ে গিয়ে থাকবে।

কবরে মুনকার-নাকীরের সওয়ালের জওয়াব দেয়া আসান হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলেছেন :

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ۔

অর্থাৎ যারা শাশ্বত বাণীতে (অর্থাৎ কালেমায়) বিশ্বাসী, আল্লাহ তাদের দুনিয়া এবং আখেরাতে এই কালিমার উপরে অর্থাৎ ঈমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। (সূরা ইবরাহীম : ২৭)

এ আয়াতের এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে পরকালে তাদের ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হল কবরে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা। যার ফলে তারা আসানী-র সাথে মুনকার-নাকীরের সব প্রশ্নের জওয়াব দিতে সক্ষম হবে। এ থেকে বোঝা গেল মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের জওয়াব আসান হওয়ার জন্য বেঁচে থাকতে ঈমান-আমলের উপর মজবুত থাকতে হবে। হযরত শাকীক বলখী (রহ.) বলেছেন : কেউ যদি বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করে তাহলে মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের জওয়াব দেয়া তার জন্য আসান হবে।

(দুই) কবরের আযাব সত্য

কবর বলতে বুঝায় মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালীন জগতকে। এ জগতকে কবর জগৎ, আলমে বরযখ বা বরযখের জগৎ বলা হয়। কবরে নেককার লোকদের বিভিন্ন রকম শান্তির উপকরণ দ্বারা আরাম পৌছানো হবে এবং বদকারদের বিভিন্ন রকম শাস্তি প্রদান করা হবে। এই কবরের আযাব সত্য। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে নসীহত নং ৮-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(তিন) পুনর্জীবিত হওয়া ও হাশর ময়দানের অনুষ্ঠান সত্য

কিয়ামতের সময় সিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার আল্লাহ্‌র হুকুমে একসময় সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হলে আদি-অন্তের সব জিন-ইনসান ও যাবতীয় প্রাণী পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার জন্য হযরত ইসরাফীল (আ.)কে নিযুক্ত রাখা হয়েছে। তিনি শিঙ্গায় ফুঁক দিলে সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। কেমন হবে এই শিঙ্গা তা যথার্থভাবে আল্লাহ পাকই জানেন। হাদীছে সে সম্বন্ধে সামান্য একটু বর্ণনা পাওয়া যায়। এই শিঙ্গার ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র থাকবে। প্রত্যেকটা ছিদ্রে আল্লাহ তা'আলা যত জিন-ইনসান পয়দা করেছেন সকলের রূহ থাকবে। যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এর আওয়াজের প্রচণ্ডতায় সব রূহ বেহুঁশ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক বলেন :

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔

অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন আসমান-যমীনের সকলে হুঁশহারা হয়ে যাবে। এটা হল প্রথম বার ফুঁক দেয়ার পরের অবস্থা। যখন দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে তখন সকলে মারা যাবে। তারপর তৃতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে, তখন সকলে আবার জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে উঠবে। (সূরা যুমার : ৬৮)

Scanned by CamScanner

যারা ঈমানদার তাদের মনে কিয়ামত হওয়া এবং মরার পরে আবার যিন্দা হওয়া সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জাগে না। আর যারা অবিশ্বাসী, তাদের মনে নানান প্রশ্ন দেখা দেয়, কাফেরদের এরকম সন্দেহের উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ؟

অর্থাৎ আমরা মরে যখন পঁচে-গলে সব মাটি হয়ে যাব, মাটির সাথে মিশে যাব, তার পরেও আবার আমাদের যিন্দা করা হবে ? এটা কীভাবে সম্ভব? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন :

قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

অর্থাৎ হে নবী! তুমি ওদের বলে দাও—প্রথমবার যিনি সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই আবার সৃষ্টি করে পুনরুত্থিত করবেন।

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে, প্রথমবার তিনি যখন সৃষ্টি করেছিলেন তখন তার সামনে কোন নমুনাই ছিল না। নমুনা ছাড়াই যখন প্রথমবার সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তখন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাতো আরও সহজ। কাজেই প্রথমবার যিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন দ্বিতীয়বার তিনি সৃষ্টি করতে পারবেন না এরকম সন্দেহেরই অবকাশ নেই। তাছাড়া মানুষ মরে পঁচে-গলে মাটি হয়ে গেলেও তার দেহের অংশ বিলীন হয়ে যায় না। তার দেহের অংশগুলো যেখানেই যেভাবে থাকুক না কেন আল্লাহ পাক হুকুম দিবেন তখন সব অংশগুলো একত্রিত হয়ে যাবে।

কিয়ামতের ভয়াবহতা এমন হবে যে, কুরআনে বলা হয়েছে : যদি কোন মহিলার গর্ভ থাকে, তাহলে তার গর্ভপাত হয়ে যাবে, দুশ্চিন্তায় যুবক বৃদ্ধ হয়ে যাবে, মানুষকে দেখাবে সবাই যেন মাতাল অবস্থায় আছে, বেহুশ অবস্থায় আছে। কিন্তু আসলে তারা মাতাল নয়। হয়রানি, পেরেশানী, ভয়াবহতা, বিভীষিকার এমন অবস্থা হবে যে, সকলকে তখন অস্বাভাবিক মনে হবে।

এক হাদীছে এসেছে : কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে যখন সবাই পেরেশান, হতাশ এবং মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে, সেই সময় যারা দুই ঈদের রাতে ইবাদত করে, তারা নিশ্চিন্ত থাকবে, তাদের মনে কোন পেরেশানী থাকবে না। ময়দানে হাশরের ভয়াবহতায় তাদের দিল ঘাবড়াবে না। দুই ঈদের রাত খুশির দুই রাত, আনন্দের রাত। এ সময়ে যারা আল্লাহকে স্মরণ

করবে, আল্লাহ পাক সবচেয়ে পেরেশানীর দিন তাদের পেরেশানী থেকে মুক্ত রাখবেন এবং আনন্দিত রাখবেন।

ময়দানে হাশরের আর একটা ভয়াবহ অবস্থা হল—যখন সূর্য মানুষের কাছে চলে আসবে। প্রচণ্ড গরমে এবং পেরেশানীতে মানুষের এত পরিমাণ ঘাম ছুটবে যে, হাদীছে এসেছে কারও কারও ঘাম তাদের পায়ের টাখনু গিরা পর্যন্ত হয়ে যাবে। কারও কারও হাঁটু পর্যন্ত হয়ে যাবে। কারও কারও মুখ পর্যন্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেকের পাপ অনুসারে ঘাম কম-বেশী হবে। এই গরম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তখন সেই ছায়ার প্রয়োজন হবে। বোখারী ও মুসলিমের হাদীছে এসেছে—তখন সাত শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া লাভ করতে পারবে।

১. ন্যায়-পরায়ণ সম্রাট।

২. যৌবনকালে যারা ইবাদত করে।

৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর আবার মসজিদে আসা পর্যন্ত যাদের অন্তর মসজিদের সাথে লাগানো থাকে।

৪. যারা আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসে।

৫. নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে যাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে।

৬. আল্লাহর ভয়ে যারা সুন্দরী নারীর অপকর্মের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে।

৭. যারা সম্পূর্ণ এখলাস নিয়ে দান-সদকা করে।

(চার) আল্লাহর বিচার ও হিসাব-নিকাশ সত্য

হাশরের ময়দানে সকলকে আল্লাহ তা'আলার বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহর কাছে সকলের বিচার হবে। তাঁর কাছে সমস্ত আমলের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। এই হিসাব-নিকাশ সত্য। এটা বিশ্বাস করতে হবে।

আমলনামার লেখা অনুযায়ী যদি হিসেব দিতে হয় অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হয়, তাহলে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হবে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে:

مَنْ نُوْقِشَ فِي الْحِسَابِ يَهْلِكْ. (متفق عليه)

অর্থাৎ যার পুঙ্খানুপুঙ্খ, পাই-টু-পাই হিসাব নেয়া হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহর কাছে এরকম হিসেব যেন দিতে না হয়, বরং বিনা হিসেবে যেন জান্নাতে যাওয়া যায়, তার জন্য দু'আ করা চাই। বিনা

Scanned by CamScanner

হিসাবে জান্নাত পাওয়ার জন্য যে সব আমলের কথা কুরআন-হাদীছে বলা হয়েছে সে সব আমল করা চাই।

কুরআন-হাদীছ থেকে জানা যায় কয়েক শ্রেণীর মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাত লাভ করতে পারবে। এক শ্রেণীর মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। আমরা যেন এই কাতারে পৌঁছতে পারি, তার চেষ্টা করতে হবে। এর চেষ্টা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের মানুষ হয়ে যেতে হবে। যে যত বেশী সুন্নাতের প্রতি যত্নবান হবে, সুন্নাতের সাথে যার যত বেশী মহব্বত হবে, সে তত বেশী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের মানুষ হবে। সে তত বেশী সুপারিশ লাভ করতে পারবে।

কিয়ামতের দিন উলামায়ে কেরামকেও সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে, হাফেজদেরকেও সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে, তারা আপনজনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিতে পারবেন। আমরা এ লাইনেও ব্যবস্থা করে রাখি। সন্তানকে হাফেজ, আলেম বানাই। সন্তানকে হাফেজ-আলেম বানাতে না পেরে থাকলে নাতী-পোতাদের হাফেজ-আলেম বানাই। আলেমের পিতা-মাতা না হতে পারলে, হাফেজ-আলেমের দাদা-দাদী, নানা-নানী হওয়ার চেষ্টা করি তাদের বংশধর হিসেবে যদি সুপারিশ পেয়ে জান্নাত লাভ করতে পারি।

আর এক শ্রেণীর লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে যেতে পারবে। তারা হল ঐসব লোক, যারা যত্নের সাথে তাহাজ্জুদের নামায পড়েন। কুরআন শরীফে খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মু'মিনদের একটা বিশেষ গুণ বলা হয়েছে :

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ.

অর্থাৎ তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে আলাদা থাকে। (সূরা সাজদাহ : ১৬)

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এখানে ঐ সব লোকদের বোঝানো হয়েছে, যারা তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। ইব্‌নে কাছীরের এক রেওয়ায়েতে আছে—হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ সব লোককে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেয়া হবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের বিনা হিসেবে জান্নাতে পৌঁছে দিবেন।

আর এক শ্রেণীর লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। তারা হল পূর্ণাঙ্গ তাওয়াক্কুলের অধিকারী লোক। মুসলিম শরীফের এক হাদীছে এসেছে—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন : আমার উম্মতের কিছু

লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে পৌছে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ তারা কারা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَرْقُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

এ হাদীছের সারার্থ হল—তারা ঐ সমস্ত লোক, আল্লাহর উপরে যাদের চরম তাওয়াক্কুল থাকে। যারা বিপদে পড়ে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করে চলে, সব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে চলে।

(পাঁচ) নেকী ও বদীর ওজন সত্য

কিয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য মীযান বা দাড়িপাল্লা (মাপযন্ত্র) স্থাপন করা হবে এবং তার দ্বারা নেকী-বদী ওজন করা হবে ও ভাল-মন্দ এবং সৎ-অসতের পরিমাপ করা হবে।

'মুস্তাদরাক' কিতাবে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কেয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্য এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা বা ওজনের যন্ত্র স্থাপন করা হবে যে, তা-তে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলেও এগুলোর সংকুলান হয়ে যাবে।

ছোট-বড় সব নেকী-বদী ওজন হওয়ার পর যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তারা হবে জান্নাতী আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে, তাদের জাহান্নামে যেতে হবে। তবে ঈমান থাকলে পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তারা জান্নাতে যেতে পারবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝.(سورة القارعة)

অর্থাৎ যার নেকের পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন-যাপন করবে, আর যার নেকের পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হল হাবিয়া নামক দোযখ।

অতএব মুক্তি পাওয়ার জন্য নেকীর পাল্লা ভারী করার চেষ্টা করতে হবে। ফরয-ওয়াজিব হুকুম-আহকাম পালন করার সাথে হাদীছে বেশ কিছু এমন আমলের কথা বলা হয়েছে, দাঁড়িপাল্লায় যার ওজন খুব বেশী হবে। তার মধ্যে একটা হল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এর ওজন সবচেয়ে বেশী হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্‌র নামের তুলনায় কোন বস্তুই ভারী হতে পারে না।[১]

১. মাযহারী ৷

তাই বেশী বেশী এই কালিমা পাঠ করা চাই। বোখারী শরীফের শেষ হাদীছে এসেছে : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۔ বাক্য দুটিও দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী হবে এবং এ বাক্য দুটি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : "সুবহানাল্লাহ" বললে আমলের দাঁড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায় আর "আল হামদুলিল্লাহ" বললে বাকী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়।[১] তাই বেশী বেশী সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ পাঠ করা চাই। আর এক হাদীছে এসেছে—সৎ চরিত্র এবং মৌনতা অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা—এদুটিও ওজনে অনেক ভারী। আর এক হাদীছে এসেছে সৎ চরিত্রের ওজন আমলনামায় সবচেয়ে বেশী হবে। এভাবে নেকীর পাল্লা ভারী করার জন্য বিভিন্ন আমলের কথা বলা হয়েছে। মুক্তি পাওয়ার জন্য এসব আমলও করা চাই।

(ছয়) আমলনামার প্রাপ্তি সত্য

কিয়ামতের ময়দানে আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে। প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে গিয়ে পড়বে এবং প্রত্যেকে তার জীবনের ভাল-মন্দ যা কিছু করেছে সব তা-তে লিখিত অবস্থায় পাবে। নেককারের আমলনামা তার ডান হাতে গিয়ে পৌঁছবে, আর বদকারের আমলনামা তার বাম হাতে গিয়ে পড়বে।

এই আমলনামা এমন অদ্ভুত আমলনামা যে, মানুষের জীবনের কোন কিছু তার মধ্যে লিপিবদ্ধ হতে বাকি থাকে না। কিয়ামতের দিন আমলনামা হাতে আসার পর প্রত্যেকেই বুঝবে আল্লাহ্‌র থেকে কোন কিছু গোপন করা সম্ভব হয়নি। কুরআন শরীফে এসেছে তখন মানুষ আশ্চর্য হয়ে বলবে :

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا.

অর্থাৎ কি অদ্ভুত আমলনামা! আমার জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন বিষয় বাদ যায়নি! তারা যা কিছু করেছে সবকিছু তা-তে মওজুদ পাবে। তোমার প্রতিপালক কারও প্রতি অবিচার করেন না। (সূরা কাহ্ফ : ৪৯)

যাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে, তারা খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যাবে যে, আমার জীবনের কোন ক্ষুদ্র নেকীও বাদ পড়েনি; সব লিখে রাখা হয়েছে। তারা খুশীতে তাদের আমলনামা মানুষকে দেখাতে থাকবে এবং বলতে থাকবে :

১. মাআরিফুল কুরআন।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.

অর্থাৎ এই দেখুন আমার আমলনামা। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর কাছে সবকিছুর হিসাব-নিকাশ হবে, (আমি আমার বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করেছি।) সে আনন্দময় জীবন যাপনে থাকবে। (সূরা হাক্কা : ১৯-২১)

আর যারা পাপী, যাদের আমলনামা বাম হাতে আসবে, তারা দুঃখে বলতে থাকবে :

يٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ۝ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ.
مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۝ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ۝ (الحاقة. ٢٩-٢٥)

অর্থাৎ হায় আফসোস যদি এই আমলনামা আমার হাতে দেয়াই না হত! আমার হিসাব যদি আমি না-ই জানতাম!! দুনিয়ার জীবন যদি আমার শেষ জীবন হত, এই জীবনের সম্মুখীন যদি আমাকে হতে না হত! আমার কোন কিছুইতো কাজে আসল না, কত ধন-সম্পদ ছিল তা কোন কাজে আসল না, কত ক্ষমতা ছিল কিছুইতো কাজে আসল না! এভাবে সে বিলাপ করতে থাকবে এবং আল্লাহর কাছে আবেদন করতে থাকবে :

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আর একটি বার দুনিয়ায় যাওয়ার সুযোগ দাও, আমি ভাল মানুষ হয়ে যাব। একটি বার অন্ততঃ আমায় সুযোগ দাও। (সূরা সাজদা : ১২)

হাদীছে এসেছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বলা হবে :

قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.

অর্থাৎ আমার আগেই সিদ্ধান্ত জানানো ছিল যে, দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার আর কাউকে পাঠানো হবে না। এ সিদ্ধান্ত তো তোমরা জেনেছ, জেনে-শুনেও তোমরা পাপের যিন্দেগী বানিয়েছ। অতএব, আজ কোন উপায় নেই।

আমাদের আমলনামা লেখার জন্য আল্লাহ পাক সদা জাগ্রত, সদা সতর্ক লেখকদল নিয়োজিত করে রেখেছেন। আমরা যা কিছুই করি না কেন সেই ফেরেশতারা সবকিছু লিখে রাখছেন। সেই ফেরেশতাদের বলা হয় কিরামান কাতিবীন। কাতিবীন শব্দের অর্থ লেখকদল, আর "কিরামান" শব্দের অর্থ হল সম্মানিত, অতএব "কিরামান কাতিবীন" অর্থ 'সম্মানিত' লেখকগণ।

অনেকে মনে করেন কিরামান এক ফেরেশতার নাম, কাতিবীন আর এক ফেরেশতার নাম। কিরামান ফিরিশতা থাকেন ডান দিকে, আর কাতিবীন

ফেরেশতা থাকেন বাম দিকে; এটা ভুল ধারণা। "কিরামান কাতিবীন"-এর অর্থ হল সম্মানিত লেখকগণ। তাঁরা সংখ্যায় অনেক। প্রত্যেকের সাথে দুইজন করে থাকেন—এমন কথা নয়। তাঁদের সম্মানিত বলার কারণ, হল তাঁরা আমাদের সঙ্গে সম্মান পাওয়ার আচরণ করেন। মানুষ যখন কোন গোনাহের কাজের ইরাদা করে, তখন তারা সাথে সাথে গোনাহ লেখেন না। এমনকি গোনাহ করার পরেও কিছুক্ষণ সময় দেয়া হয় দেখি তওবা করে কি-না। এর বিপরীত মানুষ কোন নেক কাজের ইরাদা করলেই অর্থাৎ মনে মনে নেক কাজের ইচ্ছা করলেই সাথে সাথে একটা নেকী লিখে দেন। আর সেই নেক কাজ করা সম্পন্ন হলে দশগুণ ছওয়াব লিখে দেন। আল্লাহ্র ফয়সালাতেই এরকম করা হয়। তবুও কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাগণ আমাদের সাথে এই আচরণ করেন, এ জন্যই তাঁরা আমাদের থেকে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। তাই তাঁদের কিরামান কাতিবীন বা সম্মানিত লেখকদল বলা হয়।

(সাত) হাউযে কাউছার সত্য

এই উম্মতের মধ্যে যারা পূর্ণভাবে সুন্নাতের পায়রবী করবে, কিয়ামতের ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একটি হাউয থেকে পানি পান করাবেন, যার ফলে আর তাদের পিপাসায় কষ্ট দিবে না। এই হাউযকে বলা হয় হাউযে কাউছার।

ময়দানে হাশরের একটা ভয়াবহ অবস্থা হল মানুষ প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর হয়ে পড়বে। তখন যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপরে মহব্বতের সাথে আমল করেছিল তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউযে কাউছারের থেকে পানি পান করাবেন। হাদীছে এসেছে :

مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يَظْمَأُ أَبَدًا۔ (متفق عليه)

অর্থাৎ যে একবার এই হাউযে কাউছারের শরবত পান করবে, তার আর কখনও পিপাসা লাগবে না।

এই হাউযে কাউছারের পানি পান করতে পারবে ঐ সব লোক, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক যিন্দেগী চালায়। যারা বেদআত, কুসংস্কারের অনুসরণ করে, তারা হাউযে কাউছার থেকে বঞ্চিত হবে।

(আট) পুলসিরাত সত্য

হাশরের ময়দানের চতুর্দিক জাহান্নাম দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে। এই জাহান্নামের উপর একটি পুল স্থাপন করা হবে, যা চুলের চেয়ে সরু এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো হবে। এটাকে বলা হয় পুলসিরাত। সকলকেই এই পুল পার হতে হবে।

দাঁড়িপাল্লায় ওজনের মাধ্যমে হিসাব-নিকাশের পালা শেষ হওয়ার পর পুলসিরাত পার হতে হবে। পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে যেতে হবে। পুলসিরাত হল সিরাতে মুসতাকীমের প্রতীকী পুল। কিয়ামতের দিন এই সিরাতে মুসতাকীমকেই অন্য রূপ দিয়ে পুলসিরাত বানিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যদি আমরা সিরাতে মুসতাকীমের উপরে অর্থাৎ সঠিক পথের উপর থাকি, তাহলে কিয়ামতের দিনও পুলসিরাতের উপর টিকে থাকতে পারব, পুলসিরাত পার হতে পারব। যারা দুনিয়াতে সিরাতে মুসতাকীম-এর উপরে টিকে আছে, তারা আখেরাতেও পুলসিরাতের উপরে টিকে থাকতে পারবে। যারা সিরাতে মুসতাকীমের উপর দিয়ে সারা জীবন পরিচালিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর দিয়ে পুরো পথ পার হয়ে যেতে পারবে। যে দুনিয়াতে সিরাতে মুসতাকীম-এর উপর যেভাবে চলেছে, পরকালে পুলসিরাতের উপর দিয়ে সে ঐভাবে অতিক্রম করে যাবে। হাদীছে এসেছে মানুষের আমল অনুযায়ী কেউ বিদ্যুৎ গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়-সওয়ারের মত পার হয়ে যাবে, কেউ দৌড়ে পার হবে, কেউ হেঁটে পার হবে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে সিরাতে মুসতাকীমের উপর যে যেভাবে চলছে পুলসিরাতের উপরেও সেভাবে চলতে পারবে। আর যারা দুনিয়াতে সিরাতে মুসতাকীম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে, তারা কেয়ামতের দিন পুলসিরাত থেকে বিচ্যুত হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে।

(নয়) শাফা'আত সত্য

পরকালে রাসূল (সাঃ), আলেম, হাফেজ প্রমুখদের বিভিন্ন পর্যায়ে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক প্রকারের শাফা'আত বা সুপারিশ করবেন।

(দশ) জান্নাত বা বেহেশ্‌ত সত্য

আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের জন্য আল্লাহ এমন সব নেয়ামত তৈরী করে রেখেছেন যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কারও অন্তরে তার পূর্ব

ধারণাও আসতে পারে না। এই সব মহা নেয়ামতের স্থান হল জান্নাত বা বেহেশ্‌ত। জান্নাত কোন কল্পিত বিষয় নয় বরং সৃষ্টরূপে তা বিদ্যমান আছে এবং অনন্ত কাল বিদ্যমান থাকবে। মু'মিনগণও অনন্তকাল সেখানে থাকবেন। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ের নসীহত নং ১০-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(এগার) জাহান্নাম বা দোযখ সত্য

পাপীদের আল্লাহ আগুন ও আগুনের মধ্যে অবস্থিত সাপ, বিচ্ছু, শৃঙ্খল প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্তির উপকরণ দ্বারা আযাব দেয়ার জন্য যে স্থান প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে বলা হয় জাহান্নাম বা দোযখ। দোযখ আল্লাহ্‌র সৃষ্টরূপে বিদ্যমান রয়েছে এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। কাফেররা অনন্তকাল তাতে অবস্থান করবে। এই জাহান্নামের আযাব সত্য। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে নসীহত নং ৯-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬. তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান

মৌলিকভাবে যে ৬টি বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখতে হয়, তার মধ্যে ষষ্ঠ যে বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়, তা হল তাকদীরের বিষয়ে ঈমান।

"তাকদীর" অর্থ পরিকল্পনা বা নকশা। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টিজগতের একটা নকশাও করে রেখেছেন, সব কিছুর পরিকল্পনাও লিখে রেখেছেন, এই নকশা ও পরিকল্পনাকেই বলা হয় তাকদীর। এই পরিকল্পনা এবং নকশা অনুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয় এবং হবে। অতএব ভাল-মন্দ সবকিছুই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এবং তাকদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়—এই বিশ্বাস রাখতে হবে। ভাল এবং মন্দ উভয়টার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এই বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। এর বিপরীত কেউ যদি ভাল বা 'সু'-র জন্য একজন সৃষ্টিকর্তা আর মন্দ বা 'কু'র জন্য অন্য একজন সৃষ্টিকর্তা মানে, তাহলে সেটা ঈমানের পরিপন্থী কুফ্‌র ও শির্‌ক হয়ে যাবে। যেমন : হিন্দুগণ 'সু'-র সৃষ্টিকর্তা লক্ষ্মীদেবী এবং 'কু'-র সৃষ্টিকর্তা শনি দেবতাকে মানে। এটা কুফ্‌র ও শির্‌ক।

আমাদের আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী খোদার ভিতর কোন ভাগাভাগি নেই। এক খোদাই সবকিছু করেন। হিন্দুদের খোদার মধ্যে ভাগাভাগি আছে। যেমন : তারা বলে তাদের প্রধান তিন খোদার মধ্যে একজন হল ব্রহ্মা। তারা বলে : তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আরেকজন হল বিষ্ণু, যিনি লালন-পালনকর্তা। আরেকজন হল মহাদেব, যিনি সংহারকর্তা।

দেখা গেল তাদের প্রত্যেক দেবতার ক্ষমতা সীমিত, তাদের একেকজন এক এক ডিপার্টমেন্টে কাজ করতে পারেন, অন্য ডিপার্টমেন্টে পারেন না। কিন্তু আমাদের খোদা একাই সব ক্ষমতার অধিকারী। সবকিছুর সৃষ্টিকর্তাও তিনি একা, সবকিছুর লালন-পালনকর্তাও তিনি একা। দুনিয়ার ভাল-মন্দ সব কিছুই তাঁর হাতে। হিন্দুরা যেমন মনে করে যে, "ভাল" বা "সু"-র দেবতা হল লক্ষ্মী, আর 'খারাপ' বা 'কু'-র দেবতা হল শনি। এভাবে ভাল আর মন্দের খোদায়িত্বকে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। আমাদের কাছে এরকম কোন ভাগ নেই—সবই এক আল্লাহ করেন।

এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, সবই যখন আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুসারে হয়, তখন আমলের প্রয়োজন কী, যা হওয়ার তা তো হবেই? এ প্রশ্ন করা যাবে না এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা কর্মজগতের নকশায় লিখে রেখেছেন যে, যদি মানুষ ইচ্ছা করে তাহলে এরূপ আর যদি ইচ্ছা না করে তাহলে এরূপ। এমনিভাবে আল্লাহ মন্দ-এর সৃষ্টিকর্তা হলেও তিনি দায়ী নন বরং মানুষ মন্দ করার জন্য দায়ী এ কারণে যে, তাকে আল্লাহ ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, সে নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছা শক্তি মন্দের জন্য ব্যয় করল কেন?

তাকদীর ও ভাগ্য সম্পর্কে মানুষের মনে নানান প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, এরূপ প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, কেননা, তাকদীরের বিষয়টি এমন এক জটিল রহস্যময় যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা মানব মেধার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা উদঘাটনের চেষ্টা করাও নিষিদ্ধ। আমাদের কর্তব্য তাকদীরে বিশ্বাস করা, আর আল্লাহ পাক আমলের দায়িত্ব দিয়েছেন তাই আমল করে যাওয়া।

তাকদীরে বিশ্বাসের অনেক ফায়দা রয়েছে। তার মধ্যে একটা বড় ফায়দা হল একমাত্র তাকদীরে বিশ্বাসই জীবনের অনেক ক্ষেত্রে শান্তি আনতে পারে। যেমন : অনেক চেষ্টা করেও সন্তানকে ভাল বানাতে পারলাম না, সন্তান খারাপ হয়ে গেল, তখন তাকদীরে বিশ্বাস ছাড়া মনে শান্তি আনার অন্য কোন পথ নেই। তাকদীরে বিশ্বাস অনুযায়ী তখন চিন্তা করতে হবে যে, ভাল করার মালিক আমি নই, ভাল তো করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ পাক। আমি চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু যেকোন চেষ্টার চূড়ান্ত ফলাফল কী হবে তাতো আল্লাহ পাকই নির্ধারণ করবেন। আমি চেষ্টা করতে পারি, ফলাফল নির্ধারণ করতে পারি না। এরূপ চিন্তা করলেই মনের মধ্যে শান্তি আসতে পারে। সন্তানের যেকোন অসুবিধা হলে সে ব্যাপারে এরূপ চিন্তা করতে হবে।

সন্তান মারা গেলেও একথা মনে করতে হবে যে, এর ভিতরেও আমার জন্য কোন না কোন কল্যাণ নিহিত আছে। অনেক মানুষ সন্তানের কারণে বিভিন্ন রকম পেরেশানীতে পড়ে থাকেন, আল্লাহ পাক হয়তো সেই জাতীয় পেরেশানী থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন, তাই সন্তানকে তুলে নিয়েছেন।

যাদের ছেলে হয় না শুধু মেয়ে হয়, তাদেরও চিন্তা করতে হবে যে, আমার জন্য কোন্টা ভাল তা আল্লাহ-ই ভাল জানেন। ছেলে সন্তান না হওয়ার মধ্যেই হয়তো আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। ছেলে সন্তানের কারণে অনেক মানুষ অনেক বিপদ-পেরেশানীতে পড়েন, আল্লাহ পাক হয়তো সেই বিপদ-পেরেশানী হতে আমাকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। এভাবে সবক্ষেত্রেই আল্লাহর উপর ভরসা এবং এই চিন্তা করা যে, আল্লাহ পাক আমার জন্য কল্যাণের ফয়সালাই করেছেন, এর ভিতরেই মনের শান্তি। অন্যথায় মনে শান্তি আসবে না। এ সব ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস রাখলে যে, আল্লাহ আমার জন্য কল্যাণের ফয়সালাই করে থাকবেন—এর মধ্যেই মনের শান্তি। আল্লাহ্র কোন ফয়সালা আমার কাছে খারাপ লাগলেও এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আসলে কোন্টা ভাল কোন্টা খারাপ তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ.

অর্থাৎ তোমরা অনেক কিছুকে খারাপ মনে কর, আসলে সেটা খারাপ নয়। আবার অনেক কিছুকে তোমরা ভাল মনে কর, অথচ আসলে সেটা তোমাদের জন্য খারাপ। (সূরা বাকারা : ২১৬)

এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ তা চূড়ান্তভাবে বিবেচনা আমিই করতে পারি। তোমাদের বিবেচনা অনেক সময়ই ভুল হয়ে যায়। তাই চূড়ান্তভাবে আল্লাহ্ পাকই ফয়সালা করতে পারেন কোন্টা ভাল কোন্টা খারাপ—এই বিশ্বাস রাখতে হবে। এটাকে বলা হয় তাকদীরে বিশ্বাস, আল্লাহ্র ফয়সালায় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই মানুষের মনে শান্তি আনতে পারে। মনের মধ্যে শান্তি আনার জন্য তাকদীরে বিশ্বাসের কোন বিকল্প নেই।

মুসলমানদের আরও কতিপয় আকীদা

এতক্ষণ মৌলিক যে ৬টি বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল। উক্ত ৬টি মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ছাড়াও আনুষঙ্গিক

আরও কিছু আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে, প্রত্যেক মুসলমানকে সে আকীদা-বিশ্বাস রাখতে হবে। মোটামুটিভাবে সে আকীদা-বিশ্বাসগুলি নিম্নরূপ :

মে'রাজ সম্বন্ধে আকীদা

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা একদা রাত্রে জাগরিত অবস্থায় স্বশরীরে মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখান থেকে সাত আসমানের উপর এবং সেখান থেকেও আরও উপরে যতদূর আল্লাহর ইচ্ছা নিয়ে যান। সেখানে আল্লাহর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাবার্তা বলেন। তখনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান দেয়া হয় এবং সেই রাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। একে মে'রাজ বলে। মে'রাজ সম্পর্কে ১২১-১৩৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আরশ-কুরছী সম্বন্ধে আকীদা

'আরশ' অর্থ সিংহাসন এবং 'কুরছী' অর্থ চেয়ার বা আসন। আল্লাহ যেমন, তাঁর আরশ এবং কুরছীও তেমনই শানের হয়ে থাকবে। সপ্তম আসমানের উপর আরশ ও কুরছী অবস্থিত। হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ-কুরছী এত বিশাল যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

আল্লাহর দীদার সম্বন্ধে আকীদা

আল্লাহর দীদার বা আল্লাহকে দেখা সম্বন্ধে ইসলামের আকীদা হল দুনিয়ায় থেকে জাগ্রত অবস্থায় এই চর্মচক্ষুর দ্বারা কেউ আল্লাহকে দেখতে পারেনি এবং পারবে না। তবে বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে গিয়ে আল্লাহর দীদার (দর্শন) লাভ করবেন। উল্লেখ্য, স্বপ্নে আল্লাহকে দেখা যায়, তবে সেটাকে দুনিয়ার চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা বলা হয় না।

জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হিসাবে গণ্য হবে আল্লাহর দীদার। সবচেয়ে আনন্দের, সবচেয়ে মজার এবং সবচেয়ে খুশীর বিষয় হবে আল্লাহর দীদার অর্থাৎ আল্লাহর সাক্ষাৎ, আল্লাহর দেখা। প্রত্যেকে তার আমল অনুযায়ী আল্লাহর দীদার লাভ করবে। কেউ সর্বদা আল্লাহর জামাল ও সৌন্দর্য দর্শনে ডুবে থাকবে। আবার কেউ মাত্র একবার দীদার লাভ করবে। সহীহ মত অনুযায়ী নারীগণও দীদার লাভ করবে। জান্নাতে আল্লাহর দীদার লাভ হওয়া সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে :

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۙ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ

অর্থাৎ সেদিন বহু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। (সূরা কিয়ামা : ২২-২৩)

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে—হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا ۔(رواه الشيخان)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে প্রকাশ্যভাবে।

কিয়ামতের আলামত সম্বন্ধে আকীদা

কিয়ামত হবে—একথা আমাদের জানানো হয়েছে, কিন্তু কোন্ সময়ে হবে, সময় সম্পর্কে কাউকে জানানো হয়নি। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের কিছু আলামত বা নিদর্শন বলে দিয়ে গেছেন। কিয়ামতের পূর্বে সেই সব আলামত প্রকাশ পাবে, যা দেখে বোঝা যাবে কিয়ামত আসন্ন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দুই ধরনের আলামত সম্পর্কে বলে গেছেন। কিছু হল ছোট ছোট আলামত। এগুলোকে বলা হয় "আলামতে সুগরা"। আর কিছু হল বড় বড় আলামত। সেগুলোকে বলা হয় "আলামতে কুব্‌রা"।

ছোট ছোট আলামতগুলোর মধ্যে তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে ১৫টা আলামতের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটা আলামত হল মানুষ জনগণের আমানতকে গনীমতের মালের মত লুটেপুটে খাবে। ব্যক্তিগত আমানত হোক অথবা রাষ্ট্রীয় আমানত অর্থাৎ জনগণের আমানত, সব আমানতকে মানুষ গনীমতের মালের মত লুটেপুটে খাবে। কিয়ামতের এই আলামত প্রকাশ হয়ে গেছে।

যে বিষয়গুলোকে কিয়ামতের আলামত বলা হয়েছে, এর অর্থ হল সেগুলো জঘন্য ধরনের অপরাধ। এরকম জঘন্য অপরাধ যে, এ অপরাধ হতে থাকলে পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার আর কোন সার্থকতা নেই। কাজেই এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয়া উচিত। যেমন : জনগণের আমানত যদি মানুষ গনীমতের মত লুটেপুটে খায়, তাহলে মানুষের মাল বা সম্পদের নিরাপত্তা উঠে গেল। আর মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা না থাকলে দুনিয়াকে টিকিয়ে

রাখার সার্থকতা কোথায়? তাই এটা জঘন্য ধরনের অপরাধ, এটা কবীরা গোনাহ, মারাত্মক ধরনের পাপ।

আর একটা আলামত হল—মানুষ যাকাত দেয়াটাকে জরিমানার মত দণ্ড মনে করবে। মনে করবে যাকাতের বিধান দিয়ে আমাদের উপর একটা জরিমানা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আহা, কত টাকা যাকাতে চলে যায়! যদিও যাকাতের পরিমাণ খুব বেশী নয়—শতকরা মাত্র আড়াই টাকা (২.৫০ টাকা) হারে যাকাত দেয়া ফরয। তারপরও এতটুকু অর্থ দিতে তাদের কাছে বিরাট কষ্ট মনে হবে, দণ্ডের মত লাগবে। এটা হবে মালের প্রতি তাদের মহব্বত বেড়ে যাওয়ার কারণে। যার ফলে যাকাতের বিধান তাদের কাছে জুলুম মনে হবে। আর শরীয়তের বিধানকে জুলুম মনে করা মারাত্মক পাপ। শরীয়তের প্রত্যেকটা বিধানকে স্বেচ্ছায় মনের খুশিতে মেনে নেয়াই হল ঈমানের দাবী। ইসলাম অর্থই হল আত্মসমর্পণ করা। ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তার সামনে নিজেকে সোপর্দ করে দিতে হবে। বিনা দ্বিধায়, বিনা সংকোচে কোন আপত্তি ছাড়াই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে। এটাকেই বলা হয় ইসলাম। মানুষের মধ্যে যখন মালের মহব্বত বেশী এসে যায়, তখন যাকাতের এই সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেও তার কাছে কষ্টকর লাগে, দ্বীনের অন্য কাজে ব্যয় করতেও তার খুব কষ্ট লাগে। মালের প্রতি এত বেশী মহব্বত হয়ে যাওয়া তাই মারাত্মক পাপের মূল। মানুষের মধ্যে মালের প্রতি এত মহব্বত হলে গরীবের সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। সহানুভূতি উঠে যায়। একে অপরের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। আর এ অবস্থা হলে দুনিয়া বসবাসের উপযোগী থাকে না। তখন দুনিয়াকে শেষ করে দেয়া সমীচীন হয়ে দাঁড়ায়। তাই এটাও কিয়ামতের একটা আলামত হিসেবে গণ্য হয়েছে।

আর একটা আলামত হল—মানুষ জ্ঞান অর্জন করবে দ্বীনের জন্য নয় বরং দুনিয়ার জন্য, সম্পদ উপার্জন করার জন্য। কোন্ জ্ঞান অর্জন করলে বেশী উপার্জন করা যাবে—সেটাই মানুষের মনোভাব হয়ে দাঁড়াবে। আর যখন এরকম মনোভাব হবে, তখন মানুষ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা ছেড়ে দিবে। কারণ, দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করলে অর্থাৎ কুরআন-হাদীছের কথা শিখলে টাকা পয়সা বেশী পাওয়া যায় না, ভাল চাকুরী পাওয়া যায় না, সরকারী পদ পাওয়া যায় না, গাড়ি-বাড়ি করা যায় না। টাকা-পয়সার চিন্তায় জ্ঞান অর্জন করার মনোবৃত্তি এসে গেলে দ্বীনী ইল্‌মের প্রতি আগ্রহ কমে যাবে, দুনিয়াবী

ইল্‌মের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাবে। আর যখন দ্বীনী ইল্‌মের প্রতি আগ্রহ কমে যাবে, দ্বীনী ইল্‌মের চর্চা কমে যাবে, তখন দ্বীনের উপরে চলা কমে যাবে, মানুষের আমলও কমে যাবে, কারণ, ইল্‌ম না থাকলে আমল আসবে কোথা থেকে? দ্বীনী ইল্‌ম কমে গেলে দ্বীনী ইলমের চর্চা কমে গেলে সমাজে বেদ'আত, কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে, বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ও কুফরী মতবাদ ঢুকে পড়ে। মানুষ আমলহারা-ঈমানহারা হয়ে যায়। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, সেই উদ্দেশ্য বরবাদ হয়ে যায়। আর এমন হলে দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখার কোন সার্থকতা থাকে না। তাই এটাকেও কিয়ামতের আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আর একটা আলামত হল—মানুষ তার মায়ের আনুগত্য করবে না, মায়ের কথা মেনে চলবে না, বরং মেনে চলবে তার বউয়ের কথা। অর্থাৎ বিবির কথায় চলবে মায়ের নাফরমানী করবে। পিতার সাথে খারাপ আচরণ করবে, বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভাল আচরণ করবে অর্থাৎ পিতাকে দূরে সরিয়ে দিবে আর যারা দূরের মানুষ তাদের কাছে টানবে। যাদের কাছে টানার তাদের দূরে ঠেলবে যারা দূরের তাদের কাছে টানবে। এভাবে সব স্বাভাবিক নিয়ম, সব প্রাকৃতিক নিয়ম যার ভিত্তিতে দুনিয়া সুন্দরভাবে চলছে, তা উলট-পালট করে দেয়া হবে। তখন আল্লাহও এই দুনিয়াকে উলট-পালট করে দিবেন। অর্থাৎ কিয়ামত ঘটিয়ে দিবেন।

আর একটা আলামত হল—মানুষ মসজিদের আদব-কায়দা রক্ষা করবে না, মসজিদে জোর আওয়াজে কথা বলবে। অর্থাৎ অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে, মানুষ মানুষের আদবতো রক্ষা করবেই না, এমনকি আল্লাহর দরবারের আদব পর্যন্ত রক্ষা করবে না। আদব একটা মৌলিক জিনিস। মাতা-পিতার সাথে আদব, গুরুজনদের সাথে আদব, উস্তাদের সাথে আদব, উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে আদব, দ্বীনী মজলিসের আদব, মসজিদের আদব-

এগুলো এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এর ভিত্তিতে সবকিছুর শৃঙ্খলা ঠিক থাকে। আদব উঠে গেলে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়। মাতা-পিতা ও বড় ভাই-বোনদের সাথে আদব না থাকলে পরিবারের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। সমাজের মুরব্বী ও গুরুজনদের আদব না থাকলে সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। উস্তাদের সাথে আদব না থাকলে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হতে হয়, আল্লাহর দরবারের আদব রক্ষা না করলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

এভাবে আদব না থাকলে সব ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়। তাই দুনিয়া থেকে যখন আদব-কায়দা উঠে যাবে তখন সব ক্ষেত্রে বিশৃংখল অবস্থা সৃষ্টি হবে। তখন দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখার সার্থকতা থাকবে না। এজন্যই আদব উঠে যাওয়াকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আর একটা আলামত হল—সমাজের নেতা হবে পাপী লোকেরা। অর্থাৎ ফাসেক-ফাজের ও পাপীরা হবে বড় বড় নেতা। সমাজের নেতৃত্ব থাকবে পাপীদের হাতে। জনগণের প্রতিনিধি হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট গোছের লোকেরা। অর্থাৎ যারা জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য নয় তারা হবে জনগণের প্রতিনিধি। এরকম লোকদের হাতে নেতৃত্ব গেলে, এরকম লোকেরা জন প্রতিনিধি হলে দেশ এবং সমাজের কী দুর্দশা হয়, জনগণের কী দুর্গতি হয়, তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, আজকের সমাজ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এক কথায় এরকম হলে মানুষের সুখ-শান্তি সব বরবাদ হয়ে যায়। মানুষের বেঁচে থাকার সার্থকতাই শেষ হয়ে যায়। এজন্যই এটাকে কিয়ামতের অর্থাৎ দুনিয়া বরবাদ হওয়ার আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এক হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টতঃ বলেছেন :

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (بخاري)

অর্থাৎ যখন অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব চলে যাবে তখন আর দুনিয়াতে বেঁচে থেকে কী লাভ, কিয়ামতের-ই অপেক্ষা কর। আর এক হাদীছে এরকম পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا. (ترمذى)

অর্থাৎ তখন মাটির উপরে থাকার চেয়ে মাটির ভিতরে চলে যাওয়াই ভাল অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল।

আর একটা আলামত হল—এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে, মানুষকে সম্মান করতে হবে তার অনিষ্টের ভয়ে। সম্মান করতে মনে চাইবে না, কিন্তু না করলে অসুবিধার ভয়। এই ভয়ে সম্মান দেখানো হবে। যেমন : মাস্তান দেরকে মানুষ বাহ্যিকভাবে সম্মান দেখায়, খাতির করে। অথচ মনে মনে তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। সামনে বলে ভাই কেমন আছেন, কিংবা ভাল তো? অথচ মনে মনে বলে বদমাইশটা মরলেই ভাল হত। সমাজে অপরাধীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেলেই এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন মানুষ ভয়ে তাদের

Scanned by CamScanner

সম্মান দেখাতে বাধ্য হয়। এরকম পরিবেশ সৃষ্টি হলে সম্মানী লোকের সম্মান নষ্ট হয়, অপরাধ প্রশ্রয় পায়। যখন পৃথিবীর অবস্থা এরকম উল্টো হয়ে যাবে, তখন সেই পৃথিবীকে আর টিকিয়ে রাখার যৌক্তিকতা থাকবে না। তাই এটাকেও কিয়ামতের একটা আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আর একটা আলামত হল—গান-বাদ্যের প্রচলন বেশী হবে। গায়ক গায়িকাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে যাবে, গান-বাদ্যের ব্যাপক প্রচলন ঘটবে। আর যে কোন পাপের ব্যাপক প্রচলন ঘটলে অবস্থা এমন হয় যে, মানুষ আর সেটাকে পাপ মনে করে না। গান-বাদ্যের ব্যাপারে অনেকের মনোভাব এখন এমন হয়েছে যে, তারা এটাকে পাপ মনে করছে না। একজন তো দুঃসাহসের সাথে বলেই ফেলেছে কোন্ কিতাবে লিখা আছে হারাম-বাজনা গান? এই কথা যে বলেছে তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি কিতাবের বরাত শুনতে চান, কয়টা কিতাবের নাম জানেন? কোন কিতাবের নাম শুনলে কি বুঝবেন সেটা কোন পর্যায়ের কিতাব? তাহলে শুনুন—আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, সহীহ ইবনে হিব্বান প্রভৃতি হাদীছের কিতাবে গান-বাদ্য নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে হাদীছ রয়েছে। গান-বাদ্য গোনাহে কবীরা। আর কোন গোনাহকে গোনাহ মনে না করা আরও জঘন্য অপরাধ।

আর একটা আলামত হল—ব্যাপকভাবে মদ পান করা হবে। অর্থাৎ নেশার ব্যাপক প্রচলন ঘটবে। ব্যাপক হারে মানুষ নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। নেশার হার বেড়ে গেলে কীভাবে সমাজ রসাতলে যায়, তা আমরা হাতে নাতে বুঝতে শুরু করেছি।

আর একটা আলামত হল—মানুষ আগের যুগের ধর্মীয় ব্যক্তিদের সমালোচনা করতে থাকবে। ইদানিং এ বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন কিছু লোক আইম্মায়ে মুজতাহিদীন যেমন : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), ইমাম শাফেঈ (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.) প্রমুখ মনীষীদের সমালোচনা শুরু করেছে। অথচ হাজার বছর বেশী সময় ধরে মুসলিম উম্মাহ তাদের গবেষণা করা মাসাআলা-মাসায়েলের উপরে আমল করে আসছে। কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনি। কিন্তু ইদানিং এক শ্রেণীর লোক বের হয়েছে, যারা এই সব ইমামদের সমালোচনা করে সমাজকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। আর এক শ্রেণীর লোক সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করছে। অথচ সাহাবায়ে কেরাম সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করা নিষেধ। তিরমিযী শরীফের হাদীছে এসেছে—নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কাউকে সাহাবাদের সমালোচনা করতে দেখলে বলবে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত হোক।

যাহোক, এগুলো হল কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত। যখন এই আলামতগুলো প্রকাশ পেয়ে যাবে, তখন বোঝা যাবে কিয়ামত আসন্ন। তখন দুনিয়া আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে এগুতে থাকবে। এছাড়াও বিভিন্ন হাদীছে কিয়ামতের আরও অনেকগুলো ছোট ছোট আলামতের কথা বলা হয়েছে। যেমন : ভূমিধস বেড়ে যাবে, ভূমিকম্পন বেড়ে যাবে, মানুষের মন বিকৃত হয়ে যাবে, চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে এবং একের পর এক দুর্ঘটনা বেড়েই যেতে থাকবে, এমনভাবে মানুষের উপর বিপদ আসতে থাকবে যেমন একটা মালার সুতা কেটে দেয়া হলে ঐ মালার দানাগুলো একের পর এক লাগাতার পড়তে থাকে। এরকম মানুষের উপরে বিপদ-মুসীবত একের পর এক নিরবচ্ছিন্নভাবে আসতে থাকবে।

এগুলো হল কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত। এরপর প্রকাশ পেতে শুরু করবে একে একে কিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো। সমস্ত দুনিয়ায় খৃষ্টানদের রাজত্ব হয়ে যাবে, মুসলমানদের উপরে চরমভাবে জুলুম-নির্যাতন হতে থাকবে।

কুরআন ও হাদীছে কিয়ামতের কিছু বড় বড় আলামত বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোকে "আলামতে কুবরা" বা বড় বড় আলামত বলা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হযরত মাহ্‌দীর আবির্ভাব, দাজ্জালের-আবির্ভাব, আকাশ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর দুনিয়াতে অবতরণ, ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব, দাব্বাতুল আরদ-এর বহিঃপ্রকাশ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ইত্যাদি। হযরত মাহ্‌দীর আবির্ভাবের পর থেকে কিয়ামতের বড় বড় আলামত প্রকাশ পাওয়া শুরু হবে।

হযরত মাহ্‌দী সম্বন্ধে আকীদা

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত প্রকাশিত হওয়ার পর একটা সময় এমন আসবে, যখন কাফেরদের প্রভাব খুব বেশী হবে, চতুর্দিকে নাসারাদের রাজত্ব কায়েম হবে, দাজ্জালেরও আবির্ভাব ঘটবে। এমন সময় মুসলমানগণ তাদের বাদশা বানানোর জন্য হযরত মাহ্‌দীকে তালাশ করবেন এবং একপর্যায়ে

কিছুসংখ্যক নেক লোক মক্কায় বায়তুল্লাহ শরীফে তওয়াফরত অবস্থায় তাঁকে পেয়ে তার হাতে বায়আত করে তাঁকে খলীফা নিযুক্ত করবেন। এ সময় তাঁর বয়স হবে ৪০ বৎসর।

হযরত মাহ্দীর নাম হবে মুহাম্মাদ। তাঁর পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। তিনি ফাতেমা (রাযি.)-এর বংশোদ্ভূত অর্থাৎ সাইয়্যেদ বংশীয় হবেন। মদীনা তাঁর জন্মস্থান হবে। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস হিজরত করবেন। তাঁর দৈহিক গঠন ও আখলাক-চরিত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হবে। তিনি নবী হবেন না, তাঁর উপর ওহীও নাযিল হবে না। তিনি মুসলমানদের খলীফা হবেন। তার আমলেই হযরত ঈসা (আ.) অবতরণ করবেন। ঈসা (আ.)-এর আগমনের পর তিনি ইন্তেকাল করবেন।

দাজ্জাল সম্বন্ধে আকীদা

'দাজ্জাল' শব্দের অর্থ প্রতারক, ধোঁকাবাজ। আল্লাহ তা'আলা শেষ যামানায় লোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য একজন লোককে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করবেন। তার এক চোখ কানা আর এক চোখ টেরা থাকবে। চুল কোঁকড়া ও লাল বর্ণের হবে। সে খাটো দেহের অধিকারী হবে। তার কপালে লেখা থাকবে ك ف ر অর্থাৎ কাফের। সকল মু'মিনই সে লেখা পড়তে পারবে। ইরাক ও শামদেশের মাঝখানে তার অভ্যুত্থান হবে। আল্লাহ পাক মানুষকে চরমভাবে পরীক্ষা নেয়ার জন্য তার হাতে এমন ক্ষমতা দিয়ে দিবেন সে যা বলবে তা-ই হবে। সে একটা ফসলহীন ভূমিকে বলবে তুমি ফসল উৎপাদন করে দাও! সাথে সাথে ফসল গজাবে। মৃতকে পর্যন্ত জীবিত করে দেখাবে, তার সঙ্গে কৃত্রিম বেহেশ্‌ত-দোযখ থাকবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বেহেশ্‌ত হবে দোযখ আর তার দোযখ হবে বেহেশ্‌ত। সে আরও অনেক অলৌকিক কাণ্ড দেখাতে পারবে, যা দেখে কাঁচা ঈমানের লোকেরা তার দলভুক্ত হয়ে জাহান্নামী হয়ে যাবে। হযরত মাহ্দীর সময় তার আবির্ভাব হবে। সে সময় হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং তাঁরই হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। অভ্যুত্থানের পর দাজ্জাল সর্বমোট ৪০ দিন দুনিয়াতে থাকবে।

দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য হাদীছে নিম্নোক্ত দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দাজ্জালের ফেৎনা থেকে পানাহ চাই।

হযরত ঈসা (আ.) এর পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে আকীদা

দাজ্জালের বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাসের চতুর্দিকে ঘিরে ফেলবে এবং মুসলমানগণ আবদ্ধ হয়ে পড়বে। ইত্যবসরে একদিন ফজরের নামাযের ইকামত হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে ফেরেশ্তাদের উপর ভর করে অবতরণ করবেন। তিনি নামায পড়ার পর হাতে বর্ষা নিয়ে দাজ্জালকে ধাওয়া করবেন এবং "বাবেলূদ" নামক স্থানে তাকে নাগালে পেয়ে হত্যা করবেন। ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হবে। সর্বত্র মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। ইনসাফ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ৪০ বৎসর রাজত্ব পরিচালনা করার পর হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করবেন। তাঁকে আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা শরীফের মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্শ্বেই দাফন করা হবে।

হযরত ঈসা (আ.) নবী হিসেবে আগমন করবেন না বরং তিনি আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আগমন করবেন এবং এই শরীয়ত অনুযায়ীই তিনি জীবন যাপন ও খেলাফত পরিচালনা করবেন।

ইয়া'জূজ-মা'জূজ সম্বন্ধে আকীদা

দাজ্জালের ফেতনা ও তার মৃত্যুর পর আসবে ইয়া'জূজ ও মা'জূজের ফেতনা। ইয়া'জূজ-মা'জূজ অত্যন্ত অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের সংখ্যা অনেক বেশী হবে। তারা দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং ভীষণ উৎপাত শুরু করবে, হত্যা এবং লুটতরাজ চালাতে থাকবে। তখন হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা পর্বতে আশ্রয় নিবেন। হযরত ঈসা (আ.) ও মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। আল্লাহ তা'আলা মহামারীর আকারে রোগ-ব্যাধি প্রেরণ করবেন। বর্ণিত আছে—সেই রোগের ফলে তাদের গর্দানে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি হবে, ফলে অল্প দিনের মধ্যে ইয়া'জূজ-মা'জূজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। তাদের অসংখ্য মৃত দেহের দুর্গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তখন ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের দু'আয় আল্লাহ তা'আলা এক ধরনের বিরাটকায় পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় উটের ঘাড়ের মত। তারা মৃতদেহগুলো উড়িয়ে সাগরে

Scanned by CamScanner

বা যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ফেলে দিবে। তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং সমস্ত ভূপৃষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যাবে।[১]

আকাশের এক ধরনের ধোঁয়া সম্বন্ধে আকীদা

হযরত ঈসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর কয়েকজন নেককার লোক ন্যায় পরায়ণতার সাথে রাজত্ব পরিচালনা করবেন। তারপর ক্রমান্বয়ে ধর্মের কথা কমে যাবে এবং চতুর্দিকে বে-দ্বীনী শুরু হবে। এ সময় আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া আসবে, যার ফলে মু'মিন-মুসলমানের সর্দির মত ভাব হবে এবং কাফেররা বেহুঁশ হয়ে যাবে। ৪০ দিন পর ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের আকীদা

তার কিছু দিন পর একদিন হঠাৎ একটি রাত তিন রাতের পরিমাণ লম্বা হবে। মানুষ ঘুমাতে ঘুমাতে ত্যক্ত হয়ে যাবে। গবাদি পশু বাইরে যাওয়ার জন্য চিৎকার শুরু করবে। তারপর সূর্য সামান্য আলো নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য মধ্য আকাশ পর্যন্ত এসে আবার আল্লাহর হুকুমে পশ্চিম দিকে গিয়ে অস্ত যাবে। তারপর আবার যথারীতি পূর্বের নিয়মে পূর্ব দিক থেকে উদিত এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত হতে থাকবে।

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের পর আর কারও ঈমান বা তাওবা কবূল হবে না।

দাব্বাতুল আরদ সম্বন্ধে আকীদা

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের কিছু দিন পর মক্কা শরীফের সাফা পাহাড় ফেটে অদ্ভুত আকৃতির এক জন্তু বের হবে। একে বলা হয় দাব্বাতুল আরদ (অর্থাৎ ভূমির জন্তু)। এ প্রাণীটি মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। সে অতি দ্রুত বেগে সারা পৃথিবী ঘুরে আসবে। সে মু'মিনদের কপালে একটি নূরানী রেখা টেনে দিবে, ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং বেঈমানদের নাকের অথবা গর্দানের উপর সীল মেরে দিবে, ফলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। সে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফেরকে চিনতে পারবে। এ জন্তুর আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

১. তারা বর্তমানে কোন দেশের কোথায় কীভাবে অবস্থিত, কী তাদের বর্তমান পরিচয়—তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে আগ্রহীগণ মাওলানা হেফজুর রহমান রচিত 'কাছাছুল কোরআন' পাঠ করতে পারেন।

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ۔

অর্থাৎ যখন কিয়ামত সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটা প্রাণী বের করব, সে মানুষের সাথে কথা বলবে। (সূরা নামল : ৮২)

দাব্বাতুল আরদ গায়েব হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে একটি আরামদায়ক বায়ু প্রবাহিত হবে। তাতে ঈমানদারদের বগলে কিছু অসুখ হবে এবং তারা মারা যাবে। দুনিয়ায় কোন ঈমানদার ব্যক্তি ও আল্লাহ্ আল্লাহ্ করার বা আল্লাহ্র নাম নেয়ার কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সারা দুনিয়ায় হাব্শী কাফেরদের রাজত্ব চলবে। তারা বায়তুল্লাহ শরীফকে শহীদ করে ফেলবে। কুরআন শরীফ দেল থেকে এবং কাগজ থেকে উঠে যাবে। তারপর হঠাৎ একদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে। সিঙ্গার ফুঁকে প্রথম প্রথম হালকা আওয়াজ হবে। পরে এতো কঠোর ও ভীষণ হবে যে, সমস্ত লোক মারা যাবে। যমীন ও আসমান ফেটে যাবে। পূর্বে যারা মারা গেছে তাদের রূহও বেহুঁশ হয়ে যাবে। সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।

কাশ্ফ-কারামত সম্বন্ধে আকীদা

* কারামত ও কাশ্ফ তথা অলৌকিক কিছু ঘটে থাকে বুযুর্গ এবং ওলীদের দ্বারা। বুযুর্গ এবং ওলী বলা হয় আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাকে। আর শরীয়তের বরখেলাফ করে কেউ আল্লাহ্র প্রিয় তথা ওলী বা বুযুর্গ হতে পারে না। অতএব যারা শরীয়তের বরখেলাফ করে যেমন : নামায রোযা করে না, গাঁজা, শরাব বা নেশা খায়, বেগানা মেয়েলোককে স্পর্শ করে বা দেখে, গান-বাদ্য করে ইত্যাদি, তারা কখনও বুযুর্গ নয়। যদি তারা অলৌকিক কিছু দেখায়, তাহলে সেটা কারামত নয় বরং বুঝতে হবে হয় সেটা যাদু বা কোনরূপ তুকতাক ও ভেল্কিবাজী, কিংবা যে কোনরূপ প্রতারণা। অনেক সময় শয়তান এসব লোকদের গায়েব জগতের অনেক খবর জানিয়ে দেয়, যাতে করে এটা শুনে মূর্খ লোকেরা তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং এভাবে তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়। এসব দেখে তাদের ধোঁকায় পড়া যাবে না।

কোন অলৌকিক বা অদ্ভুত ধরনের কিছু দেখাতে পারাও কারও হক হওয়ার দলীল নয়। অদ্ভুত কিছু অনেকভাবে দেখানো যায়। খাঁটি সাধনার মাধ্যমেও দেখানো যায়, আবার গলত তরীকায় সাধনার মাধ্যমেও দেখানো যায়। বুযুর্গীর শক্তিতেও দেখানো যায়, আবার যাদু, টোনা, তুকতাকের মাধ্যমেও দেখানো যায়।

তবে ঘটিতব্য অলৌকিক বিষয়টি যাদু-টোনার মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে, না ভ্রান্ত সাধনার মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে, সেটা কি সত্যিকারের বুযুর্গীঘটিত কারামত না ভেল্কিবাজী? তা বিজ্ঞ আলেমগণ তার আমল-আকীদা ও শরীয়তের পাবন্দীর বিচারপূর্বক বুঝতে সক্ষম হন। জহুরী জওহর চেনে। প্রকৃত কারামত এবং ভেল্কিবাজীর মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম মানুষদের পক্ষে কোন বিচক্ষণ আলেম বা বুযুর্গ থেকে সে ব্যাপারে পরিষ্কার জেনে না নিয়ে এগুলির পেছনে পড়ে বা এগুলি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কারও ভক্ত হওয়া ভুল।

কারও তাবীজ-তদবীরে ভাল কাজ হওয়া তার হক্কানী বা কামেল হওয়ার দলীল নয়। কারও তাবীজ-তদবীরে নিঃসন্তান ব্যক্তির সন্তান লাভ হওয়া বা কোন জটিল রোগ-ব্যাধি সেরে যাওয়া তদবীরদাতার কামেল হওয়ার দলীল নয়। তাবীজ-তদবীর হল দু'আর মত। যা কিছুই হয় আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়; এক্ষেত্রে তাবীজ দাতার কোন ক্ষমতা নেই। যেমন কারও দু'আ কবূল হওয়া তার কামেল হওয়ার কোন প্রমাণ নয়। ফাসেক-ফাজের, এমনকি কাফেরের দু'আও কবূল হতে পারে। শয়তান দুআ করেছিল কিয়ামত পর্যন্ত তাকে হায়াত দান করা হোক। শয়তানের এই দু'আ কবূল হয়েছিল। অথচ সে হল সবচেয়ে বড় কাফের। তাই দু'আ কবূল হওয়া যেমন বুযুর্গীর প্রমাণ নয়, তাবীজ-তদবীরে কাজ হয়ে যাওয়াও তদ্রূপ। একজন সাধারণ মানুষের তাবীজ-তদবীরেও কাজ হতে পারে, আবার একজন বুযুর্গের তাবীজ-তদবীরে কাজ না-ও হতে পারে। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইচ্ছা, এটা মানুষের হাতে নয়।

পীর সম্বন্ধে ভ্রান্ত আকীদা

* কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা শিরক যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন। এ আকীদা রাখা যাবে না। কারণ, সব সময় আমাদের অবস্থা জানতে হলে তাকে গায়েব জানতে হবে। আর কোন মানুষ কোন গায়েব জানেন না। গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

* কোন পীর বা বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, তিনি জানতে পেরেছেন—এটা শিরক। কোন পীর-বুযুর্গ গায়েব জানেন না, তবে কখনও কোন বিষয়ে তাদের কাশ্ফ-এল্হাম হতে পারে, তা-ও আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

* কোন পীর বুযুর্গের মর্যাদা—চাই সে যতবড় হোক—কোন নবী বা সাহাবী থেকে বেশী বা তাঁদের সমানও হতে পারে না।

মাযার সম্বন্ধে ভ্রান্ত আকীদা

সাধারণ মানুষ মাযার ও মাযার যিয়ারত সম্পর্কে এমন কিছু গলত ও ভ্রান্ত আকীদা রাখে, যার অনেকটা শিরক-এর পর্যায়ভুক্ত, যেগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন : মাযারে গেলে বিপদ-আপদ দূর হয়—এই ধারণা ভ্রান্ত। মাযারে গেলে আয়-উন্নতিতে বরকত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল হয়—এই ধারণা ভ্রান্ত। মাযারে সন্তান চাইলে বা কোন মকসূদ চাইলে তা লাভ হয়—এই ধারণা ভ্রান্ত। মাযারে মান্নত মানলে বা টাকা-পয়সা দিলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়-এই ধারণা ভ্রান্ত। মাযারে ফুল, মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেয়াকে ছওয়াবের কাজ বলে ধারণা করা হয়—এই ধারণাও ভ্রান্ত।

রাশি ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব এবং হস্তরেখা বিচার সম্বন্ধে আকীদা

এক শ্রেণীর লোক জ্যোতিঃশাস্ত্রে এবং রাশিতে বিশ্বাস করে। অনেকে আজকাল বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ব্যাপারেও জ্যোতিষীদের কাছ থেকে রাশি এবং ভাগ্য গণনা করে তারপর পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করা অন্ধ বিশ্বাস। ইসলাম ধর্মে এর কোন ভিত্তি নেই। এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নেই। অনেকে বিশ্বাস করে যে, গ্রহ-নক্ষত্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। কিছু জ্যোতিষী গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে ভবিষ্যতের শুভ-অশুভ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। এগুলো সবই কাল্পনিক। কিছু জ্যোতিষী ভাগ্য গণনা করে ভবিষ্যতে কী হবে না হবে, ভাগ্য কিভাবে পরিবর্তন করা যাবে—এই সব ব্যাপারে সাজেশন দিয়ে থাকে। এবং বিভিন্ন রকম পাথর ও রত্ন ব্যবহার করার পরামর্শ দেয় এবং বলে এগুলো দ্বারা মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটবে। এগুলো সবই কাল্পনিক। অতএব জ্যোতিষীদের কাছে ভাগ্য গণনা করে তারা ভাগ্য বদলানোর জন্য কোন রত্ন বা পাথর ব্যবহার করার পরামর্শ দিলে তা মান্য করা যাবে না। ভাগ্য গণনা করাতে যাওয়াও গোনাহ। রাশির বিষয়টাও কাল্পনিক। বলা হয় রাশি হল বারটা, ইসলামে এগুলো ভিত্তিহীন।

কোন মুসলমান কোন গণকের কাছে হাত দেখাতে পারে না। কোন মুসলমান গণকের কথায় বিশ্বাস করতে পারে না।

গণকের ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস করা কুফ্‌রী। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ اَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهٗ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ۔

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গণকের কাছে এল, অতঃপর সে যা বলে তা-তে বিশ্বাস স্থাপন করল, সে আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মাদের উপর নাযিলকৃত বিধি-বিধানের সাথে কুফরী করল।

একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, জ্যোতিষী ও গণকদের সব ভবিষ্যদ্বাণী না হলেও কিছু কিছু তো বাস্তবে সত্যে পরিণত হয়। এতে করে বোঝা গেল এ শাস্ত্রের ভিত্তি রয়েছে, সবটাই অনুমানভিত্তিক নয়। এ প্রশ্নের দুটি উত্তর রয়েছে। একটি উত্তর হল—যে কোন বিষয়ে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা অর্জন হলে মানুষ হাবভাব ও লক্ষণ দেখে সে সম্বন্ধে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতেও পারে, যার কিছুটা খেটেও যায়। তাই বলে সেটা কোন প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। এ প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর হল—যা একটি প্রসিদ্ধ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, আসমানে যখন পৃথিবীর ফয়সালা ঘোষিত হয় তখন গুপ্তসারে জিন-শয়তানরা তার কিছুটা শুনে নিতে সক্ষম হয়। তারা সেই শ্রুত তথ্যের সাথে আরও শতটা মিথ্যা যোগ করে গণক ও জ্যোতিষীদের অন্তরে তা প্রক্ষিপ্ত করে, আর জ্যোতিষী ও গণকরা তা মানুষকে শোনায়। পরে দেখা যায় তাদের বক্তব্যের কিছুটা সত্যে পরিণত হয়। এটা হল সেই অংশ যা আসমান থেকে জিন-শয়তানরা উদ্ধার করেছিল। হাদীছটি বোখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা ও মুসনাদে আহ্‌মদে বর্ণিত হয়েছে।[১]

তা'বীজ ও ঝাড়-ফূঁক সম্বন্ধে আকীদা

* তা'বীজ ও ঝাড়-ফুঁকে কাজ হওয়াটা নিশ্চিত নয়—হতেও পারে না-ও হতে পারে। যেমন : দুআ করা হলে রোগ-ব্যাধি আরোগ্য হওয়াটা নিশ্চিত নয়—আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আরোগ্য হয় নতুবা হয় না, তদ্রূপ তা'বীজ এবং ঝাড় ফুঁকও একটি দুআ এবং তা'বীজের চেয়ে দু'আ বেশী শক্তিশালী। তা'বীজ এবং ঝাড়-ফুঁকে কাজ হলেও সেটা তা'বীজ বা ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব ক্ষমতা নয় বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়ে থাকে। অতএব কোন তা'বীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাঙ্খিত ফল লাভ না হলে এরূপ বলার বা এরূপ ভাবার অবকাশ নেই যে, কুরআন হাদীছ কি তাহলে সত্য নয়?

---

১. آپ کے مسائل اور ان کا حل ج/۱ ও صحیح مسلم ج/۱ থেকে গৃহীত।

* তা'বীজ ও ঝাড়-ফুঁক কুরআন হাদীছের বাক্যাবলী দ্বারা বৈধ উদ্দেশ্যে করা হলে তা জায়েয। পক্ষান্তরে কোন কুফ্‌র-শির্‌কের কথা থাকলে বা এরূপ কোন যাদু হলে তা দ্বারা তা'বীজ ও ঝাড়-ফুঁক হারাম। এমনিভাবে কোন অবৈধ উদ্দেশ্য হাছেলের জন্য তা'বীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা হলে তা জায়েয নয়, যদিও কুরআন-হাদীছের বাক্য দ্বারা তা করা হয়।

* যে সব বাক্য বা শব্দ কিংবা যে সব নকশার অর্থ জানা যায় না তা দ্বারা তা'বীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ নয়। বাজারে অনেক তাবীজের বই পাওয়া যায়, যার মধ্যে অনেক নকশাওয়ালা তাবীজের কথা বর্ণিত আছে, এগুলির অর্থ ব্যাখ্যা না বুঝে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

* তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা ভাল আছর হলে সেটাকে তাবীজদাতার বা আমেলের বুযুর্গী মনে করা ঠিক নয়। যা কিছু হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হয়।[১]

নজর ও বাতাস লাগা সম্বন্ধে আকীদা

* হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী নযর লাগার বিষয়টি সত্য, জান-মাল ইত্যাদির প্রতি বদনযর লেগে তার ক্ষতি সাধন হতে পারে। আপনজনের প্রতিও আপনজনের বদনযর লাগতে পারে, এমনকি সন্তানের প্রতিও মাতা-পিতার বদনযর লাগতে পারে। আর বাতাস লাগার অর্থ যদি হয় জিন-ভূতের বাতাস অর্থাৎ তাদের খারাপ নযর বা খারাপ আছর লাগা, তাহলে এটাও সত্য; কেননা, জিন-ভূত মানুষের উপর আছর করতে সক্ষম।

* কেউ কারও কোন ভাল কিছু দেখলে যদি ما شاء الله (মাশা আল্লাহ) বলে, তাহলে তার প্রতি তার বদনযর লাগে না।

* বদনযর থেকে হেফাযতের জন্য কাল সুতা বাঁধা বা কালি লাগানো কিংবা কাজলের টিপ লাগানো ভিত্তিহীন ও কুসংস্কার।

কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ সম্বন্ধে আকীদা

ইসলামী আকীদা মতে কোন বস্তু বা অবস্থা থেকে কুলক্ষণ গ্রহণ করা বা কোন সময়, দিন ও মাসকে খারাপ মনে করা বৈধ নয়। এমনিভাবে হাদীছ দ্বারা স্বীকৃত নয়—এরূপ কোন লক্ষণ মানা বৈধ নয়। তবে কেউ কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা বা দুশ্চিন্তায় রয়েছে এরূপ মুহূর্তে ঘটনাক্রমে বা কিছুটা

---

১. معارف القرآن۔ الشامی جلد مرقاۃ واغلاط العوام. آپ کے مسائل اور ان کا حل ج/۱ وغیرہ গ্রন্থসমূহ থেকে গৃহীত।

ইচ্ছাকৃতভাবে খুশী বা সাফল্যসূচক কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হলে কিংবা এরূপ কিছু দৃষ্টিগোচর হলে সেটাকে সুলক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এটা মূলতঃ কোন শব্দ বা বস্তুর প্রভাবকে বিশ্বাস করা নয়—এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র রহমতের আশাকে শক্তিশালী করা।

আমরা অনেকে অনেক ধরনের কুলক্ষণ গ্রহণ করে থাকি। যেমনঃ অনেক সময় দেখা যায় কুকুর লম্বা টান দিয়ে হু করে ডাকতে থাকে, আমরা তখন বলি বোধ হয় দেশে কোন বিপদ বা মহামারী আসছে। দেশে কোন বিপদ বা মহামারী আসছে কি-না তা কুকুরে জানবে কী করে? ও কি গায়েব জানে? আল্লাহ পাক কি ওকে গায়েব জানান? কুকুর হয়তো নিজস্ব কোন দুঃখের কারণে করুণ সুরে কাঁদছে আর আমরা কুলক্ষণ মনে করছি যে, কোন বিপদ আসবে বা মহামারি আসছে। এ ধরনের কুলক্ষণ গ্রহণ করা নিষেধ। হাদীছে বলা হয়েছে এরূপ ধারণা ভুল।

আগের যুগের মানুষের ধারণা ছিল এবং এখনও আমাদের কারও কারও ধারণা এরকম যে, হুতুম পেঁচা ডাকলে ব্যাপক হারে মানুষের মৃত্যু ঘটে। হাদীছে এ ধারণাকেও ভুল বলা হয়েছে। এক কবি বলেছেন:

ایں حسینان شہر نے بستیاں اجاڑ کر دیا   بوم سالہ مفت بدنام ہو گیا

অর্থাৎ হুতুম পেঁচা বলতে থাকে শহরের এই সুন্দরী নারীরা যেনা করে শহরকে উজাড় করল, আর খামোখা এই বেচারা হুতুম পেঁচার ঘাড়ে সব দোষ চাপানো হল।

শরীয়তের আকীদা বিরুদ্ধ কয়েকটি লক্ষণ ও কুলক্ষণের তালিকা

নিম্নে আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা উল্লেখ করা হল। শরীয়তে এসব ধারণার কোন ভিত্তি নেই। অনেকে মনে করেন বাপ-দাদারা এবং মুরব্বীরা এগুলো বলে আসছেন, তাই এগুলো ঠিক হবে না কেন? কিন্তু মনে রাখা দরকার বাপ-দাদা এবং মুরব্বীদেরও ভুল থাকতে পারে। তাছাড়া বাপ-দাদা বা মুরব্বীরা কি বলেছেন সেটা দলীল নয়। কুরআন-হাদীছে যা নেই এমন কোন আকীদা-বিশ্বাস রাখা যাবে না, চাই যে কেউ তা বলে থাকুক না কেন।

নিম্নে আমাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত কয়েকটি ভুল ধারণা উল্লেখ করা হল। উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীছ বিশ্লেষণ করে বলেছেন এ

ধারণাগুলো মারাত্মক ভুল। এ সব ধারণা রাখা গোমরাহী। এ সব ধারণা দ্বারা ঈমানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এরূপ আরও বহু ভ্রান্ত ধারণা ও গলত আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল :

১. হাতের তালু চুলকালে অর্থ-কড়ি আসবে মনে করা। এটা ভ্রান্ত ধারণা। অনেকে ডান হাতের তালু চুলকালে অর্থ-কড়ি আসবে মনে করে তা-তে চুমু দিয়ে থাকে। এটা ভুল।
২. চোখ লাফালে বিপদ-আপদ আসবে মনে করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।
৩. এক চিরুনিতে দু'জন চুল আঁচড়ালে উক্ত দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লাগবে মনে করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।
৪. চুল আঁচড়ানোর সময় হাতের থেকে চিরুনি পড়ে গেলে মেহমান আসবে মনে করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।
৫. কোন বিশেষ পাখি ডাকলে মেহমান আসবে মনে করা। অনেক এলাকায় এটাকে বলা হয় কুটুম পাখি। এই পাখি ডাকলে কুটুম বা মেহমান আসবে মনে করাও ভ্রান্ত ধারণা। পাখি কোন গায়েব জানে না। কাজেই সে কী করে জানবে যে, মেহমান আসছে? এমন বহু প্রমাণ আছে যে, এই পাখি ডাকে কিন্তু মেহমান আসে না।
৬. বিড়ালে গা চুলকাতে থাকলে সে মেহমান ডেকে আনছে মনে করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।
৭. যাত্রা পথে পেছন থেকে কেউ ডাকলে খারাপ মনে করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।
৮. যাত্রা পথে হোঁচট খেলে বা মেথর দেখলে বা কালো কলসি দেখলে, কিংবা বিড়াল দেখলে কুলক্ষণ মনে করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।
৯. অমুক দিন যাত্রা ভাল নয়, বা অমুক দিন বিবাহ ভাল নয় এই বিশ্বাস করা। এটা ভ্রান্ত ধারণা। ইসলামে যে কোন দিন যাত্রা করা যায়, যে কোন দিন বিবাহ করা যায়। বিভিন্ন পঞ্জিকায় দেখা যায় ওমুক দিন বিবাহ করা ভাল নয় বা অমুক দিন যাত্রা করা ভাল নয় ইত্যাদি লেখা আছে। পঞ্জিকার এই লেখা ভুল। এগুলো হিন্দুদের ধারণা। হিন্দুরা প্রথমে তাদের পঞ্জিকায় এসব কথা লিখেছে, তা দেখে মুসলমানরাও লিখতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ভ্রান্ত ধারণা। কাজেই পঞ্জিকার এসব কথায় বিশ্বাস রাখা যাবে না।

১০. যাত্রার মুহূর্তে কেউ তার সামনে হাঁচি দিলে কাজ হবে না—এরূপ বিশ্বাস করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।

১১. জিহ্বায় কামড় লাগলে কেউ তাকে গালি দিচ্ছে বা কেউ তাকে স্মরণ করছে মনে করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।

১২. চড়ুই পাখিকে বালুতে গোসল করতে দেখলে বৃষ্টি হবে মনে করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।

১৩. দোকান খোলার পর প্রথমেই বাকি দিলে সারা দিন বাকি বা ফাঁকি যাবে মনে করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা। বরং হতে পারে আর এক ভাই/বোনকে বাকি দিয়ে উপকার করলে তার বরকতে সারাদিন তার ব্যবসা ভাল হবে। কেননা, ঠেকা ব্যক্তিকে বাকিতে প্রদান করা একটা নেকীর কাজ। আর কোন নেকীর কাজ দ্বারা বে-বরকতী হয় না বরং তাতে আরও বরকত বেশী হয়।

১৪. কোন লোকের আলোচনা চলছে, ইতিমধ্যে বা কিছুক্ষণ পরে সে এসে পড়লে অনেকে বলে থাকেন সে অনেক দিন বেঁচে থাকবে। এটাও ভ্রান্ত ধারণা। এরূপ বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৫. কোন ঘরে মাকড়সার জাল বেশী হলে কেউ কেউ মনে করে থাকে উক্ত ঘরের মালিক ঋণগ্রস্ত হয়ে যাবে। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।

১৬. আসরের পর ঘরে ঝাড়ু দেয়াকে খারাপ মনে করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।

১৭. ঝাড়ু দ্বারা বিছানা পরিষ্কার করলে ঘর উজাড় হয়ে যাবে মনে করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।

১৮. কোন বাড়িতে বাচ্চা মারা গেলে সে বাড়িতে গেলে নিজের বাচ্চাও মারা যাবে মনে করা। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।

১৯. বাচ্চাদের গায়ে ঝাড়ুর আঘাত লাগলে তাদের শরীর শুকিয়ে যাবে মনে করা। এটা ভ্রান্ত ধারণা। তবে হ্যাঁ, সন্তান আল্লাহ্‌র দান করা নেয়ামত, তাই ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের গায়ে ঝাড়ু মারা ঠিক নয়।

২০. খাওয়ার সময় জিহ্বায় কামড় লাগলে এ কথা মনে করা যে, কে যেন তাকে স্মরণ করছে। এটাও ভ্রান্ত ধারণা।

২১. গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভ থাকাকালীন এই করলে বাচ্চার এই হবে, ঐ করলে বাচ্চার ঐ হবে ইত্যাদি অনেক ধারণা মা-বোনদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এ জাতীয় ধারণা-বিশ্বাস ভিত্তিহীন। মা-বোনেরা শাশুড়ী বা

মুরব্বীদের থেকে এ সব কথা শুনে অন্যদের কাছে তা বলে থাকেন। এতে মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাস প্রচারের গোনাহ হবে। কোন কোন মা বোন এর উপর খুব জোর দিয়ে থাকেন এবং বলে থাকেন যে, এগুলো মুরব্বীদের কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে মুরব্বীদের কথাও শরীয়তের দৃষ্টিতে মন্দ হলে তা বলা যাবে না বা বিশ্বাস করা যাবে না।[১]

বি: দ্রঃ বাজারে কী করিলে কী হয়—এ জাতীয় বিভিন্ন বই রয়েছে। এ জাতীয় বইতে বিভিন্ন কথা লেখা আছে যে, এই করলে এই হয়, ঐ করলে ঐ হয় ইত্যাদি। এ জাতীয় বইয়ের অধিকাংশ বক্তব্য ভিত্তিহীন। কুরআন-হাদীছের আলোকে সেগুলো বিশ্বাস করা যায় না। অতএব এগুলোকে বিশ্বাস না করা চাই।

ঈমানের শাখা

ঈমানের পরিচয়ের মধ্যে বলা হয়েছে কতকগুলো বিষয়কে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং আমলে পরিণত করার সমষ্টি হল ঈমান। এ থেকে বোঝা গেল— ঈমানের কিছু বিষয় দেলের দ্বারা সম্পন্ন হয়, কিছু জবানের দ্বারা এবং কিছু হাত, পা ইত্যাদি বহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এ সবগুলোকে ঈমানের শাখা বলা হয়।

বড় বড় ইমামগণ হাদীছের ইঙ্গিত পেয়ে গবেষণা করে কুরআন-হাদীছ থেকে ঈমানের ৭৭টি শাখা নির্ণয় করেছেন। এর মধ্যে দেলের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৩০টি। জবানের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৭টি, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন হয় ৪০টি। আমলের সুবিধার জন্য সংক্ষেপে পৃথক পৃথকভাবে সবগুলো পেশ করা হল :

যেগুলো দেলের দ্বারা সম্পন্ন হয়

দেলের দ্বারা ঈমানের ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়। নিম্নে সে ৩০টি আমলের কথা উল্লেখ করা হল :

১. আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা।
২. আল্লাহ চিরন্তন ও চিরস্থায়ী, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁর মাখলুক—একথা বিশ্বাস করা।

---

১. اغلاط العوام প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

৩. ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ঈমান আনা।
৪. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা।
৫. আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গম্বরদের প্রতি ঈমান আনা।
৬. তাকদীরের উপর ঈমান আনা।
৭ কিয়ামতের উপর ঈমান আনা।
৮. বেহেশ্‌তের উপর ঈমান আনা।
৯. দোযখের উপর ঈমান আনা।

উল্লেখ্য—উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১০ আল্লাহ্‌র সঙ্গে মহব্বত ও শওক রাখা। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা পেশ করা হল।

আল্লাহ্‌র মহব্বত

আল্লাহ্‌র সঙ্গে মহব্বত বা ভালবাসা অর্থ হল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অন্য সকলের সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়া। এরূপ মহব্বত রাখা ওয়াজিব। এরূপ মহব্বতের সর্বনিম্ন স্তর হল কুফ্‌রী-এর উপর ঈমানকে প্রাধান্য দেয়া। এটা না হলে মানুষ মুমিনই থাকে না। তারপরের স্তর হল আল্লাহ্‌র বিধানকে অন্যের বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়া। বিধান যে পর্যায়ের, তার প্রতি ভালবাসা বা সেটাকে প্রাধান্য দেয়ার হুকুমও সেই পর্যায়ের—ওয়াজিব হলে ওয়াজিব, মোস্তাহাব হলে মোস্তাহাব। উপরোক্ত ভালবাসাকে বলা হয় মহব্বতে আক্‌লী বা বুদ্ধিজাত ভালবাসা। আর এক প্রকারের ভালবাসা রয়েছে যাকে মহব্বতে ত্ববয়ী বা স্বভাবজাত ভালবাসা বলে। তা হল আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রাণের টান হয়ে যাওয়া, তাঁর কথা শুনলে তা মানার জন্য মন উদ্বেল হয়ে উঠা এবং তাঁর নাফরমানী ছেড়ে তাঁর আনুগত্য শুরু করে দেয়া। প্রথম প্রকারের ভালবাসা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত এবং তার উপর টিকে থাকলে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভালবাসা মনে সৃষ্টি হয়ে যায়।

বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন ও হাদীছের আলোকে বলেছেন: আল্লাহ্‌র মহব্বত সৃষ্টির জন্য দ্বীনের ইল্‌ম শিক্ষা করতে হবে, হিম্মত সহকারে শরীয়তের যাহিরী বাতিনী সব ধরনের আমলের পাবন্দী করতে হবে, ফরযসমূহকে পুরাপুরি আদায় করার সাথে সাথে বেশী বেশী নফলে লিপ্ত হতে হবে, যাহের ও বাতেন উভয়কে শুদ্ধ ও পবিত্র করতে হবে, আল্লাহর মাহবূব হযরত রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ পায়রবী করতে হবে। আর যা কিছুই আমল করতে হবে তা আল্লাহ্র মহব্বত বৃদ্ধি করার নিয়তে করতে হবে, কিছুক্ষণ নির্জনে বসে 'আল্লাহ আল্লাহ' করতে হবে। আর দু'আ করতে হবে যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে মহব্বত বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্র সাথে যেন মহব্বত হয়ে যায় সেজন্য দুআ করতে থাকা। হাদীছে এরকম দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে— হযরত দাউদ (আ.) নিম্নোক্ত দুআ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ

اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ۔(مشكوة)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আবেদন করছি, আমি যেন তোমার ভালবাসা পেয়ে যাই, তোমার সাথে যেন আমার ভালবাসা হয়ে যায়। তোমাকে যারা ভালবাসে, তাদের সাথেও যেন ভালবাসা হয়ে যায়। অর্থাৎ, তোমার প্রিয় বান্দাদের সাথে যেন আমার ভালবাসা হয়ে যায় এবং যে কাজ তুমি পছন্দ কর ঐ কাজের সাথে অর্থাৎ তোমার হুকুম আহ্কাম-এর সাথে যেন আমার ভালবাসা হয়ে যায়। হে আল্লাহ্! তোমার ভালবাসা যেন আমার কাছে বেশী হয় আমার নিজের চেয়ে, আমার পরিবারের চেয়ে, অর্থাৎ আমি আমার নিজেকে যত ভালবাসি, আমার পরিবারকে যত ভালবাসি তার চেয়ে যেন তোমার ভালবাসাটা বেশী হয়ে যায়। এমনকি ঠাণ্ডা পানি যেমন প্রিয়, তার চেয়েও যেন তোমার ভালবাসা আমার কাছে বেশী প্রিয় হয়। যখন কেউ প্রচণ্ড পিপাসার মুহূর্তে ঠাণ্ডা পানি পান করে, তখন সে উপলব্ধি করতে পারে তার ভিতরে শিরা-উপশিরায় ঠাণ্ডা পানি ছড়িয়ে যাচ্ছে। কী সুন্দর আরাম সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। একটা পরম আনন্দের অনুভূতি তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন আবেদন করছেন, হে আল্লাহ! আমরা যখন ইবাদত করব সারা দেহ-মন জুড়ে যেন এরকম আনন্দের অনুভূতি, এরকম তৃপ্তি এসে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ করতেন এটা হাদীছে এসেছে। এই দুআটি আমরাও মুখস্ত করে নেই। আরবীতে মুখস্ত করতে না পারলে একথা গুলো বাংলায় বলি। তবে আরবীতে মুখস্ত করলেই উত্তম। কারণ এই দুআ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্বাচিত ভাষা। বলা যায় আল্লাহ্র নির্বাচিত ভাষা। অতএব এ ভাষায় দুআ করতে পারলেই উত্তম।

Scanned by CamScanner

বুযুর্গানে দ্বীনের অন্তরে আল্লাহর প্রতি কত ভালবাসা থাকে, সে ব্যাপারে একটা ঘটনা শুনুন। হযরত মালিক ইবনে দীনার একজন মস্ত বড় বুযুর্গ ছিলেন। হযরত উবাইদাহ্ (রহ.) নাম্নী এক মহিলা তাঁর দরবারেই আসা-যাওয়া করতেন। কোন কোন বুযুর্গ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : এই উবাইদাহ হযরত রাবেয়া বসরীর চেয়েও বড় বুযুর্গ।

কথিত আছে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, কোন ব্যক্তির কাছে আল্লাহর সমীপে হাজির হওয়া যদি সর্বাধিক প্রিয় না হয়, তাহলে সে পরহেযগারই হতে পারবে না। একথা শোনার সাথে সাথেই হযরত উবাইদাহ্ (রহ.) বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তার অন্তরে আল্লাহ'র প্রতি কত ভালবাসা ছিল, আল্লাহ'র কাছে যাওয়ার প্রতি কত আকর্ষণ ছিল যে, শুধু আল্লাহ'র কাছে যাওয়ার কথা শুনতেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেছেন। অথচ আজকাল মুসলমানদের অবস্থা হল, তারা মৃত্যুর নাম পর্যন্ত শুনতে প্রস্তুত নয়। এর কারণ হল দুনিয়ার মহব্বত এবং দুনিয়ার সহায়-সম্পদের প্রতি অন্তরের টান। ফলে অন্তর কখনো এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে প্রস্তুত হয় না। তাই আল্লাহ্‌কে পেতে হলে অন্তর থেকে পৃথিবীর সব সহায় সম্পদের ভালবাসা দূর করে দিতে হবে। নতুবা আল্লাহ'র মহব্বত সৃষ্টি হবে না। তাঁর কাছে যেতেও মনে চাইবে না।

❖ ❖ ❖

১১. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ১১ নং হল আল্লাহর আছমায়ে হুছনা (আল্লাহর উত্তম নামসমূহ)-এর সাথে মহব্বত পয়দা করা এবং বেশী বেশী সেগুলো পাঠ করা। আছমায়ে হুছনা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১২. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ১২ নং হল বেশী বেশী তওবা করা। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

তাওবা-এস্তেগফারের নিয়ম পদ্ধতি

তাওবা অর্থ গোনাহ থেকে আনুগত্যের দিকে এবং গাফলত থেকে আল্লাহর স্মরণের দিকে ফিরে আসা। আর এস্তেগফার অর্থ ক্ষমা চাওয়া। প্রত্যেক বান্দার উপর তার পাপ থেকে তওবা-এস্তেগফার করা ওয়াজিব।

তওবার জন্য মোট ৫টি কাজ করতে হবে :

১. খাঁটি অন্তরে তওবা করতে হবে। অর্থাৎ শুধু আল্লাহর আযাবের ভয় ও তাঁর নির্দেশের মহত্ত্বকে সামনে রেখে তওবা করতে হবে।

২. অতীত পাপের প্রতি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে।
৩. উক্ত পাপ থেকে এখনই বিরত হতে হবে।
৪. ভবিষ্যতে উক্ত পাপ না করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।
৫. আল্লাহ্‌র হক বা বান্দার হক নষ্ট হয়ে থাকলে তার সংশোধন ও প্রতিকার করতে হবে। যেমন : নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহ্‌র হক আদায় না করে থাকলে তা আদায় করতে হবে। আর বান্দার হকের মধ্যে অর্থ সম্পদ বিষয়ক হক নষ্ট করে থাকলে উক্ত অর্থ বা উক্ত পরিমাণ অর্থ হকদারের নিকট বা তার মৃত্যু হয়ে থাকলে তার উত্তরাধিকারীর নিকট ফেরত দিতে হবে। আর সম্ভব না হলে তাদের থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে। আর অর্থ সম্পদ ব্যতীত অন্য কোন হক নষ্ট করে থাকলে যেমন গীবত বা গালি গালাজ করে থাকলে বা মুখে কিংবা কথায় কষ্ট দিয়ে থাকলে তার থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে। কোন ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে উক্ত অন্যায় উল্লেখপূর্বক ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে, অন্যথায় অন্যায় উল্লেখ করা ছাড়াই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। তার মধ্যেও ফেতনার আশঙ্কা থাকলে শুধু আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে। আর হকদার ব্যক্তি মৃত হলে তার উদ্দেশ্যে কিছু সদকা করে দিবে।

বিঃ দ্রঃ পরোল্লেখিত পাঁচটি বিষয় পূর্ণ করা ব্যতীত শুধু গতানুগতিকভাবে মুখে তাওবা/এস্তেগফারের বাক্য আওড়ালেই তাওবা হয়ে যায় না। যদিও শুধু তাওবার বাক্য মুখে আওড়ানোটাও ফায়দা থেকে খালি নয়।

❖ ❖ ❖

১৩. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ১৩ নং হল হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগয ফিল্লাহ অর্থাৎ কারও সাথে আল্লাহ্‌র জন্যই মহব্বত রাখা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই কারও সাথে দুশমনী রাখা। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগয ফিল্লাহ

ঈমান পূর্ণ করার জন্য যেমন আল্লাহকে ভালবাসতে হবে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি রাখতে হবে তদ্রূপ আল্লাহ যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে বা যে কাজ ও যে গুণকে ভালবাসেন তাকেও ভালবাসতে হবে। একে বলা হয় হুব্ব ফিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্য দোস্তী রাখা বা আল্লাহ্‌র ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসা। এর বিপরীত আল্লাহ যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে বা যে কাজ ও যে দোষকে ঘৃণা

করেন, না পছন্দ করেন তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে হবে। একে বলে বুগয ফিল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা বা আল্লাহর দুশমনের সঙ্গে দুশমনী রাখা। এমনিভাবে রাসূলের প্রিয় যারা তাদের ভালবাসা এবং রাসূলের দুশমন যারা অন্তর থেকে তাদের সাথে দুশমনী রাখাও ঈমানের জন্য জরুরী

❖ ❖ ❖

১৪. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ১৪ নং হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মহব্বত রাখা। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

রাসূলের প্রতি ভালবাসা প্রসঙ্গ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। হাদীছে তাই বলা হয়েছে :

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থাৎ তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে বেশী প্রিয় না হব, তার পিতা-মাতা এবং তার সন্তানাদি থেকে, এমনকি সমস্ত মানুষ থেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে এরকম অধিক প্রিয় না হব, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবে না।

একবার হযরত ওমর (রাযি.) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে ভালবাসি। ইসলামে এটাই নিয়ম যে, আল্লাহর ওয়াস্তে কেউ যদি কাউকে ভালবাসে, তাহলে তাকে বলে দিবে যে, আমি আপনাকে ভালবাসি। হযরত ওমর (রাযি.)ও তা-ই বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আপনাকে ভালবাসি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার জীবনের থেকেও আমাকে বেশী ভালবাস? ওমর (রাযি.) কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন যে, আমার জীবনের চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বেশী ভালবাসি কি-না। আমরা হলে বলে দিতাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার জীবন থেকেও আপনাকে বেশী ভালবাসি। কারণ, আমরা কপটতা জানি, সাহাবীগণ কপটতা জানতেন না। তারা যা অন্তরে আছে, মুখেও তা-ই বলতেন। যা হোক, হযরত ওমর (রাযি.) কিছুক্ষণ চিন্তা করে পরে বললেন : না, আমার জীবন থেকে আপনাকে বেশী ভালবাসি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : না ওমর, তাহলে হয়নি,

এখনো ভালবাসা হয়নি। তোমার জীবন থেকেও আমাকে বেশী ভালবাসতে হবে, তা না হলে আমাকে ভালবাসা হল না। তিনি আবার চিন্তা করলেন। চিন্তা করে মনকে প্রস্তুত করলেন। তারপর বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি আমার জীবন থেকেও আপনাকে বেশী ভালবাসি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : الان يا عمر অর্থাৎ ওমর! এতক্ষণে হয়েছে। নিজের আপনজন, নিজের ধন-সম্পদ, নিজের ঘর-বাড়ি, নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, এমনকি নিজের জীবন—এই সব কিছুর চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসা বেশী হতে হবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেছেন :

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآءُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ
اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ.

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি লোকদের বলে দাও : যদি তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভাই-বোন, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ, যা অনেক কষ্ট করে উপার্জন করেছ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যার লোকসানকে তোমরা ভয় পাও, তোমাদের ঘর-বাড়ি যাকে তোমরা খুব পছন্দ কর, এই সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি ভালবাসার মাত্রা যদি বেশী না হয়, তাহলে তোমরা শাস্তির নির্দেশের অপেক্ষা কর। (সূরা তাওবা : ২৪)

এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী নিজের স্বামী-স্ত্রী বা পুত্র-কন্যার চেয়ে, নিজের আপনজনের চেয়ে, নিজের ধন-সম্পদের চেয়ে, নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ঘর-বাড়ির চেয়ে, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বেশী ভালবাসতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম তা দেখিয়ে গেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাবুকের যুদ্ধে সমস্ত মাল এনে দিয়েছেন, ঘরে একটা কান-কড়িও রাখেননি। তাঁর মনোভাব হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেয়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আমি সব দিয়ে দিলাম। সারাটা জীবন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ব্যয় করেছেন। তিনি মক্কার একজন বড় ধনী ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তার এমন অবস্থা হয়েছে যে, নিজের জন্য কিছুই রাখেননি, রাসূলের জন্য নিজের সব কিছু উজাড় করে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَانَفَعَنِيْ مَالٌ قَطُّ مَانَفَعَنِيْ مَالُ اَبِيْ بَكْرٍ - (ابن ماجة)

অর্থাৎ কারও সম্পদ আমার এত কাজে আসেনি, আবূ বকরের সম্পদ আমার যত কাজে এসেছে। আবূ বকরের বদলা আমি দিতে পারব না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। নিজের সব কিছু তিনি দিয়ে দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। তিনি প্রমাণ করেছেন নিজের ধন-সম্পদের চেয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বেশী ভালবাসতেন। এক মহিলা সাহাবীর ঘটনা শুনুন। ওহুদের যুদ্ধে একবার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গিয়েছেন। দ্রুত সংবাদ মদীনায় পৌছে গেল। মদীনা থেকে ওহুদের ময়দান তিন মাইল দূরে। একজন মহিলা মদীনা থেকে ওহুদের ময়দানের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে আর জিজ্ঞাসা করছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী অবস্থা তোমরা আমাকে বল। একজন বলল : তোমার ছেলেতো শহীদ হয়ে গেছে। সে বলল : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী অবস্থা তোমরা আমাকে বল। সে শুধু ময়দানের দিকে ছুটছে আর জিজ্ঞাসা করছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী অবস্থা আমাকে বল। আরেকজন তাকে খবর দিল : তোমার স্বামী শহীদ হয়ে গেছে। এতেও তার পরওয়া নেই। সে শুধু ময়দানের দিকে ছুটছে আর বলছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী অবস্থা তা-ই আমাকে বল। এই মহিলা সাহাবী প্রমাণ করে দিয়েছেন, তার অবস্থাই বলে দিয়েছে যে, তার পুত্রের চেয়ে, তার স্বামীর চেয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বেশী ভালবাসতেন।[১]

হযরত যায়েদ ইবনে দাছিনা (রাযি.) একবার মক্কার মুশরিকদের হাতে বন্দী হয়ে যান। বদরের যুদ্ধে তিনি উমাইয়া ইবনে খালাফকে হত্যা করেছিলেন। তার পুত্র সাফওয়ান তাকে ক্রয় করে নিয়ে যায়। তার উদ্দেশ্য হল সে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিবে, অর্থাৎ হযরত যায়েদকে হত্যা করে দিবে। একজন হত্যার পূর্বে আবূ সুফয়ান হযরত যায়েদ ইবনে দাছিনার সামনে প্রস্তাব রাখল যে, এখন তোমাকে হত্যা করে দেয়া হবে। তবে যদি তুমি স্বীকার করে বল যে, তোমার স্থানে মুহাম্মাদকে হত্যা করে দেয়া হবে এবং তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে—এতে তুমি রাজী? তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তিনি বললেন : আমার স্থলে আমার রাসূলকে শহীদ করে দেয়া

১ سیرت المصطفیٰ جلد ۲ ص ۱.

হবে—এতো অনেক বড় কথা। আমি মুক্তি পেয়ে যাব, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে একটা সামান্য কাঁটা বিঁধবে, আমি তা-ও মেনে নিব না। আমার জীবনের বিনিময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে সামান্য একটু কাঁটা বিঁধুক, তা-ও বরদাশ্ত করব না। তিনি প্রমাণ করলেন যে, নিজের জীবনের চেয়েও তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বেশী ভালবাসতেন।[১]

হযরত ছওবান (রাযি.) একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়েছেন। তাকে খুব মলিন দেখাচ্ছিল। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। যেন বিরাট কোন দুশ্চিন্তা তার মাথার উপরে সওয়ার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছওবান! তোমার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভিতরে হঠাৎ চিন্তা এসে গেল যে, আপনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন, তখন আপনাকে ছাড়া দুনিয়াতে আমরা কীভাবে থাকব? আপনাকে ছাড়া এই দুনিয়াতে থাকা সম্ভব হবে না—এই চিন্তায় আমার মনের এই অবস্থা হয়েছে। তখন কুরআনের আয়াত নাযিল হল :

وَ مَنْ يُّطِعِ اللهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ
الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۞ (سورة النساء: ٦٩)

এই আয়াতের সারমর্ম হল—যারা আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ এবং আল্লাহ্র রাসূলকে ভালবাসে, তাদের সঙ্গে তাদের হাশর হবে। কিয়ামতের দিন তাঁরা একসঙ্গে থাকতে পারবে। এই আয়াত শুনে সাহাবী শান্ত হলেন। এসব ঘটনা প্রমাণ করে রাসূলের প্রতি সাহাবীদের কেমন ভালবাসা ছিল। এগুলোকে শুধু ইতিহাসের ঘটনা হিসেবে শুনলে চলবে না। নিজেদের মধ্যে ঐরকম উপলব্ধি সৃষ্টি করতে হবে। সাহাবায়ে কেরামের এরকম অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যায়, যা-তে বোঝা যায় তাঁরা নিজেদের জীবনের চেয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশী ভালবাসতেন।

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ছিল তাঁদের সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন্ত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

১. ايضا ।

তাঁরা ঐভাবে ভালবাসতে পেরেছেন। এখন আমরা কীভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ভালবাসব? আমাদের সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে উপস্থিত নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে কীভাবে তাঁকে ভালবাসতে হবে? সেটাও বহু হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়ে গেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবর্তমানে তাঁকে ভালবাসার বিশেষ ২টি তরীকা রয়েছে। যথা :

১ নং তরীকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে অর্থাৎ তাঁর তরীকাকে ভালবাসা। তাঁর তরীকাকে কেমন ভালবাসতে হবে? নিজের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসতে হবে। হাদীছে বলা হয়েছে :

مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِیْ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ۔(ترمذی)

অর্থাৎ যে আমার আদর্শকে, আমার তরীকাকে, আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে ভালবাসাই হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসা। অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে যদি আমরা আমাদের জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারি, তাহলে বোঝা যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আমাদের যথার্থ ভালবাসা আছে। এ জন্যেইতো যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন আদর্শকে নিয়ে সমালোচনা হয়, যেমন দাড়ি, টুপি, বোরকা, পর্দা, কুরআন, হাদীছ বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোন আদর্শ নিয়ে যখন সমালোচনা হয়, টিটকারী-উপহাস হয়, তখন যে খাঁটি মু'মিন, তার ভিতরে এরকম স্পৃহা এসে যায় যে, আমাকে এটার বদলা নিতেই হবে, এটার মোকাবেলা করতে গিয়ে আমার জীবন চলে গেলেও তা করতে হবে।

যদি কেউ বলেন এটা হল ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি, আমরা বলব এটা বাড়াবাড়ি নয়; এটা হল নিজের জীবনের চেয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বেশী ভালবাসা থাকার পরিচয়। এটা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যথার্থ ভালবাসা থাকার বহিঃপ্রকাশ। মু'মিন

হিসেবে আমার চেতনা হল—যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ নিয়ে তিরস্কার করা হবে, সেটা আমার কাছে বরদাশ্ত হতে পারে না। কেউ যদি আমার আপনজনকে আঘাত করে, তাহলে আমার ভিতর যতটুকু ক্রোধের সৃষ্টি হয়, যতটুকু সেটা প্রতিরোধ করার স্পৃহা সৃষ্টি হয়, রাসূলের আদর্শ নিয়ে কেউ সমালোচনা করলে, তার চেয়েও বেশী ক্রোধ সৃষ্টি হতে হবে, তার চেয়েও বেশী স্পৃহা আসতে হবে। এটাই হল ঈমানের পরিচয়।

২ নং তরীকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসার ২ নং তরীকা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাদের ভালবাসা ছিল, তাদের ভালবাসা। কারও সাথে যদি আমার প্রেম হয়ে যায়, কারও সাথে যদি আমার ভালবাসা হয়ে যায়, তাহলে তার আপনজনও আমার কাছে ভাল লাগবে। শুধু তার আপনজন নয়, তার সবকিছুই আমার ভাল লাগবে। এমনকি, তার কাপড়-চোপড়টাও আমার কাছে ভাল লাগবে, তার ঘর-বাড়িটাও আমার কাছে ভাল লাগবে। কারণ, তাকে আমার ভাল লাগে। তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসলে তাঁর প্রিয় সাহাবীদেরও ভালবাসতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বলেছেন :

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ ـ الحديث ـ (رواه الترمذى)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা সাবধান থাক, তোমরা আমার সাহাবীদের সমালোচনার পাত্র বানাবে না। আমার সাহাবীদের সমালোচনা করবে না, তাঁদের দোষ খুঁজবে না। যে আমার সাহাবীদের ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল, আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখল।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে সাহাবীদের ভালবাসা রাসূল (সাঃ)কে ভালবাসা, সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ রাখা। অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসার আরেকটা তরীকা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ভালবাসা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের মানুষদের ভালবাসা। হযরত আলী (রাযি.)কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালবাসতেন, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন : যে আলীকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আলীকে অসন্তুষ্ট করল, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারী সাহাবীদের ভালবাসতেন, তাই হাদীছে এসেছে : যে ব্যক্তি আনসারী সাহাবীদের ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল, যে তাদের অসন্তুষ্ট করল, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করল। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের ভালবাসতেন, তাদের ভালবাসা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসার একটা তরীকা। এমনকি, যাদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোনভাবে একটু সম্পর্ক রয়েছে, তাদেরও ভালবাসতে হবে। যেমন রাসূল (সাঃ) আরবদের মাঝে আগমন করেছেন, তাই আরবদেরও ভালবাসতে বলা হয়েছে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে :

أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ لِأَنِّيْ عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ - (الحاكم والطبراني والبيهقي)

অর্থাৎ তোমরা আরবদের ভালবাস। কারণ, আমি আরবী অর্থাৎ আমার ভাষা আরবী। সাথে সাথে কুরআনের ভাষাও আরবী, জান্নাতীদের ভাষাও হবে আরবী।

এ হাদীছে দেখানো হয়েছে যে, আরবদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটু ভাষাগত সম্পর্ক রয়েছে, তাই আরবদেরও ভালবাসতে বলা হয়েছে।

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে যদি আমরা ভালবাসি, তাঁর আপনজনকে যদি আমরা ভালবাসি, তাঁর সাহাবীদের যদি আমরা ভালবাসি, তাঁর দেশের মানুষকে যদি আমরা ভালবাসি, তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছু যদি আমরা ভালবাসি, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসা হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসার এই হল তরীকা। এই তরীকা যারা অনুসরণ করবে, তারাই রাসূলের আশেক বা রাসূল-প্রেমিক। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমিক হওয়ার দাবী করলাম, কিন্তু তাঁর আদর্শের ধারে কাছে আমি থাকলাম না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের সাথে আমার প্রেম নেই, তাহলে আমি রাসূলের প্রেমিক নই।

আল্লাহ পাক আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাঁটি প্রেমিক হওয়ার তাওফীক দান করুন। এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করতে হবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ نَبِيِّكَ وَحُبَّ بَيْتِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَ سُنَّتِهٖ وَاَحْيِنَا فِىْ مِلَّتِهٖ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ وَاَدْخِلْنَا فِىْ عُشَّاقِهٖ وَخُدَّامِ دِيْنِهٖ.

এ দুআটির ভাবার্থ হল— হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমরা চাই যেন তোমার প্রেমিক হতে পারি, যেন তোমার নবীর প্রেমিক হতে পারি, যেন নবীর পরিবার ও সাহাবীদের প্রেমিক হতে পারি, নবীকে যারা ভালবাসেন তাঁদের প্রেমিক হতে পারি। হে আল্লাহ! তোমার নবীর আদর্শ অনুসরণের তাওফীক দাও। নবীর দলভুক্ত করে আমাদের হাশরের ময়দানে উঠিয়ো। নবীর আশেকদের তালিকায়, দ্বীনের খাদেমদের তালিকায় আমাদের শামেল কর।

❖ ❖ ❖

১৫.দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ১৫ নং হল এখলাস। অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই করা। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

এখলাস ও সহীহ্ নিয়ত

ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে রাজী-খুশি করার নিয়তে করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রাজী-খুশী করার ইচ্ছা বা নিজের নফসের কোন খাহেশকে মিশ্রিত না করার নাম হল এখলাস তথা খাঁটি নিয়ত। কোন কোন ইবাদতে কিছু কিছু পার্থিব ফায়দাও হাছেল হয়ে থাকে তবে সেটাকে উদ্দেশ্য বানিয়ে ইবাদত করা ঠিক নয়। এই এখলাস ও খাঁটি নিয়ত না হলে কোন ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায় না।

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-সদকা, কুরআন তেলাওয়াত, উযূ, গোসল, এ'তেকাফ, কুরবানী, যিকির-আযকার ইত্যাদি যাবতীয় আমলের জন্য তাসহীহে নিয়ত হল বুনিয়াদী বিষয়। নিয়ত সহীহ না থাকলে আল্লাহর কাছে আমল কবূল হয় না এবং তার ছওয়াবও পাওয়া যায় না। অনেক আমল করলাম কিন্তু নিয়ত সহীহ নেই, তাহলে কোন আমলের কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না। সহীহ নিয়ত বা এখলাসকে তাই বলা হয় আমলের রূহ। রূহ ছাড়া অর্থাৎ প্রাণ ছাড়া একটা দেহের যেমন কোন মূল্য থাকে না, সহীহ্ নিয়ত বা

Scanned by CamScanner

এখলাস ছাড়াও কোন আমলের কোন মূল্য থাকে না। সহীহ নিয়ত বা এখলাস তাই ফরয, আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে বলেছেন :

وَمَا أُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ۔

অর্থাৎ মানুষকে যে ইবাদতের হুকুম দেয়া হয়েছে, তা এখলাসের সাথে অর্থাৎ সহীহ নিয়তের সাথে করার হুকুম দেয়া হয়েছে। (সূরা বাইয়্যিনাহ)

সহীহ নিয়ত না হলে সেটা ইবাদত বলে গণ্য হবে না, সেটার কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না।

নিয়ত খাঁটি করা তথা এখলাস হাছেল করার জন্য ইবাদত করার পূর্বে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করছি এই চিন্তা করে নিতে হবে এবং দেলের মধ্য থেকে কোন রিয়া বা লোক দেখানোর চিন্তা থাকলে তা দূরে নিক্ষেপ করতে হবে।

❖ ❖ ❖

১৬. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ১৬ নং হল আল্লাহকে ভয় করা তথা তাকওয়া। নিম্নে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়

"তাকওয়া" কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় : (১) ভয় (২) বিরত থাকা। বস্তুত মানুষের মধ্যে ভয় সৃষ্টি হলেই মানুষ কোন কিছু থেকে বিরত থাকে; তাই ভয় হল বিরত থাকার কারণ আর বিরত থাকা (অর্থাৎ গোনাহ থেকে বিরত থাকা) হল আসল উদ্দেশ্য।

শরীয়তে খাওফ বা ভয় বলতে নিজের ব্যাপারে আল্লাহর আযাবের ভয়-ভীতির সম্ভাবনা বোধ করাকে বোঝানো হয়। এই ভয় এত উত্তম জিনিস যে, এটা এসে গেলে মানুষ থেকে কোন গোনাহ হতে পারে না। তাই গোনাহমুক্ত জীবন অর্জন করতে হলে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় অর্জন করা অপরিহার্য। যে যত বেশী আল্লাহর নিকটতম মানুষ, তার মধ্যে এই ভয় তত বেশী।

আল্লাহর ভয় সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর একটা ঘটনা শুনুন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযি.)কে কতটুকু ভালবাসতেন তা কারও অজানা নয়। এমনকি এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিবি সাহেবানদের মধ্যে কাকে বেশী ভালবাসেন? রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর করলেন, আয়েশাকে। এ ছাড়াও হযরত আয়েশার মর্যাদা অনেক ছিল। তিনি শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে এত বেশী পারদর্শী ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবীরা পর্যন্ত মাসায়েলের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে সালাম করতেন। স্বয়ং হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন, দশটি বিশেষ গুণের কারণে আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য বিবিগণ থেকে শ্রেষ্ঠ। এতসব মর্যাদা এবং গুণের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয়ে তিনি এত বেশী জড়সড় থাকতেন যে, তিনি বলতেন—হায় আফসোস! আমি যদি কোন গাছ হতাম, তাহলে সর্বদা মাওলার তাসবীহ পড়তে থাকতাম এবং পরকালে আমাকে হিসাব দিতে হত না। হায়! আমি যদি পাথর হতাম! হায়! আমি যদি মাটির ঢিলা হতাম! অথবা আমি যদি গাছের পাতা কিংবা কোন তৃণলতা হতাম।

হযরত রাবেয়া বসরী এক উঁচু দরজার বুযুর্গ নারী ছিলেন। প্রায় সব মুসলিম মা-বোনের কাছেই তিনি পরিচিত। তিনি আল্লাহর ভয়ে সর্বদা কাঁদতেন। নামাযেও এত কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে সাজদার জায়গা পর্যন্ত ভিজে যেত। কখনো জাহান্নামের কথা শুনলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। সর্বদা কাফনের কাপড় সাথে রাখতেন। তাঁকে কেউ কোন কিছু উপহার দিলে এই বলে তা ফেরত দিতেন যে, এই দুনিয়া দিয়ে আমি কী করব? আমার দুনিয়ার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

এই খাওফ তথা তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় অর্জন করার জন্য বেশী বেশী আল্লাহ্‌র আযাব গযবের কথা এবং বেশী বেশী পরকালের আযাবের কথা চিন্তা করতে হবে।

❖ ❖ ❖

১৭. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ১৭ নং হল রজা তথা আল্লাহ্‌র রহ্‌মতের আশা রাখা।

১৮. নং হল আল্লাহ্‌র রহ্‌মত থেকে নিরাশ না হওয়া। নিম্নে রজা তথা আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

আল্লাহর রহমতের আশা

আল্লাহ্‌র আযাবের যেমন ভয় রাখতে হবে তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র রহমত, মাগফেরাত, জান্নাত এবং অনুগ্রহ লাভের আশাও মনে থাকতে হবে— নিরাশ হওয়া যাবে না। ভয় এতটা কাম্য নয় যে, আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে হতাশা

জন্মাবে। আবার আল্লাহ্‌র রহমতের আশাও এতটা প্রবল হওয়া ঠিক নয় যাতে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করার মত দুঃসাহস দেখা দেয়, এই ভেবে যে, আল্লাহ তাআলা রহমত করবেন। বরং ভয় ও আশা এতদুভয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকতে হবে।

এই রজা হাছেল করার উপায় হল—আল্লাহ অসীম ও অপার রহমতের অধিকারী—এ কথাটি বেশী বেশী চিন্তা করা।

উল্লেখ্য, কেউ যদি শুধু আল্লাহ্‌র রহমত-মাগফেরাত ও জান্নাত লাভের আশা করে আর তা লাভের পদ্ধতি অর্থাৎ নেক আমল, তওবা প্রভৃতি অবলম্বন না করে, তাহলে সেটাকে রজা বা আশা বলা হবে না বরং সেটা হবে বীজ বপন না করে ফসল অর্জনের আশা করার মত অলীক কল্পনা।

❖ ❖ ❖

১৯. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ১৯ নং হল হায়া বা লজ্জা। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

হায়া বা লজ্জাশীলতা

নিন্দা সমালোচনার ভয়ে কোন দূষণীয় কাজ করতে মানুষের মধ্যে যে জড়ত্ববোধ হয়ে থাকে সেটাকে বলে হায়া বা লজ্জা। এই লজ্জা মানুষকে ভাল কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্যেই হাদীছে বলা হয়েছে:

اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِيْ إِلَّا بِخَيْرٍ-

অর্থাৎ, লজ্জা কেবল সুফল ও কল্যাণই বয়ে আনে। (বোখারী ও মুসলিম)

এর বিপরীত লজ্জা না থাকলে মানুষ যে কোন অন্যায় কাজই করতে পারে। তাই হাদীছে এসেছে পূর্বের যুগের নবীগণও বলতেন:

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ-(بخاری)

অর্থাৎ যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন যা ইচ্ছা তা-ই কর।

এখানে উল্লেখ্য, কোন ভাল কাজ করতে যদি কখনও জড়তাবোধ হয় তাহলে সেটা লজ্জা বা প্রশংসনীয় গুণ বলে আখ্যায়িত হবে না। যেমন: বোরকা পরিধান করতে, পর্দা করতে, নামায পড়তে, তাসবীহ হাতে নিতে জড়তাবোধ হল, এটা লজ্জা বা হায়া নয় বরং এটা হল ধর্মীয় হীনমন্যতাবোধ। এমনিভাবে নিজেকে অত্যন্ত ছোট করে প্রকাশ করা, যেখানে সেখানে চুপ

করে থাকা এবং হীনতা প্রকাশ করা, এটাও লজ্জা বা হায়া বলে প্রশংসিত হওয়ার নয় বরং এটা হল স্বভাবগত দুর্বলতা।

❖ ❖ ❖

২০. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২০ নং হল শোকর। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

শোকর প্রসঙ্গ

নেয়ামতকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনে করতে হবে। আর যে ব্যক্তি নেয়ামতকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনে করবে, স্বাভাবিকভাবে তার ফলশ্রুতি স্বরূপ সে আল্লাহ্‌র প্রতি মনে মনে প্রফুল্ল হবে এবং সর্বান্তঃকরণে সেই অনুগ্রহ দানকারী আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত হবে, তাঁর নির্দেশ পালনে তৎপর হবে এবং তাঁর দেয়া নেয়ামতকে তাঁর নাফরমানীর কাজে লাগাবে না। এটাকেই বলা হয় শোকর বা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা।

আল্লাহ পাক আমাদের যত ধরনের নেয়ামত দান করেছেন, সব নেয়ামতের শোকর আদায় করতে হবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের কত ধরনের নেয়ামত দান করেছেন? সাধারণভাবে আমরা টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত তথা অর্থ সংক্রান্ত বিষয়কে আল্লাহ্‌র নেয়ামত মনে করি, এটাও অবশ্যই আল্লাহ্‌র নেয়ামত। তবে এর বাইরেও অনেক নেয়ামত আমরা ভোগ করি, যেটাকে আমরা নেয়ামত মনে করি না, অথচ সেগুলিও আল্লাহ্‌র নেয়ামত। সুস্থ থাকা, এটাও একটা বড় নেয়ামত। এক একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এত বড় এক একটা নেয়ামত যে, সারা দুনিয়া দিয়েও একটা অরিজিনাল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি আল্লাহ পাক মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের গঠন অবয়ব যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, এটাও আল্লাহ্‌র নেয়ামত। আমাদের যে অঙ্গ যেভাবে তৈরি করা আমাদের জন্য ভাল, আল্লাহ পাক সেভাবেই সে অঙ্গ তৈরি করেছেন। এক একটা অঙ্গ নিয়ে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে খুব সহজেই অনেকটা বুঝে আসবে আল্লাহ পাক যেভাবে অঙ্গ সৃষ্টি করেছেন তার ব্যতিক্রম হলে আমাদের জন্য অনেক অসুবিধার কারণ হত। চোখটা যেখানে আছে, সেখানে না থেকে যদি অন্য স্থানে থাকত, যেমন মাথার উপরে থাকত, তাহলে আমরা কীভাবে পথ চলতাম? যদি পিছনের দিকে চোখ থাকত, তাহলেও কীভাবে সামনের দিকে চলতাম। আল্লাহ পাক চোখ দিয়েছেন, এই চোখে যেন ধুলা-বালি লাগতে না পারে সে জন্য চোখের

উপরে ভ্রু দিয়েছেন। এরপরেও কোনভাবে যদি চোখে কোন ময়লা ঢুকে যায়, তাহলে চোখের পানির সাথে মিশে সেই ময়লা বের হয়ে আসছে।

আল্লাহ পাক যেভাবে যে অঙ্গ সৃষ্টি করেছেন তার ব্যতিক্রম হলে এর চেয়ে ভাল হত কি-না এ ব্যাপারে একটা ঘটনা শুনুন। একবার এক ব্যক্তি ট্রেন স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকায় তার ঘুম পেল। কিন্তু লোকের ভীড়ে সে হাত পা ছড়িয়ে শোয়ার জায়গা পেল না। সে মনে মনে ভাবল—যদি হাত-পা খুলে রাখার ব্যবস্থা থাকত, তাহলে হাত পা খুলে আমার ব্যাগের মধ্যে রেখে সুন্দর ঘুমাতে পারতাম। কিছুক্ষণ পর তার ব্যাগটা চুরি হয়ে গেল। তখন তার বুঝে আসল যে, হাত পা খুলতে পারার ব্যবস্থা থাকলে আজই তার হাত পা চুরি হয়ে যেত। এমনিভাবে প্রত্যেকটা অঙ্গ নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের গঠনের যথার্থতা বুঝে আসবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা তীনের মধ্যে বলেছেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.

অর্থাৎ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সবচেয়ে উত্তম গঠন দিয়ে। অর্থাৎ এমন গঠন দিয়ে তৈরি করেছি যে, এর চেয়ে সুন্দর গঠন আর হতে পারে না। আল্লাহ পাক এমন সুন্দর গঠন দিয়ে মানুষকে তৈরি করেছেন যে, এর চেয়ে সুন্দরভাবে, এর থেকে ভালভাবে গঠন করা সম্ভব নয়। অতএব এগুলিও আল্লাহ্র বড় নেয়ামত।

যত ধরনের বিপদ-আপদ থেকে আমরা মুক্ত আছি, যত ধরনের রোগ-শোক থেকে আমরা মুক্ত আছি, তা-ও আল্লাহ্র বড় নেয়ামত। বিপদ-আপদ বা রোগ-শোকে আক্রান্ত হলেও তখন মনে করতে হবে এর চেয়ে আরও বড় বিপদ-আপদ হতে পারত, এর চেয়েও বড় রোগ-ব্যাধি হতে পারত, আল্লাহ পাক তার থেকে আমাদের মুক্ত রেখেছেন, এটাও আল্লাহ্র নেয়ামত। তাছাড়া যতটুকু রোগ-ব্যাধি আমাকে দিয়েছেন, যতটুকু বিপদ-আপদে আমরা পড়ছি, এর ভিতরেও কোন না কোনভাবে কল্যাণ নিহিত আছে। আল্লাহ্র বিবেচনায় এর মধ্যেও কোন না কোনভাবে আমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। কাজেই এগুলিও আল্লাহ্র নেয়ামত। এভাবে যদি আমরা চিন্তা করি যে, আল্লাহ পাক যত কিছু দিয়েছেন সবই নেয়ামত, আল্লাহ পাক কত বিপদ-আপদ, কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্ত রেখেছেন, তা-ও সব নেয়ামত। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে আমাদের প্রতি আল্লাহ্র কত নেয়ামত, কত অনুগ্রহ তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَوْ اَنَّمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ۔(سورة لقمان : ٢٧)

অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত গাছপালা যদি কলম হয়, আর সমুদ্রের সাথে সাত সমুদ্র যোগ হয়ে যদি কালি হয় আর তার দ্বারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান-গরিমা, মহত্ত্ব-কুদরত ও তাঁর নেয়ামতের কথা লেখা হতে থাকে, তবুও তা লেখা শেষ করা যাবে না। সুবহানাল্লাহ! অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا۔(سورة ابراهيم : ٣٤)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা করলে শেষ করতে পারবে না।

শোকর আদায় করলে আল্লাহ তাআলা তার ফায়দা দুনিয়াতেও দান করে থাকেন। একটা ঘটনা শুনুন। হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈলকে মক্কায় রেখে যাওয়ার পর এবং কাবা শরীফ নির্মাণ করার পূর্বে দু'বার মক্কায় এসেছিলেন। একবারও হযরত ইসমাইল (আ.) ঘরে ছিলেন না। কিন্তু সেখানে তিনি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করেননি। প্রথমবার যখন আসেন, তখন হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ঘরে তাঁর এক স্ত্রী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলেন : সংসার কেমন চলছে? সে বলতে লাগল, বড় কষ্টে আছি, খুব অভাব-অনটনের মধ্যে দিন যাচ্ছে। তার কথার মধ্যে নাশোকরী প্রকাশ পেল ! তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন : তোমার স্বামী এলে তাকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে সে যেন ঘরের চৌকাঠ বদলে ফেলে!

হযরত ইসমাঈল (আ.) ঘরে এলে স্ত্রী সমস্ত ঘটনা তাকে শুনালেন। সবকিছু শুনে হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন : যিনি আগমন করেছিলেন তিনি আমার পিতা। আর চৌকাঠ হলে তুমি। আমার পিতা তোমাকে ত্যাগ করার কথা বলে গেছেন। এই বলে তিনি তাকে তালাক দিয়ে দেন এবং আবার বিবাহ করেন।

কিছুদিন পর হযরত ইবরাহীম (আ.) আবার আসলেন। তখনও হযরত ইসমাঈল (আ.) ঘরে ছিলেন না। ঘরে ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)কে খুব যত্ন করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, সংসার কেমন চলছে? তিনি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে বললেন : আমরা খুব ভাল আছি, খুব সুখে আছি। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁকে খুব

দু'আ দিলেন এবং বললেন : তোমার স্বামী আসলে তাকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে ঘরের চৌকাঠ ঠিক আছে। সে যেন এটা ঠিক রাখে। হযরত ইসমাঈল (আ.) ঘরে আসার পর বিবি তাকে পুরো ঘটনা জানালেন : ঘটনা শুনে তিনি বললেন, যিনি আগমন করেছিলেন তিনি আমার পিতা আর চৌকাঠ অর্থ তুমি। আমার পিতা আমাকে বলে গেছেন আমি যেন তোমাকে আমার সঙ্গে রাখি। (বোখারী শরীফ)

এ ঘটনায় দেখা গেল, প্রথম স্ত্রী শোকর আদায় করেনি, যার ফলে আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহীম (আ.) তার প্রতি নারাজ হয়েছেন এবং আর এক নবী হযরত ইসমাঈল (আ.) তাকে নিজের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় স্ত্রী শোকর আদায় করেছেন। তাই তিনি নবীর দুআ পেয়েছেন এবং নবীর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছেন। এটা তার শোকর আদায় করার ফল।

শোকর হাছেলের তরীকা হল আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহসমূহকে স্মরণ করতে হবে। আর সব নেয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করতে হবে।

উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র কোন নেয়ামতের ভিত্তিতে শুধু মুখে "আলহামদু লিল্লাহ" বললেই শোকর আদায় হয়ে যায় না বরং প্রকৃত শোকর হল নেয়ামতের ভিত্তিতে মনে মনে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রফুল্ল হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নেয়ামতদাতা আল্লাহর হুকুম পালনে তৎপর হওয়া। তবে এর সাথে সাথে খুশিতে জবান থেকে "আলহামদু লিল্লাহ" বের হলে সেটাও ইবাদত বলে গণ্য হবে এবং ছওয়াবের কারণ হবে।

❖ ❖ ❖

২১. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২১ নং হল অঙ্গীকার রক্ষা করা। নিম্নে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

অঙ্গীকার রক্ষা করা প্রসঙ্গ

অঙ্গীকার রক্ষা করা ওয়াজিব। এমনকি বালক বা শিশুকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কোন কিছু প্রদানের অঙ্গীকার করলেও তা পূরণ করা জরুরী। পূরণ করার নিয়ত না থাকলে অঙ্গীকার করবে না। তবে কোন পাপ কাজের অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করা যাবে না।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক মহিলা তার বাচ্চাকে কোলে নেয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোনভাবেই তাকে কোলে নিতে

পারছিল না। বাচ্চাটি কাছেই আসছিল না। তখন সেই মহিলা বাচ্চাটিকে কাছে আনার জন্য হাত মুঠ করে বাচ্চাকে দেখিয়ে বলছিল, আস! আস! তোমাকে এই জিনিসটা দিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আসলেই কি তাকে কিছু দেয়ার ইচ্ছা আছে, না কি শুধু ভোলানোর জন্যই মিছেমিছি বলছ? মহিলা বলল, না আমার হাতে খেজুর আছে, সত্যিই তাকে খেজুর দিব! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে ঠিক আছে। যদি তোমার কোন কিছু দেয়ার নিয়ত না থাকত, আর তুমি মিছেমিছিই এমন বলতে, তাহলে তোমার আমলনামায় একটা মিথ্যার গোনাহ লেখা হত।[১] দেখা গেল হাসি-ফূর্তিচ্ছলে হোক বা যে কোনভাবে হোক, ওয়াদা খেলাফ করার বা মিথ্যা বলার অবকাশ শরীয়তে নেই।

❖ ❖ ❖

২২. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২২ নং হল সবর। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

সবর প্রসঙ্গ

সবর অর্থ মনকে মজবুত রাখা, মনকে ধরে রাখা। সবর কয়েক প্রকার :

(ক) ইবাদতের সময় ছবর, অর্থাৎ ইবাদত ও নেক কাজের উপর মনকে পাবন্দির সাথে ধরে রাখা এবং ধৈর্যসহকারে সহীহ তরীকায় তা আদায় করা।

(খ) গোনাহের সময় সবর, অর্থাৎ মনকে গোনাহ থেকে দূরে ধরে রাখা।

(গ) কষ্ট ও বিপদ-আপদের সময় সবর, অর্থাৎ কেউ কোন কষ্ট দিলে প্রতিশোধ না নেয়া এবং রোগ-ব্যাধি হলে বা জান-মালের ক্ষতি হলে বে-সবর হয়ে শরীয়তের খেলাফ কোন কথা মুখ থেকে বের না করা বা বয়ান করে ক্রন্দন না করা।

সবর গুণের অনেক মর্তবা। সবরের প্রতিদান হল জান্নাত। হাদীছে বলা হয়েছে :

وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔

অর্থাৎ সবরের বদলা হল জান্নাত।

---

১. ابو داود كتاب الادب ۔

অর্থাৎ উপযুক্ত সবরের বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যেতে পারে। 'সবর' অর্থ আল্লাহ্ পাক যে অবস্থায় রেখেছেন আমি তাতেই আমি সন্তুষ্ট, আমার কোন অভিযোগ নেই। এরূপ সবরের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি চরম ভক্তি প্রকাশ করা হয়, আল্লাহ্র কাছে চরমভাবে নিজেকে সোপর্দ করা হয়। আল্লাহ্র নিকট নিজেকে এরকম চরমভাবে ন্যস্ত করলে কেন আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন না? যে ব্যক্তি বিনা যুক্তিতে আল্লাহ্কে ভালবাসে, বিনা যুক্তিতে আল্লাহ্র সব কিছুকে মেনে নেয়, কোন অভিযোগ ছাড়াই আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট থাকে, যে আল্লাহ্র প্রতি এরকম চরমভাবে নিবেদিত, তাকে আল্লাহ জান্নাত দিবেন না তাহলে কাকে জান্নাত দিবেন? তাই সবরের প্রতিদান হল জান্নাত।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ۔ اُوْلٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔

অর্থাৎ সবরকারীদের সুসংবাদ দিয়ে দাও। যারা বিপদের সময় বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও দয়া হবে।

❖ ❖ ❖

২৩. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২৩ নং হল ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা ও বড়দের প্রতি সম্মানবোধ। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

স্নেহ-মমতা ও সম্মানবোধ

স্নেহ-মমতা ও ভক্তিবোধ উত্তম চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। ইসলামে ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি সম্মানবোধের গুরুত্ব এত বেশী যে, কারও মধ্যে এ দুটো গুণ উপস্থিত না থাকলে সে যেন মুসলমান বলেই আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য থাকে না। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا۔الحديث

অর্থাৎ যারা ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী)

❖ ❖ ❖

সহমর্মিতা :

ছোটদের প্রতি স্নেহ বোধ, বড়দের প্রতি সম্মানবোধ-এর ন্যায় আর একটি বিষয় রয়েছে সহমর্মিতা। ইসলামে সহমর্মিতাবোধও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে :

اَلْمُسْلِمُوْنَ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اشْتَكٰى كُلُّهٗ. وَاِنْ اشْتَكٰى رَأْسُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ-(مسلم)

অর্থাৎ সমস্ত মুসলমান একটা দেহের ন্যায়, একটা দেহের চোখ যদি অসুস্থ হয়, তাহলে গোটা দেহ তা টের পায়, মাথা যদি অসুস্থ হয়, গোটা দেহ তা টের পায়। অর্থাৎ একটা দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয় তাহলে অন্যান্য অঙ্গ যেমন তা উপলব্ধি করতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত মুসলমানের মধ্যে একের প্রতি অন্যের এরূপ একাত্মতা ও সহমর্মিতা থাকতে হবে।

সমস্ত মানুষ একই পরিবারভুক্ত, সকলেই এক আল্লাহর বান্দা, সকলেই এক আদমের সন্তান— মনের মধ্যে এই উপলব্ধি বদ্ধমূল ও উজ্জীবিত থাকলে পারস্পরিক একাত্মতা ও সহমর্মিতাবোধ উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। এক হাদীছে বলা হয়েছে :

كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا-(متفق عليه)

অর্থাৎ তোমরা সকলে এক আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে জীবন যাপন কর।

হাদীছে আরও ইরশাদ হয়েছে : তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একথা বলে সহমর্মিতাবোধকে জাগ্রত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

❖ ❖ ❖

২৪. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২৪ নং হল রেযা বিল কাযা তথা তাকদীর ও আল্লাহ্‌র ফয়সালার উপর রাজী থাকা। নিম্নে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

আল্লাহ্‌র ফয়সালায় রাজী থাকা

আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর ফয়সালার উপর অভিযোগ পরিত্যাগ করাকে বলা হয় 'রেযা বিল কাযা'। মানুষ আসবাব গ্রহণ করবে, চেষ্টা চরিত্র করবে, দু'আ করবে সুন্নাত এবং আনুগত্য হিসেবে। তারপর[]

Scanned by CamScanner

আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফয়সালা ঘটবে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং মুখে বা অন্তরে কোন অভিযোগ আনবে না। স্বয়ং চেষ্টা এবং দু'আ করার সময়ও মনের এই অবস্থা রাখবে যে, উদ্দেশ্য মোতাবেক না ঘটলেও তাতে আমি সন্তুষ্ট। এটাই হল রেযা বিল কাযা।

আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা সহজ হবে যদি কেউ এই চিন্তা করে যে, আল্লাহ ভাল, তাঁর সব কাজই ভাল, তিনি পরম দয়ালু, বিন্দুমাত্র নিষ্ঠুর নন; অতএব তিনি যা করেন তাতেই মঙ্গল নিহিত।

❖ ❖ ❖

২৫. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২৫ নং হল তাওয়াক্কুল করা। নিম্নে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হতে পারে না— এই বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ। যেহেতু তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হতে পারে না, তাই শরীয়তের নিয়মানুযায়ী যে কোন চেষ্টা-তদবীর গ্রহণ করার পর কামিয়াবীর জন্য মনে মনে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখতে হবে। এরূপ ভরসা রাখাকে বলা হয় তাওয়াক্কুল। উল্লেখ্য, চেষ্টা তদবীর না করে হাত পা গুটিয়ে অকর্মন্য হয়ে বসে থাকা বা চেষ্টা না করে ফলের আশা করা শরীয়তের বিধান নয় এবং এটাকে তাওয়াক্কুলও বলা হয় না বরং নিয়মমত চেষ্টা তদবীর করে, নিয়মমত আসবাব গ্রহণ করে তার ফলের জন্য এবং কামিয়াবী-র জন্য মনে মনে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখাকেই বলা হয় তাওয়াক্কুল।

প্রথম অধ্যায়ে হযরত হাজেরা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সে ঘটনায় হযরত হাজেরা (আ.)-এর তাওয়াক্কুল এবং তার পরিণামে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত লাভের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার গুণ হাছেল করার এ কথা চিন্তা করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, আল্লাহ দয়াময়, তিনিই মঙ্গলময়, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই। কাজেই তাঁর উপর ভরসা করলেই আমার মঙ্গল হবে। তাঁর উপর ভরসা করা ব্যতীত কোন উপায়ও নেই।

❖ ❖ ❖

২৬. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২৬ নং হল নিজেকে বড় এবং ভাল মনে না করা। নিজেকে বড় মনে করাকে বলা হয় উজব বা আত্মগর্ব। নিম্নে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

নিজেকে বড় মনে করা

"অহংকার" বলা হয় নিজেকে বড় মনে করা, সেই সাথে সাথে অন্যকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করা। কেউ যদি কোন বিষয়ে অন্যকে তুচ্ছ মনে না করে শুধু নিজেকে বড় মনে করে গর্ববোধ করে, তাহলে সেটাকে বলা হয় উজব বা আত্মগর্ব। অহংকার করাও কবীরা গোনাহ, আত্মগর্ব করাও গোনাহে কবীরা।

আমরা ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধি, রূপ-সৌন্দর্য, মান-মর্যাদা যা কিছু নিয়ে নিজেদেরকে বড় মনে করে থাকি, যদি আমরা চিন্তা করতাম যে, এগুলো আল্লাহর দান, তাহলে আমরা নিজেদের বড় মনে করতে পারতাম না। বরং যত ধন-সম্পদ ইত্যাদি বাড়ত, তত মনে করতাম যে, আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কথা মনে করে ততই আল্লাহর সামনে বেশী নত হতাম। আমার যত ধন-সম্পদ থাকুক, যত জ্ঞান-বুদ্ধি থাকুক, যত মান-সম্মান থাকুক, যত প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকুক, যা কিছুই থাকুক, এ সবইতো আল্লাহর দেয়া। আমার নিজস্ব বাহুবলে কিছু অর্জিত হয়নি। তাহলে এগুলো নিয়ে আমার নিজেকে বড় মনে করা বা আত্মগর্ব করার কী আছে?

❖ ❖ ❖

২৭. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২৭ নং হল হিংসা-বিদ্বেষ না রাখা। নিম্নে হিংসা-বিদ্বেষ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা

পরের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি ভাল কিছু দেখে মনে কষ্ট লাগা এবং আকাঙ্খা হওয়া যে, সেটা না থাকুক বা ধ্বংস হয়ে যাক এবং তা হলেই মনে আনন্দ লাগা— এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় হাছাদ (হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা)। সাধারণতঃ তাকাব্বুর (নিজের বড়ত্ববোধ) বা শত্রুতা থেকে এই মনোভাব সৃষ্টি হয় কিংবা কারও মন যদি খবীছ হয় তাহলেও এই মনোবৃত্তি জাগতে পারে। হাছাদের কারণে নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হতে হয়। হিংসুক ব্যক্তি

Scanned by CamScanner

চিরকাল মনের কষ্টে কাল যাপন করতে থাকে, জীবনে কখনও মনে শান্তি পায় না।

এখানে উল্লেখ্য, কারও ভাল কিছু দেখে সেটা ধ্বংসের কামনা না করে শুধু নিজের জন্য অনুরূপ হয়ে যাওয়ার কামনা করা গর্হিত নয় বরং এরূপ কামনা করার ক্ষেত্রে মাসআলা হল সেটা ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয় হলে এরূপ কামনা করা ওয়াজিব, মোস্তাহাব পর্যায়ের হলে মোস্তাহাব আর মোবাহ পর্যায়ের হলে মোবাহ। এটাকে হাছাদ নয় বরং গেবতা বলা হয়।

কারও মনে কারও প্রতি হাছাদ বা হিংসা দেখা দিলে মনে না চাইলেও লোক সমাজে তার প্রশংসা করবে এবং তার যে নেয়ামতের কারণে হাছাদ হয়, সেটা তার জন্য আরও বৃদ্ধি পাক আল্লাহর কাছে এই দুআ করতে থাকবে। আর মনে না চাইলেও দেখা হলে তাকে সালাম করবে, তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাবে। এরূপ করতে থাকলে মন থেকে হাছাদ বা হিংসা দূর হয়ে যাবে।

❖ ❖ ❖

২৮. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২৮ নং হল রাগ না করা। নিম্নে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

রাগ বা গোস্বা প্রসঙ্গ

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রক্তের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাকে বলে রাগ বা গোস্বা। এই রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানুষের বুদ্ধি ঠিক থাকে না, তখন মুখ দিয়েও অনেক অন্যায় কথা বের হয়ে যায়। আবার অনেক অন্যায় কাজও করে ফেলে এবং পরিণামে অনেক ক্ষতি ও লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়। রাগ স্বভাবগত বিষয়, এর জন্য মানুষ দায়ী নয়। তবে রাগ চরিতার্থ করা না করা মানুষের ইচ্ছার অধীন, তাই এর জন্য সে দায়ী।

রাগ বর্জন করা দ্বারা আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যারা উঁচু মাকাম মর্যাদার লোক, তারা রাগ করতেও পারেন না। রাগ তাদের জন্য শোভাও পায় না। এক রেওয়ায়েতে এসেছে : একদিন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) তাঁর গোলামের প্রতি রাগ হয়ে তাকে বকাঝকা করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে বললেন :

لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ !

অর্থাৎ রাগের কারণে তিরস্কারও করছ আবার অন্য দিকে সিদ্দীকও হয়ে যাবে? কা'বার রবের কসম! এমন হতে পারে না।[১]

অর্থাৎ মানুষের প্রতি রাগ দেখাও, আবার তুমি আবূ বকর সিদ্দীক! "সিদ্দীক" বলা হয় দ্বীনের ক্ষেত্রে যার মর্যাদা অনেক উঁচু, ধর্মের ক্ষেত্রে যার মর্যাদা, যার মাকাম অনেক উপরে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সিদ্দীক হয়ে আবার মানুষের প্রতি রাগ? সিদ্দীক হবে আবার রাগও করবে, মানুষকে বকাঝকা করবে, তিরস্কার করবে, তা কী করে হতে পারে? এ দুটোর ভিতর সমন্বয় হতে পারে না। তুমিতো আবূ বকর সিদ্দীক, তাই তুমি রাগ করতে পার না। তুমি ধর্মীয় বড় ব্যক্তিত্ব হয়ে মানুষের প্রতি রাগ করবে, রাগ হজম করতে পারবে না, তা হতে পারে না।

দ্বীনের পথে চলতে গেলে রাগ হজম করার অভ্যাস করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের এক আয়াতে নেককার মানুষের গুণাগুণ বর্ণনা করে বলেছেন :

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ۔(ال عمران: ۱۳۴)

অর্থাৎ নেককার মানুষের একটা বড় গুণ হল তারা ক্রোধ হজম করতে জানে।

বুযুর্গানে দ্বীন কীভাবে রাগ দমন করতেন তার কয়েকটা ঘটনা শুনুন। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কত বেশী রাগকে দমন করতে পারতেন, তার আর একটা ঘটনা নিম্নরূপ।

একদিন তিনি মসজিদ থেকে নামায পড়ে ফারেগ হয়ে ঘরে যাচ্ছিলেন। তখন একজন লোক তাঁর সাথে সাথে যাচ্ছিল। লোকটা তাঁর সমালোচনা শুরু করে দিল যে, আপনি এই করেন, সেই করেন ইত্যাদি। লোকটা সমালোচনা করেই যাচ্ছে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সমালোচনা শুনে মোটেই রাগছেন না; বরং শুনছেন আর হাসছেন। কিছুদূর গিয়ে রাস্তা দুই দিকে ভাগ হয়ে গেল। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর বাসার রাস্তা গিয়েছে এক দিকে, আর সেই লোকের বাসার রাস্তা গিয়েছে আরেক দিকে। সেই মোড়ে গিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) দাঁড়ালেন এবং বললেন ভাই! এখন তো আমরা আলাদা হয়ে যাব। আমি বুঝলাম আমার ব্যাপারে আপনার ভিতরে অনেক রাগ রয়ে গেছে। অনেক কিছুই হয়তো বলার আছে, এখন আলাদা হয়ে গেলে তা আর বলতে পারবেন না। তাই আমি এখানে একটু দাঁড়াই, আপনার

১. اصلاحی خطبات ج/۸ ؛

Scanned by CamScanner

যা বলার আছে বলুন। বলে আপনার মন পুরো শান্ত হলে তখন আমি চলে যাব। তারপর চিন্তা করে দেখব আপনি যা বলেছেন যদি সে সব ব্যাপারে আমার এসলাহ করার কিছু থাকে, সংশোধন করার কিছু থাকে, অবশ্যই তা করব।[১]

এই হল বুযুর্গানে দ্বীনের আমল। তাঁরা নিজেদের ব্যাপারে কখনই রাগ করতেন না, কিন্তু শরীয়তের কোন হুকুম লঙ্ঘন হতে দেখলে, শরীয়তের অবমাননা হতে দেখলে তারা প্রচণ্ড রাগ হয়ে যান। কোথায় রাগ করা যাবে আর কোথায় করা যাবে না—এটাই হল তার মাপকাঠি। আমি রাগবো কিসের জন্য? আমি আমার নিজের জন্য রাগবো না বরং শরীয়তের জন্য রাগবো। রাগ, বন্ধুত্ব-শত্রুতা, আদান-প্রদান সবকিছু আবর্তিত হবে শরীআতকে কেন্দ্র করে, দ্বীনকে কেন্দ্র করে। তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে একথাই বলা হয়েছে :

مَنْ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ وَاَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهٗ۔

অর্থাৎ ঈমান পূর্ণ করার চারটা আমল। তা হল—যা কিছু মানুষকে দিব আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য দিব অর্থাৎ দ্বীনকে সামনে রেখে দিব। যা না দিব তা-ও আল্লাহকে রাজী-খুশী করার জন্য অর্থাৎ দ্বীনকে সামনে রেখে করব। যাকে ভালবাসব আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসব। আর যার প্রতি রাগ হব, যাকে ভাল না বাসব, সেটাও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করব।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে মানুষের দেয়া, না দেয়া, ভালবাসা, রাগ হওয়া না হওয়া সবকিছু আবর্তিত হবে আল্লাহকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ দ্বীন ও শরীয়তকে কেন্দ্র করে। যে ব্যক্তি এরকম করে, সে-ই পূর্ণাঙ্গ ঈমানের উপর আছে, পূর্ণাঙ্গ সহীহ তরীকার উপরে আছে।

রাগ হতে হবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে অর্থাৎ দ্বীনের উদ্দেশ্যে। তাই ব্যক্তির প্রতি রাগ নয় বরং কোন অন্যায় দেখলে সেই অন্যায়ের প্রতি রাগ আসা জরুরী। সেই অন্যায়কে বাধা দেয়া আমার দায়িত্ব। আমার সামনে কোন অন্যায় কাজ হচ্ছে, আমার সাধ্য আছে আমি সেটাকে বাধা দিতে পারি, সেটার প্রতিবাদ করতে পারি, তবুও করলাম না, তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম না, তাহলে আমি সহীহ তরীকার উপর নেই। অন্যায়ের প্রতি রাগ আসবে কিন্তু ব্যক্তির প্রতি কোন রাগ থাকবে না। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে তিনি তাঁর সামনে, তাঁর মজলিসে

---

১. اصلاحی خطبات ج/۸ ۱

কোন অন্যায় কাজ হতে দেখলে অত্যন্ত রেগে যেতেন। যদি কেউ তাঁর মজলিসে বসার আদব রক্ষা না করত, সাথে সাথে তিনি তাকে ধমক দিতেন। এজন্য প্রসিদ্ধ ছিল তিনি খুব রাগী। হযরত থানভী (রহ.) নিজেই বলেছেন— আমি যখনই রাগ প্রকাশ করি, তখন আমার দিলে দিলে এই নিয়ত থাকে যে, হে আল্লাহ! আমি অন্যায়ের জন্য রাগ করছি, ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার কোন ক্ষোভ নেই। ঐ ব্যক্তিতো তোমার কাছে আমার চেয়ে ভাল হতে পারে। তোমার কাছে ঐ ব্যক্তির মর্যাদা আমার চেয়ে বেশীও হতে পারে। তাই ব্যক্তির প্রতি আমার কোন রাগ নেই, আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি মাত্র।

রাগ হবে দ্বীনের খাতিরে: ব্যক্তিগত আক্রোশে নয়। এর একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হল হযরত আলী (রাযি.)-এর ঘটনা। প্রসিদ্ধ আছে এক ইয়াহুদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দিয়েছিল। হযরত আলী (রাযি.) ছিলেন বাহাদুর মানুষ। তিনি সাথে সাথে লোকটাকে ধরে উঁচু করে আছাড় দিয়ে ফেলে দিলেন। তারপর তার বুকের উপরে চড়ে বসলেন যে, তোকে শেষ করে দিব। রাসূলকে গালি দেয়ার মত এতবড় দুঃসাহস তোর! তখন লোকটা হযরত আলী (রাযি.)-এর মুখের উপর থুতু মারল। তখন সাথে সাথে হযরত আলী (রাযি.) তাকে ছেড়ে দিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল আপনার মুখে থুতু মারা হল, আপনার তো আরও রেগে যাওয়ার কথা, অথচ আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন! হযরত আলী (রাযি.) বললেন : পূর্বে তার প্রতি রাগ করেছিলাম আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য যে, আল্লাহর রাসূলকে সে গালি দিয়েছে, এতবড় দুঃসাহস তার। আর যখনই সে আমার মুখে থুতু মেরেছে, তখন আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ এসে গেছে। এই রাগ বা আক্রোশটা আল্লাহর জন্য নয় বরং আমার নিজের জন্য। এখন তাকে হত্যা করলে সেটা হবে আমার ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। এটাই হল দ্বীনকে সামনে রেখে রাগ করা বা রাগ বর্জন করার নমূনা।[১]

আর একটা ঘটনা শুনুন।[২] হযরত আব্বাস (রাযি.) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর ঘর ছিল মসজিদে নববীর সাথে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুব ভালবাসতেন। হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর ঘরের পানি পড়ার পরনালাটা মসজিদের গায়ে এসে লেগেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরনালাটা সরাতে

---

১. اصلاحی خطبات ج/৮ ॥ ২. ایضا ॥

বলেননি; বরং বলেছেন, এতো আব্বাসের ঘরের পরনালা। এটা এভাবেই থাকুক। হযরত ওমর (রাযি.) এ ঘটনাটা জানতেন না। এরপর হযরত ওমর (রাযি.) যখন খলীফা হয়েছেন, তখন তিনি দেখেছেন আল্লাহ্‌র ঘরের সাথে পরনালাটা লেগে আছে, তিনি রাগান্বিত হয়েছেন যে, নিজের ঘরের চালের পানি আল্লাহ্‌র ঘরের পরে গিয়ে পড়ছে, এটা বেআদবী হচ্ছে। হযরত ওমর (রাযি.) হুকুম দিয়েছেন। পরনালাটি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। হযরত আব্বাস (রাযি.) শুনেই খলীফার কাছে এসে বললেন যে, আপনি আমার ঘরের পরনালা ভেঙ্গেছেন, আপনি জানেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এই পরনালাটি এভাবেই মসজিদের সাথে লাগানো ছিল, রাসূল সেটা ভাঙ্গেননি বরং সমর্থন করেছেন? একথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর (রাযি.)-এর আগের রাগ পানি হয়ে গেল। তিনি আব্বাস (রাযি.)কে বললেন : আপনি আমার সাথে আসুন! আব্বাস (রাযি.)কে সাথে নিয়ে ঐ পরনালার সেখানে গেলেন। সেখানে গিয়ে সওয়ারীর মত হয়ে দাঁড়ালেন এবং আব্বাস (রাযি.)কে বললেন : আপনি আমার পিটের উপর দাঁড়িয়ে পরনালাটি আবার লাগান।

হযরত আব্বাস (রাযি.) বললেন : আপনি খলীফা, আপনার পিঠে উঠে কেন লাগাব? আমি অন্য কোন লোক দিয়ে লাগিয়ে নিব। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন : না, আল্লাহর রাসূল যেটা দেখেছেন এবং সমর্থন করেছেন, আমি ওমর সেটা ভাঙ্গার কে? আমার নফসের শাস্তির জন্য আপনাকে বলছি আমি এখানে দাঁড়াব, আপনি আমার পিঠে উঠে ওটা লাগাবেন। হযরত ওমর (রাযি.) প্রথমে সেটা ভেঙ্গেছেন দ্বীনী চেতনায়, প্রথমে রাগান্বিত হয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ্‌র রাসূলের খাতিরে, আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রাসূলকে রাজী-খুশী করার জন্য। পরে যখন বুঝেছেন এই ভাঙ্গাটা রাসূলের রেযামন্দীর বাইরে চলে যাচ্ছে, এই রাগটা রাসূলের সন্তুষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। তখন তিনি আবার সেটা করেছেন যাতে রাসূল সন্তুষ্ট। এভাবে আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের রেযামন্দীর কথা চিন্তা করে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

এছাড়াও রাগ নিয়ন্ত্রণ করার আরও অনেক পন্থা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটা পন্থা হল দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ দমন না হলে বসে পড়তে হবে। বসা অবস্থায় রাগ দমন না হলে শুয়ে পড়তে হবে। তাহলে নফসের উল্টো করা হবে। নফসকে দমন করতে হলে সব সময় নফসের উল্টো করতে হয়। নফসের স্বভাব হল যখন রাগ হয়, সে চেতে ওঠে, শোয়া থাকলে বসে যায়, বসা থাকলে দাঁড়িয়ে ওঠে। অর্থাৎ রাগের গতি হল উপরের

দিকে। তাই বলা হচ্ছে রাগ দমন করার জন্য গতি নিচের দিকে করে দাও। দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়, বসা থাকলে শুয়ে পড়, তাহলে রাগ কমে যাবে। এরপরও যদি রাগ দমন না হয়, তাহলে ঠাণ্ডা পানি পান করতে বলা হয়েছে। ঠাণ্ডা পানি পান করলে রাগের কারণে রক্তে যে উষ্ণতা সৃষ্টি হয়, সেই উষ্ণতা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এভাবে রাগ পড়ে যাবে।

রাগ দমন করার আরেকটা পন্থা হল : যখন রাগ হয়, তখন মনে করতে হবে যে, আমার চেয়ে উপরওয়ালা একজন আছেন, তিনি যদি আমার প্রতি রাগ করেন, তাহলে আমার কী উপায় হবে?

রাগ দমন করার আর একটা পদ্ধতি হল 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়ে নেয়া। কারণ রাগের মধ্যে শয়তানের ওয়াছওয়াছার দখল থাকে। আর শয়তানের ওয়াছওয়াছা থেকে বাঁচার একটা উপায় হল 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম' পাঠ করা। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে :

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ۔(حم السجدة: ٣٢)

অর্থাৎ যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন উস্কানী তোমাকে পায়, তাহলে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম' পড়ে নিও। (হা-মীম আস্ সাজদাহ : ৩৬)

এতেও রাগ না গেলে ঠাণ্ডা পানি পান করতে হবে বা উযূ কিংবা গোসল করে নিতে হবে।

❖ ❖ ❖

২৯. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২৯ নং হল কারও প্রতি বদ গোমানী বা কু-ধারণা না করা, কারও অহিত চিন্তা না করা। নিম্নে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

বদগোমানী বা কু-ধারণা প্রসঙ্গ

যে সব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্ম পরায়ণ ও নেককার বলে মনে হয়, তার সম্পর্কে কোন প্রমাণ ব্যতীত কুধারণা পোষণ করা হারাম ও গোনাহে কবীরা। হাদীছে বিনা প্রমাণে কারও প্রতি কু-ধারণা করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ۔ (ابن كثير فى تفسيره عن مالك)

অর্থাৎ তোমরা কু-ধারণা থেকে বিরত থাক, কেননা কু-ধারণা করা মিথ্যার শামিল। কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ . إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ .

অর্থাৎ হে মুমিনরা! তোমরা কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কেননা কিছু কিছু কু-ধারণা গোনাহ। (সূরা হুজুরাত : ১২)

❖ ❖ ❖

৩০. দেলের দ্বারা ঈমানের যে ৩০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ৩০ নং হল দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করা।

দুনিয়ার মহব্বত বলতে বোঝায় হুব্বে জাহ বা দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মান ও প্রশংসার প্রীতি এবং হুব্বে মাল বা সম্পদের মোহ। নিম্নে উভয়টা সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

ইজ্জত-সম্মানের মহব্বত

প্রশংসা, সুনাম ও সম্মানের লোভকে বলা হয় হুব্বে জাহ। এ লোভ মনে এলে অন্যের প্রশংসা, সুখ্যাতি ও সম্মান দেখে মনে আগুন জ্বলে উঠে এবং হিংসা লাগে এবং অন্যের অপমান বা পরাজয়ের কথা শুনে মনে আনন্দ জন্মে। এমনিভাবে অনেক খারাবী এ রোগের কারণে দেখা দেয়।

মনের মধ্যে এ রোগ সৃষ্টি হলে এই চিন্তা করতে হবে যে, আমি যাদের নিকট ভাল হতে চাই তারাও থাকবে না আমিও থাকব না। অতএব, এমন অসার জিনিসের প্রতি মন লাগানো নির্বুদ্ধিতা বৈ কী?

মালের মহব্বত

মাল ও সম্পদের মোহ তথা টাকা-পয়সার লোভ এত বড় খারাপ জিনিস যে, একবার তা মনে ঢুকলে সেখানে আল্লাহর মহব্বত ও আল্লাহর স্মরণ থাকতে পারে না। এমনিভাবে ঘর-বাড়ি, বাগ-বাগিচা, আসবাব-পত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির মহব্বত এক কথায় দুনিয়ার মহব্বত তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সবকিছুর মহব্বত এমন এক জঞ্জাল, যার মধ্যে আল্লাহর মহব্বত থাকতে পারে না। এই দুনিয়ার মহব্বতের কারণে মানুষ হক— না হক, হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার বিচার হারিয়ে ফেলে। এমনকি মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ঈমান হারা অবস্থায়ও মৃত্যুবরণ করতে পারে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা। তবে উল্লেখ্য, ধন-সম্পদ, মাল-আসবাব ইত্যাদির প্রতি স্বভাবগতভাবে মানুষের কিছু আকর্ষণ থাকে। এটা শরীয়তে

নিন্দনীয় নয়. এমনিভাবে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে সম্পদ উপার্জন করাও নিন্দনীয় নয়; বরং নিন্দনীয় হল সম্পদের প্রতি মনের আকর্ষণকে এতটা বল্গাহীন ছেড়ে দেয়া বা এমনভাবে সম্পদ উপার্জনে মত্ত হওয়া যে, আল্লাহর হুকুম-আহকামের পরওয়া থাকে না এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আদর্শের চেয়ে সেটাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

কারও মনে মালের মহব্বত দেখা দিলে তাকে এই চিন্তা করতে হবে যে, এ সবকিছু একদিন ছেড়ে যেতে হবে। আর অপব্যয় না করা চাই। কেননা অপব্যয় থেকে আয় বৃদ্ধির লোভ জন্মে। গরীব লোকদের সংসর্গ গ্রহণ ও ধনীদের সংসর্গ বর্জন করা চাই।

যুহ্‌দ বা দুনিয়াত্যাগ

এখানে উল্লেখ্য, সম্পদের মোহ বর্জন করার নাম যুহ্‌দ বা দুনিয়া ত্যাগ। তবে যুহ্‌দের এই অর্থ নয় যে, বৈধ আসবাব এবং সম্পদও বর্জন করতে হবে। বরং যুহ্‌দ বা দুনিয়া ত্যাগের অর্থ হল সম্পদ পেলেও খুব আনন্দিত নয়, আবার না পেলেও বা পেয়ে হাতছাড়া হলেও দুঃখিত নয়— মনের এই অবস্থাই হল যুহ্‌দের উচ্চ স্তর। একজন যাহেদ বা দুনিয়ার মোহ ত্যাগকারী ব্যক্তি সম্পদ উপার্জনের জন্য চেষ্টা করবে সম্পদের প্রতি মোহের কারণে নয় বা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে নয় বরং প্রয়োজন পূরণ করার এবং আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে। তার নযর থাকবে আল্লাহ ও আল্লাহর নিকট যে পুরস্কার রয়েছে তার প্রতি পার্থিব সম্পদের প্রতি নয়।

যুহ্‌দ হাছেল করার উপায় হল : এই চিন্তা করা যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাত চিরস্থায়ী, দুনিয়ার সব কিছুই ত্রুটিপূর্ণ ও দোষযুক্ত আর পরকালের সবকিছু ত্রুটি ও দোষমুক্ত। এরূপ চিন্তা করলে দুনিয়া ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি হবে।

যেগুলো যবানের দ্বারা সম্পন্ন হয় :

যবানের দ্বারা ঈমানের ৭টি আমল সম্পন্ন হয়। নিম্নে সে ৭টি আমলের কথা উল্লেখ করা হল।

১. কালিমায়ে তাইয়্যেবা পড়া।
২. কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করা। নিম্নে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত সম্পর্কিত জরুরী কিছু বিষয়ের আলোচনা পেশ করা হল।

কুরআন তেলাওয়াত

কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের ফায়দা

কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করলে প্রতিটি হরফে কমপক্ষে ১০ টি করে নেকী পাওয়া যায়, চাই কুরআনের অর্থ বুঝে পড়ুক বা না বুঝে পড়ুক। এক শ্রেণীর লোক বলে যে, কুরআনের অর্থ না বুঝে পড়লে কোন ফায়দা নেই, তাদের কথা ভুল।

তবে কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা ছওয়াব পাওয়ার জন্য সহীহ-শুদ্ধভাবে তাজবীদ সহকারে তেলাওয়াত করা চাই।

প্রত্যেকটা হরফকে সঠিক মাখরাজ থেকে পূর্ণ সিফাত সহকারে আদায় করাকে তাজবীদ বলে। তাজবীদ রক্ষা করে কুরআন পাঠ করা ফরয।[১]

হরফের মাখরাজ ও ছিফাত সম্পর্কে "আহকামে যিন্দেগী" গ্রন্থের শেষে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। সেটা দেখে নিন। তবে মনে রাখতে হবে, শুধু এসব নিয়ম-কানুন ও বর্ণনা পড়ে কুরআন সহীহ-শুদ্ধভাবে পাঠ করা সম্ভব নয়। যিনি সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে পারেন, এরূপ লোকের নিকট মশ্‌ক করা ব্যতীত কুরআন সহীহ শুদ্ধভাবে পাঠ শিক্ষা করা যায় না।

কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে করণীয় আমলসমূহ

* কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে মিসওয়াক করে নেয়া উত্তম।
* কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে উযূ করে নেয়া উত্তম, আর কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে হলে উযূ করে নেয়া জরুরী।
* ভাল পোশাক পরিধান করে খুশবু মেখে ও পরিপাটি হয়ে তেলাওয়াতে বসা আদব।[২]
* কেবলামুখী হয়ে বসে (হেলান বা টেক না দিয়ে) তেলাওয়াত করা আদব।[৩]
* এখলাসের সাথে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করতে হবে।
* তেলাওয়াতের সময় এই মনোভাব জাগ্রত রাখবে যে, সে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব তেলাওয়াত করছে, আল্লাহ্‌র সাথে তার একান্ত কথাবার্তা হচ্ছে, আল্লাহ তাকে দেখছেন।[৪]

---

১. غنية القارى ۔ ২. شرعة الاسلام ۔ ৩. ايضا ۔ ৪. كتاب الاذكار ۔

* খুশু-খুযু ও বিনয়ের সাথে তেলাওয়াত করা উত্তম।[১]

* আমলের নিয়তে তিলাওয়াত করবে।

* কুরআনের বিষয়বস্তুর প্রতি খেয়াল ও চিন্তা সহকারে তেলাওয়াত করা উত্তম। তবে কেউ না বুঝে পড়লেও তার তিলাওয়াত অর্থহীন নয়। কেউ কেউ বলে থাকে যে, না বুঝে পড়লে কোন লাভ নেই, এরূপ ব্যক্তি মূর্খ বা বে-দ্বীন। কেননা, কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা নিম্নোক্ত ফায়দাগুলো সর্বাবস্থায় লাভ হয়ে থাকে, চাই বুঝে পড়ুক বা না বুঝে পড়ুক।

(১) তেলাওয়াতের দ্বারা দেলের জং (গুনাহের কালিমা) দূর হয়।

(২) কুরআন তেলাওয়াতে প্রতি হরফে অন্ততঃ ১০টি নেকী অর্জন হয়।

(৩) কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা আল্লাহর মহব্বত বাড়ে।

* তেলাওয়াতের শুরুতে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম" ও "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলা ওয়াজিব। তেলাওয়াতের মধ্যে কোন নতুন সূরা আসলে তার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে সূরা তাওবা ব্যতীত, তবে তাওবা থেকেই তেলাওয়াত শুরু করলে তখন বিসমিল্লাহ বলবে। সূরা তাওবার শুরুতে আউযুবিল্লাহি মিনান্নারি-- যে দু'আটি পড়ার রেওয়াজ রয়েছে এ দু'আটির কোন প্রমাণ নেই।

* দরূদ এবং ওয়াজ্দ (মহব্বত) এর স্বরে তেলাওয়াত করবে।

* রোদন বা রোদনের ভঙ্গি সহকারে তেলাওয়াত করা উত্তম।[২]

* সুন্দর আওয়াজে তেলাওয়াত করা উত্তম। সুন্দর আওয়াজ বলতে বুঝায় এমন স্বরে তেলাওয়াত করা যেন শ্রবণকারী বুঝতে পারে যে, সে আল্লাহর ভয় নিয়ে তেলাওয়াত করছে।[৩]

* রিয়ার আশঙ্কা থাকলে কিংবা কোন নামাযী বা ঘুমন্ত ব্যক্তি প্রমুখের অসুবিধার আশঙ্কা থাকলে নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করা উত্তম। অন্যথায় মধ্যম আওয়াজে তেলাওয়াত করা উত্তম।[৪]

* কুরআন শরীফ রেহাল, বালিশ, ডেস্ক প্রভৃতি উঁচু কিছুর উপর রেখে তেলাওয়াত করবে।

* কুরআন খতম হলে তখনই আবার শুরু থেকে কিছুটা আরম্ভ করে রাখা সুন্নাত।

* কুরআন খতম করার প্রাক্কালে দু'আ করা মোস্তাহাব।[৫]

---

১. ايضا । ২. كتاب الاذكار । ৩. شرعة الاسلام । ৪. كتاب النكار । ৪. ايضا ।

Scanned by CamScanner

* তেলাওয়াতের শুরু বা শেষে কুরআনকে চুমু দেয়া বা চোখে-মুখে ছোঁয়া লাগানো জায়েয ।[১]

কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব বখশে দেয়ার ব্যাপারে একটা বিশেষ কথা মনে রাখা দরকার। তা-হল অনেক মা-বোন আছেন তারা নিজেরা তেলাওয়াত করে অন্য কোন হুজুর মহিলা বা হুজুর পুরুষের কাছে বলেন যে, আমি এক খতম তেলাওয়াত করেছি একটু বখশে দিন। জেনে রাখা দরকার, আসলে শরীয়তে বখশে দেয়ার বিশেষ কোন সিস্টেম নেই। বখশে দেয়া কথাটার অর্থ হল দান করে দেয়া। যিনি তেলাওয়াত করবেন তিনিই তার ছওয়াব বখশে দিবেন বা দান করবেন। আমি মাইয়্যেতের উদ্দেশে অর্থাৎ আমার মৃত আপনজনের উদ্দেশে এর ছওয়াব পৌছে দেয়ার জন্য তেলাওয়াত করেছি, এখন বখশে দেয়ার জন্য হুজুরের মাধ্যম ধরতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। যখন আমি তেলাওয়াত করি তখন আমার নিয়ত এটাই থাকে যে, আল্লাহ যেন আমাকে এর ছওয়াব দান করেন এবং আমার আপনজন যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তাদের রূহে, তাদের আমলনামায় যেন এর ছওয়াব পৌছে যায়। এই যে নিয়ত করা হল, এই নিয়তের কারণেই ছওয়াব পৌছে যায়। তেলাওয়াতের পরে আলাদাভাবে কিছু বলার তেমন প্রয়োজন নেই। যদি বলতে চান বলতে পারেন, কিন্তু এর জন্য বিশেষ কোন সিস্টেম বা এমন কোন বিশেষ ব্যবস্থা, যেটা হুজুর জানেন আমরা জানি না, এমন কিছু নেই। কাজেই হুজুরের মাধ্যমে বখশে দিতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। আমরা নিজেরাই আল্লাহর কাছে বলতে পারি যে, হে আল্লাহ! আমি যা তেলাওয়াত করেছি, তার ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিন এবং এর ছওয়াব আমার অমুক অমুক আত্মীয়ের আমলনামায় পৌছে দিন। ব্যস! এতেই বখশে দেয়া হয়ে যাবে।

তেলাওয়াতের সাজদা

* কুরআন শরীফে মোট ১৪টি সাজদার আয়াত আছে; এগুলো পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে সাজদা দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। একে সাজদায়ে তেলাওয়াত বা তেলাওয়াতের সাজদা বলে।

* সাজদায়ে তেলাওয়াতের নিয়ম এই যে, নামাযের ন্যায় পাক-পবিত্র অবস্থায় কেবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার বলে একটি সাজদা করবে, সাজদায়

১ خير الفتاوى ج ١، ٥٠

তিনবার সাজদার তাসবীহ পড়ে আবার আল্লাহু আকবার বলে উঠবে। হাত উঠাতে বা বাঁধতে হবে না। না দাঁড়িয়ে বসে বসেও সাজদা করা যায় বা দাঁড়িয়ে সাজদায় গিয়ে সাজদা করে বসে থাকলেও দুরস্ত আছে। শয্যাশায়ী রোগী নামাযের সাজদায় যেরূপ ইশারা করে এই সাজদাও তদ্রূপ ইশারায় করলেই আদায় হয়ে যাবে।

* সাজদার আয়াত তেলাওয়াত বা শ্রবণের সময় উযূ না থাকলে পরে যখন উযূ করবে তখন সাজদা করে নিলেও আদায় হয়ে যাবে। উযূ থাকলেও পরে আদায় করে নেয়া যায় তবে সাথে সাথে সাজদা করে নেয়া উত্তম। মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত সাজদা আদায় করে নিতে হবে: নতুবা গোনাহগার হতে হবে।

* হায়েয নেফাস অবস্থায় সাজদার আয়াত শুনলে সাজদা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু গোসলের হাজতের অবস্থায় বা হায়েয নেফাস থেকে পাক হয়ে গোসলের পূর্বাস্থায় সাজদার আয়াত শুনলে সাজদা ওয়াজিব হবে।

* নামাযের মধ্যে সাজদার আয়াত পড়লে সাজদার আয়াত পড়া মাত্র নামাযের মধ্যেই তৎক্ষণাৎ সাজদা করে নিতে হবে। তৎক্ষণাৎ সাজদা না করে এক দুই আয়াত আরও পড়ার পর সাজদা করলেও দুরস্ত আছে। কিন্তু আরও বেশী পড়ার পর সাজদা করলে সাজদা আদায় হবে না গোনাহগার হতে হবে।

* নামাযের মধ্যে সাজদার আয়াত পড়ে তৎক্ষণাৎ যদি রুকূতে চলে যায় এবং রুকূর মধ্যে সাজদায়ে তেলাওয়াতেরও নিয়ত করে তাতেও সাজদা আদায় হয়ে যাবে। আর রুকূতে অনুরূপ নিয়ত না করলে তারপর যখন সাজদা করবে তখন নিয়ত না করলেও তেলাওয়াতের সাজদা আদায় হয়ে যাবে।

* নামাযের মধ্যে অন্য কাউকে সাজদার আয়াত পড়তে শুনলে নামাযের মধ্যে সাজদা করবে না, নামাযের পরে সাজদা করবে। নামাযের মধ্যে করলেও তা আদায় হবে না, উপরন্তু পাপ হবে।

* এক জায়গায় বসে একটি সাজদার আয়াত বারবার পড়লে বা শুনলে একটি সাজদাই ওয়াজিব হয়, শর্ত হল মজলিস এক থাকতে হবে—মজলিস পরিবর্তন হলে হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে। দুনিয়াবী কথাবার্তা বা কাজ দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হয়েছে ধরা হবে। এক জায়গায় বসে একাধিক সাজদার আয়াত পড়লে বা শুনলে যত আয়াত তত সাজদা ওয়াজিব হবে।

* রেডিও, টেপরেকর্ডারে সাজদার আয়াত তেলাওয়াত শুনলে সাজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হয় না ।[১]

* সমস্ত সূরা পাঠ করা এবং সাজদা থেকে বাঁচার জন্য শুধু সাজদার আয়াত বাদ দিয়ে যাওয়া মাকরূহ ও নিষিদ্ধ ।

কুরআনের আদব ও আযমত সম্পর্কিত আরও কয়েকটি বিধান

* পড়ার অযোগ্য ছেঁড়াফাটা পুরাতন কুরআন শরীফ পবিত্র কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করে দেয়া উত্তম ।[২]

* ভুলে কুরআন শরীফ পড়ে গেলে তওবা-এস্তেগফার করে নিবে ।[৩] এর জন্য কুরআনের ওজনে কোন কিছু দান করা জরুরী বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা ভুল ।

* কুরআন শরীফ বরাবর রাখা থাকলে সে দিকে পা ছড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে কুরআন শরীফ উঁচুতে থাকলে সেদিকে পা ছড়িয়ে দেয়াতে অসুবিধা নেই ।[৪]

* রেকর্ড করার জন্য টেপরেকর্ডারে তেলাওয়াত বা ওয়াজ করা জায়েয । টেপরেকর্ডার থেকে তেলাওয়াত বা ওয়াজ শোনাও জায়েয ।[৫]

❖ ❖ ❖

৩. ঈমানের যে ৭টি আমল যবানের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ৩ নং হল ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ।

অত্র কিতাবের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রয়োজন পরিমাণ ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেকের উপর ফরয । প্রয়োজন পরিমাণ ইল্‌ম বলতে বোঝায় নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির যেসব লেন-দেন ও কায়-কারবার করতে হয়, সেসব বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল, হুকুম-আহকাম ও নিয়ম-কানুন জানা । আমরা যদি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, উযূ, গোসল ইত্যাদি বিষয়ের মাসআলা- মাসায়েল শিক্ষা না করি, তাহলে আমাদের ফরয তরক করার গোনাহ হতে থাকবে ।

❖ ❖ ❖

১. آلات جدیدہ کے شرعی احکام ۔ امداد الفتاوی ج/۲ ۔ ২. فتاوی محمودیہ ج/۱ ۔ ৩. فتاوی محمودیہ ج/۱ ۔
৪. آلات جدیدہ کے شرعی احکام ۔ ৫. ایضاً ۔

৪. ঈমানের যে ৭টি আমল যবানের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ৪ নং হল ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) বলেছেন : ইলমে দ্বীনের একটি অধ্যায় নিজে শিক্ষা করা এক হাজার রাকআত নফল নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর একটি অধ্যায় অন্যকে শিক্ষা দেয়া একশত রাকআত নফল নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

৫. ঈমানের যে ৭টি আমল যবানের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ৫ নং হল দুআ বা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা।

দুআ করা বা আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়াকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। তাই আল্লাহ্‌র কাছে বেশী বেশী প্রার্থনা করা চাই। কীভাবে দুআ বা মুনাজাত করতে হয়, কখন দুআ বেশী কবূল হয়, দুআ কবূল হওয়ার জন্য কী কী আমল করণীয় রয়েছে, এ সম্পর্কে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬. ঈমানের যে ৭টি আমল যবানের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ৬ নং হল আল্লাহর যিকির। নিম্নে যিকির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

যিকির

যিকির অর্থ স্মরণ করা। মনের মধ্যে সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র স্মরণ রাখতে হবে। মনের মধ্যে সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র চিন্তা আনয়নের জন্য সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতে হবে। হাঁটতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকির করতে হবে। ঘরের কাজ-কর্মের ফাঁকেও যিকির করতে হবে। প্রচুর পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহকে প্রচুর স্মরণ করতে হবে। করতে করতে এমন অবস্থা সৃষ্টি হবে যে, সারাক্ষণ মাথার ভিতরে আল্লাহ্‌র ফিকির এসে যাবে। কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌কে প্রচুর স্মরণ করার হুকুম দিয়ে বলা হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا۔

অর্থাৎ হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, প্রচুর স্মরণ। (আহযাব : ৪১)

এখানে আল্লাহ্‌কে অনেক বেশী স্মরণ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কত বেশী তা বলা হয়নি। এর অর্থই হল যত বেশী স্মরণ করা সম্ভব, তত বেশী স্মরণ করতে হবে। এই বেশীর পরিমাণ বাড়তে বাড়তে একটা পর্যায়ে এমন হবে যে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এসে যাবে।

আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা দুইভাবে হয়—একটা হল প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, প্রত্যেকটা পদে পদে যে দু'আগুলি আছে সেগুলো পড়ে নেয়া। দু'আ না থাকলে নিজের ভাষায় আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করা, নিজের ভাষায় আল্লাহ্‌র কাছে বলা। আরেকটা স্মরণ হল মুখের যিকির। মুখের যিকিরের বিভিন্ন বাক্য বা শব্দ রয়েছে। যেমন : লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। এগুলিও যিকির। সব সময় এ যিকিরগুলো করা যায়। বিশেষভাবে সমতল স্থান দিয়ে চলার সময় বা বসে থাকার সময় বলতে থাকবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। উপরের দিকে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলতে বলতে উঠবে। প্রতিদিন আমরা দোতলায়, তিন তলায় বা আরও উপর তলায় উঠি। যখন এরকম উপর দিকে উঠব, আল্লাহু আকবার বলতে বলতে উঠব। আবার যখন নিচের দিকে নামব, কিংবা রাস্তায় চলছি সামনের রাস্তা ঢালু, তখন সুবহানাল্লাহ বলতে বলতে নামব। রাস্তা দিয়ে চলার সময় সামনের দিকে উঁচু থাকলে আল্লাহু আকবার বলতে বলতে উঠব। লিফ্‌ট দিয়ে উপর দিকে উঠার সময় এবং নামার সময়ও এ আমল চলবে।

প্রতিদিন আমরা পদে পদে এই যিকিরগুলোর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। হয় সুবহানাল্লাহ, না হয় আল্লাহু আকবার, না হয় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর ভাল কিছু সামনে পড়লে আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়াও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আল হামদুলিল্লাহ ৩৩ বার ও আল্লাহ আকবার ৩৪ বার পাঠ করার আমল রয়েছে। এগুলি হল মুখের যিকির। এছাড়াও আরও অনেক রকম যিকির রয়েছে। কুরআন তেলাওয়াত করাও যিকির। আল্লাহ আল্লাহ বলাও যিকির سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ বলাও এক ধরনের যিকির। এভাবে যখন আমরা উত্তমভাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকব, পদে পদে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকব, তখন আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক জুড়ে যাবে। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জোড়ার এ-ই হল সহজ তরীকা।

আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জোড়ার জন্য আমাদেরকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে। তাহলে যে কোন দুটো জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক জুড়তে হলে সেই দুটো জিনিসকে পরিষ্কার করে নিতে হয়। যেমন আমরা যদি সলিশন দিয়ে দুটো রাবার বা দুটো কাঠের মাঝে জোড়া লাগাতে চাই, তাহলে প্রথমে ঐ দুটো রাবার বা কাঠকে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপরে সলিশন দিয়ে সেই দুটোকে জোড়া লাগাতে হয়। দুটো কাঁচকে জোড়া লাগাতে চাইলেও প্রথমে সে দুটোকে পরিষ্কার করে নিতে হয়। পরিষ্কার করে না

নিলে, ময়লাযুক্ত অবস্থায় থাকলে তাতে জোড়া লাগানো যায় না। তদ্রূপ আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক জুড়তে গেলেও পরিষ্কার করে নিতে হবে, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক জোড়ার অর্থ হল দিলের সাথে সম্পর্ক জোড়া। তাই দিলকে পরিষ্কার করে নিতে হবে, অর্থাৎ দিলকে গোনাহ থেকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তাহলে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের জোড়া লাগবে, নতুবা জোড়া লাগবে না। দিলের ভিতরে গোনাহ্র যত জঞ্জাল, যত আবর্জনা আছে, তা থেকে দিলকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। দিল যত পরিষ্কার হবে, আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক তত বেশী মজবুত হবে।

দিল পরিষ্কার থাকার অর্থ হল গোনাহ থেকে দিলকে পরিষ্কার রাখা। গোনাহ করলে দিল পরিষ্কার থাকে না, বরং ময়লা যুক্ত হয়ে যায়। হাদীছে এসেছে— বান্দা যখন একটা পাপ করে তার অন্তরে একটা কাল দাগ পড়ে যায়। এভাবে পাপ করতে করতে তার অন্তর সম্পূর্ণ কালিমা লিপ্ত হয়ে যায়। সম্পূর্ণ কালো হয়ে যায়।

গোনাহের দ্বারা অন্তর অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানুষ যে কোন গোনাহ-ই করুক, প্রথমে দিলের ভিতরে সেই গোনাহের চেতনা আসে, তারপর সেই পাপে সে জড়িত হয়। বোঝা গেল আসল গোনাহ হয় দিলের দ্বারা। তাই গোনাহ দ্বারা দিল অপরিচ্ছন্ন হয়। অতএব আল্লাহ্র সাথে দিলের সম্পর্ক জুড়তে হলে দিলকে পরিষ্কার রাখতে হবে। নতুবা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক জুড়বে না। দিলকে পরিষ্কার করার উপায় হল যিকির। হাদীছে এসেছে :

لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالٌ وَصَقَالُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللهِ. (تنبيه الغافلين)

অর্থাৎ সবকিছুর রেত আছে যা দ্বারা জং পরিষ্কার করা হয়। আর দিলের রেত হল যিকির। তাই আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক জুড়তে হলে দিল পরিষ্কার করা জরুরী। আর দিল পরিষ্কার করার জন্য যিকির জরুরী। নিম্নে যিকিরের কয়েকটি সুন্নাত ও আদব উল্লেখ করা হল।

যিকিরের সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. যিকিরের জন্য উযূ করা শর্ত নয়, তবে উযূর সাথে যিকির করলে যিকিরের আছর বেশী হয় এবং নূরানিয়্যাত হাছিল হয়।
২. কেবলামুখী হয়ে যিকিরে বসা উত্তম।
৩. হুজুরে কল্ব বা একাগ্রতার সাথে যিকির করতে হবে।

৪. এই একীনের সাথে যিকির করবে যে, আল্লাহ আমার যিকির শুনছেন, তাই আল্লাহর আযমত ও মহব্বতের সাথে যিকির করতে হবে।
৫. এখলাসের সাথে যিকির করতে হবে।
৬. মহিলাদের আওয়াজেরও পর্দা রয়েছে। তাই পরপুরুষের কানে যেন তাদের আওয়াজ না যায় এভাবে যিকির করবে।
৭. যে শব্দ বলে যিকির করবে তার অর্থের দিকে খেয়াল রাখতে পারলে ভাল।
৮. সম্ভব হলে পিতা, স্বামী বা কোন মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে কোন হক্কানী পীর মুরশিদ বা বুযুর্গ থেকে কী যিকির করবে সে ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে সে মোতাবেক যিকির করবে। নতুবা নিজের থেকে কোন যিকির করলে তার জন্য সময় ও সংখ্যা নির্ধারণ করে নেয়া উত্তম।

❖ ❖ ❖

৭. ঈমানের যে ৭টি আমল যবানের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে সপ্তম নম্বর হল অনর্থক কথা থেকে যবানকে হেফাযত করা। নিম্নে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

অনর্থক কথা ও অতিরিক্ত কথা প্রসঙ্গ

দ্বীনী ও প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য সব কথা হল অনর্থক কথা। দ্বীনী ও প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া বেশী কথা বলাও একটি বদ অভ্যাস। প্রয়োজনীয় কথা বলতে বোঝায় তিন ধরনের কথা। যথা : (এক) যা নেকী অর্জনের উদ্দেশ্যে বলা হয়। (দুই) যা গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য বলা হয়। (তিন) যা না বললে পার্থিব ক্ষতি হয়।

প্রয়োজনীয় কথা ব্যতীত বেশী কথা দ্বারাও মানুষ শত শত গোনাহে লিপ্ত হয়— যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, নিজের বড়ায়ী বয়ান করা, কাউকে অভিশাপ দেয়া, কারও সাথে অহেতুক তর্ক জুড়ে দেয়া, অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেলা ইত্যাদি। এর বিপরীত কম কথা বলার অভ্যাস থাকলে বহু পাপ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। তাই কম কথা বলা ভাল। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ صَمَتَ نَجَا.

অর্থাৎ যে চুপ থাকে, সে নিরাপদ থাকে, অর্থাৎ, যবানের সাথে সংশ্লিষ্ট গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকে। (তিরমিযী)

বেশী বলার রোগ হলে যে কোন কথা মনে এলে তা বলার পূর্বে চিন্তা করে নিবে, ছওয়াবের বা দরকারী হলে বলবে নতুবা বলবে না। আর একান্ত জরুরত না হলে কারও সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবে না।

যেগুলো বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন হয়

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়। নিম্নে সে ৪০টি আমলের কথা উল্লেখ করা হল।

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের যে ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়, তা নিম্নে দেয়া হল।

১. পবিত্রতা হাছেল করা।
২. নামাযের পাবন্দী করা।
৩. সদকা, যাকাত, ফিত্‌রা, দান-খয়রাত, মেহমানদারী ইত্যাদি।
৪. রোযা রাখা।
৫. হজ্জ করা।
৬. এ'তেকাফ করা (শবে কদর তালাশ করা এর অন্তর্ভুক্ত)।
৭. হিজরত করা অর্থাৎ দ্বীন ও ঈমান রক্ষার্থে দেশ-বাড়ি ত্যাগ করা।
৮. মান্নত পুরা করা।
৯. কছম করলে তা পূরণ করা আর কছম ভঙ্গ করলে তার কাফফারা দেয়া।
১০. কোন কাফফারা থাকলে তা আদায় করা।
১১. ছতর ঢেকে রাখা।
১২. কুরবানী করা।
১৩. জানাযা ও তার যাবতীয় আনুষঙ্গিক কাজের ব্যবস্থা করা।
১৪. অভাব গ্রস্তকে ঋণ দেয়া।
১৫. ঋণ পরিশোধ করা।

নিম্নে ঋণ দেয়া ও নেয়ার বিস্তারিত আদব ও মাসায়েল বয়ান করা হল।

ঋণ সম্পর্কিত আদব ও মাসায়েল

* যথাসম্ভব ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

* এমন ব্যক্তির নিকট ঋণ চাওয়া ঠিক নয়, যার ব্যাপারে বোঝা যায় যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ভক্তি বা লজ্জা বা চাপ ইত্যাদির কারণে অস্বীকার করতে পারবে না। যার ব্যাপারে নিশ্চিত জানা আছে যে, অনিচ্ছা হলে স্বাধীনভাবে

সে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবে না—এরূপ লোকের নিকট ঋণ চাওয়াতে দোষ নেই।

* ঋণ গ্রহণ করলে সেটা পরিশোধের সময় নির্দিষ্ট করে নিবে।

* ঋণ নিলে সেটা স্মরণ রাখার জন্য লিখে রাখবে।

* যত দ্রুত সম্ভব ঋণ পরিশোধ করে দেয়া প্রয়োজন, কেননা ঋণ পরিশোধ না করে মৃত্যুবরণ করলে তার রূহ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে—জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।

* পাওনাদার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেও চাওয়ার অধিকার রাখে।

* পাওনাদার শক্ত কিছু বললেও তা সহ্য করতে হবে।

* সাধ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করা বা আজ-কাল বলে টালবাহানা করা জুলুম।

* ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি অস্বচ্ছল হলে তাকে সময় সুযোগ দেয়া উচিত-পেরেশান করা উচিত নয়। পারলে ঋণ পুরোটা বা তার কিয়দাংশ মাফ করে দিবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের কষ্ট থেকে মুক্তি দিবেন।

* বিশ্বাস ও ভক্তির সাথে নিম্নের দুআটি পড়লে ইনশাআল্লাহ ঋণ আদায় হয়ে যাবে—

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হারাম হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রুযী দ্বারা আমার অভাব পূরণ কর এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা কর। (তিরমিযী)

* সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করলে মামলা করে বা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে যে কোনভাবে পাওনা উসূল করে নেয়া পাওনাদারের জন্য জায়েয। এরূপ অবস্থায় দেনাদারকে শক্ত কথা বলাও জায়েয।[1]

❖ ❖ ❖

১৬. বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের যে ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ১৬ নং হল লেন-দেন ও কায়-কারবার সততার সাথে এবং জায়েয তরীকা মোতাবেক করা।

১৭ নং সত্য সাক্ষ্য দান করা। সত্য জানলে তা গোপন না করা।

১৮ নং বিবাহের দ্বারা হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা।

---

১. بہشتی زیور، وآداب المعاشرت থেকে গৃহীত।

১৯ নং পরিবার-পরিজনের হক আদায় ও চাকর-নওকরদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। চাকর-নওকরদের সাথে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হল চাকর-নওকরদের হক আদায় করা। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হল।

মানুষের হক

চাকর-নওকরদের হক বা তাদের সাথে যা করণীয়

১. নিজেরা যা খাবে চাকর-নওকরকে তা খাওয়াবে।
২. নিজেরা যা পরিধান করবে চাকর-নওকরকে সেরূপ পরিধান করাবে।
৩. তাদের সাধ্যের বাইরে কোন কাজের চাপ দিবে না।
৪. কোন কাজ তাদের কষ্টসাধ্য হলে ঐ কাজে তাদের সহায়তা করবে।
৫. তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে অর্থাৎ কঠোর ব্যবহার ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করবে না।
৬. তারা রোগাক্রান্ত হলে কিংবা কোন কষ্টে পড়লে তাদের সমবেদনা জানাবে।
৭. তাদের দ্বীন ও শরীয়ত মোতাবেক চালাবে। কেননা, অধীনস্থকে দ্বীনের উপর চালানো কর্তব্য।

❖ ❖ ❖

২০. বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের যে ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২০ নং হল মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা অর্থাৎ মাতা-পিতার হক আদায় করা। নিম্নে মাতা-পিতার হক বা অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

মাতা-পিতার হক

বান্দার হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হক হল পিতা-মাতার হক। কুরআনে কারীমে বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজের হকের কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে পিতা-মাতার হকের কথাও উল্লেখ করেছেন। দুটো কথাকে পাশাপাশি এক সাথে উল্লেখ করেছেন। যেমন এক আয়াতে বলেছেন :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا۔

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধান দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না, আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (বনী ইসরাঈল : ২৩)

Scanned by CamScanner

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হল পিতা-মাতার হক বা তাদের অধিকার আদায় করা। এই আয়াতে আল্লাহ পাক দুটো কথাকে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। একটা হল আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। এটা হল আল্লাহ্‌র হক। তারপর বলা হয়েছে পিতা-মাতার হক আদায় কর। এ দুটো কথাকে পাশাপাশি বলার উদ্দেশ্য হল একথা বোঝানো যে, আল্লাহর হক আদায় করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, পিতা-মাতার হক আদায় করাও তার কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্‌র হক আদায় না করলে যেমন নাজাত পাওয়া যাবে না, পিতা-মাতার হক আদায় না করলেও নাজাত পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্‌র হক আদায় না করলে যেমন আল্লাহ নারাজ হবেন, পিতা-মাতার হক আদায় না করলেও আল্লাহ নারাজ হবেন। হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ۔(ترمذی)

অর্থাৎ পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি। আর এক হাদীছে বলা হয়েছে :

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ۔(مسلم)

অর্থাৎ মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত।

এ দুই হাদীছ মিলালে বোঝা যায় পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট রেখে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা যাবে না। পিতা-মাতার খেদমত এবং আনুগত্য ছাড়া জান্নাত লাভ করা যাবে না। পিতা-মাতার হক বা অধিকার তাই অনেক বড়। সমস্ত মানুষের মধ্যে পিতা-মাতার অধিকার সবচেয়ে বড়।

পিতা-মাতা আমাদের দুনিয়াতে আসার ওছীলা। তারা না হলে আমরা দুনিয়াতে আসতে পারতাম না। তারা যে আদর যত্ন করে আমাদের লালন-পালন করেছেন, ঐ আদর যত্ন না থাকলে আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না, এই পর্যায় আসতে পারতাম না। তাই পিতা-মাতার অনুগ্রহের কোন বদলা হতে পারে না। আমাদের প্রতি পিতা-মাতার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসার কোন বদলা হতে পারে না। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালবাসা অকৃত্রিম ভালবাসা, নিঃস্বার্থ ভালবাসা। এরকম অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর দ্বিতীয়টি নেই। স্বামী-স্ত্রী একজন আরেকজনকে ভালবাসে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে ভালবাসে, এক ভাই আরেক ভাইকে ভালবাসে, এই সব ভালবাসার মধ্যে কোন না কোন ভাবে স্বার্থ থাকে। তাই যখনই স্বার্থ নষ্ট হয়ে যায়, প্রেম ভালবাসা

এবং বন্ধুত্বও নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সন্তান পিতা-মাতার সাথে যত খারাপ ব্যবহার করুক তবুও পিতা-মাতার স্নেহ ভালবাসা বহাল থাকে। পিতা-মাতার ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসা। অকৃত্রিম ভালবাসা। এই ভালবাসার বদলা দেয়া সম্ভব নয়। এই ভালবাসার কোন বদলা হয় না। তাই পিতা-মাতার হক কত বড় তা ভাষা দিয়ে বোঝানো কঠিন। মোটামুটিভাবে বোঝানোর জন্য বলা হয় আল্লাহ্‌র হকের পরেই পিতা-মাতার হক। পিতা- মাতার হক, পিতা-মাতার আনুগত্য, পিতা-মাতার খেদমত তাই এত গুরুত্বপূর্ণ।

মাতা-পিতার হক এবং তাদের খেদমত বলতে কী বুঝায়? মাতা-পিতার সম্মান করা, তাদের হুকুমের আনুগত্য করা, কথা কাজ ও আচরণে কোনভাবে তাদের কষ্ট না দেয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা আল্লাহর কোন হুকুমের বিরুদ্ধে কিছু না বলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কথা মানতে হবে। তবে মাতা-পিতা যদি এমন কোন হুকুম করেন, যে হুকুম মানলে আল্লাহর নাফরমানী হবে, অর্থাৎ গোনাহ হবে, সে হুকুম মান্য করা যাবে না। কারণ হাদীছে এসেছে :

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔(احمد و الحاكم)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাফরমানী হয় এমন কোন বিষয়ে কারও কথা মানা যাবে না।

অতএব দুর্ভাগ্যবশত : যদি কোন পিতা-মাতা বলেন যে, নামায পড়তে পারবে না, তাহলে সে হুকুম মানা যাবে না। কারণ, সে হুকুম মানলে গোনাহ হবে। যদি বলে দাড়ি রাখতে পারবে না, সে হুকুমও মানা যাবে না। কারণ, তাতে গোনাহ হবে। পিতা-মাতার কোন গোনাহের হুকুম মানা যাবে না। যতক্ষণ গোনাহ না হবে, ততক্ষণ তাদের কথা মানতে হবে।

নফল কাজের চেয়ে, নফল আমলের চেয়ে পিতা-মাতার খেদমতের গুরুত্ব শরীয়তে বেশী। বোখারী শরীফের হাদীছে এসেছে— এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। এসে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! জেহাদের অনেক ফযীলত শুনেছি, আমি জেহাদে যেতে চাই। জেহাদের ছওয়াব অর্জন করতে চাই, আল্লাহকে রাজী-খুশী করতে চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন :

اَلَكَ وَالِدَانِ؟ قَالَ نَعَمْ۔

অর্থাৎ তোমার পিতা-মাতা আছেন কি? তিনি বললেন : জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা-মাতা আছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ-(بخارى)

অর্থাৎ তাহলে তাদের খেদমত করে জেহাদ কর। অর্থাৎ ময়দানের জেহাদ ছেড়ে তাদের খেদমত কর।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে—নফল জেহাদের চেয়ে পিতা-মাতার খেদমতের গুরুত্ব বেশী। পিতা-মাতার খেদমতের প্রয়োজনে জেহাদ, এমনি-ভাবে অন্যান্য নফল আমল ছেড়ে দিতে হবে। মুসনাদে আহমদ কিতাবের এক রেওয়ায়েতে এসেছে—একবার এক জেহাদের প্রস্তুতি চলছিল। সকলে নাম লেখাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জেহাদে যেতে চাই। সে তার জেহাদে যাওয়ার স্পৃহা বোঝানোর জন্য বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! জেহাদে যাওয়ার জন্য আমি মাতা-পিতাকে রেখে চলে এসেছি। যদিও তারা কাঁদছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝলেন সে মাতা-পিতার সম্মতি ছাড়াই তাদের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েই চলে এসেছে, তাই তার চলে আসার সময় তারা কাঁদছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

اِرْجِعْ فَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا-(مسند احمد)

অর্থাৎ তাহলে ফিরে গিয়ে তাদের হাসাও, যেমন কাঁদিয়ে এসেছ।

এই সব হাদীছ থেকে বোঝা যায় মাতা-পিতার খেদমত নফল আমলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও নফল আমল করতে জযবা বোধ হয়। কিন্তু পিতা-মাতার খেদমতের প্রয়োজন থাকলে এই জযবাকে ত্যাগ করতে হবে। এটাই হল শরীয়ত। জযবার উপর নয় বরং শরীয়তের উপর আমল করতে হবে। একটা ঘটনা শুনুন। ঘটনাটি হযরত ওয়ায়েছ করনী (রহ.)-এর। হাদীছেও এ ঘটনা এসেছে। হযরত ওয়ায়েছ করনী (রহ.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইয়ামানে বসবাস করতেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসার জন্য তার মন ছটফট করছিল। একবার রাসূলের কাছে আসতে পারলে সাহাবীর মর্যাদা পেয়ে যাবেন। একজন সাহাবীর মর্যাদা এত বড় যে, সাহাবী ছাড়া আর যত মুসলমান আছে, সব মুসলমানকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় তাহলেও একজন সাহাবীর মর্যাদার সমান হবে না। এটা অত্যন্ত আবেগের বিষয় ছিল। কিন্তু আসতে পারছিলেন না বৃদ্ধা মায়ের কারণে। মায়ের খেদমতের প্রয়োজন ছিল। রাসূলের কাছে আসতে গেলে

মায়ের খেদমতের ত্রুটি হয়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চিঠি লিখলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই অবস্থা। আমার খুব মনে চায় আপনার দরবারে আসতে, আপনাকে এক নজর দেখতে!! আমি সাহাবী হতে চাই!! কিন্তু আমার মায়ের খেদমতের জন্য আসতে পারছি না। আসলে আমার মায়ের কষ্ট হয়। এখন আমার কী করণীয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার মায়ের খেদমত করতে থাক। তিনি তা-ই করতে থাকলেন। রাসূলের খেদমতে আসার আবেগকে বর্জন করে মায়ের খেদমত করতে থাকলেন। কারণ, রাসূলের কথাই ছিল শরীয়ত। তিনি আবেগকে বর্জন করে শরীয়তের উপর আমল করলেন। এর কারণে তার মার্যাদা এত বেড়ে গেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাযি.)কে বলেছিলেন : হে ওমর! একদিন ওয়ায়েছ করনী নামের একজন লোক ইয়ামান থেকে মদীনায় আসবে। তার চেহারার গঠন এরকম হবে। সে যখন আসবে তখন তার কাছে অনুনয়-বিনয় করে দু'আ চাইবে। কারণ, তার দু'আ কবূল হবে। হযরত ওমর (রাযি.)-এর মত বড় সাহাবী, যিনি চার খলীফার একজন। তাকে শিখানো হচ্ছে তার কাছে দু'আ চেয়ে নেয়ার কথা। এটা কত বড় মর্যাদার কথা! এরপর থেকে হযরত ওমর (রাযি.) যখনই শুনতেন ইয়ামান থেকে কোন কাফেলা এসেছে, তিনি ছুটে যেতেন তাদের কাছে। জিজ্ঞাসা করতেন তাদের মধ্যে ওয়ায়েছ করনী নামের কোন লোক এসেছে কি-না। একদিন তাকে পেয়ে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন গঠনের কথা বলেছিলেন, ঠিক তেমনই তাকে পেলেন। পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন, আর বললেন : আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। ওয়ায়েছ করনী আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি খলীফা হয়ে আমার কাছে দু'আ চাচ্ছেন আমার এমন কী মর্যাদা হয়ে গেল? তখন হযরত ওমর (রাযি.) বললেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার ব্যাপারে এই এই বলে গেছেন। শুনে হযরত ওয়ায়েছ করনী (রহ.) খুশীতে কেঁদে দিলেন। তিনি নিজের আবেগ ছেড়ে দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় অর্থাৎ শরীয়তের উপর আমল করেছেন, তাই তার এত মর্যাদা হয়েছে। আমরা হলে তো মানতাম না। মূলতঃ নিজের আবেগ নয়, বরং শরীয়ত মান্য করার মধ্যেই কামিয়াবী।

আমরা হলে আবেগের ঠেলায় মনে করতাম আমি সাহাবী হতে চাই। মায়ের খেদমতে একটু ত্রুটি হলে কী আছে? কিন্তু আবেগের নাম ইসলাম

Scanned by CamScanner

নয়। বরং আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল যা বলেন সেটা আবেগ বিরোধী হলেও সেটার উপর আমল করার নাম হল ইসলাম। তাই মাতা-পিতা অসুস্থ থাকলে, তাদের খেদমতের প্রয়োজন থাকলে নফল আমল করার আবেগ ছাড়তে হবে, এটাই ইসলাম। জযবা বা আবেগের নাম ইসলাম নয়। এরকম মুহূর্তে নফল আমলের চেয়ে মাতা-পিতার খেদমতের দ্বারাই বেশী ফযীলত অর্জন করা যাবে।

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার মধ্যে অনেক ধরনের ফযীলত রাখা হয়েছে। মহব্বতের নজরে পিতা-মাতার দিকে একবার তাকালে এক হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব রাখা হয়েছে। পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি রাখা হয়েছে! মাতা-পিতার পায়ের নীচে অর্থাৎ তাদের খেদমত ও আনুগত্যের ভিতরে সন্তানের জান্নাত রাখা হয়েছে। এগুলি হল পরকালের ফযীলত।

পিতা-মাতার খেদমতের মধ্যে দুনিয়াবী ফায়দাও রয়েছে। যারা মাতা-পিতার খেদমত করে, তারা দুনিয়াতে খুব সুখ-শান্তিতে থাকে। যারা পিতা-মাতার খেদমত করে, দুনিয়ায় তাদের রিযিকে বরকত হয়। এর বিপরীতে যারা পিতা-মাতার খেদমতে ত্রুটি করে, দুনিয়াতে তাদের অশান্তি আসে, আয় রোজগারের বরকত উঠে যায়। আমাদের কাছে এরকম বহু ঘটনা আছে। অনেকে এসে বলেন হুজুর! খুব টেনশনে আছি, পেরেশানিতে আছি, জীবনে কোন বরকত নেই, সব জায়গায় বে-বরকতী। এদের অনেকের ক্ষেত্রে আমরা খুঁজে পেয়েছি যে, পিতা-মাতার সাথে তাদের সুসম্পর্ক নেই। পিতা-মাতার খেদমতে তাদের ত্রুটি আছে। কিংবা যতদিন তারা বেঁচে ছিলেন, তাদের খেদমতে তারা ত্রুটি করেছিল। তাই পিতা-মাতার খেদমতে ত্রুটি করায় দুনিয়া-আখেরাত সব জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এমনকি মৃত্যুর সময়ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

ফকীহ্ আবুল লাইছ সমরকন্দী (রহ.) বর্ণনা করেছেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একজন লোক ছিলেন, নাম আলকামা। মৃত্যুর সময় তার আশেপাশের লোকজন তাকে কালিমা পড়ানোর জন্য খুব চেষ্টা করল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কালিমা বের হচ্ছিল না। তার বিবি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সংবাদ নিয়ে গেলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলকামার এই অবস্থা! কোনভাবেই তার মুখ থেকে কালিমা বের হচ্ছে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযি.)কে পাঠিয়ে দিলেন যে, তার অবস্থা দেখে আস। তিনি দেখে খবর পাঠালেন যে,

তার অবস্থা হল কোনভাবেই তার মুখ থেকে কালিমা বের হচ্ছে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন : তার মাতা-পিতা আছেন? বললেন : পিতা মারা গেছেন, মাতা আছেন, খুব বৃদ্ধা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মায়ের কাছে খবর পাঠালেন যদি আপনার পক্ষে আমার কাছে আসা সম্ভব হয়, তাহলে আসবেন নতুবা আমি আপনার কাছে আসব। তার মাতা খুব বৃদ্ধা ছিলেন, চলা-ফেরা করতে কষ্ট হত। তিনি খুব কষ্ট স্বীকার করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন আপনার পুত্র আলকামা কেমন? তিনি বললেন, খুব ভাল, খুব নামাযী, খুব তাহাজ্জুদ-গোজার, প্রচুর নফল রোযা রাখে, প্রচুর দান খয়রাত করে, তার আমল অনেক ভাল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার সাথে সম্পর্ক কেমন? তখন তিনি বললেন : আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট নই। কারণ, সে আমার খেদমত করে না, আমার কথার চেয়ে বিবির কথাকে প্রাধান্য দেয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

سَخَطُ اُمِّهٖ حَجَبَ لِسَانَهٗ عَنْ شَهَادَةِ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-(تنبيه الغافلين)

অর্থাৎ এই যে মায়ের অসন্তুষ্টি, এ কারণে তার মুখ থেকে কালিমায়ে শাহাদাত বের হচ্ছে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলালকে বললেন : বেলাল! লাকড়ী জমা কর! আলকামাকে সেই লাকড়ী দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হবে। একথা শুনে আলকামার মা চিৎকার করে বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! না এটা করবেন না, আমার সন্তান আগুনে জ্বলবে; আমি বরদাশ্ত করতে পারব না। দেখা গেল মায়ের দরদ কখনো ফুরায় না। মায়ের দরদের কোন তুলনা হয় না। পিতার চেয়ে মায়ের দরদ অনেক বেশী। এজন্য খেদমতের ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মায়ের হক বেশী। হাদীছে এসেছে এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : من ابر ؟ অর্থাৎ, ভাল ব্যবহার সবচেয়ে বেশী করব কার সাথে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন : امك। অর্থাৎ তোমার মায়ের সাথে। সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন : তারপর? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন : তোমার মায়ের সাথে। সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন তারপর? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন : তোমার মায়ের

Scanned by CamScanner

সাথে। সাহাবী আবার প্রশ্ন করলেন : তারপর? এবার চতুর্থ বারে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : পিতার সাথে।

এ হাদীছ থেকে বোঝা যায় খেদমত এবং ভাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মাতার হক তিনগুণ বেশী। কারণ, সন্তানের প্রতি পিতার চেয়ে মায়ের দরদ অনেক বেশী। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন : আলকামাকে আগুনে জ্বালিয়ে দিব, তখন তার মা চিৎকার দিয়ে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! না, এটা করবেন না। আমার কলিজার টুকরাকে আমার চোখের সামনে আগুনে জ্বালাবেন, আমি মা হয়ে তা কী করে সহ্য করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আপনি যদি আলকামার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে ও জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, সেটা কী করে সহ্য করবেন? সেই আগুন থেকে তাকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হল তাকে মাফ করে দেয়া, আপনার সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া। তখন আলকামার মা বলে উঠলেন আসমানের খোদাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, এই উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি— আমি আলকামাকে মাফ করে দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বেলাল গিয়ে দেখ এখন কী অবস্থা? হযরত বেলাল (রাযি.) গিয়ে ঘরে ঢুকেছেন, সাথে সাথে শুনতে পেলেন আলকামার মুখ থেকে বের হচ্ছে—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই অবস্থায় তার ইন্তেকাল হল। এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল মায়ের অসন্তুষ্টি মৃত্যুর সময় মুখ থেকে কালিমা উচ্চারণ হতে দেয় না।[১]

যাহোক, যা আলোচনা চলছিল মাতা-পিতার খেদমতের ফায়দা দুনিয়াতেও পাওয়া যায়, মৃত্যুর সময়ও পাওয়া যায় এবং পরকালেও পাওয়া যায়।

আমরা যদি আমাদের পিতা-মাতার খেদমতে ত্রুটি করি, তাহলে আমাদের সন্তানাদিও আমাদের খেদমতে ত্রুটি করবে। আর আমরা পিতা-মাতার খেদমতে ত্রুটি না করলে আমাদের সন্তানরাও আমাদের খেদমতে ত্রুটি করবে না।

---

১. আলকামার ঘটনা সম্পর্কিত এই রেওয়ায়েত সহীহ কি-না কিছু সন্দেহ রয়েছে। তবে ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, যাতে দেখা যায় পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির কারণে মৃত্যুর সময় মুখ থেকে কালিমা বের হয়নি।।

আমরা যারা পিতা-মাতার খেদমতে ত্রুটি করেছি এখন পিতা-মাতা দুনিয়াতে নেই, তাদের কী উপায়? তাদের উপায়ও হাদীছে বলে দেয়া হয়েছে। এক নম্বর উপায় হল— পিতা-মাতার জন্য দু'আ করা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পিতা-মাতার জন্য দু'আ করার কথা বলা হয়েছে। কী বলে দু'আ করতে হবে তাও আল্লাহ তা'আলা শিখিয়ে দিয়েছেন :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا۔(بنی اسرائیل : ۲۴)

অর্থাৎ হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! আমার পিতা-মাতার প্রতি রহম কর, ছোটবেলায় যেমন আদর সোহাগ করে তারা আমাদের লালন-পালন করেছিলেন। তারা এখন তোমার দরবারে আছে, তাদেরকেও তুমি ওরকম আদর যত্ন করে রাখ। দু'আর কত সুন্দর ভাষা আল্লাহ্ পাক শিক্ষা দিয়েছেন।

এ দু'আর মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহ্র রহমত কামনা করা হয়। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, পিতা-মাতা অমুসলমান হলেও তাঁদের জীবদ্দশায় এ রহমতের দু'আ এই নিয়তে জায়েয হবে যে, পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তাওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহমতের দু'আ করা জায়েয নয়।

মৃত পিতা-মাতাকে খুশী করার জন্য আর একটা করণীয় হল তাদের জন্য ঈছালে ছওয়াব করতে থাকা। নফল নামায পড়ে, কুরআন তেলাওয়াত করে, দান-সদকা করে তাদের রূহে ছওয়াব পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। যখন তারা ছওয়াব পেতে থাকবেন, যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জানিয়ে দেয়া হবে যে, তোমার অমুক সন্তান তোমার জন্য এই হাদিয়া পাঠাচ্ছে। তাতে তারা খুশী হয়ে যাবেন। এভাবে মৃত মাতা-পিতাকে খুশী করান যায়।

মাতা-পিতার জন্য আর একটা করণীয় হল তাদের বন্ধু-বান্ধব, তাদের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গেও তাদের মত সু-ব্যবহার ও খেদমত করতে থাকা। হাদীছে আছে এটার দ্বারাও মাতা-পিতা সন্তুষ্ট হবেন।

মৃত পিতা-মাতার জন্য আর একটা করণীয় হল যদি তাদের অনাদায়ী কোন ঋণ থাকে, তাহলে সাধ্যমত তা আদায়ের ব্যবস্থা করা। ঋণের কারণে মানুষের আমল ঝুলন্ত থাকে, কবূল হয় না, তার আত্মার শান্তির ফয়সালা মওকূফ হয়ে থাকে। তাই মাতা-পিতার যে কোন রকম ঋণ থাকুক, মানুষের ঋণ হোক, বা আল্লাহ্র ঋণ হোক সব ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা

Scanned by CamScanner

করতে হবে। আল্লাহ্‌র ঋণ থাকলে তা দেয়ার অর্থ হল তাদের নামায অনাদায়ী থাকলে তার ফিদইয়া দেয়া, হজ্জ অনাদায়ী থাকলে বদলী হজ্জ করানোর ব্যবস্থা করা, যাকাত অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করা ইত্যাদি। সন্তানের যদি সাধ্য থাকে, তাহলে এগুলো করা দ্বারাও মৃত পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করান যায়। আর যতক্ষণ তারা দুনিয়াতে বেঁচে আছেন, ততক্ষণ সাধ্যমত তাদের খেদমত করতে থাকা। বিশেষভাবে বৃদ্ধ বয়সে তাদের খেদমতের প্রয়োজন বেশী হয়, এই সময়ে তাদের খেদমতের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ (بنی اسرائیل : ۲۳)

অর্থাৎ, মাতা-পিতার উভয়কে অথবা একজনকে যদি বৃদ্ধ অবস্থায় পাও, তাহলে তাদের খুব খেদমত কর। কোনভাবে তাদের কষ্ট দিও না। একটা কথা দ্বারাও কখনো কষ্ট দিবে না। অনেক সময় দেখা যায় মাতা-পিতা বার্ধক্যে উপনীত হলে এক কথা বারবার বলতে থাকেন। এতে সন্তান ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে বলতে পারে— উফ! কী যন্ত্রণায় পড়লাম! কী প্যাচাল পাড়া শুরু করলেন! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন মুখ থেকে এরকম উফ-ও বলতে পারবে না। তাদেরকে ধমক দিতে পারবে না, তাদের সাথে নরমে সম্মান রক্ষা করে কথা বলবে।

পিতা-মাতার খাতিরে পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনের সাথে এবং পিতা- মাতার ঘনিষ্ঠজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, সম্মানের ব্যবহার করা এবং সাধ্য অনুযায়ী তাদের উপকার ও সাহায্য করা কর্তব্য।

পিতা-মাতার খেদমত করলে ইল্‌মেও বরকত হয়। ইমাম গাযালী (রহ.)-এর ঘটনা তার প্রমাণ। ইমাম গাযালী (রহ.) ইসলামী ইতিহাসের একজন বড় আলেম ব্যক্তি, বড় দার্শনিক ব্যক্তি। তিনি ইসলামী ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন। তার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, দীর্ঘ দিন তিনি মায়ের খেদমতে থাকার কারণে ইল্‌ম চর্চা করতে পারেননি। আল্লাহ পাক এর ওছীলায় তাকে এত ইল্‌ম দিয়েছেন যে, ইসলামী ইতিহাসের শীর্ষ-স্থানীয় আলেমদের তালিকায় চলে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার ইলমে বরকত দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ পাক পিতা-মাতার খেদমতের মধ্যে সব ধরনের ফায়দা নিহিত রেখেছেন। আল্লাহ পাক আমাদের সহীহ সমঝ দান করেন। মাতা-পিতার খেদমতের তাওফীক দান করেন। আমীন!

বি: দ্র: দুধ মাতার সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাঁর আদব-তাযীম রক্ষা এবং যথাসাধ্য তাঁর ভরণ-পোষণ করতে হবে। আর বিমাতা নিজের আপন মাতা না হলেও যেহেতু সে পিতার প্রিয়জনের মধ্যে একজন, তাই তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার এবং যথাসাধ্য তার জানে-মালে খেদমত করতে হবে।[১]

❖ ❖ ❖

২১. বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের যে ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২১ নং হল ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা তথা সন্তানের হক আদায় করা। নিম্নে সন্তানের হক সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

সন্তানের হক

মনে রাখতে হবে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যেমন অধিকার রয়েছে, পিতা-মাতার প্রতিও সন্তানের অধিকার রয়েছে। শরীয়তে একদিকে পিতা-মাতার হকও রেখেছে, অন্যদিকে সন্তানের হকও রেখেছে। শুধু সন্তানই পিতা-মাতার জন্য করবে, পিতা-মাতা সন্তানের জন্য করবে না—এরকম নয়। উভয় দিকেই বিধান রাখা হয়েছে, উভয় পক্ষেরই করণীয় রয়েছে। সন্তানেরও করণীয় আছে, পিতা-মাতারও করণীয় আছে। সন্তানেরও যেমন করণীয়, পিতা-মাতারও তেমন করণীয়। বরং হাদীছ থেকে বোঝা যায় সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করাটা বেশী গুরুত্ব রাখে। কেননা, তারা যদি তাদের করণীয় কাজ না করেন, অর্থাৎ যেভাবে সন্তানকে গড়ে তোলা কর্তব্য, যেভাবে সন্তানকে লালন-পালন করা কর্তব্য সেভাবে না করেন, তাহলে সন্তান থেকে তাদের যা পাওয়ার তারা তা পাবেন না। অর্থাৎ পিতা-মাতা করলে সন্তান করবে, নতুবা সন্তান করবে না। অতএব পিতা-মাতার করাটাই হল বুনিয়াদী বা মৌলিক বিষয়।

একবার হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে একজন লোক আসলেন। হযরত ওমর (রাযি.) তখন খলীফা ছিলেন। সেই লোকটা তার ছেলেকে নিয়ে খলীফার দরবারে এসে বললেন : হে খলীফা! আমার এই সন্তান আমার কথা মানে না, আমার অধিকার আদায় করে না। হযরত ওমর (রাযি.) ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার পিতার অভিযোগ সত্য কি? ছেলেটা উল্টো প্রশ্ন

১. পিতা-মাতার অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি— معارف القرآن - حقوق العباد - تنبيه الغافلين - مفاتيح الجنان - احسن الفتاوى ج/١ ও تعليم الدين প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

Scanned by CamScanner

করল যে, হে খলীফা! পিতা-মাতার জন্য সন্তানের যেমন কর্তব্য আছে, সন্তানের জন্যেও কি পিতা-মাতার কোন কর্তব্য আছে? হযরত ওমর (রাযি.) বললেন : হ্যাঁ আছে। তখন হযরত ওমর (রাযি.) তিনটা কর্তব্যের কথা উল্লেখ করলেন। এক নম্বর কর্তব্য—পিতা একটা ভাল মায়ের ব্যবস্থা করবে। এটা বললেন এজন্য যে, ভাল মায়ের গর্ভে ভাল সন্তান হয়। তাই ভাল সন্তান চাইলে তার জন্য একটা ভাল মায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

দুনিয়াতে বাস্তবেও দেখা গেছে অধিকাংশ বুযুর্গ এবং ওলী-আউলিয়াদের বংশ ভাল এবং তারা ভাল মায়ের সন্তান। এই হযরত ওমর (রাযি.)-এর জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। যখন তিনি খলীফা ছিলেন, তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল তিনি রাতের বেলায় বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে দেখতেন মানুষের কী অবস্থা। রাতের অন্ধকারে নির্জন মুহূর্তে মানুষের আসল চরিত্র ফুটে ওঠে। মানুষের প্রকৃত অবস্থা এবং পারিবারিক আসল অবস্থা, মনের আসল কথা এই সময়ে জানা যায়। তাই তিনি মানুষের দ্বীনী, ঈমানী এবং জাগতিক আসল অবস্থা জানার জন্য রাতের বেলায় বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখতেন। একবার এক ভোর রাতে তাহাজ্জুদের পরে তিনি বের হয়েছেন। একটা বাড়ির কাছে গিয়ে শুনছেন— এক মা তার মেয়েকে ডেকে বলছেন যে ওঠো, তাড়াতাড়ি ওঠো, ভোর হয়ে গেছে, দুধ দোহন করতে হবে, দুধ বিক্রি করতে হবে, তারপর খাবার জোগাড় করতে হবে, তাড়াতাড়ি ওঠো! আমাদের টাকা-পয়সার প্রয়োজন অনেক, তাই দুধের মধ্যে একটু পানি মিশ্রিত করে দিতে হবে, তাহলে পয়সা বেশী আসবে। তখন মেয়ে বলছে : মা, খলীফা ওমরের তো ঘোষণা যে, দুধের ভিতরে কেউ পানি মিশাতে পারবে না, মিশালে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। মা বলল : এখন রাতের অন্ধকার, খলীফা তো জানতেই পারবেন না আমরা দুধে পানি মিশ্রিত করলাম কি-না। মেয়ে বলল : খলীফা না জানলেও আল্লাহ তা'আলা জানবেন। খলীফার শাস্তি থেকে বাঁচলেও আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচা যাবে না। হযরত ওমর (রাযি.) নীরবে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনলেন। পরের দিন তিনি ঐ মেয়েকে দরবারে ডেকে আনলেন। ডেকে এনে দরবারীদের সামনে নিজের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে এই মেয়ের বংশে ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.)-এর জন্ম হয়েছে, যাকে ওমরে ছানী বা দ্বিতীয় ওমর বলা হয়।[১] তিনি সাহাবী

১. اصلاحی خطبات، محمد تقی عثمانی ۔

ছিলেন না কিন্তু সম্পূর্ণ সাহাবীর চরিত্রে উত্তীর্ণ ছিলেন। যার জীবনের কোন একটা আচরণ সম্পর্কে কেউ কোন দিন সমালোচনা করতে পারেনি। এমন মহান ব্যক্তিত্ব ঐ মেয়ের গর্ভে জন্ম নেন। তাই বলা হচ্ছিল ভাল সন্তান চাইলে, ভাল মায়ের ব্যবস্থা করতে হয়। দেখা গেল ভাল সন্তান চাইলে সন্তানের জন্মের আগ থেকে তার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। মায়ের চিন্তা-চেতনা, মায়ের স্বভাব-চরিত্র সবকিছুর প্রভাব পড়ে সন্তানের মধ্যে। যেমন মা হবে, তেমন সন্তান হবে। মা যেরকম চিন্তা-ভাবনা করে, সন্তানের ভিতরে ওরকম চিন্তা-চেতনা আসে।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) একটা বাস্তব ঘটনা বয়ান করেছেন : এক নতুন দম্পতি অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী দুজনে স্থির করল যে, আমরা একটা ভাল সন্তান চাই। তাই এখন থেকে আমরা কোন খারাপ কাজ করব না, কোন খারাপ চিন্তা করব না, খারাপ কিছু মনে স্থান দিব না। যাতে আমরা একটা ভাল সন্তান লাভ করতে পারি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা জীবন চালাতে থাকল। এক সময় তাদের একটা ছেলে সন্তান হল। ছেলেটা কিছু বড় হয়েছে। ছেলেকে সাথে নিয়ে পিতা একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে ছিল একটা বরই গাছ। ছেলেটা ঐ গাছ থেকে একটা বরই ছিড়ে খেল। তখন পিতা চিন্তা করলেন, এতো পরের মাল চুরি করে খাওয়া। এই চুরির মনোবৃত্তি তার ভিতরে কোত্থেকে আসল! ঘরে ফিরে বিবিকে জিজ্ঞাসা করল— সত্য কথা বল! সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় তোমার ভিতরে এরকম চুরির চিন্তা এসেছিল কি-না? বিবি বলল : হ্যাঁ, সন্তান গর্ভে ছিল, এ সময় আমাদের পাশের বাড়ির বরই গাছ থেকে মালিকের অগোচরে একটা বরই ছিড়ে খেয়েছিলাম। এ কারণেই হয়তো সন্তানের ভিতরে এর প্রভাব পড়েছে।

মানুষের মন-মানসিকতা গঠনের পেছনে অনেক কিছু দায়ী, অনেক কিছু উৎস আছে। তার ভিতরে মাতা-পিতার চিন্তা-চেতনাও একটা। মাতা-পিতার চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসিকতা যেমন, তাদের সন্তানও তেমন গড়ে ওঠে। চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসিকতা গঠনের পেছনে মানুষের খাদ্য পানিয়েরও আছর আছে। এ জন্য নিজের যেমন হালাল মাল খাওয়া কর্তব্য, সন্তানকেও হালাল মাল দ্বারা লালন-পালন করা কর্তব্য।

সন্তানকে লালন পালন করা যে ফরয, এই ফরয আদায় হবে না যদি সন্তানকে হালাল মাল দ্বারা লালন-পালন করা না হয়। কারণ, হালাল মাল দ্বারা লালন-পালন করলে সন্তানের ভিতরে ভাল চেতনা সৃষ্টি হবে। নতুবা

Scanned by CamScanner

তার ভিতরে গোনাহের চেতনা সৃষ্টি হবে। হারাম মালের আছর খারাপ হয়। শরীয়তে যত খাদ্য-খাবারকে হারাম করা হয়েছে, তা হারাম করার একটা প্রধান কারণ হল তার ভিতরে খারাপ প্রভাব রয়েছে। শূকর, কুকুর খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে। কারণ, তাদের ভিতরে চারিত্রিক খারাবী রয়েছে। তাদের ভিতরে বেহায়াপনা এবং নির্লজ্জতা রয়েছে। যারা এগুলো খায় তারাও এরকম নির্লজ্জ হয়ে যায়। পশ্চিমা বিশ্বের যারা শূকর খায়, তারা এমন নির্লজ্জ হয়ে যায় যে, মানুষের সামনে রাস্তায়, পার্কে শূকর-কুকুরের মত নির্লজ্জভাবে যৌন কর্মে লিপ্ত হয়। তারা এরকম নির্লজ্জ কেন হয়? কারণ, নির্লজ্জ হওয়ার মত খাদ্য-খাবার তারা গ্রহণ করে। এছাড়াও আরও অনেক কারণ রয়েছে।

যাহোক, মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসিকতা গঠনের পেছনে খাদ্যের বিরাট প্রভাব আছে। হযরত মাওলানা ইয়াকূব নানুতুবী (রহ.) যিনি একসময় দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি একবার এক দাওয়াতে গিয়েছিলেন। কয়েক লোকমা খাওয়ার পরেই তাঁর মনে সন্দেহ জাগে যে, খাদ্যটা বোধ হয় হালাল নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে বুযুর্গানে দ্বীনের অন্তরে এরকম অনুভূতি জাগ্রত হয়ে থাকে। তিনি মেজবানকে অর্থাৎ ঘর ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এই খাদ্য-খাবার কীভাবে সংগ্রহ করেছেন? খবর নিয়ে জানতে পারলেন, এই খাবার হালাল উৎস থেকে আসেনি। হযরত ইয়াকূব নানুতুবী (রহ.) তখন খাওয়া বন্ধ করে দিলেন, আর এক লোকমাও গ্রহণ করলেন না। ইয়াকূব নানুতুবী (রহ.) নিজে বয়ান করেছেন : এরপর ঐ যে এক-দুই লোকমা খেয়েছি, তার কারণে দুই মাস পর্যন্ত মনের মধ্যে গোনাহের আগ্রহ হতে থাকত এবং মনের ভিতর গোনাহের অন্ধকার অনুভব হত।

যখন গোনাহের চেতনা ভিতরে আসে তখন বুযুর্গানে দ্বীন টের পান যে, ভিতরে অন্ধকার, তাদের অস্বস্তি বোধ হতে থাকে। হাদীছেও এসেছে মানুষ যখন গোনাহ করে, গোনাহের কারণে তার কলবে অর্থাৎ অন্তরে একটা কালো দাগ পড়তে থাকে। এভাবে গোনাহ করতে করতে, কালো দাগ পড়তে পড়তে এক সময় কলব সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায়, বুযুর্গানে দ্বীন ঐ অন্ধকার টের পান। ঐ অন্ধকারের কারণে তারা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। আমরা ঐ অন্ধকার টের পাই না। কারণ, আমরা সব সময় থাকিই অন্ধকারের ভিতরে, আলোর ভিতরে থাকিই না, তাই অন্ধকারের কষ্ট বোধ করি না। যারা সব সময় আলোর ভিতরে থাকেন, অন্ধকারে তাদের কষ্ট বোধ হয়। যেমন

শহরের মানুষ সব সময় বিদ্যুতের আলোর মধ্যে থাকে, সব সময় আলো ঝলমলে পরিবেশের মধ্যে থাকে। এ কারণে একটু সময়ের জন্যেও বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকারে তাদের দারুণ অস্বস্তি বোধ হয়। কিন্তু যে সব গ্রামের মানুষ কোন দিন বিদ্যুতের মুখ দেখেনি, তারা সব সময়ই অন্ধকারে থাকতে অভ্যস্ত, অন্ধকারে থাকা তাদের কাছে কোনই কষ্টকর লাগে না। একটা চেরাগ জ্বালালেই তাদের কাছে মনে হয় অনেক আলোকিত। অন্ধকারে তারা কোন অস্বস্তি বোধ করে না। কারণ, অন্ধকারের মধ্যেই তারা সব সময় থাকে। এভাবেই গোনাহ করলে কলবে যে অন্ধকার সৃষ্টি হয়, বুযুর্গানে দ্বীন সেই অন্ধকারে খুব অস্বস্তি বোধ করেন। কারণ, তারা ঐ অন্ধকারে থাকতে অভ্যস্ত নন। তারা সব সময় অন্তরকে পরিষ্কার রাখেন, আলো ঝলমলে রাখেন।

যাহোক হযরত ওমর (রাযি.) এক নম্বরে বললেন : সন্তানের একটা হক হল তার ভাল মায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় হকের কথা বললেন : সন্তানের ভাল নাম রাখতে হবে। ভাল নামেরও ভাল প্রভাব হয়ে থাকে। এজন্যেই ইসলাম ভাল অর্থপূর্ণ নাম রাখতে বলেছে। ভাল নামের ভাল আছর হয়, খারাপ নামের খারাপ আছর হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন কেউ যদি আসত যার নামের অর্থ খারাপ, তিনি তার ঐ নাম পরিবর্তন করে একটা ভাল অর্থপূর্ণ নাম রেখে দিতেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বয়ান করেছেন যে, একটা ছেলের নাম ছিল কালীমুল্লাহ। তার পিতা আমার কাছে এসে বলল যে, হুজুর! আমার ছেলেটা প্রায়ই অসুস্থ থাকে। আমি তার নাম পরিবর্তন করে "সালীমুল্লাহ" রেখে দিলাম। "কালীম" শব্দের অর্থ হল আহত, এই শব্দের ভিতরে অসুস্থতার ইঙ্গিত আছে। আর "সালীম" শব্দের অর্থ নিরাপদ, সুস্থ। হযরত থানভী (রহ.) বলেন : সালীমুল্লাহ নাম রাখার কিছু দিন পরেই ছেলেটা সুস্থ হয়ে গেল। নামের এরকম আছর হয়ে থাকে।

আমাদের সমাজে একটা বড় দোষ রয়েছে। তা হল আমরা অনেকেই তো ভাল নাম রাখি না, ইংরেজী নাম রাখি, বাংলা নাম রাখি, বা ইংরেজী, বাংলা, আরবী, ফার্সী মিলিয়ে জগাখিচুড়ি স্টাইলের নাম রাখি। যারা একটু ভাল নাম রাখি, তারাও সেই ভাল নাম শিকায় তুলে রাখি। ভাল নাম কাগজে-কলমে রেখে একটা বাজে ডাক নাম দিয়ে তাকে ডাকতে থাকি। এমন করলে ভাল নাম রাখার ফায়দা পাওয়া যাবে না। ভাল নাম রাখার

Scanned by CamScanner

ফায়দা তখনই পাওয়া যাবে, যখন সেই নামে তাকে ডাকা হবে। যাহোক শরীয়াতে ভাল নাম রাখতে বলা হয়েছে। এটা সন্তানের একটা অধিকার।

এরপর তৃতীয় নম্বরে হযরত ওমর (রাযি.) বললেন : সন্তানের আর একটা অধিকার হল পিতা-মাতা তাকে কুরআন-কিতাব শিক্ষা দিবে। কুরআন কিতাব শিখানো বলতে কুরআন শরীফ পড়া শিখানো; এটাতো আছেই। এছাড়াও জন্মের শুরু থেকেই যেন তার ভিতরে দ্বীন ইসলামের চেতনা আসে এ ধরনের কথাবার্তা শিখাতে হবে। দ্বীনের কথা শিখাতে হবে, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের কথা শিখাতে হবে। সন্তানকে সর্বপ্রথম যে কথা শিখানো উত্তম তা হল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এভাবে জীবনের শুরুতে তার ভিতরে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের কথা ঢুকিয়ে দেয়া হবে। জন্মের শুরু থেকেই যেন তার মধ্যে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের কথা এবং দ্বীনের জরুরী ইবাদতের কথা তার ভিতরে প্রবেশ করে, এজন্য যখন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সাথে সাথে তার ডান কানে আযানের শব্দগুলো এবং বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শোনানো সুন্নাত। এখন যদিও সে এ কথাগুলোর অর্থ বুঝবে না, কিন্তু তার মনের মধ্যে এই কথাগুলোর আছর পড়বে। সে বুঝুক আর না বুঝুক আছর হবেই। এজন্য সুন্নাত হল ছেলে হোক মেয়ে হোক, সবার ডান কানে আযানের শব্দগুলো এবং বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শোনাতে হবে। সন্তানের শিশু বয়স থেকেই পদে পদে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের কথা তাদেরকে শিখাতে হবে। ছোট বয়সে যে কথাগুলো, যে চেতনাগুলো তার ভিতরে ঢুকবে, সেটা পাথরে অঙ্কন হওয়ার মত স্থায়ী হয়ে থাকবে। হাদীছে বলা হয়েছে :

اَلْعِلْمُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ ـ (رواه البيهقي في المدخل)

অর্থাৎ ছোট বয়সে ইলম শিখা পাথরের অঙ্কনের মত।

অর্থাৎ ছোট বয়সে কোন কথা শিখলে পাথরের দাগের মত সেটা স্থায়ী হয়ে থাকবে। এজন্যই ছোট বাচ্চাদের অল্প বয়স থেকেই সাধ্যমত দ্বীন শিখানো কর্তব্য। হযরত ওমর (রযি.) তাই বললেন : এটা সন্তানের হক। তিনি মোট তিনটা হকের কথা বললেন। তখন ঐ ছেলেটা বলল : মহামান্য খলীফা! আপনি সন্তানের তিনটা হকের কথা বলেছেন— ভাল মায়ের ব্যবস্থা করা, ভাল নাম রাখা আর কুরআন-কিতাব শিক্ষা দেয়া। তাহলে শুনুন, আমার মা হল সিন্ধুর এক বান্দী, পিতা আমার নাম রেখেছেন হাফ্ল, হাফ্ল

শব্দের অর্থ হল চর্মচিকা। আর আমাকে মোটেও কুরআন শিক্ষা দেননি। সম্ভবতঃ তার পিতা অর্থ না বুঝেই হাফল নাম রেখেছিল। আমরাও তো কত শব্দ না বুঝে নাম রাখি। হযরত ওমর (রাযি.) ছেলেটির কথা শুনে তার পিতাকে ধমক দিয়ে দরবার থেকে বের করে দিলেন যে, তুমি বলছ সন্তান তোমার অধিকার আদায় করে না, তুমিই তো সন্তানের অধিকার আদায় করনি।[১] তুমি যদি সন্তানের অধিকার আদায় করতে, তাহলে তোমার সন্তানও তোমার অধিকার আদায় করত। এ থেকে বোঝা যায় সন্তানের হক আদায় করা হল বুনিয়াদী বিষয়। আমরা যদি সন্তানের অধিকার আদায় করি, তাহলে সন্তান আটোমেটিক এমনভাবে গড়ে উঠবে যে, সে আমাদের আনুগত্য করবে, আমাদের খেদমত করবে। শরীয়ত যেভাবে সন্তানকে গড়ে তুলতে বলেছে, সেভাবে যদি আমরা সন্তানকে গড়ে তুলি, তাহলে আশা করা যায় সন্তান আমাদের অবাধ্য হবে না। আমরা সন্তানের জন্য করলে সন্তানও আমাদের জন্য করবে। মাতা-পিতাদের এ কথাটা মনে রাখতে হবে, আর সন্তানদেরও মনে রাখতে হবে তারা যদি পিতা-মাতার জন্য না করে, তাহলে তাদের সন্তানও তাদের জন্য করবে না। একটার সাথে আর একটা সম্পর্কিত। একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন নয়।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। সন্তানের জন্য আমরা যা করব, তা সন্তান থেকে পাওয়ার আশায় নয় বরং আমরা সন্তানের জন্য করব আমাদের দায়িত্ব হিসেবে। সন্তানকে দ্বীনদার বানানো, ইসলামী তরীকায় গড়ে তোলা পিতা-মাতার উপর ফরয। এটা কোন হালকা বিষয় নয়, এটা ফরয পর্যায়ের দায়িত্ব। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ۔(متفق عليه)

অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই যিম্মাদার, প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

সন্তান পিতা-মাতার অধীনস্থ, তাই সন্তান সম্পর্কে পিতা-মাতাকে জবাবদিহি করতে হবে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সম্পর্কে যেমন জবাবদিহি করতে হবে, সন্তানকে আমরা সহীহ তরীকায় লালন-পালন করেছি কি না এজন্যও জবাবদিহি করতে হবে। কাজেই সন্তান লালন-পালন করতে হবে দায়িত্ব পালনের অনুভূতি নিয়ে। যদি এই দায়িত্ব পালনে আমাদের ত্রুটি

১. تنبيه الغافلين ॥

হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেই। আর যদি আমাদের তেমন কোন ত্রুটি না থাকে, তারপরও আমাদের সন্তান অবাধ্য হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে এটা পরীক্ষাস্বরূপ হচ্ছে বা গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য হচ্ছে। আল্লাহ্র নবী হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তানও পিতাকে মানেনি। শেষ পর্যন্ত কাফেরদের সাথে পানিতে ডুবে মরেছে, তবুও পিতার কথা মানেনি। এটা নবীর মর্যাদাকে বুলন্দ করার জন্যই ছিল। নতুবা আল্লাহ্র নবী সন্তানকে ভাল বানানোর চেষ্টায় ত্রুটি করেছেন তাতো হতে পারে না। হযরত নূহ (আ.)-এর এ ঘটনা থেকে এটাও শিক্ষণীয় যে, আমরা সন্তানকে ভাল বানানোর চেষ্টা করব, কিন্তু চূড়ান্তভাবে আল্লাহর ফয়সালা যা তা-ই হবে। আমরা চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে তা জরুরী নয়। আল্লাহ্র নবীর চেষ্টা সত্ত্বেও যখন হয়নি, তখন আমাদের চেষ্টায় হয়েই যাবে তা চিন্তা করা ভুল। তবে আমাদের চেষ্টা করতে থাকা কর্তব্য। তাই আমরণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে হবে। আল্লাহ্ই ফয়সালার মালিক।

সন্তানকে দ্বীনদার বানানোর জন্য দিলের মধ্যে ছটফটানি থাকতে হবে। সন্তান আগুনে পুড়ে যেতে থাকলে তা থেকে বাঁচানোর জন্য যেমন ছটফটানি আসে, তার চেয়ে বেশী ছটফটানি আসতে হবে। কারণ, দুনিয়ার আগুনের চেয়ে জাহান্নামের আগুন অনেক অনেক বেশী ভয়াবহ। সন্তানকে দ্বীনদার বানাতে না পারলে তারা সেই আগুনে দগ্ধ হবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا۔

অর্থাৎ হে মুমিনরা! তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা তাহরীম : ৬)

এ আয়াতে আল্লাহ পাক আগুন থেকে বাঁচাও কথাটা বলে এরকম একটা চেতনা জাগ্রত করে দিতে চান যে, তোমাদের সন্তানাদি আগুনের দিকে দৌড়াচ্ছে, আগুনে পুড়ে তোমাদের চোখের সামনে দগ্ধ হতে থাকবে। এরকম মুহূর্তে সন্তানকে বাঁচানোর জন্য ভিতরে যেমন তড়পানির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, জাহান্নামের আগুন থেকে সন্তানকে বাঁচানোর জন্য যেন ঐরকম তড়পানি সৃষ্টি হয়। এরকম মনোভাব নিয়ে সন্তানকে দ্বীনের দিকে আনার চেষ্টা করতে হবে। এই পর্যায়ের চেষ্টা যখন আসছে এরকম চেতনা তড়পানি যখন আসবে, তখন ইনশাআল্লাহ আমাদের সন্তান ভাল হবে। যদি ভাল না-

ও হয় আমাদের চেষ্টা আমরা করে যাব। আল্লাহ পাক আমাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিবেন, আল্লাহর কাছে আমরা নাজাত পেয়ে যাব। আমাদের নাজাতের জন্যই সন্তানের নাজাতের ফিকির করতে হবে। আমি শুধু আমার নাজাতের ফিকির করব তা নয়, আমি নিজের নাজাতের ফিকিরও করব, অন্যদের নাজাতের ফিকিরও করব। যে যত বেশী কাছের তার প্রতি আমার দায়িত্ব বেশী, তার নাজাতের ফিকিরও আমাকে বেশী করতে হবে।[১]

আল্লাহ পাক আমাদের সহীহ সমঝ দান করুন। আমাদের সন্তানদেরকে নেককার পরহেযগার হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

❖ ❖ ❖

২২. বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের যে ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ২২ নং হল আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

আত্মীয়-স্বজনের হক

* আনুগত্য, খেদমত, সদ্ব্যবহার এবং আদব-তা'জীমের ক্ষেত্রে দাদা-দাদী এবং নানা-নানীর হক পিতা-মাতার তুল্য। চাচা এবং ফুফুর হক পিতার তুল্য। ছোট ভাইয়ের কাছে বড় ভাই পিতৃতুল্য। হাদীছের বর্ণনা ও ইংগিত অনুসারে এরূপই প্রমাণিত হয়। এছাড়া ভাতিজা, ভাতিজী, ভাগিনা, ভাগ্নী প্রমুখ আত্মীয়-স্বজন, যাদের সাথে জন্মগতভাবেই আত্মীয়তা হয়

সাধারণভাবে তাদের সকলের হক বা অধিকার নিম্নরূপ :

১. তাদের ভালবাসা।

২. তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

৩. তাদের মধ্যে কারও ভরণ-পোষণের কষ্ট থাকলে সঙ্গতি অনুসারে তাদের আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করা।

৪. মাঝে-মধ্যে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা।

৫. তাদের দ্বারা কোন কষ্ট পেলে তা সহ্য করা।

৬. তাদের সাথে আত্মীয়তা ও সম্পর্ক ছেদন না করা।

৭. সালাম, কালাম ও হাদিয়া আদান-প্রদান অব্যাহত রাখা। উল্লেখ্য যে,

---

১. تحبيب الغافلين - اولاد ، حقوق العباد ، احسن الفتاوى ج/٥ ، مفتاح الجنان এবং 'মাতা পিতা ও সন্তানের হক' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

উপরোক্ত বিষয়গুলো আমল করাকে বলা হয় 'ছেলায়ে-রেহ্‌মী' অর্থাৎ, আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এই ছেলায়ে-রেহ্‌মী ওয়াজিব।

* শ্বশুর-শাশুড়ী, শালা, ভগ্নীপতি, জামাই, পুত্রবধূ, স্ত্রীর আগের ঘরের সন্তান, স্বামীর অন্য পক্ষের সন্তান ইত্যাদি যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে আত্মীয়তা হয়, তাদের হকও সাধারণ মুসলমানের চেয়ে বেশী। সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান ও এতীম-মিসকীনের চেয়ে তাদের প্রাধান্য দেয়া উচিত। অনেক আলেমের মতে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের ন্যায় বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথেও ছেলায়ে-রেহ্‌মী রক্ষা করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীরই হুকুম এক পর্যায়ের।[১]

❖ ❖ ❖

২৩. বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের যে ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে নং হল উপরওয়ালার অনুগত হওয়া, যেমন চাকরের প্রভুভক্ত হওয়া।
২৪. ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করা।
২৫. মুসলমানদের জামা'আতের সাথে থাকা ও হক্কানী জামা'আতের সহযোগিতা করা, তাদের মত- প'থ ছেড়ে অন্যভাবে না চলা।
২৬. শরী'আত বিরোধী না হলে শাসনকর্তাদের অনুসরণ করা।
২৭. লোকদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ হলে তা মিটিয়ে দেয়া।
২৮. সৎকাজে সাহায্য করা।
২৯. আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার করা তথা সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজে বাধা দেয়া। নিম্নে আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়ম-পদ্ধতি ও মাসায়েল বর্ণনা করা হল।

ওয়াজ-নসীহতের মাসায়েল

* ওয়াজ-নসীহত ও বয়ান করার পূর্বে নিয়ত সহীহ করে নিবে অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন যিন্দা করার এবং ছওয়াব হাছিল করার নিয়তে করবে।

* যে বিষয় বিশুদ্ধভাবে জানা আছে একমাত্র সেটাই বলবে। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে যেটা জানা হয়নি, তাহকীক ছাড়া সেটা বর্ণনা করা মিথ্যা বয়ান করার শামিল।

* অন্যকে যে বিষয়ের দাওয়াত ও নসীহত প্রদান করবে, প্রথমে নিজে সেটার উপর আমল শুরু করতে পারলে উত্তম। অন্যথায় মানুষের মনে তার দাওয়াত ও নসীহতের আছর কম হবে।

---

১. مفاتیح الجنان . حقوق العباد . تعلیم الدین এবং মা-বাপ ও সন্তানের হক গ্রন্থাদি থেকে গৃহীত।

* যে বিষয় শ্রোতাদের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় সে বিষয়ের বয়ানকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরী।

* দ্বীনকে সহজভাবে পেশ করা নিয়ম, যেন শ্রোতারা দ্বীনকে কঠিন মনে করে না বসে।

* বয়ান এবং ওয়াজের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নসীহত না করা। এতে উক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে বক্তার প্রতি মনে মনে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং হিতে বিপরীত হতে পারে।[১]

❖ ❖ ❖

৩০. বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের যে ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ৩০ নং হল জেহাদ করা। সীমান্ত রক্ষা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

৩১. হদ তথা শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি কায়েম করা।

৩২. আমানত আদায় করা। গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা এর অন্তর্ভুক্ত।

৩৩. প্রতিবেশীর হক আদায় করা ও তাদের সম্মান করা। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হল।

প্রতিবেশীর হক

হাদীছে প্রতিবেশীর বহু অধিকার বর্ণিত হয়েছে। প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে হাদীছে যা বলা হয়েছে, সেই অধিকারগুলো নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে বুঝে আসবে ইসলাম কত হৃদ্যতাপূর্ণ, কত সহানুভূতিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে চায়। একজন প্রতিবেশী আরেকজন প্রতিবেশীর সেই অধিকারগুলো যদি আদায় করে, তাহলে দেখা যাবে প্রতিবেশী আপনজনের মত হয়ে যাবে। হাদীছে সেই সব অধিকার আদায়ের ব্যাপারে জোর তাগিদও দেয়া হয়েছে। একটা হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ.(مسلم)

অর্থাৎ কেউ মু'মিন হয়ে থাকলে সে যেন প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করে। অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে :

أَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا.

অর্থাৎ প্রতিবেশীর অধিকার আদায় কর, তাহলে মু'মিন হতে পারবে।

---

১. اصول قرآنی کے دعوت دینی ومفتاح الایمان، شرح الاسلام، معارف القرآن، معارف انقلاب امت، اصلاح প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল প্রতিবেশীর অধিকার ঠিকমত আদায় না করলে সে মু'মিন হতে পারবে না। অর্থাৎ খাঁটি মু'মিন বা পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবে না। মু'মিন হিসেবে একজন মানুষের অনেক কিছু করণীয় আছে, সেই সবগুলো যদি সে না করে, তাহলে সে পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবে না। প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করাও সেই করণীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই প্রতিবেশীর অধিকার আদায় না করলে সে কীভাবে পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবে? এ হাদীছগুলোতে প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারলেন যে, প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

مَا حَقُّ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক প্রতিবেশীর উপর আরেক প্রতিবেশীর অধিকার কী কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে যা বলেছিলেন তা শোনার আগে প্রতিবেশী কাদের বলা হয় তা শুনুন। এক রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী বাড়ির চতুর্দিকে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত সকলেই প্রতিবেশী।[১]

তিন ধরনের প্রতিবেশী আছে। কিছু প্রতিবেশী আছে যারা প্রতিবেশীও আবার আত্মীয়-স্বজনও। তাদের অধিকার ডবল। আত্মীয় হিসেবেও তাদের অধিকার রয়েছে, আবার প্রতিবেশী হিসেবেও অধিকার রয়েছে। আর এক ধরনের প্রতিবেশী হল যারা আত্মীয় নয়, শুধু পাশাপাশি অবস্থানকারী হিসেবে প্রতিবেশী। আরেক ধরনের প্রতিবেশী আছে যারা আশেপাশে বসবাসকারী হিসেবেও নয় তবে একসাথে উঠা-বসা করে, বা একসাথে সফর করে বা এক অফিস-আদালতে চাকুরী করে, বা একই স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় একসাথে পড়াশুনা করে এবং একসাথে কিছুক্ষণ থাকে, তারাও প্রতিবেশী। যদিও তারা সাময়িক প্রতিবেশী, তবুও প্রতিবেশী হিসেবে তাদের কিছু অধিকার থাকবে। এমনকি সফরে একসাথে এক গাড়িতে পাশাপাশি বসে যাচ্ছে সেও প্রতিবেশী, যতক্ষণ এক সাথে আছে ততক্ষণ সে প্রতিবেশী। যাহোক যেরকম প্রতিবেশীই হোক প্রতিবেশীর অধিকার কি সে সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন :

---

১. عمل ।

اِنِ اسْتَقْرَضَكَ اَقْرَضْتَهُ . وَاِنِ اسْتَعَانَكَ اَعَنْهُ . وَاِنِ احْتَاجَ اَعْطَيْتَهُ . وَاِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ . وَاَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّيْتَهُ . وَاَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ عَزَّيْتَهُ . وَاِذَا مَاتَ اِتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ . وَلَا تَسْتَطِيْلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ فَتَحْجِبَ عَنْهُ الرِّيْحَ اِلَّا بِاِذْنِهِ . وَلَا تُؤْذِيْهِ بِرِيْحِ قِدْرِكَ اِلَّا اَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا . وَاِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاَهْدِلَهُ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَاَدْخِلْهَا سِرًّا وَلَا تُخْرِجْ بِهَا وَلَدَكَ لِيَغِيْظَ بِهَا وَلَدَهُ . (فتح الملهم عن الطبراني وغيرها)

অর্থাৎ প্রতিবেশী যদি ঠেকায় পড়ে তোমার কাছে ঋণ চায়, তাহলে তাকে ঋণ দিবে, অস্বীকার করবে না। শুধু ঋণ নয় যেকোন ব্যাপারে তোমার কাছে সহযোগিতা চাইলে তার সহযোগিতায় তুমি এগিয়ে আসবে। এটা শুধুমাত্র প্রতিবেশীর অধিকার নয়, সমস্ত মুসলমানের অধিকার। বলা হয়েছে : যেকোন মুসলমান ঠেকায় পড়লে অন্য মুসলমানরা তাকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসবে। কোন মুসলমানের উপর যুলুম হচ্ছে, আরেকজন মুসলমানের যতটুকু সাধ্য তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কীভাবে তাকে এর থেকে উদ্ধার করা যায়, বুদ্ধি দিয়ে হোক, পরামর্শ দিয়ে হোক, অর্থ দিয়ে হোক— যেকোনভাবে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। যেকোনভাবে তাকে উদ্ধার করতে হবে। যার যতটুকু সাধ্য আছে সে অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা মুসলমানরা আজ এই আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে আছি। খৃষ্টানরা সমাজ-সেবায়, মানুষের সাহায্য সহযোগিতায় আমাদের থেকে অনেক অগ্রসর। খৃষ্টান মিশনারীরা, বিভিন্ন খৃষ্টান এনজিওরা আর্থিক সাহায্য দিয়ে আমাদের মুসলমানদের কাছে টেনে নিচ্ছে, এমনকি খৃষ্টান পর্যন্ত বানিয়ে ফেলছে। মুসলমান তার আদর্শ ছেড়ে দিয়ে পেছনে পড়ে যাচ্ছে, আর মুসলমানদের আদর্শ অন্যরা গ্রহণ করে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। যাহোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : প্রতিবেশী সহযোগিতা চাইলে তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। তারপর তিনি বললেন : প্রতিবেশী অভাবে পড়লে তাকে অর্থ দিয়ে তার অভাব দূর করবে। অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষায় যাবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর বললেন : প্রতিবেশীর অধিকারের মধ্যে আরও রয়েছে প্রতিবেশীর কোন সুখের বিষয় ঘটলে তুমিও তাতে সুখী হবে, তুমিও তাতে নিজেকে সুখী বোধ করবে, তুমি তাকে মোবারকবাদ জানাবে। অর্থাৎ, আমি আমার নিজের সুখে যেমন সুখী,

Scanned by CamScanner

প্রতিবেশীর সুখেও আমি ওরকম সুখী হব, ওরকম আনন্দ বোধ করব, যাতে প্রতিবেশী বোঝে যে, উনি আমাকে খুবই আপন মনে করেন। তাই আমার খুশীতে উনিও খুশী।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : প্রতিবেশীর বিপদের কিছু ঘটলে, তার অসুখের কিছু ঘটলে তাকে সান্ত্বনা জানাবে, সমবেদনা জানাবে যে, তোমার ব্যথায় আমিও ব্যথিত। এটাকে বলা হয় সমবেদনা। সমবেদনা অর্থ একই রকম বেদনা, সমান বেদনা। সমবেদনা করার দ্বারা এটাই ফুটে উঠে যে, আমরা কেউ কারোর থেকে দূরের নই, কেউ কারও পর নই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন : তোমার ঘরে যদি ভাল রান্না-বান্না হয়, তোমার ঘরে যদি ভাল ফল-ফ্রুটের ব্যবস্থা হয়, ভাল খাদ্য-খাবারের ব্যবস্থা হয়, তাহলে প্রতিবেশীর জন্য তা থেকে কিছু হাদিয়া পাঠাবে। সে যেন এটা মনে না করে যে, তারা একা আনন্দে মেতে আছে। আর যদি ব্যবস্থা কম হয় এবং তা থেকে পাঠানো সম্ভব না হয়, তাহলে সে সব জিনিস গোপনে ঘরে ঢুকাও, যেন প্রতিবেশী দেখতে না পায়, যেন প্রতিবেশীর বাচ্চারা দেখতে না পায়। তোমার বাচ্চার হাতে সে সব জিনিস দিয়ে বাচ্চাকে বের করে দিবে না। যদি বাচ্চাদের হাতে সে সব জিনিস দিয়ে তাদের বের করে দাও, তাহলে প্রতিবেশীর বাচ্চারা সেটা দেখবে, তাহলে ঐ প্রতিবেশীর মনে কষ্ট আসবে যে, আমি আমার বাচ্চাকে এটা দিতে পারলাম না! আমার সাধ্য নেই, তাই দিতে পারলাম না! এটা প্রতিবেশীর জন্য খুবই মনঃকষ্টের বিষয় হবে, এরকম যেন না হয়।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : প্রতিবেশীর কেউ মৃত্যুবরণ করলে তুমি (পুরুষ হলে) তার জানাযার সাথে থাকবে। তারা যেন এটা মনে করতে না পারে যে, আমাদের আপনজন মারা গেল, অথচ আমাদের আশ-পাশের লোকজনের তাতে কোনই দুঃখ হল না।

প্রতিবেশীর কোনভাবে যেন কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই আরও বললেন : যখন তুমি একটা দেয়াল বানাবে, তখন খেয়াল করবে, দেয়াল এতটা উঁচু করবে না যাতে প্রতিবেশীর বাতাস বন্ধ হয়ে যায়। একান্তভাবে সেরূপ করতে হলে প্রতিবেশীর অনুমতি নিয়ে নিবে। যদিও শহরের জীবনে এখন এরকম খেয়াল রাখাটা সম্ভব নয়, কারণ চতুর্দিকে বড় বড় বিল্ডিং তৈরী হয়ে আগে থেকেই

বাতাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবুও যতটুকু সম্ভব এবং যেখানে সম্ভব এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রতিবেশীর অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন : তোমার বাসার ময়লা-আবর্জনার গন্ধ দিয়ে কাউকে কষ্ট দিবে না। অর্থাৎ তোমার বাসার ময়লা-আবর্জনা অন্য কারও বাড়ির পাশে, অন্য কারও দেয়ালের পাশে রেখে আসবে না, তাহলে এই দুর্গন্ধে তার কষ্ট হবে। আজকাল আমাদের সমাজে এটা খুবই লক্ষ্য রাখার বিষয়। এখন ঘন-বসতি হয়েছে, তাই অন্যের বাড়ির সামনে ময়লা-আবর্জনা ফেলে কাউকে কষ্ট দেয়া উচিৎ নয়। শহরে আমরা অনেকে ডাস্টবিন দূরে থাকলে দূরে যাওয়ার ঝামেলা না করে সহজেই আরেকজনের বাড়ির পাশে ময়লা-আবর্জনা ফেলে আসি; এটা পাপ। কারণ, এতে প্রতিবেশীকে দুর্গন্ধের কষ্ট দেয়া হয়। আর কাউকে কষ্ট দেয়া হারাম, গোনাহে কবীরা। বিশেষভাবে প্রতিবেশীকে দুর্গন্ধের কষ্ট দেয়া প্রতিবেশীর অধিকার নষ্ট করা।

এমনকি এক গাড়িতে যারা আরোহণ করে, তারাও একে অপরের প্রতিবেশী। তাই নিজে সিটের বেশী জায়গা দখল করে রেখে অন্য কোন ভাই বা বোনকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়। এটা হল প্রতিবেশীর অধিকার। শুধু প্রতিবেশীর নয় মুসলমান হিসেবেও একজন মুসলমানের উপর আরেকজন মুসলমানের এই অধিকার রয়েছে যে, কেউ কাউকে কোনভাবে কষ্ট দিতে পারবে না। হাদীছে বলা হয়েছে :

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ. (مسلم)

অর্থাৎ, খাঁটি মুসলমান তাকেই বলে, যার দ্বারা অন্য কোন মুসলমান কোনভাবে কষ্ট পায় না।

খাঁটি মুসলমান হওয়া এত সহজ নয়। আমরা একটু নামায-রোযা করলাম, একটু দান-খয়রাত করলাম, হজ্জ করলাম, যাকাত দিলাম, ব্যস নিজেদের মনে করি খাঁটি মুসলমান হয়ে গেলাম, অথচ বিভিন্নভাবে মানুষকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছি। তাহলে আমরা খাঁটি মুসলমান নই। বিশেষভাবে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া এত খারাপ যে, হাদীছে বলা হয়েছে :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ. (مسلم)

অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার কষ্ট থেকে নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে যেতে পারবে না।

কারণ, যে প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করে না সে খাঁটি মুমিন নয়, আর খাঁটি মুমিন না হলে জান্নাতে যাওয়া যায় না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهٖ-(رواه احمد)

অর্থাৎ আল্লাহ এবং আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি যার ঈমান আছে সে যেন প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করার তওফীক দান করুন। আমীন!

শুধু প্রতিবেশী নয়, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও মুসলমানদের কেউ অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করা সুন্নাত। শুশ্রূষার অনেক সুন্নাত ও আদব রয়েছে। নিম্নে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

শুশ্রূষার বিধান

ইসলামে যে শুশ্রূষার বিধান রাখা হয়েছে, সেটা এ কারণে, যেন অসুস্থ ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, সবাই আমার আপন, কেউ আমার থেকে দূরে নয়, সকলেই আমার ব্যাপারে চিন্তিত, সকলেই আমার ব্যাপারে ব্যথিত, আমার সুস্থ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সবাই ব্যাকুল। রোগ-শুশ্রূষার যতগুলি সুন্নাত শরীয়তে রাখা হয়েছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, রোগ শুশ্রূষার বিধান এজন্যই, যাতে রুগীর মন আনন্দিত হয়ে যায়, তার মনে যেন কষ্ট না থাকে। তাই বলা হয়েছে :

* যখন কেউ শুশ্রূষা করতে যাবে, তখন খুব ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরিধান করে যাবে না, খুব চেহারা মলিন করে যাবে না। কেননা, চেহারা মলিন করে থাকলে রুগীর মনে কষ্ট আসতে পারে এই ভেবে যে, আমাকে তাদের ঘৃণা হচ্ছে বা আমার অবস্থা হয়তো খুব খারাপ তাই জেনে ওরা মন খারাপ করে আছে, তাই এদের সকলের চেহারার ভিতরে বিষণ্ণতার ছাপ দেখা যাচ্ছে। তাহলে রুগী নিজের ব্যাপারে আরও দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে। ছেঁড়া-ফাটা, নোংরা পোশাক পরিধান করে গেলেও রুগী ভাবতে পারে যে, তার বিষয়টাকে খুবই হালকাভাবে দেখা হচ্ছে, তাই কোন রকম দায়সারা গোছের সাক্ষাতে এসেছে তারা।

১. فتح الملهم ج ١ ও حقوق العباد প্রভৃতি থেকে গৃহীত।

* আবার খুব জাঁক-জমকের পোশাক পরিধান করে শুশ্রূষা করতে যাওয়াও নিয়ম নয়। কারণ, তখন রুগী বুঝবে যে, আমি অসুস্থ আছি, অথচ এদের ভিতরে তার কোন অনুভূতি নেই, এরা খুব ফুর্তিতেই আছে। চিন্তা করে দেখুন কত সুন্দর বিধান ইসলামে রাখা হয়েছে।

* শুশ্রূষার সুন্নাতের মধ্যে রুগীর বিছানায় গিয়ে বসতে বলা হয়েছে। রুগীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে না বরং কোমল দৃষ্টিতে তাকাবে, যাতে রুগীর মন আপ্লুত হয়ে যায়।

* শুশ্রূষার নিয়মের মধ্যে আরও বলা হয়েছে রুগীর হাঁটুর ধারে বসতে, কারণ, দূরে দূরে থাকলে রুগী মনে করতে পারে যে, আমাকে হয়তো ওদের ঘৃণা হচ্ছে, আমাকে অস্পৃশ্য ভাবা হচ্ছে। রুগীর মনে যদি এরকম চিন্তা আসে, তাহলে সে শুশ্রূষা দ্বারা রুগীর মন ভাল হবে না বরং আরও খারাপ হবে। তাই রুগীর পাশে গিয়ে বসতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে রুগীর কপালে বা হাতে হাত রেখে বলবে ভাই কেমন আছেন? এরূপ করলে রুগী মনে করবে এরা আমাকে দূরের মনে করে না।

* রুগীর সামনে তার জন্য রোগ মুক্তির দুআ করবে যে, হে আল্লাহ! তাকে সুস্থ করে দাও। হাদীছে রোগীর কাছে থেকে তার রোগ আরোগ্যের জন্য সাতবার নিম্নোক্ত দুআ পড়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে :

اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ۔(ابو داؤد والترمذى)

অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে, মহান আরশের অধিপতির কাছে আমি তোমার রোগমুক্তি কামনা করছি। এই দুআটা সাতবার পড়া সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুগীর কাছে এই দুআ সাতবার পড়তেন।

* রোগীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলবে— لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللهُ অর্থাৎ কোন অসুবিধা নেই, আল্লাহ চাহেতো অচিরেই পবিত্রতা (সুস্থতা) লাভ হবে।[১]

* শুশ্রূষার আরও একটা সুন্নাত হল রুগীর কাছে খুব বেশীক্ষণ অবস্থান করবে না। বেশীক্ষণ অবস্থান করলে রুগীর কষ্টের কারণ হতে পারে। তাই বেশীক্ষণ অবস্থান করবে না বরং তাড়াতাড়ি চলে আসবে। আবার খুব বেশী ঘন ঘনও যাবে না, যাতে তার কষ্ট না হয়। এভাবে রোগ শুশ্রূষার যতগুলি সুন্নাত ও নিয়ম নীতি রয়েছে তা এজন্য যে, রুগীর মনের অবস্থার যেন উন্নতি হয়, তার মনের কষ্ট যেন লাঘব হয়। তাই বলা হয়েছে : যাদের সাথে সম্পর্ক

১. بخاری ۱

কম তারা শুশ্রূষার জন্য যাবেও কম, যাদের সাথে সম্পর্ক বেশী তারা যাবেও বেশী। কেননা যাদের সাথে সম্পর্ক কম তারা বার বার গেলে রুগীর খুব একটা ভাল লাগবে না বরং যার সাথে সম্পর্ক বেশী সে বেশী বেশী গেলে তার ভাল লাগবে।

❖ ❖ ❖

৩৪. বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের যে ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ৩৪ নং হল মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হল মানুষের হক আদায় করা। ইসলামে মুসলমানেরও অধিকার রয়েছে, অমুসলমানেরও অধিকার রয়েছে। সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। এমনকি গরীব-দুঃখী ও চাকর-নওকরদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। মুসলমান ও অমুসলমান প্রত্যেকের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে, প্রত্যেকের হক আদায় করতে হবে। নিম্নে প্রত্যেকের হক সম্পর্কে ভিন্ন-ভিন্নভাবে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হল।

গরীব দুঃখীর হক

এতীম, মিসকীন, বিধবা, অন্ধ, পঙ্গু, আতুর, চিররোগা, ভিক্ষুক, মুসাফির প্রভৃতি দুঃস্থ ও নিরাশ্রয়ী মানুষেরও অনেক অধিকার রয়েছে এবং তাদের জন্যেও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন:

১. তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।

২. টাকা-পয়সা বা খাদ্য পোশাক দিয়ে তাদের সাহায্য করা। তবে এমনভাবে সাহায্য করা ঠিক নয়, যাতে ভিক্ষাবৃত্তি প্রশ্রয় পায়। কেননা, ভিক্ষাবৃত্তিকে ইসলাম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এ জন্যেই যার নিকট এক দিনের খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে, তার পক্ষে খোরাকীর জন্য হাত পাতা জায়েয নেই এবং জেনে-শুনে এরূপ ব্যক্তিকে দান করাও নিষেধ। এমনিভাবে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও সওয়াল করা হারাম।[১] এ ছাড়া যে ব্যক্তি উপার্জন করে খাওয়ার ক্ষমতা রাখে তার জন্য হাত পাতা নিষেধ এবং এরূপ হাত পাতা ব্যক্তিকে দান করাও নিষেধ।

৩. তারা কাজ করতে অক্ষম হলে তাদের কাজ করে দেয়া। আর কাজ করতে জানলে প্রয়োজনে তাদের কাজে সহযোগিতা করা।

৪. কথা দ্বারা তাদের সান্ত্বনা দেয়া এবং তাদের সাথে ভাল কথা বলা।

---

১. احسن الفتاوی ج ٢ ।

হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী ভাল কথা বলাতেও সদকার ছওয়াব হয়।

৫. যথাসাধ্য তাদের আকাঙ্ক্ষা ও আবদার রক্ষা করা।

৬. তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, নম্র ব্যবহার করা, রূঢ় ব্যবহার না করা। সদ্ব্যবহার সচ্চরিত্রের অংশ। অতএব কোন মুমিন অসদ্ব্যবহার করে অসচ্চরিত্রের পরিচয় দিতে পারে না।

সাধারণ মুসলমানের হক

মুসলিম শরীফের এক হাদীছে মুসলমানদের বিশেষ ছয়টা হকের কথা বলা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ . قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ . وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ . وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ . وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ . وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

অর্থাৎ মুসলমানের হক ছয়টি : জিজ্ঞাসা করা হল সেগুলো কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াব দিলেন—

১. কোন মুসলমানকে দেখলে সালাম দিবে।
২. কোন মুসলমান মহব্বত করে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করবে। (অর্থাৎ যদি দাওয়াত গ্রহণে অন্য কোন বাধা না থাকে)। এমনিভাবে কোন মুসলমান ডাকলে তার ডাকে সাড়া দিবে।
৩. উপদেশ চাইলে তাকে উপদেশ দিবে।
৪. হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার জওয়াব দিবে।
৫. পীড়িত হলে তার শুশ্রূষা করবে।
৬. তাদের কারও মৃত্যু হলে তার দাফন-কাফনে শরীক হবে।

এ ছাড়াও আরও বিভিন্ন হাদীছ থেকে বোঝা যায় কোন মুসলমান কোন কাজে আটকে গেলে সকলে মিলে তার কাজ উদ্ধার করে দিতে হবে, মযলূমের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে, মুসলমানদের ভালবাসতে হবে, কোন কারণে কোন মুসলমানের সাথে দ্বন্দ্ব-কলহ হয়ে গেলে তা আপোষ মীমাংসা করে ফেলতে হবে। ইত্যাদি।

অমুসলমানের হক

হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি অমুসলমান ইসলাম ধর্মের অনুসারী না হলেও তারাও মানুষ, মানুষ হিসেবে তাদেরও কিছু হক রয়েছে। যেমন :

অন্যায়ভাবে কারও জানে কষ্ট না দেয়া,. কারও সম্পদের ক্ষতি না করা, গালি-গালাজ না করা, তাদের জীবন বিপন্ন হতে দেখলে তা থেকে রক্ষা করা, অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও বিপদ-আপদে সহযোগিতা করা। ইত্যাদি।

❖ ❖ ❖

৩৫ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের যে ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ৩৫ নং হল অর্থের সদ্ব্যবহার করা।

৩৬ সালামের জওয়াব দেয়া ও সালাম প্রদান করা। পূর্বে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

৩৭ যে হাঁচি দিয়ে 'আল হামদুলিল্লাহ' পড়ে তাকে 'ইয়ার হামুকাল্লাহ' বলা। নিম্নে হাঁচি ও তার জওয়াব সম্পর্কিত বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল।

হাঁচি সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ) পড়ে আল্লাহ্র শোকর আদায় করবে।

* যে উক্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ শুনবে তার জন্য يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ারহামু কাল্লাহ) বলে জওয়াব দেয়া সুন্নাত। এবং হাঁচি দাতা এর জওয়াবে বলবে-

يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

* যখন শ্রোতা ব্যস্ততার মধ্যে বা কোন লিপ্ততার মধ্যে থাকবে, তখন হাঁচিদাতার জন্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আস্তে বলা উত্তম, যাতে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে জওয়াব দিতে গিয়ে শ্রোতার কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে।

* হাঁচি দেয়ার সময় আদব হল— হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ বন্ধ করে রাখবে, যাতে শব্দ কম হয় এবং মুখ ও নাকের ময়লা কারও গায়ে ছুটে গিয়ে না লাগে।

* বার বার হাঁচি দিলে বার বার يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলার দরকার নেই, বুঝতে হবে যে, তার সর্দি হয়েছে বা হবে।

❖ ❖ ❖

হাঁচির মত আর একটি বিষয় রয়েছে হাই তোলা। নিম্নে সে সম্পর্কেও আলোচনা পেশ করা হল।

হাই সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* হাই আসলে যথাসাধ্য তা ঠেকাতে চেষ্টা করবে। যদি একান্ত না পারা যায় তবে মুখ ঢেকে নিবে।

* হাই আসলে হাত দিয়ে মুখ ঢাকার নিয়ম হল— বাম হাতের পিঠ মুখের সাথে আর পেট অপর দিকে থাকবে। নামাযে এবং নামাযের বাইরে সব স্থানেই একই হুকুম, তবে নামাযে হাত বাঁধা অবস্থায় থাকলে ডান হাতের পেট মুখের দিকে আর পিঠ বাইরের দিকে রেখে মুখ ঢাকবে।

* হাই আসলে হা হা করে জোরে শব্দ করবে না।

* হাই আসলে পড়বে—

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

❖ ❖ ❖

৩৮. বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের যে ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ৩৮ নং হল পরের ক্ষতি না করা। কাউকে কোনরূপ কষ্ট না দেয়া।

মানুষকে কষ্ট দেয়া কবীরা গোনাহ। মুসলমান হোক অমুসলমান হোক কোন মানুষকে কষ্ট দেয়া জায়েয নয়। এমনকি কোন প্রাণীকেও কষ্ট দেয়া যাবে না। নিম্নে প্রাণীর হক সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করা হল।

পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর হক

ইসলামে জীবজন্তুরও হক রয়েছে। জীবজন্তুর প্রতি অনুগ্রহ করলে তার বিনিময়ে জান্নাত লাভ হওয়ার কথা হাদীছে এসেছে। পক্ষান্তরে জীবজন্তুকে কষ্ট দিলে তার কারণে জাহান্নামে যাওয়ার কথাও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। বোখারী শরীফের এক হাদীছে এসেছে—বনী ইসরাঈলের এক বেশ্যা নারী একটা পিপাসার্ত কুকুরকে দেখল যে, কুকুরটি পানির পিপাসায় একটা কূয়ার কাছে দাঁড়িয়ে জিহ্বা কাদা চাটছে। মেয়ে লোকটির মায়া হল। সে কূয়ার মধ্যে নেমে তার চামড়ার মোজায় করে পানি তুলে কুকুরটিকে পানি পান করালো। এই পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি এত খুশি হন যে, তার জন্য জান্নাতের ফয়সালা করেন। এর বিপরীতে এক নারী একটা বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল, ফলে বিড়ালটি না খেয়ে মারা যায়। এর কারণে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের ফয়সালা করেন। আবূ দাউদ

শরীফের এক হাদীছে এসেছে—একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা দেয়াল ঘেরা বাগানের কাছ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। বাগানের মধ্যে একটা উট বাঁধা ছিল। উটটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে কাঁদতে শুরু করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের মালিককে ডেকে বললেন : উট আমার কাছে অভিযোগ করেছে তুমি তাকে ঠিকমত খাদ্য দাও না এবং তাকে কষ্ট দাও। এ সব হাদীছ থেকে বোঝা যায়—অযথা কোন পশুপক্ষীকে কষ্ট দেয়া অন্যায়। খাওয়ার প্রয়োজনে তাদের যবাই করতে হলেও ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা যবাই করে কষ্ট দেয়া যাবে না। যে সব পশুর দ্বারা কাজ নেয়া হয়, তাদের দ্বারা তাদের শক্তির চেয়ে অতিরিক্ত কাজ নেয়া যাবে না। নিষ্ঠুরভাবে জীব জন্তুকে প্রহার করা যাবে না। জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নয় বরং আল্লাহর মাখলূক হিসেবে তাদের প্রতিও ভালবাসা থাকা চাই।

❖ ❖ ❖

৩৯. বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের যে ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ৩৯ নং হল খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও নাচ-গান থেকে দূরে থাকা। নিম্নে নাচ-গান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

গান-বাদ্য ও ছায়াছবি

গান-বাদ্য শ্রবণ

আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীছের কিতাবে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাদীছে গান-বাদ্য হারাম হওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে। কুরআন শরীফেও এরূপ বর্ণনা এসেছে। কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোন নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল বা অন্য কোন পাপ পঙ্কিলযুক্ত না হয় তবে তা জায়েয।

যদি কেউ গান-বাদ্য শ্রবণের বদ-অভ্যাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তবে তার থেকে পরিত্রাণের উপায় হল সে মনে চাইলেই মনের চাহিদার বিরুদ্ধে গান-বাদ্য শোনা থেকে বিরত থাকবে এবং গান-বাদ্যের উপকরণ ও পরিবেশ থেকে দূরে থাকবে। এভাবে একসময় তার মনে গান-বাদ্যের চাহিদা দুর্বল হয়ে যাবে।

সিনেমা, বাইস্কোপ ও অশ্লীল ছায়াছবি দর্শন

এগুলোর মধ্যে পাঁচ রকমের পাপ রয়েছে। (১) সময় নষ্ট (২) সম্পদ নষ্ট (৩) স্বভাব-চরিত্র নষ্ট (৪) স্বাস্থ্য নষ্ট (৫) ঈমান ও আমল নষ্ট।

সিনেমা বাইস্কোপ দেখার বদ-অভ্যাস থেকে পরিত্রাণের জন্যেও পূর্বের মত মনে চাইলেই তা থেকে বিরত থাকবে। এভাবে একসময় তার মনে এগুলোর চাহিদা দুর্বল হয়ে যাবে।

৪০. বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ঈমানের যে ৪০টি আমল সম্পন্ন হয়, তার মধ্যে ৪০ নং হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।

এতক্ষণ ঈমানের শাখাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল। এ শাখাগুলির উপর আমল করলে ঈমান ঠিক হবে এবং ঈমান মজবুত হবে। এর বিপরীত কুফ্‌র, শিরক, বিদআত, রছম ও গোনাহের বিষয়াদি রয়েছে, যার দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হয়। নিম্নে কুফ্‌র, শিরক, বিদআত, রছম ও গোনাহের বিষয়াদি সম্পর্কে বিবরণ পেশ করা হল, যেন এগুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে ঈমানকে রক্ষা করা যায়।

কুফ্‌র, শির্‌ক ও বিদআত-কুসংস্কার

কতিপয় কুফ্‌রী ও তার বিবরণ

* যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয়, তার কোনটি অস্বীকার করা কুফ্‌রী।

* কুরআন-হাদীছের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয় অস্বীকার করা যেমন : নামায, রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা, নামাযের সংখ্যা, রাকআতের সংখ্যা, রুকূ-সাজদার অবস্থা, আযান, যাকাত, হজ্জ, ইত্যাদি বিষয়ের কোনটি অস্বীকার করা কুফ্‌রী। কেউ এসব বিষয় অস্বীকার করলে সে মুমিন মুসলমান থাকে না বরং কাফের হয়ে যায়।

* কুরআন হাদীছের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা দেয়া, যা কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বিবরণের খেলাফ—এটাও কুফ্‌রী। যেমন : কেউ যদি বলে জান্নাত-জাহান্নাম আছে বলে বিশ্বাস করি, কিন্তু জান্নাত অর্থ হল মনের খুশী আর জাহান্নাম অর্থ হল মনের যন্ত্রণা। এরূপ ব্যাখ্যা দেয়া কুফ্‌রী।

* কুফ্‌র ও ভিন্নধর্মের কোন শি'আর বা ধর্মীয় বিশেষ নিদর্শন গ্রহণ করা কুফ্‌রী, যেমন : হিন্দুদের ন্যায় পৈতা গলায় দেয়া, খৃষ্টানদের ক্রুশ গলায় ঝুলানো ইত্যাদি।

* কুরআনের কোন আয়াতকে অস্বীকার করা বা তার কোন নির্দেশ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফ্‌রী। যেমন : নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফ্‌রী।

* কুরআন শরীফকে নাপাক স্থানে ও ময়লা আবর্জনার মধ্যে নিক্ষেপ করা কুফ্‌রী।

* ইবাদত ও তাযীমের নিয়তে কবরকে চুমু দেয়া কুফ্‌রী। ইবাদতের নিয়ত ছাড়া চুমু দেয়া গোনাহে কবীরা।

* দ্বীন ও ধর্মের কোন বিষয় নিয়ে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফ্‌রী। এ জন্যেই নামায, রোযা নিয়ে উপহাস করা কুফ্‌রী। ইসলামের পর্দা ব্যবস্থাকে তিরস্কার করা বা উপহাস করা কুফ্‌রী। দাড়ি-টুপি, মাদ্রাসা-মসজিদ নিয়ে উপহাস করা কুফ্‌রী। ইসলামের কোন বিষয়— তা যত সামান্যই হোক- তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

* আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কোন হুকুমকে খারাপ মনে করা এবং তার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা কুফ্‌রী।

* হারামকে হালাল মনে করা এবং হালালকে হারাম মনে করা কুফ্‌রী। নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা করা ইত্যাদি ফরযসমূহকে ফরয তথা অত্যাবশ্যকীয় জরুরী মনে না করা এবং গান-বাদ্য, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম সমূহকে হারাম মনে না করা এবং এগুলোকে মৌলভীদের বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করা কুফ্‌রী। কেননা, কোন ফরযকে ফরয বলে অস্বীকার করা বা কোন হারামকে জায়েয মনে করা কুফ্‌রী।

* কারও মৃত্যুতে আল্লাহ্‌র উপর অভিযোগ আনা, আল্লাহ্‌কে যালেম সাব্যস্ত করা কুফ্‌রী। যেমন : অনেক মা-বোন সন্তান মারা গেলে এরকম বলে উঠেন যে, (নাউযু বিল্লাহ!) আল্লাহ আর কাউকে চোখে দেখল না, আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে গেল! ইত্যাদি।

* কাউকে কুফ্‌রী শিক্ষা দেয়া কুফ্‌রী।

* হারাম বস্তু পানাহারের সময় বিসমিল্লাহ বলা, যেনায় লিপ্ত হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা কুফ্‌রী।

* দ্বীনী ইলমের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ও অবমাননাকর বক্তব্য প্রদান করা কুফরী। যেমন : এরূপ বলা যে, (নাউযু বিল্লাহ!) মাদ্রাসায় পড়ে কী হবে? এই ফকীরী বিদ্যা শিখে লাভ কী? ইত্যাদি। এরূপ বলা কুফরী।

* হক্কানী উলামায়ে কেরামকে দ্বীনী ইলমের ধারক-বাহক হওয়ার দরুন গালি দেয়া বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। এটাও কুফরী।

* কেউ প্রকাশ্যে কোন গোনাহ করে যদি বলে যে, আমি এর জন্য গর্বিত তাহলে সেটা কুফরী।

* আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননা করা, আল্লাহ ও নবীকে গালি দেয়া এবং তাঁদের শানে বে-আদবী করা কুফরী।

* যে যাদুর মধ্যে ঈমানের পরিপন্থী কুফর ও শিরকের কথাবার্তা বা কাজকর্ম থাকে তা কুফরী।

* গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্রমন্ত্রকে মুক্তির পথ মনে করা এবং একথা বলা যে, ইসলাম সেকেলে মতবাদ, এর দ্বারা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব নয়— এটা কুফরী।

* ডারউইন-এর বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করা কুফরী অর্থাৎ, একথা বিশ্বাস করা যে, বিবর্তন অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হতে হতে একপর্যায়ে বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ বিশ্বাস ইসলাম ও ঈমান পরিপন্থী। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই মনুষ্য জাতির বিস্তৃতি ঘটেছে।[১]

কতিপয় শিরক

* কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন। তিনি সর্বত্র হাযির-নাযির। এরূপ ধারণা রাখা শিরক।

* কোন পীর-বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, তিনি জানতে পেরেছেন। এরূপ ধারণা রাখা শিরক। কেননা, আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ গায়েব জানে না।

* কোন পীর-বুযুর্গের কবরের নিকট সন্তান বা অন্য কোন উদ্দেশ্য চাওয়া শিরক। সন্তান দেয়ার মালিক আল্লাহ। আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নিকটে সন্তান চাওয়া শিরক।

---

১. ماخوذ از معارف القرآن، جواہر الفقہ، احسن الفتاوی ج/۱، امداد الفتاوی ج/۵، ফাতাওয়া ও মাসায়েল، آپ کے مسائل اور ان کا حل وغیرہ ।

* পীর বা পীরের কবরকে সাজদা করা শিরক।

* কোন বুযুর্গের নাম অযীফার মত জপ করা শিরক।

* কোন পীর-বুযুর্গের নামে শিন্নি, গরু, মুরগি, খাসি ইত্যাদি সদকা বা মান্নত মানা। অনেক মা-বোন বিভিন্ন মাযারে শিন্নি, গরু, মুরগি, খাসি ইত্যাদি মান্নত করে থাকে। এ থেকে বিরত থাকা উচিত। এরূপ মান্নত করে থাকলেও তা পূরণ করা যাবে না।

* কোন পীর-বুযুর্গের নামে জানোয়ার যবেহ করা শিরক।

* কারও দোহাই দেয়া। যেমন : কেউ বলল অমুক পীরের দোহাই। এরূপ দোহাই দেয়া শিরক।

* আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নামের কছম খাওয়া বা কিরা করা শিরক।

* আলী বখ্শ, হোসাইন বখ্শ ইত্যাদি নাম রাখা শিরক।

* গ্রহ নক্ষত্রের তা'ছীর (প্রভাব) মানা বা তিথি পালন করা শিরক।

* জ্যোতির্বিদ, গণক, ঠাকুর বা যার ঘাড়ে জিন এসেছে তার নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী খবর বিশ্বাস করা। অনেকে মনে করে জিনরা গায়েব জানে। এ ধারণা ভুল। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না।

* কোন জিনিস দেখে কুলক্ষণ ধরা বা কু-যাত্রা মনে করা, যেমন অনেকে যাত্রামুখে কেউ হাঁচি দিলে কু-যাত্রা মনে করে থাকে। বা যাত্রামুখে হোচট খেলে বা কাল হাড়ি দেখলে যাত্রা অশুভ মনে করে। এরূপ ধারণা রাখা শিরক।

* এরকম বলা যে, খোদা-রাসূলের মর্জি থাকলে এই কাজ হবে বা খোদা-রাসূল যদি চায় তাহলে এই কাজ হবে। এভাবে আল্লাহ্র মর্জির সাথে রাসূলের মর্জিকে শামেল করা হয় বলে এ রকম বলা শিরক। বরং বলতে হবে আল্লাহ্র মর্জি হলে এই কাজ হবে বা আল্লাহ চাইলে এ কাজ হবে।

* এরকম বলা যে, উপরে আল্লাহ নীচে আপনি (বা অমুক)। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এরকম বলে থাকেন যে, উপরে আল্লাহ আর নীচে আপনি আছেন। এ রকম বলা দ্বারা কোন মানুষকে আল্লাহ্র সমপর্যায়ের সাব্যস্ত করা হয়। তাই এটা শিরকের পর্যায়ভুক্ত।

* "কষ্ট না করলে কেষ্ট (শ্রীকৃষ্ণ) পাওয়া যায় না" বলা শিরক। কেননা, এতে করে হিন্দুদের দেবতা (কেষ্ট বা শ্রীকৃষ্ণ)কে স্বীকার করে নেয়া হয়।[১]

১. কতিপয় শিরক-এর অধীন যাবতীয় তথ্য تعلیم الدین و احسن الفتاوی থেকে গৃহীত ॥

কতিপয় বিদআত

"বিদআত" অর্থ নতুন সৃষ্টি। শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন সৃষ্টিকে। যেমন :

* কোন বুযুর্গের মাযারে ধুমধামের সাথে মেলা মিলানো বিদআত।

* উরস করা বিদআত। অনেকে মনে করে ওরস করা ছওয়াবের কাজ। এজন্যেই অনেকে বলে থাকে "ওরস মোবারক" বা "পবিত্র ওরস মোবারক"। তারা ওরসকে পবিত্র এবং মোবারক অর্থাৎ বরকতময় মনে করে। এটা ভুল ধারণা। হাদীছে ওরস সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অতএব ওরস করা ছওয়াবের কাজ নয় বরং এটা বিদআত ও গোনাহের কাজ। অতএব কোন ওরস উপলক্ষ্যে টাকা-পয়সা দেয়াও গোনাহের কাজ।

* মৃতের কুলখানী করা (অর্থাৎ চতুর্থ দিনে ঈছালে ছওয়াব করা) বা মৃতের চেহলাম বা চল্লিশা করা বিদআত। কারও মৃত্যুর ঠিক চার দিন পর তার জন্য দুআ বা ঈছালে ছওয়াব করাকে সাধারণতঃ কুলখানী বলা হয়। আর চল্লিশ দিন পর তার জন্য দুআ ও ঈছালে ছওয়াবকে বলা হয় চল্লিশা। শরীয়তে কুলখানী ও চল্লিশা পালন করারও কোন ভিত্তি নেই। অতএব কুলখানী বা চল্লিশা করা বেদআত। অনেকে মনে করেন বাপ-দাদারা চিরকাল এগুলো করে আসছেন, এখন কেন করা যাবে না। এ ধারণা ঠিক নয়। তারা ভালভাবে মাসআলা না জানার কারণে করে থাকলেও আমাদের তা করতে হবে, এ যুক্তি ঠিক নয়। তারা ভালভাবে মাসআলা না জানার কারণে করে থাকলে হয়তো আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিবেন, কিন্তু আমরা জানার পরেও জিদবশতঃ করলে তা ক্ষমা পাওয়া কঠিন হতে পারে।

* জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা বিদআত। শরীয়তে মৃত্যুবার্ষিকী বলেও কিছু নেই, জন্মবার্ষিকী বলেও কিছু নেই। অতএব জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা বিদআত এবং গোনাহের কাজ।

* কবরের উপর চাদর দেয়া বিদআত।

* কবরের উপর ফুল দেয়া বিদআত।

* কবর পাকা করা বিদআত।

* কবরের উপর গম্বুজ বানানো বিদআত।

* মাযারে চাদর, শামিয়ানা, মিঠাই ইত্যাদি নযরানা দেয়া বিদআত।

* প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদআত। কোন কোন স্থানে অনেক মা-বোনেরাও মীলাদ পাঠ করা শুরু করেছেন বলে শোনা যায়। এটা বর্জন করা চাই।

* মীলাদ অনুষ্ঠানে কেয়াম করা বিদআত। এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্যের কথা জানেন। তাই তারা বলতে চান মীলাদের ভিতর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ হয়, যখন দুরূদ শরীফ পড়া হয়, তখন কেয়াম করতে হবে অর্থাৎ দাঁড়াতে হবে; কারণ, রাসূলের নামে দুরূদ পড়া হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন এবং তিনি সেই মজলিসে হাজির হয়ে যান, তাই তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতে হবে। হক্কানী উলামায়ে কেরাম বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন না, তাই তাঁর নামে দুরূদ পড়া হলে তিনি জানবেন কী করে? কোন মানুষ গায়েব জানে না, গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। তবে আল্লাহ্ তাঁর কোন খাস বান্দাকে গায়েবের অর্থাৎ, অদৃশ্য বিষয়ে জানাতেও পারেন। কিন্তু মীলাদের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানানো হয় এবং তিনি হাজির হয়ে যান এমন কোন দলীল নেই বরং এমন দলীল রয়েছে, যাতে বোঝা যায় তিনি হাজির হন না। হাদীছে পরিষ্কার আছে :

صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ ـ (مشكوة عن النسائى)

অর্থাৎ, তোমরা আমার প্রতি দুরূদ পাঠ কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সে দুরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হবে।

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ لِلّٰهِ مَلٰٓئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ أُمَّتِيَ السَّلَامَ ـ (مشكوة عن النسائى والدارمى)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক দল ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন যারা সারা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন। আমার উম্মতের পক্ষ থেকে দুরূদ সালাম যা পাঠ করা হয় তারা সেগুলো আমার কাছে পৌঁছে দেন।

লক্ষ্য করুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন : তাঁর কাছে দুরূদ সালাম পৌঁছে দেয়া হয়, তিনি হাজির হন না। সারকথা, দুরূদ পাঠ করা হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির হন এই বিশ্বাসে মীলাদে কেয়াম করা ভিত্তিহীন।

* ঈদের নামাযের পর মুসাফাহা ও মুআনাকা বা কোলাকুলি করা বিদআত। বাচ্চাদের বোঝানো উচিত যে, তোমরা ঈদের দিন কোলাকুলি করবে না। তাহলে ছোট থেকেই বাচ্চারা এটা শিখে যাবে।

* আযানের পর হাত উঠিয়ে দুআ করা বিদআত।[১] আযানের পর যে দুআ রয়েছে, তা পাঠ করা সুন্নাত। তবে হাত না উঠিয়েই সে দুআ পাঠ করতে হবে।

* আযান-ইকামতের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম এলে বৃদ্ধ আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে লাগানো বিদআত।[২] কেউ কেউ মনে করে এর দ্বারা চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। এটা কোন সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

* "আমীন" বলে মুনাজাত শেষ করা নিয়ম, অনেকে কালিমায়ে তাইয়্যেবা বলতে বলতে মুখে হাত বুলান এবং মুনাজাত শেষ করেন—এটা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, এটা বিদআত।[৩]

কতিপয় রসম বা কুসংস্কার ও কুপ্রথা

* বিধবা বিবাহকে দূষণীয় মনে করা। অনেক মহিলা বয়স এবং প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এবং বিবাহ বসতে কোন অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও মানুষে কী মনে করবে এই চিন্তা করে বিবাহ বসে না। এটা ঠিক নয়। প্রয়োজন বোধ করলে বিবাহ বসা উচিত। নতুবা যেনা ইত্যাদি গোনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

* বিবাহের সময় সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও সমস্ত দেশাচার পালন করা এবং অযথা অপব্যয় করা।

* নছব বা বংশের গৌরব করা।

* কোন হালাল পেশাকে অপমানের মনে করা। যেমন : দপ্তরীর কাজ করা, মাঝিগিরি বা দর্জিগিরি করা, তৈল-লবণের দোকান করা ইত্যাদি।

* বিবাহ শাদিতে হিন্দুদের রছম পালন করা যেমন : ফুল-কুলা দ্বারা বউ বরণ করা, ভরা মজলিসে বউ-এর মুখ দেখানো, গীত গেয়ে স্ত্রী-পুরুষ একত্রিত হয়ে বর-কনেকে গোসল দেয়া ইত্যাদি। মহিলাগণই এ গোনাহে বেশী জড়িত হয়ে থাকেন। এ থেকে বিরত হওয়া চাই।

---

১. احسن الفتاوی ج/١ ॥ ২. احسن الفتاوی ج/١ اور راہ سنت ॥ ৩. ماخوذ از تعلیم الدین آپ کے مسائل اور ان کا حل
راہ سنت احسن الفتاوی ج/١ و الفرقان وغیرہ

* মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়কে দূষণীয় মনে করা। এই চিন্তা থেকেই অনেকে মৃত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় অন্য লোকদের দিয়ে দেয়। মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়কে দোষণীয় মনে করে তা অন্যকে দিয়ে দেয়া ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, এরূপ দূষণীয় মনে না করে ছওয়াবের নিয়তে দান করে দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। সেটাও ওয়ারিছদের অনুমতিক্রমে হতে হবে। কেননা, ওয়ারিছগণই উক্ত কাপড়-চোপড়ের মালিক। তাই তাদের অনুমতি ব্যতীত তা দান করে দেয়া যাবে না।

* বিনা প্রয়োজনে শখবশতঃ কুকুর পালন করা নিষিদ্ধ। তবে শিকার ও পাহারার প্রয়োজনে কুকুর পালন করা বৈধ।

* বিবাহ-শাদি, খৎনা ইত্যাদিতে হাদিয়া-উপঢৌকন দেয়া একটা রছমে পরিণত হয়েছে। সাধারণতঃ এসব উপঢৌকন প্রদানের পশ্চাতে ভাল নিয়ত থাকে না বরং খারাপ নিয়ত থাকে। যেমন : কেউ কেউ এরকম চিন্তা থেকে দেয় যে, না দিলে অসম্মান হয় বা দুর্নাম হয়। কিংবা এরূপ চিন্তা করে যে, অমুক অনুষ্ঠানে তারা দিয়েছিল এখন আমরা না দিলে কেমন হয়, তাই দিতে হয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মানুষ দিয়ে থাকে।

* বিবাহ-শাদিতে পদে পদে শত শত রছম ও কুসংস্কার পালিত হয়, এগুলো বর্জনীয়। প্রত্যেকটা পদে পদে শরীয়তের তরীকা কী তা জেনে বাকি সব পরিত্যাগ করা উচিত।

* শবে বরাতে হালুয়া-রুটি করা, পটকা ফুটানো, আতশবাজি করা। মোমবাতি জ্বালানো। এগুলো রছমে পরিণত হয়েছে। তাই এগুলো থেকে বিরত থাকা জরুরী। একথা মনে করা যাবে না যে, ছোট বাচ্চারা মোমবাতি জ্বালাচ্ছে, ছোট বাচ্চারা পটকা ফোটাচ্ছে তাতে আর এমন কী ক্ষতি? কিন্তু করছে তো অন্যায় কাজ। আমরা গার্জিয়ানরা টাকা-পয়সা দিচ্ছি, সমর্থন করছি, আমাদের সহযোগিতায় হচ্ছে, কাজেই আমরাও ঐ পাপে শরীক হয়ে যাচ্ছি। আমরা যদি এটার সমর্থন দেই, কিংবা তাতে বাধা না দেই, তাহলে ওরা শিখবে যে, এগুলো করতে হয়। এভাবে একটা অন্যায় জিনিস ছোটদের শিক্ষা দেয়া হল। এভাবে আমাদের ছোট সন্তান, আমাদের ছোট ভাই, আমাদের আপনজনকে আমরা অন্যায় কাজ শিক্ষা দিলাম। অন্যায় কাজ শিক্ষা দেয়াটাও পাপ। শবে বরাত একটা বিশেষ মর্যাদার রাত। কাজেই এ রাতে গোনাহ করা হলে সেটা বেশী বড় গোনাহ হয়ে দাঁড়াবে।

* আশুরায় খিচুড়ি ও শরবত তৈরি এবং বণ্টন করা।

* শাব্দিক অর্থে "ঈদ মুবারক" বলা খারাপ ছিল না, কিন্তু এটা রছমে পরিণত হয়েছে বিধায় পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

* মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য বা ধর্মীয় অন্য কোন কাজের জন্য মজলিসের মধ্যে এমনভাবে চাঁদা আদায় ও দান কালেকশন করা যে, মানুষ শরমে পড়ে বা চাপের মুখে পীড়াপীড়ির কারণে দান করে। এভাবে কালেকশন করা ঠিক নয়।

* বিপদ-আপদে যে কোন দান-সদকা করলে বিপদ দূরীভূত হয়, কিন্তু গরু, ছাগল, মোরগ প্রভৃতি কোন প্রাণীই যবাই করতে হবে— যেমন বলাও হয় জানের বদলে জান— এটা একটা রছম। জানের বদলে জান হওয়া জরুরী নয় বরং যে কোন সদকা হলেই তা বিপদ দূরীভূত হওয়ার সহায়ক।

* মাইয়েতের জন্য ঈছালে ছওয়াব করা, দুআ করা শরীয়তসম্মত বিষয়, কিন্তু সেটা সম্মিলিত হয়েই করতে হবে এরূপ বাধ্যবাধকতার পেছনে পড়াও রছমে পরিণত হয়েছে। যেমন : আমরা ধরে নিয়েছি কেউ মারা গেলে হুজুরদের ডেকে সম্মিলিতভাবে দুআ করাতে হয় নতুবা কর্তব্য পালন করা হল না। এ ধারণা ঠিক নয়। নিজেরাও একাকী দুআ করা যেতে পারে।[১]

কবীরা গোনাহ

কবীরা গোনাহ বা বড় গোনাহের তালিকা

১. শিরক করা কবীরা গোনাহ।

শিরক এত বড় গোনাহ যে, আল্লাহ তাআলা অন্য সব গোনাহ ক্ষমা করেন কিন্তু শিরক ক্ষমা করেন না। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ۔

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা শিরক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য গোনাহ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা নিসা : ১১৬)

২. মা-বাপের নাফরমানী করা অর্থাৎ, তাঁদের হক আদায় না করা কবীরা গোনাহ। এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

---

১. ماخوذ از بہشتی زیور، تعلیم الدین، اصلاح الرسوم، احسن الفتاوی وغیرہا ۔

৩. "কাতয়ে রেহমী" করা অর্থাৎ, যে সব আত্মীয়দের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করা ও তাদের হক নষ্ট করা কবীরা গোনাহ। এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

৪. যেনা করা অর্থাৎ, নারীর সতীত্ব নষ্ট করা এবং পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা কবীরা গোনাহ। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

যেনা বা ব্যভিচার

যেনা অর্থাৎ, নারীর সতীত্ব নষ্ট করা এবং পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা। এটা অতি জঘন্য কবীরা গোনাহ। গায়র মাহরাম পুরুষদের দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং প্রয়োজন ব্যতীত তাদের সাথে খোশগল্প করা দ্বারা ধীরে ধীরে নারীগণ পুরুষের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং যেনার দিকে অগ্রসর হয়। একারণে এরূপ দৃষ্টি দেয়া এবং এরূপ আলাপচারিতাকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

যেনা থেকে বেঁচে থাকতে হলে যেনার উপসর্গ যেমন : প্রেমালাপ, গোপন যোগাযোগ, গায়রে মাহরামের সাথে নির্জন বাস, পর্দা লঙ্ঘন ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আর যেনার কারণে জাহান্নামের যে কঠিন শাস্তি হবে তা স্মরণ রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহ সব কিছুই দেখেন। অতএব গোপনে যেনা করলেও আল্লাহ তা'আলা তা দেখবেন এবং কোন মানুষ এখন না দেখলেও কিয়ামতের ময়দানে সকলের সামনে এটা প্রকাশ করে দেয়া হবে। আর যে সব কথা শুনলে, যেখানে গেলে বা যা দেখলে কিংবা যা পড়লে অথবা যা চিন্তা করলে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বা যেনার মনোভাব জাগ্রত হয় তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

এরপরও যেনার খাহেশ প্রবল হলে নিম্নোক্ত আয়াত (সূরা ইবরাহীম : ২৭ নং আয়াত) তিনবার পড়ে শরীরে ফুঁক দিবে, তাহলে যেনার খাহেশ দুর্বল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَآءُ.

❖ ❖ ❖

৮. আমানতের খেয়ানত করা কবীরা গোনাহ। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

আমানতদারী

শরীয়তে আমানতদারী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা যথাযথভাবে আদায় করা যেমন : আমানতদারী, তেমনিভাবে কেউ কোন গোপনীয় কথা জানলে বা কোনভাবে কারও কোন গোপনীয় বিষয় জানতে পারলে তা গোপন রাখাও আমানতদারীর অন্তর্ভুক্ত। টাকা-পয়সার আমানত, কথার আমানত, কাজের আমানত, দায়িত্বের আমানত ইত্যাদি যে কোন আমানতের খেয়ানত করা কবীরা গোনাহ।

❖ ❖ ❖

৬. মানুষ খুন করা কবীরা গোনাহ।

৭. কারও প্রতি মিথ্যা তোহ্মত বা অপবাদ লাগানো, বিশেষভাবে কারও প্রতি যেনা বা ব্যভিচারের অপবাদ লাগানো কবীরা গোনাহ।

৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কবীরা গোনাহ।

৯. সাক্ষ্য গোপন করা কবীরা গোনাহ, যখন অন্য কেউ সাক্ষ্য দেয়ার না থাকে।

১০. যাদু শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া এবং যাদু দ্বারা কারও ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করা কবীরা গোনাহ।

১১. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ওয়াদা খেলাফ করা, কথা দিয়ে তা ঠিক না রাখা কবীরা গোনাহ। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

১২. গীবত করা কবীরা গোনাহ। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

গীবত

হেয় করে তোলার উদ্দেশ্যে পশ্চাতে কারও প্রকৃত দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করাকে গীবত বলে। আর প্রকৃতপক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে সেটাকে বলে বুহতান, যা গীবতের চেয়েও বড় অপরাধ। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, পোশাক-পরিচ্ছদ, শারীরিক গঠন, বংশ ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের দোষ বর্ণনাই গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, যা সত্য তা-ই বলছি, তাহলে গীবত হবে কেন? কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। যা সত্য তা-ই যদি পশ্চাতে বলা হয় তাকে বলে গীবত। আর প্রকৃতপক্ষে সেই দোষ তার মধ্যে না থাকলে সেটাকে বলে বুহতান, যা গীবতের চেয়েও বড় গোনাহ, ডবল গোনাহ। এক হল গীবত বা সমালোচনা করার গোনাহ, আরেক হল মিথ্যা বলার গোনাহ।

এক হাদীছে গীবত এবং বোহ্তানের এরকম পরিচয় দেয়া হয়েছে। রেওয়ায়েতটি এরকম— এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন :

مَا الْغِيْبَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اَخِيْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَاِلَّا فَقَدْ بَهَتَّهُ۔(ابو داود)

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার কোন ভাইয়ের পশ্চাতে তার দোষ-বদনাম বর্ণনা করা। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি বাস্তবেই তার মধ্যে সে দোষ থাকে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি বাস্তবেই তার মধ্যে সেই দোষ থাকে, তাহলেতো গীবত হবে। আর যদি বাস্তবে তার মধ্যে সেই দোষ না থাকে, তাহলে সেটা হবে বুহতান অর্থাৎ অপবাদ।

গীবত করা হারাম, যেনার চেয়েও গুরুতর কবীরা গোনাহ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :[১]

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا۔

অর্থাৎ, গীবত করা যেনার চেয়েও গুরুতর।

গীবত করা এত মারাত্মক গোনাহ, অথচ আমরা এটাকে গোনাহই মনে করি না। আমাদের কোন মজলিস গীবত থেকে খালি যায় না। দুই-চারজন একসাথে বসে কথা শুরু করলেই ব্যস, গীবত শুরু হয়ে যায়। খুব মজা করে গীবত করতে থাকি। একজন মন্তব্য করেছেন গীবত যেন এখন ঘি-ভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, ঘি-ভাত খেতে যেরকম মজা লাগে, গীবত করতেও আমাদের ওরকম মজা লাগে। গীবতকে যেন আমরা গোনাহই মনে করছি না। অথচ কোন গোনাহকে গোনাহ মনে না করা মারাত্মক গোনাহ। কোন গোনাহকে গোনাহ মনে করা সত্ত্বেও যদি কেউ সেই গোনাহ করে, তাহলে তার মনের ভিতর সেই গোনাহের জন্য অনুশোচনা থাকে, ফলে একদিন না একদিন সেই গোনাহের জন্য সে তওবা করে নিতে পারে। কিন্তু কোন গোনাহকে যদি কেউ গোনাহই মনে না করে, তাহলে সেই গোনাহের জন্য তার মনে কোন অনুশোচনা থাকে না। ফলে ঐ গোনাহ থেকে তার কোন দিন তওবা করা হয়ে ওঠে না। ঐ পাপ নিয়েই সে কবরে চলে যায়। এ কারণে গোনাহকে গোনাহ মনে না করা খুবই মারাত্মক ব্যাপার।

১. এ হাদীছটা সনদের দিক থেকে তেমন মজবুত নয়, তবে এর অর্থ সহীহ।

গীবত করার অনেক ক্ষতি, গীবতের শাস্তি খুব সঙ্গীন। হাদীছে এসেছে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ . قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ .

(ابو داود، كتاب الادب)

অর্থাৎ হযরত আনাস (রাযি.) বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যখন মে'রাজের সময় আমাকে আসমানে তুলে নেয়া হয়, তখন আমি এমন এক দল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করি, যাদের নখ ছিল তামার, তারা নিজেদের নখ দ্বারা নিজেদের চেহারা ও সীনা খামছে খামছে ছিঁড়ছিল। আমি হযরত জিব্রাঈল (আ.)কে জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? তিনি বললেন: এরা ঐ সমস্ত লোক যারা মানুষের গোশত খেত অর্থাৎ মানুষের গীবত করত এবং মানুষের ইজ্জতের উপর হামলা করত।

গীবতের আর একটা ক্ষতি হল— যারা গীবত করে, তাদের দু'আ কবূল হয় না। তাই গীবত বর্জন করতে হবে।

গীবতের আর একটা ক্ষতি হল— যার গীবত করা হয় তার আমলনামায় গীবতকারীর ছওয়াব চলে যায়, এবং তার গোনাহ গীবতকারীর আমলনামায় চলে আসে। এ জন্যেই হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলতেন, যদি কারও গীবত করতেই হয়, তাহলে মা-বাপের গীবত কর! কথাটা একটু বুঝতে হবে। এ কথার অর্থ হল, যেহেতু গীবত করলে আমি যার গীবত করব, আমার নেকী তার আমলনামায় চলে যাবে এবং তার গোনাহ আমার আমলনামায় চলে আসবে। এজন্যেই তিনি বলতেন যদি একান্তই কারও গীবত করতে হয়, তাহলে মাতা-পিতার গীবত কর। তাহলে অন্ততঃ তোমার ছওয়াব অন্যের আমলনামায় না গিয়ে তোমার মাতা-পিতার আমলনামায় গেল।

গীবত করলে যেহেতু যার গীবত করা হয় তার আমলনামায় গীবত কারীর ছওয়াব চলে যায়, এ জন্যেই হযরত হাছান বসরী (রহ.) যার নাম আমরা অনেকে শুনেছি। তিনি অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি কখনও যদি শুনতেন যে, অমুকে আমার গীবত করেছে, তাহলে তার কাছে প্লেট ভরে ফল-ফ্রুট-মিষ্টি-মিঠাই হাদিয়া পাঠিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, মাশাআল্লাহ তিনি আমার

Scanned by CamScanner

অনেক উপকার করেছেন, এত কষ্ট করে ছওয়াব অর্জন করে তিনি আমাকে সেই ছওয়াব দিয়ে দিয়েছেন। তাই তার উদ্দেশে মিষ্টি পাঠিয়ে দিতেন।

বোঝা গেল নিজের দু'আ কবূল করার স্বার্থে এবং নিজের ছওয়াব হেফাজত করার স্বার্থে গীবত থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন।

গীবত বর্জন করা ছাড়া আল্লাহ ওয়ালা হওয়া কঠিন। বহু বুযুর্গ এমন বলে গেছেন, যারা জীবনে কোন দিন কারও গীবত-শেকায়েত করেননি। হযরত হাছান বসরী (রহ.) কারও গীবত করতেন না। ইমাম মুসলিম (রহ.) সম্পর্কে ইতিহাস রয়েছে তিনিও জীবনে কারও গীবত-শেকায়েত করেননি। হযরত হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)ও জীবনে কারও গীবত-শেকায়েত করেননি।

আমরা অনেকে মনে করি শুধু মুখে বললেই গীবত হয়। কিন্তু তা নয়, মুখে বললেও যেমন গীবত হয়, তদ্রূপ অঙ্গভঙ্গী এবং ইশারা-ইঙ্গিতেও গীবত হয়। একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ছিলেন। তখন কথায় কথায় হযরত সাফিয়া (রাযি.)-এর আলোচনা এসে গেল। হযরত সাফিয়া ছিলেন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর সতীন। সতীনের প্রতি সতীনের একটু ইয়ে থাকেই। হযরত সাফিয়া (রাযি.) ছিলেন একটু বেঁটে। তাই হযরত আয়েশা (রাযি.) হযরত সাফিয়া (রাযি.)-এর আলোচনা করতে গিয়ে হাত দ্বারা ইশারা করে দেখালেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাফিয়া তো ইয়ে অর্থাৎ বুঝাতে চাইলেন যে সে খাটো। এভাবে ইশারা দ্বারা গীবত হয়ে গেল। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আয়েশা! আজ তুমি এমন একটা কাজ করলে, যদি এই আমলের দুর্গন্ধ এবং তার বিষ সমুদ্রে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে গোটা সমুদ্রের পানি দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিষাক্ত হয়ে যাবে।[১] বোঝা গেল ইশারা ইঙ্গিত এবং অঙ্গ-ভঙ্গীতেও কারও দোষ প্রকাশ করা গীবত এবং পাপের অন্তর্ভুক্ত।

অনেকে মনে করি শুধু স্বভাব-চরিত্রের দোষ প্রকাশ করাই গীবত। কিন্তু তা নয়। স্বভাব-চরিত্রের দোষ প্রকাশ করা যেমন গীবত, তদ্রূপ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, পোশাক-পরিচ্ছদ, শারীরিক গঠন, বংশ ইত্যাদির যে কোন বিষয়ের দোষ বর্ণনাই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। গীবত যেমন জীবিত মানুষের হয় তেমনি মৃত মানুষেরও হয়। ছোট-বড়, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের দোষ চর্চাই গীবত।

---

১. ترمذی ۱

গীবত করা হারাম, কবীরা গোনাহ। তবে কয়েকটা ক্ষেত্রে গীবত করা অর্থাৎ পশ্চাতে দোষ বলা পাপ নয়। পরিভাষায় সেগুলোকে গীবত বলাও হয় না। যেমন : ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করতে গিয়ে বিচারকের নিকট প্রতিপক্ষের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতে হয়। কেউ মনে করতে পারে এটাও গীবত, কিন্তু তা নয়। এতে গীবতের গোনাহ হবে না। তদ্রূপ কাউকে অপরের ক্ষতি থেকে সাবধান করার নিয়তে যদি কিছু বলা হয়, তাতেও গীবতের গোনাহ হবে না। যেমন : কোন বাতিল মতবাদপন্থী থেকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে তার চিন্তাধারার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করলে তাও গীবত হবে না। এমনিভাবে ছাত্রকে শাসন করানোর জন্য উস্তাদের কাছে ছাত্রের দোষ-ত্রুটি বললে বা গুরুজনের নিকট অধীনস্থদের শাসন করানোর জন্য তাদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করলে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

নিজে গীবত করলে যেমন গোনাহ হয়, তেমনিভাবে স্বেচ্ছায় এবং মনোযোগ সহকারে গীবত শুনলেও গীবতের গোনাহ হয়।

কাউকে গীবত করতে শুনলে তাকে বাধা দেয়া উচিত। না পারলে সেই মজলিস ত্যাগ করতে হবে। যদি সে মজলিস ত্যাগ করা সম্ভব না হয়, তাহলে গীবত শোনা থেকে মনোযোগ হটিয়ে মনে মনে অন্য কিছু ভাবা শুরু করতে হবে বা মনে মনে যিকির-আযকার ইত্যাদিতে লিপ্ত হতে হবে। তাহলেও গীবত শোনার গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

যদি কখনও কারও গীবত শোনা হয়ে যায়, কারও গীবত নিজের কানে আসে, তাহলে সেই গীবত শোনার পর নিম্নোক্ত পাঁচটা কাজ করা উচিত—

১. এ শোনা কথা অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।
২. যার দোষ শোনা হল তার দোষ খুঁজতে শুরু না করা।
৩. যার দোষ শোনা হল তার উপর বদ-গোমানী না করা। বিনা দলীল-প্রমাণে কারও ব্যাপারে বদ-গোমানী করা জায়েয নয়।
৪. পারলে গীবতকারীকে গীবতের অভ্যাস পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিতে হবে।
৫. প্রয়োজন মনে করলে আসল ব্যক্তির থেকে জেনে নেয়া যেতে পারে যে, ব্যাপারটা কতদূর সত্য। তবে তাহ্কীক করতে গিয়ে গীবতকারীর নাম উল্লেখ করা উচিত নয়। তাতে ফ্যাসাদ বৃদ্ধি পাবে।

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন— যদি কেউ কখনও নফসের ধোঁকায় বা বে-খেয়ালীতে কারও গীবত করে ফেলে, তাহলে নিজে এস্তেগফার করে নিতে হবে, যার গীবত করা হয়েছে তার জন্যও এস্তেগফার করতে হবে।

Scanned by CamScanner

আর সম্ভব হলে এবং ভাল মনে করলে যার গীবত করা হয়েছে তার নিকট ওযরখাহী করে নিতে হবে যে, ভাই বা বোন! অন্যায়ভাবে আমি আপনার গীবত করে বসেছি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। তবে অনেক সময় এরকম বলতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সে রকম হলে না বলে নিজে নিজেই আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। ভবিষ্যতে আর গীবত না করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আর গীবত করা দ্বারা সেই ব্যক্তির মান-সম্মানের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার জন্য যাদের সামনে সেই লোকের গীবত করা হয়েছে তাদের সামনে তার প্রশংসা করতে হবে।

❖ ❖ ❖

১৩. কোন স্বামীর বিরুদ্ধে তার স্ত্রীকে, কোন মনীবের বিরুদ্ধে তার চাকরকে, কোন উস্তাদের বিরুদ্ধে তার শাগরেদকে, রাজার বিরুদ্ধে প্রজাকে, কর্তার বিরুদ্ধে কর্মচারীকে ক্ষেপিয়ে তোলা কবীরা গোনাহ।
১৪. নেশা করা কবীরা গোনাহ। মদ, গাজা, হেরোইন, আফিম সব ধরনের নেশা করাই কবীরা গোনাহ ও হারাম।
১৫. জুয়া খেলা কবীরা গোনাহ।
১৬. সুদ প্রদান, সুদ গ্রহণ ও সুদের সাথে যে কোন ভাবে জড়িত থাকা কবীরা গোনাহ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।

সুদ

সুদ অনেক প্রকারের আছে— সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ ইত্যাদি সর্বপ্রকারের সুদই মহাপাপ। সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেনদেনের সাক্ষ্যদাতা ও সুদ বিষয়ক লেনদেনের দলীল লেখক সকলের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। সকলেরই কবীরা গোনাহ হয়। আজকাল অনেক মা-বোনেরা ব্যক্তিগতভাবে বা সমিতির মাধ্যমে সুদে টাকা লাগান বা সুদে টাকা ঋণ নেন। এটা কঠিন গোনাহ। তদুপরি এরকম কারবারে কোন বরকতও হয় না।

❖ ❖ ❖

১৭. ঘুষ বা রেশওয়াত প্রদান ও গ্রহণ করা কবীরা গোনাহ।
১৮. অন্যায়ভাবে কারও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হরণ বা ভোগ দখল করা কবীরা গোনাহ।
১৯. অনাথ, এতীম, নিরাশ্রয় বা বিধবার মাল গ্রাস করা কবীরা গোনাহ।

২০. খোদার ঘর যিয়ারতকারী তথা হজ্জযাত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা কবীরা গোনাহ।
২১. মিথ্যা কছম করা কবীরা গোনাহ।
২২. গালি দেয়া কবীরা গোনাহ।
২৩. অশ্লীল কথা বলা কবীরা গোনাহ। নিম্নে গালি দেয়া ও অশ্লীল কথা বলা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বলা

যেটা প্রকাশ করতে মানুষ শরম বোধ করে, এটাকেই পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করাকে বলা হয় গালি বা অশ্লীল কথা। আর যদি সেটা অবাস্তব হয় তাহলে মিথ্যা অপবাদের গোনাহও হবে। কাউকে গালি দেয়া হারাম, এমনকি কোন কাফের বা জীবজন্তুকেও গালি দেয়া নিষেধ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ۔ (رواہ مسلم فی کتاب الایمان)

অর্থাৎ, গালি দেয়া ফাসেকী।

গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বলার বদঅভ্যাস পরিত্যাগের জন্য একটা জিনিসেরই প্রয়োজন, আর তা হল "ইচ্ছা"। গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বলার চিন্তা জাগ্রত হলে এই চিন্তা করতে হবে যে, গালি-গালাজ করা ও অশ্লীল কথা বলা গোনাহে কবীরা। এর জন্য আমার শাস্তি হবে। এভাবে চিন্তা করে বিরত থাকলে ধীরে ধীরে গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বর্জনের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

❖ ❖ ❖

২৪. তাকাব্বুর বা অহংকার করা কবীরা গোনাহ। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

তাকাব্বুর বা অহংকার

জ্ঞান-বুদ্ধি, ইবাদত-বন্দেগী, মান-সম্মান, ধন-দৌলত, রূপ-সৌন্দর্য ইত্যাদি যে কোন দ্বীনী বা দুনিয়াবী গুণে নিজেকে বড় মনে করা এবং সেই সাথে অন্যকে সে ক্ষেত্রে তুচ্ছ মনে করাকে বলে তাকাব্বুর বা অহংকার। অহংকার গোনাহে কবীরা। কেউ এ রোগে আক্রান্ত হলে সে কারও উপদেশ গ্রহণ করে না, কারও সৎপরামর্শও গ্রহণ করে না। এ রোগ হক ও সত্য

Scanned by CamScanner

গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এ হল দ্বীনী ক্ষতি। আর অহংকারীকে মনে প্রাণে সকলে ঘৃণা করে এবং সময়-সুযোগে তার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে, এভাবে দুনিয়াতেও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

অন্তরের রোগগুলির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হল তাকাব্বুর বা অহংকার। তাকাব্বুর বা অহংকারকে বলা হয় 'উম্মুল আমরায' অর্থাৎ, সমস্ত রোগের মা। মা থেকে যেমন সন্তানাদির জন্ম হয়, সেই সন্তানাদির আরও সন্তানাদি হয়। এভাবে এক মা থেকে বহু মানুষের সৃষ্টি হয়, একজন মা থেকে বহু মানুষের বিস্তার ঘটে। তদ্রূপ এক অহংকারের কারণে মনের বহু রোগ সৃষ্টি হয়। মা যেমন বহু মানুষের মূল, অহংকার রোগও তদ্রূপ বহু রোগের মূল।

অহংকার রোগ থেকে মানুষের ভিতর অনেক রোগ জন্ম নেয়। যেমন মনের একটা রোগ হল হিংসা। এই হিংসা রোগ অহংকার থেকে জন্ম নেয়। হিংসা হল একজনের ভাল কিছু দেখে তা ধ্বংস হওয়ার কামনা করা। কেউ যখন নিজেকে বড় মনে করে, অর্থাৎ, নিজের মধ্যে বড়াঈ বা অহংকার বোধ থাকে, তখন সে অন্যের ভাল কিছু দেখলে মনে করে যে, ওতো আমার চেয়ে বড় হয়ে গেল, আমি ছোট হয়ে গেলাম। তখনই তার মনের মধ্যে অন্যের সেই ভালটা ধ্বংস হওয়ার কামনা জাগে। এটাকেই বলা হয় হাছাদ বা হিংসা। যেমন : একজনের টাকা-পয়সা দেখে, মান-সম্মান, ইজ্জত-আব্রু দেখে, পদমর্যাদা দেখে ভিতরে হিংসা আসে এবং মনে মনে কামনা জাগে যে, ওর ওটা যদি ধ্বংস হয়ে যেত। দেখা গেল এই হিংসারোগ অহংকার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা মানুষের গীবত-শেকায়েত করি, চিন্তা করলে দেখা যায় এখানেও আমাদের মনের ভিতরে অহংকার কাজ করতে থাকে। আরেকজনের গীবত বা দোষ চর্চা করা হয় কেন? এজন্যই করা হয় যে, তার দোষ বললে সে একটু ছোট হবে এবং আমি যখন অন্যের এই দোষ বলছি এর দ্বারা বোঝাবে যে, আমার ভিতরে এই দোষ নেই, আমি মাশাআল্লাহ খুব ভাল। আমার ভিতরে সেই দোষ থাকলে কি আর আমি সেটা দোষ হিসেবে উল্লেখ করতাম? দেখা গেল গীবত করার সময় মনের ভিতরে নিজের বড়াঈ বা অহংকার কাজ করতে থাকে।

অহংকার ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে মানুষ গীবত-শেকায়েত করে থাকে। তবে অহংকার তার একটা বড় কারণ। একজন মানুষ আর একজন মানুষের প্রতি যুলুম করে, এর পেছনেও অহংকার কাজ করে থাকে। যার প্রতি আমি যুলুম করছি, তাকে আমি ছোট মনে করছি এবং নিজেকে বড় মনে

করছি। এই মনোভাব থেকেই যুলুম করা আসছে। আমি নিজেকে বড় মনে করছি বলেই ভাবছি ও আমার সাথে এরকম ব্যবহার করল কেন, আমি ওকে দেখিয়ে ছাড়ব! এই ভেবে তার প্রতি যুলুম করছি। দেখা গেল যুলুম করার মনোভাবও অহংকার থেকে সৃষ্টি হয়। প্রতিশোধ নেয়ার জযবাও অহংকার থেকে সৃষ্টি হয়। এভাবে বড়াঈ বা অহংকার রোগ থেকে বহু রোগ সৃষ্টি হয়, বহু পাপের জন্ম হয়। এমনকি এই অহংকারের কারণে কুফরী পর্যন্ত এসে যেতে পারে।

এই অহংকারের কারণেই শয়তান কাফের হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)কে তৈরি করে যখন ইবলীসকে হুকুম দিয়েছিলেন আদমকে সাজদা কর, তখন সে সাজদা করেনি। তার ভিতরে অহংকার এসে গিয়েছিল যে, আমি আগুনের তৈরী আর আদম মাটির তৈরী। আমি আদমের সামনে নত হতে পারি না। এই অহংকারে সে আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করল এবং কাফের হয়ে গেল। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ۔

অর্থাৎ, সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল। আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (বাকারা : ৩৪)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে অহংকারই ছিল তার অস্বীকার করা এবং কাফের হওয়ার কারণ। এই তাকাব্বুরই তাকে কাফের বানালো, এই তাকাব্বুরই তাকে উচ্চ মর্যাদা থেকে নীচে নামিয়ে দিল, তাকে লাঞ্ছিত, অভিশপ্ত বানালো। শেখ সাদী বলেছেন :

تکبر عزازیل راخوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد

অর্থাৎ, অহংকারই আযাযীলকে অর্থাৎ, ইবলীসকে লাঞ্ছিত করল, অহংকারই তাকে অভিশাপের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করল।

মানুষের মধ্যে যখন অহংকার আসে, তখন সে অনেক সময় সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। আত্মগরিমার কারণে সে সত্যকে অস্বীকার করে বসে। এমনকি খোদাকে পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে। এমনকি নিজে খোদায়ী দাবী করে বসে। ফিরআউন আল্লাহকে অস্বীকার করে বসেছিল। সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করে বসেছিল। ক্ষমতা এবং দাপটের অহংকারেই সে নিজেকে খোদা বলে বসেছিল। কারূন ধন-সম্পদের অহংকারে খোদার

Scanned by CamScanner

অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন, সে ধন-সম্পদকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মনে করেনি বরং এর কারণে নিজেকে বড় মনে করে বসেছে এবং এর অহংকারে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেছে, আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْٓءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ۔

অর্থাৎ, কারূন মূসা (আ.)-এর বংশের লোক ছিল। সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়ে গিয়েছিল, আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে বসেছিল। সম্পদের বড়াইতে সম্পদের দম্ভে সে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে বসেছিল। আল্লাহ বলেন তাকে এত সম্পদ দেয়া হয়েছিল যে, সম্পদের ভাণ্ডারগুলোর চাবি উঁচু করতে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন হত। (কাসাস : ৭৬)

আমরা ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধি, রূপ-সৌন্দর্য, মান-মর্যাদা যা কিছু নিয়ে অহংকার করে থাকি, যদি আমরা চিন্তা করতাম যে, এগুলো আল্লাহ্‌র দান, তাহলে আমরা অহংকার করতে পারতাম না। বরং যত ধন-সম্পদ ইত্যাদি বাড়ত, তত মনে করতাম যে, আমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কথা মনে করে ততই আল্লাহ্‌র সামনে বেশী নত হতাম। আমার যত ধন- সম্পদ থাকুক, যত জ্ঞান-বুদ্ধি থাকুক, যত মান-সম্মান থাকুক, যত প্রভাব- প্রতিপত্তি থাকুক, যা কিছুই থাকুক, এসবইতো আল্লাহ্‌র দেয়া। আমার নিজস্ব বাহুবলে কিছু অর্জিত হয়নি। তাহলে এগুলো নিয়ে আমার অহংকার করার কী আছে?

আমরা সম্পদ নিয়ে অহংকার করি। কিন্তু যদি আমরা মনে করতাম যে, আমরা এই সম্পদের আসল মালিক নই বরং আল্লাহ এগুলোর আসল মালিক। তিনি এগুলো আমাদের কাছে রেখেছেন। তাঁর হুকুম অনুযায়ী ব্যয় করার জন্য। এরূপ মনে করলে সম্পদ নিয়ে আমাদের অহংকার বোধ হত না। যেমন : কোন মিল ফ্যাক্টরীর মালিক তার ক্যাশিয়ারের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখল এবং বলল এ টাকাগুলো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। তাদের বেতন-ভাতা, অফিস খরচ ইত্যাদিতে ব্যয় কর। এই টাকার জন্য ক্যাশিয়ারের কোন অহংকার আসে না যে, আমার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা আছে! অহংকার না আসার কারণ হল তার বিশ্বাস আছে যে, এই টাকার আসল মালিক সে নয়। আসল মালিক হল ফ্যাক্টরীর মালিক। তিনি

তার কাছে এই টাকা দিয়েছেন তার হুকুম মত ব্যয় করার জন্য। যেহেতু সে আসল মালিক নয়, কাজেই সেই টাকা নিয়ে তার অহংকার করার কিছু নেই। তদ্রূপ একজন মু'মিন, যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, সে এটাও বিশ্বাস করে যে, টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত আল্লাহ্‌র দেয়া। আল্লাহ হলেন আসল মালিক। তিনি দিয়েছেন তাঁর হুকুম মত ব্যয় করার জন্য। কাজেই এটা নিয়ে অহংকার করার কিছু নেই।

এমনিভাবে আল্লাহ পাক যত গুণাবলী দিয়েছেন, জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন, পদমর্যাদা দিয়েছেন, মান-সম্মান দিয়েছেন, এই সবকিছু আল্লাহ্‌র দান, তাঁর অনুগ্রহ। মানুষ নিজের ক্ষমতাবলে এগুলো অর্জন করতে পারে না। আল্লাহর দেয়া জিনিস আল্লাহ পাক যে কোন সময় ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। রাজাকে পথের ফকীর বানাতে পারেন, সম্মানী ব্যক্তিকে হেয় বানাতে পারেন। সবকিছু আল্লাহ্‌র হাতে। কাজেই কোন কিছু নিয়ে অহংকার করা চলে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, সে অহংকার করতে পারে না। অহংকার করার অর্থই হল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে একরকম অস্বীকার করা। আর আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করা অনেকটা আল্লাহকে অস্বীকার করা। অতএব আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী মানুষ অহংকার করতে পারে না। আল্লাহকে বিশ্বাস করলে সবকিছু আল্লাহ্‌র দেয়া একথা বিশ্বাস করতে হবে। কারও ভিতরে এই বিশ্বাস থাকলে তার ভিতরে অহংকার আসতে পারবে না। যে আল্লাহকে স্বীকার করবে, সে নিজেকে সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র মধ্যে বিলিন করে দিবে। তার ভিতর আমিত্ব বলে কিছু থাকবে না। আমার গুণ, আমার সম্পদ, আমার পদ, আমার মর্যাদা, এরূপ কোন আমিত্ব বলতে তার ভিতরে কিছু থাকবে না। মু'মিনের কাছে "আমি" বলতে কিছু নেই। ইসলামের কালিমার ভিতরেই এরূপ আমিত্ব বর্জনের শিক্ষা রয়েছে। কালিমার মধ্যে বলা হয়েছে:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই।

মা'বূদ অর্থ যার ইবাদত করা যেতে পারে, যার গোলামী ও দাসত্ব করা যেতে পারে। তিনি সবকিছু করেন। কাজেই তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত বা গোলামী করা যায় না। অতএব "কোন মা'বুদ নেই" একথা বললেই বোঝা যায় আর কেউ কিছু করতে পারে না। একমাত্র তিনিই সবকিছু করতে পারেন। সবকিছু তিনিই করে থাকেন। অতএব সবকিছু তাঁরই। আমার বলতে

কিছুই নেই। আমিত্ব বলতে কিছুই নেই। এভাবে কালিমার ভিতরে আমিত্ব বিসর্জন দেয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আমিত্ববোধ আমাদের ধ্বংস করে দেয়।

অতএব মু'মিন অহংকার করতে পারে না। মু'মিন কোন বড়াই দেখাতে পারে না। মু'মিন থাকবে গোলামের মত বিনয়ী। সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, সকল মানুষের সরদার বরং সকল নবী-রাসূলের ইমামরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। যিনি আল্লাহ্‌পাকের পরেই সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। সেই রাসূলের ভিতরে এতটা বিনয় ছিল যে, তিনি সব ক্ষেত্রে গোলামের মত হয়ে থাকতে চাইতেন। গোলামের মত চলতে চাইতেন, গোলামের মত বসতে চাইতেন, গোলামের মত বসে খাবার খেতে চাইতেন। এক হাদীছে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِنِّيْ اٰكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبِيْدُ- (مشكاة عن شرح السنة)

অর্থাৎ, আমি গোলামের মত বসে খাই।

যখন মানুষের মধ্যে বিনয় আসে, বিনয় মানুষকে এরকম গোলাম বানিয়ে ফেলে, আল্লাহর গোলাম বানিয়ে ফেলে। আর বিনয় না থাকলে মানুষের মধ্যে অহংকার আসে, সেই অহংকারে মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজেকে খোদা বলেও দাবি করে বসে।

মানুষ কোন কিছু নিয়ে অহংকার করতে পারে না। কারণ, তার কোন কৃতিত্ব নিজের নয়; বরং সব কিছু আল্লাহর দেয়া। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এমন, যার সমস্ত কৃতিত্ব নিজের। কাজেই অহংকার করা একমাত্র আল্লাহকেই মানায়, অন্য কাউকে নয়। তাই হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন :

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ . وَالْعَظَمَةُ اِزَارِيْ. فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ.

(مسلم، ابو داود)

অর্থাৎ অহংকার আমার ভূষণ, অর্থাৎ, অহংকার একমাত্র আমাকেই মানায়, আর কাউকে নয়। কারণ, মানুষ কী নিয়ে অহংকার করবে, তার নিজস্ব কৃতিত্ব বলে কিছু নেই। সবইতো আমার দেয়া। কাজেই অহংকার করলে একমাত্র আমিই করতে পারি, অহংকার একমাত্র আমাকেই মানায়, আর কাউকে নয়। অহংকার হল আমার ভূষণ। আমার এই ভূষণকে নিয়ে যারা টানাটানি করবে, আমি তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।

হাদীছে এসেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সমস্ত আসমান-যমীনকে তাঁর কুদরতী হাতে গুটিয়ে নিবেন। কীভাবে গুটিয়ে নিবেন তা আল্লাহ পাক-ই

জানেন। আমরা আল্লাহ পাকের সত্তা কত বড় তা-ও কল্পনা করতে পারি না। সেই সত্তার হাত কত বড় তা-ও কল্পনা করতে পারি না। সেই হাতে আসমান যমীনকে কীভাবে গুটিয়ে নিবেন তাও বুঝতে পারি না। কুরআন-হাদীছে এসেছে তাই আমরা বিশ্বাস করি। যা হোক, আসমান-যমীনকে তার হাতে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন :

اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ؟ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ ؟ (متفق عليه)

অর্থাৎ, ঐ অহংকারকারীরা কোথায় যারা অনেক কিছু নিয়ে অহংকার দেখাত? দাম্ভিক লোকেরা কোথায় যারা অনেক কিছু নিয়ে দম্ভ দেখাতো? তারা আজ কোথায়? আল্লাহ আরও বলবেন :

اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ ؟ (متفق عليه)

অর্থাৎ আজ আমিই সম্রাট, কোথায় দুনিয়ার সম্রাটরা? সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে যারা অহংকার দেখাতো, তারা আজ কোথায়?

কিয়ামতের দিন এই ঘোষণার সময় বুঝে আসবে দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে অহংকার কত বড় ঠুনকো বিষয় ছিল!

অহংকারের কারণে আল্লাহ তাআলা এত গোস্বা হন যে, হাদীছে এসেছে—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ - (مسلم)

অর্থাৎ যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার আছে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না।

যদিও অহংকারের পাপ ক্ষমা হয়ে গেলে অহংকারীও জান্নাতে যেতে পারবে। কিন্তু অহংকার করলে বা অন্য কোন পাপ করলে আল্লাহ পাক যে চরম গোস্বা হন, সেদিকে তাকালে ক্ষমা পাওয়ার আশা খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর গোস্বার সেই চরম দশার দিকে তাকিয়েই তাই ঐ কথাটি বলেছিলেন।

এক বুযুর্গ বলেছেন মন যদি অহংকার করতে চায়, তাহলে মনকে বোঝাতে হবে। কবির ভাষায় :

اَوَّلُكَ نُطْفَةٌ قَذِرَةٌ ÷ وَاٰخِرُكَ جِيْفَةٌ مَدِرَةٌ ÷ وَاَنْتَ فِيْمَا بَيْنَهُمَا تَحْمِلُ عَذِرَةً -

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ, হে মন! তুমি কী নিয়ে বড়াই করতে চাও? তোমার মধ্যে বড়াই করার মত কী আছে? শুরুতে তুমি ছিলে এক ফোটা নাপাক দুর্গন্ধযুক্ত পানি, তোমার শেষ ফল হল মরে পচে দুর্গন্ধময় লাশ হয়ে যাবে, আর মাঝখানে নাপাক দুর্গন্ধময় কিছু ময়লা পেটের মধ্যে বহন করে চলছ। কাজেই বড়াই বোধ ছাড়, অহংকার বোধ ছাড়, বিনয়ী হতে শিখ।

যারা বড় হন, তারা অহংকার করেন না বরং তারা বিনয়ী হন। এক বুযুর্গ মহিলার ঘটনা শুনুন। হযরত আফীরাহ্ আবিদাহ একজন বড় বুযুর্গ মহিলা ছিলেন। বুযুর্গ পুরুষরা পর্যন্ত তাঁর কাছে এসে দুআ চাইতেন। একদিন একদল আবেদ তাঁর খেদমতে এসে আরয করলেন, আমাদের জন্য দু'আ করে দিন। উত্তরে তিনি বললেন : আমি এত বেশি পাপ করেছি যদি পাপের কারণে বোবা হয়ে যাওয়ার বিধান থাকত তাহলে আমিও আমার পাপের কারণে এত দিন বোবা হয়ে যেতাম। কিন্তু যেহেতু দু'আ করা সুন্নাত। তাই দু'আ করে দিচ্ছি। অতঃপর তিনি সকলের জন্য দু'আ করে দিলেন।

এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল যখন দলে দলে আল্লাহ্র ওলীগণ মিলে তাঁর খেদমতে গেছেন, তখন তিনি যে অনেক বড় ওলী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। অথচ নিজেকে কত ছোট মনে করতেন যে, বলেছেনঃ আমি এত বেশি পাপ করেছি, যদি পাপের কারণে বোবা হয়ে যাওয়ার বিধান থাকত তাহলে আমিও আমার পাপের কারণে এতদিনে বোবা হয়ে যেতাম। অর্থাৎ অনেক বড় আল্লাহ্র ওলী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে বড়ই পাপী মনে করতেন। অথচ আজ-কাল মানুষের অবস্থা হল, কোন রকম একটু তসবীহ- তাহলীল শুরু করলেই নিজেকে বড় ওলী এবং বুযুর্গ মনে করতে থাকে। এটা আল্লাহ তাআলার দরবারে খুবই অপছন্দনীয়। তাই সর্বাবস্থায় নিজেকে ছোট, হীন ও অপরাধী মনে করে বিনয়ী থাকা চাই। স্মরণ রাখা চাই জেনে না-জেনে প্রতিদিন আমরা শত শত হাজার হাজার অপরাধ করছি। এসব অপরাধ ও অন্যায়ের কথা স্মরণ থাকলে ইবাদত-বন্দেগী করা সত্ত্বেও ভিতরে অহংকার আসতে পারে না।

বুযুর্গানে দ্বীন অহংকার করেন না, তারা কোন মানুষকে তুচ্ছ জানা তো দূরের কথা কোন প্রাণীকেও তুচ্ছ জানেন না। আমরা হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)-এর কথা শুনেছি। ইরানের একটা প্রসিদ্ধ এলাকা হল বোস্তাম। বায়েজিদ (রহ.) এই এলাকার অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁকে বোস্তামী বলা হয়। এই বায়েজিদ বোস্তামী অনেক উঁচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর

তার এক মুরীদ তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হুজুর! আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কী মুআমালা করলেন। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) বললেন : আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, বায়েজিদ আমার জন্য কী কী করে এসেছ? আমি চিন্তা করছিলাম কী বলব, কোন আমলের কথাই উল্লেখ করতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম কোন আমলের কথা উল্লেখ করব, যদি ভিতরে এখলাসের ত্রুটি থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেটা নাকচ করে দিবেন। তাই কোনটাই বলতে পারছিলাম না, চুপ করে ছিলাম। তখন আল্লাহ পাক বললেন : তোমার একটা আমল আমার খুব পছন্দ হয়েছে। একদিন শীতের রাতে বাইরে একটা কুকুরের বাচ্চা শীতের কারণে কাঁতরাচ্ছিল। তোমার দয়া হয়েছিল। তুমি মনে করেছিলে এওতো আল্লাহর মাখলূক, আমিও আল্লাহর মাখলূক। আমি আরামে শুয়ে আছি, আর আল্লাহর এই মাখলূকটা কষ্ট পাচ্ছে। এই ভেবে তুমি কুকুরের বাচ্চাটাকে তুলে এনে তোমার লেপের তলে রেখেছিলে। তুমি তাকে তুচ্ছ জাননি। তোমার এই আমলটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এটাই হল তোমার সবচেয়ে বড় আমল।

দেখা গেল মানুষের জীবনের কোন্ আমলটা আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয় হবে, তা বোঝা কঠিন। একটা ক্ষুদ্র আমলও আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয় হয়ে যেতে পারে। তাই কোন আমলকে তুচ্ছ মনে করতে নেই। হতে পারে ছোট একটা আমলও আমার নাজাতের ওছীলা হয়ে দাঁড়াবে। এমনিভাবে কোন ছোট পাপকেও তুচ্ছ জানতে নেই। কারণ, একটা ছোট পাপের কারণেও আল্লাহ তা'আলা কঠিনভাবে পাকড়াও করতে পারেন। হাদীছে এসেছে এক ব্যক্তি একটা পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে তার ওছীলায় আল্লাহ তা'আলা তাকে নাজাত দিয়ে দেন এবং এক নেককার মহিলা এক বিড়ালকে বেঁধে রাখায় বিড়ালটা না খেয়ে মারা যায়। এর কারণে আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলাকে শাস্তি দেন।

❖ ❖ ❖

২৫. চুরি করা, ডাকাতি ও লুটতরাজ করা, পকেট মারা, ছিনতাই করা কবীরা গোনাহ।

২৬. গান-বাদ্য শ্রবণ করা কবীরা গোনাহ। এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২৭. স্বামীর নাফরমানী করা অর্থাৎ, স্বামীর হক আদায় না করা কবীরা গোনাহ। এমনিভাবে স্ত্রীর হক আদায় না করাও কবীরা গোনাহ। নিম্নে স্বামী ও স্ত্রীর হক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

স্ত্রীর হক

ইসলাম দুনিয়া-আখেরাত সব জগতেরই শান্তির জন্য এসেছে। ইসলামের বিধি-বিধান পালন করলে দুনিয়াতেও শান্তি হবে, আখেরাতেও শান্তি হবে। কিন্তু এই শান্তির জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামকে মানতে হবে। আংশিক মান্য করলে পূর্ণাঙ্গ ফায়দা পাওয়া যাবে না। পরিবারে শান্তি আনতে হলেও পরিবারের সকলকে ইসলামী বিধি-বিধান মান্য করতে হবে অর্থাৎ, পরিবারের সকলকে একজনের প্রতি আরেকজনের যা করণীয় তা করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন সকলকেই একজনের প্রতি আর একজনের যা করণীয় তা করতে হবে। তাহলে পরিবারে শান্তি আসবে। প্রধানতঃ স্বামী-স্ত্রীকে একজনের প্রতি আরেকজনের যা করণীয় তা করতে হবে। কারণ, স্বামী- স্ত্রী হল পরিবারের মূল ভিত্তি। আগে ভিত দোরস্ত হওয়া চাই। অতএব স্বামী এবং স্ত্রীকে একে অপরের অধিকার আদায় করতে হবে।

স্বামী-স্ত্রী দুইজনেরই একজনের উপর অন্যজনের অধিকার রয়েছে। শুধু পুরুষদেরই অধিকার নয়, মহিলাদেরও অধিকার রয়েছে। অথচ অনেকেই মহিলাদের অধিকারকে খাটো করে দেখেন। এজন্যই কুরআন হাদীছেও মহিলাদের অধিকারের কথা বেশী করে বলা হয়েছে। কুরআন শরীফে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত যে আয়াতগুলো রয়েছে, তার অধিকাংশটাই মহিলাদের অধিকার বিষয়ক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিশেষ বিশেষ ভাষণে নারীদের অধিকারের কথা ফলাও করে বলতেন। বিদায় হজ্বের ভাষণেও তিনি নারীদের অধিকারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিদায় হজ্বের ভাষণ ছিল বড় মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ ভাষণ। তিনি বলেছিলেনও আগামী বছর হয়তো তোমাদের সাথে আর আমার দেখা হবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমার সময় শেষ। এই শেষ মুহূর্তে এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সম্মুখে দেয়া এই ভাষণে তিনি বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কথা বলে গেছেন। তার ভিতরে একটা বলেছেন :

أَلَا فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.(متفق عليه)

অর্থাৎ, খুব খেয়াল করে শুনে রাখ, নারীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিচ্ছি, নারীদের অধিকার আদায় করার নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা এই নির্দেশ গ্রহণ কর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন :

إِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ.(متفق عليه)

অর্থাৎ, জেনে রাখ— মহিলাদের পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে পাঁজরের হাড় যেমন স্বাভাবিকভাবে বাঁকা, অনুরূপ মহিলাদের ভিতরেও স্বভাবগত কিছু বক্রতা থাকে। নবী কারীম (সাঃ) বোঝাতে চাচ্ছেন যে, মহিলাদের মধ্যে কিছুটা বক্রতা থাকলেও তাদের ভিতরে কিছুটা ভুল-ত্রুটি থাকলেও, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তাদের মধ্যে স্বভাবগত বক্রতা রাখা হল কেন? এর জওয়াব হল— হয়তো এর মধ্যেই কোন কল্যাণ রয়েছে। যেমন : তারা বক্রতা প্রদর্শন করলে পুরুষ তাদের এসলাহ করতে থাকবে, এতে করে পুরুষ এসলাহের ছওয়াব পেতে থাকবে। এসলাহ না হলে তাদের বক্রতার কারণে যে কষ্ট আসবে, তাতে সবর করলে আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদা বাড়তে থাকবে। যাহোক তাদের স্বভাবগত যে বক্রতা রয়েছে সেটা থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

অর্থাৎ, নারীদের সঙ্গে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে। যদি নারীদের কিছু অপছন্দনীয় লাগে, তাহলে মনে রেখ, হতে পারে তোমরা একটা বিষয়কে অপছন্দ করবে, অথচ তার মধ্যেই আল্লাহ তাআলা প্রচুর কল্যাণ রাখবেন।

(সূরা নিছা : ১৯)

এ আয়াতে আল্লাহ পাক একথা বলেননি যে, তাদের মধ্যে খারাপ কিছু দেখলে, তোমার মনপুত নয় এমন কিছু দেখলে, শাসন করে ধমক দিয়ে, মার দিয়ে সোজা করে ফেল। বরং আল্লাহ বলেছেন যদি এরকম কিছু দেখ, তাহলে মনে করবে হয়তো ওর ভিতরেই তোমার জন্য কোন কল্যাণ রয়েছে।

Scanned by CamScanner

এ আয়াতে নারীদের দোষ-ত্রুটিকে সহনশীলতার সাথে দেখতে বলা হয়েছে। এ জন্য মন খারাপ না করতে বলা হয়েছে।

অনেক সময় স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি দেখে স্বামীর মন খারাপ হতে পারে, তার চেহারা ছবি, চলা-ফেরা পছন্দ না হলেও মন খারাপ হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও স্বামীকে ঐ কথাটি মনে রাখতে বলা হয়েছে যে, হয়তো ওর ভিতরেই আল্লাহ তার জন্য কোন কল্যাণ রেখেছেন। এরূপ চিন্তা করলে স্বামীর মন খারাপ হওয়াটা কমে যাবে। তাছাড়া স্ত্রীর মধ্যে বহু দোষ-ত্রুটি থাকলেও তার কিছু না-কিছু গুণও অবশ্যই আছে। স্বামীকে সেই গুণগুলো দেখে স্ত্রীর প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। আমাদের স্বভাব হল আমরা একজনের শুধু দোষগুলো দেখি, তার গুণগুলো দেখি না। যার কারণে তার সম্পর্কে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। অথচ একজন মানুষ যত খারাপই হোক না কেন, তার মধ্যে কোন না-কোন গুণও অবশ্যই থাকবে। কথায় বলে ঘড়ি যদি একেবারে অচলও হয়, তবুও অন্তত দিনে রাতে দুইবার টাইম ঠিক দিবে। যেমন : একটা ঘড়ির কাটা ১২টার উপরে এসে বন্ধ হয়ে আছে, তাহলে এ ঘড়ি দুপুর ১২টায় এবং রাত ১২টায় এই দুইবার ঠিক টাইম দিবে। বোঝা গেল অচল জিনিসের মধ্যেও কিছু কিছু ফায়দা অবশ্যই আছে। অচল জিনিসের ভিতরেও ভালাইয়ের দিক আছে। তাই কোন নারীর যত দোষ-ত্রুটি থাকুক, তার অনেক গুণও থাকবে। সেই গুণগুলো দেখে সেগুলোর ভিত্তিতে তার প্রতি মুগ্ধ থাকার চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا رَضِيَ مِنْهَا بِاٰخَرَ ـ (مسلم)

অর্থাৎ, কোন স্বামী যেন তার স্ত্রীর প্রতি রুষ্ট হয়ে না থাকে। স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দনীয় লাগলে তার এমন কিছু বিষয় থাকবে যা তার ভাল লাগবে।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেছেন : এই বিবিরা সামান্য একটা কথার ভিত্তিতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সাথে চলে আসে। সেই কথাটা হল— তাকে বলা হয় অমুকের ছেলের সাথে তোমাকে বিবাহ দিলাম, আর সে বলে কবূল করলাম। ব্যস এতটুকু কথার পরই সে তার মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে দিয়ে স্বামীর কাছে চলে আসে। স্বামীর কথায় উঠা-বসা করে, স্বামীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে, স্বামীকে ছাড়া আর কারও চিন্তা করে না। এ বিষয়টা চিন্তা করলে বিবির প্রতি মুগ্ধ হওয়ার

জন্য তার মধ্যে আর কোন গুণ থাকার দরকার হয় না। অন্য কোন গুণ থাকলেতো সোনায় সোহাগা। যদি গুণের চেয়ে দোষের পরিমাণ বেশী থাকে, তাহলে স্বামীকে মনে করতে হবে যে, আল্লাহ পাক এর মধ্যে কোন না-কোনভাবে তার ফায়দা রেখেছেন। অন্তত এতটুকু ফায়দা তো হবেই যে, তার দোষ-ত্রুটি দেখে রাগ আসতে চাইবে, তখন সবর করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রতিদিন এরকম হতে হতে সবরের গুণ স্বভাবে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি সত্যিকারভাবে কারও ভিতর সবরের গুণ এসে যায়, তাহলে সে জান্নাতে চলে যেতে পারবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَلصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔

অর্থাৎ, সবরের পুরস্কার হল জান্নাত।

সমাজ নারীদের অধিকারের ব্যাপারে সব সময়ই অবহেলা করে থাকে। এই অবহেলা করার পরিণামেই আজ নারীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে নেমে পড়েছে। অথচ ইসলাম নারীদের যেভাবে মূল্যায়ন করেছে, নারীরা যদি তা বুঝত, তাহলে তারা আন্দোলন করে ইসলাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করত না, বরং পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইত।

ভরণ-পোষণ পাওয়া স্ত্রীর অধিকার। সাধ্য অনুযায়ী পরিবারের জন্য ব্যয় করা স্বামীর দায়িত্ব। সাধ্যের ভিতরে যতটুকু সম্ভব দিতে হবে। সাধারণভাবে পরিবারের যতটুকু না হলে নয় ততটুকু দেয়ার সাধ্য আল্লাহ পাক দিয়েই থাকেন। এরকম খুব কম দেখা যায় যে, কেউ হালাল পথে থাকলে এবং আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ তাকে একেবারেই অক্ষম করে রাখেন। তবে হ্যাঁ, নিত্য প্রয়োজনের বাইরে ডজন ডজন শাড়ী দিতে হবে, নানান রকম অলংকার দিতে হবে, এতটা না-ও হতে পারে। যারা হালাল উপায়ে থাকতে চায়, তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আল্লাহ তাদের দুনিয়াতে মোটামুটি চালিয়ে নেন, খুব বেশী সম্পদ দেন না। তাদের জন্য আখেরাতেই সব জমা রাখেন। তবে দুই একজন ব্যতিক্রম হয় তাদের আল্লাহ পাক দুনিয়াতেও অনেক সম্পদ দিয়ে থাকেন। যাহোক, যে অবস্থায়ই হোক পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাবী দাওয়া পূরণ করা গৃহকর্তার দায়িত্ব নয়। প্রত্যেক ঈদ আসলে নতুন নতুন কাপড়-চোপড় দিতে হবে, বিবাহ-শাদি ইত্যাদি অনুষ্ঠান আসলে নতুন নতুন কাপড়-চোপড়, নতুন নতুন গয়না-

Scanned by CamScanner

সাজনা দিতে হবে এটাও দায়িত্ব নয়। বরং এই মানসিকতাই ভাল নয় যে, নতুন নতুন অনুষ্ঠান আসলেই প্রত্যেকবার নতুন নতুন শাড়ী-গয়না চাই। আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে গেলে প্রত্যেকবার আমার নতুন নতুন সেট চাই—এই মানসিকতাই ভাল নয়। নারীদের মনোভাব এই থাকতে হবে যে, আমার সাজ-গোজ যা কিছু করার আমি ঘরে করব, যা কিছু দেখানোর স্বামীকে দেখাব, বাইরের লোককে নয়। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় মহিলাদের মানসিকতা হল এর উল্টো। ঘরে স্বামীর কাছে থাকে বিধবার মত, আর বাইরে যাওয়ার সময় সাজ গোজের বাহার কে দেখে! যেন বাইরের লোকদেরকে সৌন্দর্য দেখানোর জন্য যাচ্ছে। অথচ কুরআন শরীফে এটা নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔

অর্থাৎ, তোমরা জাহিলী যুগের নারীদের মত সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য বের হয়ো না। (আহযাব : ৩৩)

বোঝা গেল বাইরে সাজ-গোজ করে যাবে না। বাইরে যাবে সাদামাঠাভাবে। যাতে পর-পুরুষের নজর পড়ে গেলেও পর-পুরুষের নজর খারাপ না হয়। কিন্তু মহিলারা চলছে উল্টো। তারা বাইরে খুব সাজ-গোজ করে যায়, যার ফলে পর পুরুষের নজর খারাপ হয়। আবার ঘরে সাজ-গোজ না করার কারণে স্বামী ঘরে এসে দেখে বিবির রূপ-সৌন্দর্য কিছুই নেই, তখন বাইরে গিয়ে অন্য নারীদের রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি সে আকর্ষণবোধ করে। এভাবে স্বামীরও নজর খারাপ হয়।

ইসলামে নারীদের তো রাণীর মত রাখা হয়েছে। নারী শব্দকে উল্টিয়ে দিলে হয় রাণী। তারা থাকবে রাণীর হালে। তাদের ভরণ-পোষণ দিবে স্বামী, তাদের ইজ্জত-আব্রু হেফাযতের দায়িত্ব নিবে স্বামী, তাদের জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিবে স্বামী, তাদের মনোরঞ্জনের দায়িত্ব স্বামীর, সবকিছুই স্বামীর দায়িত্ব। তাদের কোন ঝুঁকি ঝামেলা নেই। সংসার চালানোর কোন পেরেশানী তাদের করতে হবে না। তাহলে কেন তারা রাণীর হালে থাকবে না? কেন তারা অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করবে? কিসের জন্য তারা আন্দোলন করবে? তারা আন্দোলন করছে চাকুরীর জন্য, কিন্তু তাদের চাকুরীর প্রয়োজন কী? মানুষ চাকুরী করে ভরণ-পোষণের জন্য। অথচ তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা চাকুরী

ছাড়াই ঘরে বসে ভরণ-পোষণ পাবে। তাহলে তাদের চাকুরীর কী প্রয়োজন? অতএব কিসের জন্য তারা আন্দোলন করছে?

মহিলারা মনে করছে চাকুরী তাদের অধিকার। অথচ চাকুরী করা অধিকার নয়। এটা হল দায়িত্ব। দায়িত্ব আর অধিকার এই দুটোর মধ্যে তারা পার্থক্য বুঝছে না। তাদের ভরণ-পোষণ হল তাদের অধিকার। চাকুরী ছাড়াই এ অধিকার তাদের দিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের ঘাড়ে চাকুরী করার দায়িত্ব চাপানো হয়নি। এটা তাদের জন্য আছানী করা হয়েছে। এভাবে উপার্জনের পেরেশানী থেকে তাদের মুক্তি দেয়া হয়েছে। এটা তাদের প্রতি করুণা করা হয়েছে। অথচ তারা বুঝছে এভাবে তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। তারা উল্টো বুঝছে। ইসলাম নারীদের যে অধিকার দিয়েছে, সে সম্পর্কে তারা সঠিকভাবে বুঝলে তারা ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসতে আগ্রহী হবে। আমরা তাদের সঠিকভাবে বিষয়টা বুঝাই না, তাই তারা অবুঝের মত অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করে। অনেক মহিলা বুঝতেও চান না। কুরআন-হাদীছে নারীদের অধিকারের কথা কত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

অর্থাৎ, তোমাদের (স্বামীদের) উপর নারীদের অধিকার আছে। যেমন তাদের (অর্থাৎ, স্ত্রীদের) উপর স্বামীদের অধিকার আছে। (সূরা বাকারা : ২২৮)

এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় পুরুষরা যেহেতু মনে করে অধিকার শুধু আমাদের, নারীদের কোন অধিকার নেই, তাই আল্লাহ বলেছেন : তোমাদের যেমন অধিকার আছে তাদেরও অধিকার আছে, তাদের অধিকারকে খাটো করে দেখ কেন? তাদের অধিকারের দিকে নজর দাওনা কেন? এ আয়াতে নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার সমান—একথা বলা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে :

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

অর্থাৎ, নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। (বাকারা : ২২৮)

যেহেতু পুরুষদের সমাজ অঙ্গনে কাজ করতে হবে, রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে কাজ করতে হবে, তাই তাদের দৈহিক ক্ষমতা, মানসিক ক্ষমতা, তাদের বুদ্ধিমত্তা তুলনামূলকভাবে বেশী দেয়া হয়েছে। তদুপরি পুরুষরা পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করে। এসব কিছুর কারণে পুরুষের কর্তৃত্ব এসে যায়, শ্রেষ্ঠত্ব

Scanned by CamScanner

এসে যায়। এভাবে কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে পুরুষ উপরে, কিন্তু অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান। নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব থাকার যে কারণ বলা হল এটাই আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

অর্থাৎ, পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ব করবে, কারণ আল্লাহ কতককে কতকের উপর অর্থাৎ, পুরুষকে নারীর উপর দৈহিক, মানসিক, মেধাগত শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তদুপরি পুরুষরা নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করে থাকে। (সূরা নিছা : ৩৪)

পুরুষদের কর্তৃত্বের কথা শুনলে নারীরা কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, তাদের অধিকার খাটো হয়ে গেল। কিন্তু পূর্বেও বলা হয়েছে অধিকার আর দায়িত্ব-কর্তৃত্ব এক জিনিস নয়। নারীদের অধিকারকে কোথাও খাটো করে দেখা হয়নি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের অধিকারকে এমন বড় করে দেখা হয়েছে যে, তারা তা শুনলে আনন্দিত হবেন। যেমন : স্ত্রীর মনোরঞ্জনের দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রীর মনের খুশী ও চাহিদার দিকে স্বামীকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই যদি স্ত্রী চায় যে, শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে একান্নভুক্ত থাকতে আমার ভাল লাগে না, আমি স্বামীকে নিয়ে ভিন্ন হয়ে যেতে চাই, তাহলে স্বামীকে তা-ই করতে হবে। স্ত্রীর এরকম চাওয়ার ও বলার অধিকার রয়েছে। এখন কেউ যদি মনে করে, তাহলে শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করবে কে? এক্ষেত্রে ফেকাহর কিতাবে মাসআলা লেখা হয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করার দায়িত্ব পুত্রবধুর নয়, বরং পুত্রের। ছেলে তার মা-বাপের খেদমত করবে। ছেলের উপর মাতা-পিতার খেদমত করা ওয়াজিব। ছেলের বধুর উপর সেটা ওয়াজিব নয়। ছেলের বধু যদি করে তাহলে সেটা তার অনুগ্রহ। না করলে তাকে সে জন্য জবরদস্তী করা যাবে না। এই মাসআলা শুনলে শ্বশুর-শাশুড়ীদের ক্ষোভ লাগবে যে, তাহলে কি আমাদের অধিকারই নেই? অবশ্যই আপনাদের অধিকার রয়েছে, কিন্তু আপনাদের ছেলেদের উপরে, ছেলের বউদের উপরে নয়। পিতা বা মাতা হিসেবে তাদের সন্তানের উপরে তাদের হক রয়েছে। সন্তানের উপরে ওয়াজিব তাদের খেদমত করা। কিন্তু সন্তানের বধূ অর্থাৎ, পুত্র-বধুর সেটা দায়িত্ব নয়। সে যদি করে, তাহলে সেটা তার নফল কাজ হবে। তার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ী কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় না করলে জবরদস্তী করাতে পারবেন না।

এমনিভাবে স্বামীর ঘরের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করাও স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। করলে সেটা তার অনুগ্রহ। স্বামীর রান্না-বান্না করে দেয়াও স্ত্রীর অনুগ্রহ। সে চাইলে স্বামীকে বলে দিতে পারে তোমার মা-বাবা আছে, ভাই-বোন আছে তাদের রান্না-বান্নার দায়িত্ব আমার নয়, আমি করতে পারব না। এমনকি স্ত্রী যদি খান্দানী মহিলা হয়—যারা রান্না-বান্না করতে অভ্যস্ত নয়— তাদের উপর স্বামীর জন্যও রান্না-বান্না করে দেয়া ওয়াজিব নয়। এরকম স্ত্রীর জন্য স্বামী চাকর-চাকরাণীর ব্যবস্থা করে দিবে। যেহেতু সে খান্দানী মহিলা, সে রান্নাবান্নায় অভ্যস্ত নয়, এটা জেনেই তাকে বিবাহ করেছে, কাজেই তার মনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, তার সাধ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্ত্রীদের প্রতি এতটা লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে। তবে স্ত্রীদেরও মনে রাখতে হবে যে, স্বামীর খেদমত করতে পারাই তার জন্য শোভনীয় এবং স্বামীর সাথে আইন না দেখিয়ে আখলাকের পরিচয় দিয়ে স্বামীর সব রকম খেদমত করলেই সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আইন দেখাতে গেলে শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। বিবি আয়েশার মনোরঞ্জনের জন্যই এটা করেছেন। স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে সর্বক্ষণ সময় দিতে না পারে তাহলে স্ত্রীর কাছে এমন কোন মহিলার আসা যাওয়া বা রাখার ব্যবস্থা করবে, যার দ্বারা স্ত্রী একাকিত্বের কষ্ট থেকে মুক্তি পায়। প্রয়োজনে তারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতেও যেতে পারবে।

নারীদের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে আরও একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তাহল প্রয়োজন হলে তারা বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু অবশ্যই শরীয়তসম্মত পর্দা করে যেতে হবে। পর্দা করা ফরয। অনেক মা বোন আছেন যারা দ্বীনদার বলে পরিচিত। তারা নামায পড়েন, রোযা রাখেন, হজ্ব করেন, যাকাত দেন, আরও অনেক দ্বীনদারির কাজ করেন। কিন্তু পর্দা ফরয, এ বিষয়টাকে তারা অমান্য করে চলছেন। কোন নারী পর্দা লঙ্ঘন করলে ফরয তরকের কারণে তার যেমন কবীরা গোনাহ হবে, মা-শাশুড়ী বা গার্জিয়ান হয়ে তাদের এটা করতে দিলে তাদেরও কবীরা গোনাহ হতে থাকবে। আমরা দ্বীনদার হওয়ার দাবি করি, কিন্তু এই বিষয়টা আমরা মানি না, অনেকে জানি না, অনেকে বুঝতেই চাই না। আল্লাহ পাক আমাদের সহীহ বুঝ নসীব করুন।

বিনা প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন থাকলে তারা বাইরে যাবে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার অধিকার তাদের আছে, প্রয়োজনে সেখানে যাবে, কিন্তু মার্কেটে ঘোরা, পার্কে ঘোরা, এই অধিকার তাদের দেয়া হয়নি। যেখানে গেলে তাদের দ্বীনী মন-মানসিকতা নষ্ট হবে, দ্বীনের চেতনা নষ্ট হবে, পর্দা লঙ্ঘন হবে, সেখানে যাওয়ার অধিকার তাদের দেয়া হয়নি। সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। এই নিয়ম পালন করলে এত রূপ চর্চা করার জন্য, এত সাজ-সজ্জা করার জন্য এত দাবি তাদের থেকে উঠবে না। নানান রকম শাড়ী দাও, নানান রকম গয়না দাও, এসব দাবি কমে আসবে। বাইরে নানা রকম অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন চাহিদা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে তারা দেখে অনেকের বিবিরা নতুন নতুন দামী দামী শাড়ী পরে এসেছে, নানা রকম গয়না পরে এসেছে। কত জাঁকজমক করে এসেছে। এসব দেখে তাদের ভিতরে ঐসব পাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মনের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড বাড়ানোর চিন্তা ঢোকে। অনেক সময় বেদ্বীন লোকদের পরিবেশে গিয়ে বদদ্বীনী চেতনাও তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তখন ঘরে এসে স্বামীর কাছে, গার্জিয়ানের কাছে নানান রকম বায়না ধরতে থাকে। স্বামীকে, গার্জিয়ানকেও তারা বিভ্রান্ত করে ফেলে।

এ জন্য শরীয়তে নিয়ম রাখা হয়েছে— পরিবারের সদস্যদের দ্বীনদার বানাতে চাইলে, নিজেরা দ্বীনদার থাকতে চাইলে, দ্বীনদার মানুষের কাছে বেশী বেশী যাতায়াত রাখতে হবে। বে-দ্বীন লোকদের কাছে, বে-দ্বীন লোকদের পরিবেশে যাওয়া ও উঠা বসা থেকে বিরত থাকতে হবে। আমি গরীব হয়ে থাকলে আমার ছেলে-মেয়েদের, আমার পরিবারের সদস্যদের ধনীদের কাছে, ধনীদের বাসায় বেশী পাঠানো ঠিক নয়। কারণ তাদের কাছে গেলে ওদের মনে হবে আমাদের অনেক কিছু নেই, আমাদের বাপ, আমাদের স্বামী আমাদের এগুলো দেয়নি। এদের কতকিছু আছে আমাদের কিছুই নেই। এভাবে একদিকে তাদের মনে স্ট্যান্ডার্ড বাড়ানোর চিন্তা ঢুকতে থাকবে, আর একদিকে স্বামীর প্রতি বা পিতা-মাতার প্রতি বা গার্জিয়ানের প্রতি না-শোকরী আসতে থাকবে। এমনিতেই স্বামীর না-শোকরী করার একটা স্বভাব মহিলাদের মধ্যে আছেই, এর পরেও যদি এরকম পরিবেশে যায়, তাহলে না-শোকরীর মাত্রা আরও বাড়তে থাকবে।

মহিলাদের না-শোকরীর মনোভাব প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের নসীহত নং ৬-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোন নারীর মধ্যে এরূপ মনোভাব থাকলে তাকে কী করতে হবে, তা-ও সেখানে আলোচনা করা হয়েছে।

না-শোকরী করা মারাত্মক গোনাহ, কবীরা গোনাহ্। আল্লাহর না-শোকরী করাও কবীরা গোনাহ, বান্দার না-শোকরী করাও কবীরা গোনাহ্।

এভাবে নারীদের জন্য ইসলাম এমন সব অধিকার রেখেছে, যা জানলে নারী সমাজ আনন্দিত হবেন। ইসলাম নারীকে অনেক অধিকার দিয়েছে। কিছু দায়িত্বও দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই একে অপরের উপর অধিকারও রয়েছে, একের জন্য অপরের করণীয়ও বা দায়িত্বও রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবকিছু ভালভাবে বোঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

স্বামীর হক

স্বামীর প্রতি যেমন স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, স্ত্রীর প্রতিও স্বামীর অধিকার রয়েছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার হল—স্ত্রী স্বামীর উদ্দেশ্যে ঘরে সাজ-গোজ করে থাকবে। স্বামীর এই অধিকার খুব শক্ত অধিকার। এমনকি ফেকাহ্র কিতাবে মাসআলা বলা হয়েছে—যত কারণে স্বামী স্ত্রীকে মারধর করতে পারে, তার ভিতরে এটাও একটা। স্ত্রী যদি ঘরে সাজ-গোজ করে না থাকে, তাহলে স্বামী এর জন্য স্ত্রীকে মার দিতে পারে। স্বামীর মনোরঞ্জন বৈবাহিক জীবনের একটা বড় উদ্দেশ্য। স্ত্রী ঘরে সাজ-গোজ করে না থাকলে স্বামীর মনোরঞ্জনে ব্যাঘাত ঘটবে, এভাবে বৈবাহিক জীবনের একটা বিরাট ক্ষতি সাধিত হবে। তাই শরীয়ত এ বিষয়টাকে শক্ত করে দেখেছে। স্বামী স্ত্রীকে আরও যে সব কারণে মার দিতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে যদি স্ত্রী শরীয়তসম্মতভাবে না চলে। স্বামী পর্দায় চলতে বলে অথচ সে পর্দায় চলে না, স্বামী নামায পড়তে বলে, রোযা রাখতে বলে, অথচ সে নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, তাহলেও স্বামী তাকে মার দিতে পারবে। কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যায়, এসব কারণে কোন স্বামী কোন স্ত্রীকে মারে না। মারে যতসব আজেবাজে কারণে। যেখানে মারার কথা বলা হয়নি, সেখানে মারে। তরকারীতে লবণ একটু কম হল কেন, মার দিয়ে বসে, টাইম মত রান্না হল না কেন মার দিয়ে বসে। শরীয়তের খেলাফ করার কারণে তাকে মার দেয় না,

---

১. اصلاح انقلاب امت، تحفۂ زوجین، امداد الفتاوی ج/۲، احسن الفتاوی । থেকে গৃহীত ।

Scanned by CamScanner

বরং শরীয়ত না মানার জন্য চাপ দেয়। বন্ধু-বান্ধবের সামনে যাওয়ার জন্য, তাদের সাথে কথা-বার্তা বলার জন্য চাপ দেয়। না মানলে স্ত্রীকে মার দেয়। যার কারণে এসব মারে ভাল ফল হয় না বরং খারাপ ফল হয়। যদি শরীয়ত মানানোর জন্য মার দেয়া হয়, তাহলে স্ত্রীর মন খারাপ করা ঠিক হবে না; বরং সে ভাববে আমি নামায পড়ি না, তাই আমাকে মার দিয়েছে, কোন খারাপ উদ্দেশ্যে মার দেয়নি, আমার মঙ্গলের জন্যই তিনি এটা করেছেন। ঘরে সাজ-গোজ না করার কারণে মার দিলেও তার মন খারাপ করা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে তাকে ভাবতে হবে আমার খারাপের জন্য তো এটা করা হয়নি।

তবে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। তা হল যে সব ক্ষেত্রে স্ত্রীকে মারার অনুমতি দেয়া হয়েছে, এই মারার অর্থ গরুপেটা করা নয়, এটা হল সামান্য চড়-থাপ্পড় বা রশি দিয়ে কিংবা কাপড় পেঁচিয়ে তার দ্বারা বা মেসওয়াক দ্বারা হালকা একটু আঘাত করা, যাতে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এবং তার সংশোধন হয়ে যায়। কিন্তু অনেকে এটা না বুঝে বলে যে, ইসলাম নারীকে নির্যাতন করার অনুমতি দিয়েছে।

যাহোক, নারী সাজ-সজ্জা করবে ঘরে। বাইরের জন্য সাজ-সজ্জা করবেই না। কাজেই বাইরের অনুষ্ঠানে যাওয়ার সাজের জন্য নতুন নতুন শাড়ী গয়না দিতে হবে এর প্রশ্নই উঠবে না, এটা পুরুষের কোন দায়িত্বই নয়।

স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে স্বামীর সাথে তার শুধু মহব্বত-ভালবাসার সম্পর্ক নয়, আদব-তা'যীমের সম্পর্কও রয়েছে। স্বামী স্ত্রীকে মহব্বত করবে, ভালবাসবে, স্ত্রীও স্বামীকে মহব্বত করবে ভালবাসবে। সাথে সাথে স্ত্রী স্বামীর আদব-সম্মানও রক্ষা করবে। এটা স্বামীর অতিরিক্ত প্রাপ্য। স্ত্রীকে স্বামীর আদব-সম্মান রক্ষা করে চলতে হবে। স্ত্রীর কাছে স্বামীর এতটা আদব সম্মান প্রাপ্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কথায় বলেছেন :

لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔ (ترمذی)

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর কাউকে সাজদা করা জায়েয নেই। কোন মানুষ কোন মানুষকে সাজদা করতে পারবে না। যদি কোন মানুষকে হুকুম দিতাম অন্য কোন মানুষকে সাজদা করার, তাহলে একমাত্র স্ত্রীকে হুকুম দিতাম সে তার স্বামীকে সাজদা করবে।

এ হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়—আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের পরে স্ত্রীর কাছে সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা পাবে স্বামী। কাজেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

শুধু মহব্বত ভালবাসার সম্পর্ক নয়। স্ত্রী স্বামীর আদব-তা'যীমও রক্ষা করে চলবে। এ জন্যেই স্ত্রীর প্রতি হুকুম হল, সে তার স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে না। তবে প্রয়োজন হলে নাম বলতে পারবে। গ্রামদেশের মহিলাদের মত নয় যে, প্রয়োজন হলেও নাম বলবে না বরং বলবে অমুকের বাপ, আমাদের বাড়ির উনি, এরকম নয়। নাম বলা নিষেধ নয়, নাম ধরে ডাকা নিষেধ। নাম বলা আর নাম ধরে ডাকা এক কথা নয়। স্বামীর নাম ধরে ডাকা নিষেধ, কারণ এটা স্বামীর আদবের খেলাফ। স্বামী স্ত্রীর মুরব্বী। তাই মুরব্বী হিসেবে স্বামীর আদব রক্ষা করতে হবে।

সব মুরব্বীদের সাথেই আদব রক্ষা করতে হবে। বয়সের মুরব্বী হোক বা ইলমের মুরব্বী হোক, বা দ্বীনী মুরব্বী হোক, কারও নাম ধরে ডাকা নিষেধ। স্ত্রীরাও এরকম স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে না। যখন স্বামীর সাথে এক সাথে হাঁটবে বা চলবে, পিছনে পিছনে থাকবে। যেমন মুরব্বীদের সামনে রেখে হাঁটতে হয়। যিনি আমার বয়সে মুরব্বী কিংবা ইল্ম-কালামে মুরব্বী, চলার সময় তাকে আমি সামনে রাখব, আমি পিছনে থাকব। মুরব্বীদের সাথে যেমন রুক্ষ স্বরে কথা বলা যায় না, জোর আওয়াজে কথা বলা যায় না, ঝাঁঝালো সুরে কথা বলা যায় না। স্বামীর সাথেও স্ত্রী এগুলো করতে পারবে না। স্বামীর সাথে ঝাঁঝালো সুরে কথা বলতে পারবে না। চড়া গলায় কথা বলতে পারবে না। মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারবে না। এগুলি হল ইসলামের শিক্ষা দেয়া আদব। স্ত্রীকে এই সমস্ত আদব রক্ষা করতে বলা হয়েছে। এগুলো দ্বারাই পারিবারিক শৃংখলা রক্ষা পাবে।

ইসলাম পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার শিক্ষাও দিয়েছে। স্ত্রী স্ত্রীর মত চলবে, ছেলে-মেয়ে ছেলে-মেয়ের মত চলবে, যার যেমন খুশী সে তেমন চলবে— ইসলাম এরকম পরিবারের কথা বলেনি। পরিবারের ছোটরা বড়দের আদব তা'যীম রক্ষা করবে, স্ত্রীও স্বামীর আদব-তা'যীম রক্ষা করে চলবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসাও থাকবে, আদব-তা'যীমও থাকবে। ভালবাসা আর আদব তা'যীম—এই দুটোর ভিতরে সমন্বয় করে চলতে হবে। স্বামী স্ত্রীকে আদর স্নেহ করবে, ভালবাসবে আবার শাসনও করবে। আবার স্ত্রীও স্বামীকে ভালবাসবে, সাথে সাথে তার আদব-তা'যীমও রক্ষা করে চলবে। দুটোর ভিতরে সমন্বয় করে চলবে।

স্ত্রীকে কীভাবে শাসন করতে হবে, তার পদ্ধতিও কুরআন শরীফে বলে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ۔

অর্থাৎ, তোমরা যে সমস্ত নারীদের অবাধ্য হওয়ার ও মাথায় চড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কর, যখন এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তোমরা তাদের শাসন কর। (সূরা নিসা : ৩৪)

এ আয়াতে শাসন করার তিনটা পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে। এক নম্বর : তাদের উপদেশ দিয়ে বোঝাও। একটু অন্যায় করলেই সাথে সাথে ধরে মার-পিট শুরু করে দিবে এই শিক্ষা দেয়া হয়নি। বরং প্রথমে তাদেরকে ভাল কথা বলে, উপদেশ দিয়ে ভাল বানানোর চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে, উপদেশের পদ্ধতিতে কাজ না হলে তাদের সাথে মেলামেশাটা বন্ধ করে দাও, এক বিছানায় থেকেও তাকে আলাদা করে দাও অর্থাৎ, এক বিছানায় থাক, কিন্তু অন্য দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে থাক। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাক, তাহলে তার আত্মমর্যাদাবোধ থাকলে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগতে পারে, এভাবে তার সংশোধন হয়ে যেতে পারে। স্বামী তার স্ত্রী সম্পর্কে বুঝতে পারবে যে, এভাবে তার সংশোধন হওয়া সম্ভব কি না। এভাবে যদি কাজ না হয় তৃতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে তাদের কিছুটা মারধর করে সংশোধন করার চেষ্টা কর। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এই আয়াতে যে তিনটা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, যে সিরিয়ালে বলা হয়েছে, সেভাবেই করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে উপদেশ, দ্বিতীয় পর্যায়ে বিছানায় ত্যাগ, তৃতীয় পর্যায়ে মারধর হবে। পূর্বেও বলা হয়েছে এই মার অর্থ গরুপেটা করা নয়। নারীদের প্রতি নির্যাতন করার অনুমতি ইসলামে দেয়া হয়নি। এরকম নির্যাতনের পর্যায়ে মারধর নয়। কী রকম মারধর হবে সে সম্পর্কেও হাদীছে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হাদীছে বলা হয়েছে :

وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ۔ (ابن ماجة والترمذى)

অর্থাৎ, এরকম মার যে শরীরে কোন দাগ পড়তে পারবে না। খুব জোরে মার দিতে পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَتَهٗ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ۔ (متفق عليه)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ দাসী-বাদীকে যেরকম মারে, বিবিকে সে রকম মারবে না। রাতের বেলায় তার কাছে আবার যাবে তাও মনে রেখ। কত সুন্দরভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটা বলেছেন। এখন যে

রাগের চোটে বে-সামাল হয়ে মারবে, রাতের বেলায় আবার তার কাছে মাং নত করতে হবে। তখন শরম লাগবে না? এগুলো স্মরণ রেখে মার, তাহ ব্যালান্স থাকবে। মারের ক্ষেত্রে যেন ব্যালান্সহারা হয়ে না যায়, বে-সামা হয়ে না যায়- এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মার দেয়ার কথা বলার প বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔

অর্থাৎ, মনে রাখবে অবশ্যই আল্লাহ সুমহান, সুউচ্চ। তিনি অনেক বড়। (সূরা নিসা : ৩৪

এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, তোমার উপরে আল্লাহ আছেন, তোমাকে শাসন করার কর্তৃত্ব দেয়া হল, এই কর্তৃত্ব পেয়ে তুমি লাগামহীন হয়ে যা না, বে-সামাল হয়ে যাবে না। মনে রাখবে তোমার উপরেও আরেকজ কর্তৃত্বকারী আছেন। তোমার অধীনস্থের ক্ষেত্রে বে-সামাল হয়ে জুলু বাড়াবাড়ি করলে তোমার উপরওয়ালাও তোমাকে শাস্তি দিতে পারেন মানুষের ভিতরে ব্যালান্স আনার উপায় হল এই যে, মনে করবে আমার চে উপরওয়ালা একজন আছেন। এটা মনে রাখলে মানুষ বে-সামাল হতে পার না। আমরা আমাদের অধীনস্থদের বিভিন্ন অপরাধের কারণে শাস্তি দেই ধমকানী দেই, শাসানী দেই, ছাত্রদের, ছেলে-মেয়েদের শাসন করি, মারধ দেই, এইসব ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে যে, আমার উপরওয়ালা একজ আছেন, আমি যদি বে-ইনসাফী করি, আমার উপরওয়ালা তার প্রতিশোধ নিতে পারেন। আল্লাহর বান্দার সাথে আমি বাড়াবাড়ি করলে আল্লাহও আমার সাথে কঠোরতা করতে পারেন। আল্লাহ পাকের নিয়মই এরকম। আল্লাহর বান্দার সাথে আমি যেমন করব, আল্লাহ পাকও আমার সাথে তেমন করবেন। আল্লাহর বান্দাকে আমি ক্ষমা করলে, আল্লাহও আমাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহর বান্দার প্রতি আমি রহম করলে আল্লাহও আমার প্রতি রহম করবেন। আল্লাহর বান্দার দোষ গোপন করলে আল্লাহও আমার দোষ গোপন করবেন। মোটকথা বান্দার সাথে বান্দার মু'আমালা যেমন হবে, ঐ বান্দার সাথে আল্লাহর মু'আমালাও তেমন হবে। তাই রাগের মাথায় বে-সামাল না হওয়া চাই। হালকা চড়-থাপ্পড় বা হালকা মার দেয়া যেতে পারে এ কথা বলা হয়েছে। যে সমস্ত মহিলাদের মধ্যে সামান্যতম আত্মমর্যাদা থাকে, এতটুকু হলেই তারা সংশোধন হয়ে যাবে।

ইসলামী তরীকায় মারধর হলে সংশোধন হয়। ইসলামের তরীকার বাইরে বেশী মারধর হলে সংশোধন হবে না বরং আরও বাঁকা হয়ে যাবে। আমার ছাত্র, আমার ছেলে-মেয়ে আমার অধীনস্থ যতটুকু অপরাধ করেছে, তার থেকে যদি বেশী শাস্তি দেই, তাহলে তারা ভাল হবে না বরং বিগড়ে যাবে। তাদের ভিতরে জিদ সৃষ্টি হবে যে, আমি এতটুকু অন্যায় করলাম, আমাকে এত বেশী শাস্তি দিল কেন? যতটুকু অন্যায় ততটুকু শাস্তি দেয়া হলে এরূপ জিদ আসতে পারে না বরং তাতে তার ভিতরে নমনীয়তা আসবে। তার ভিতরে অনুশোচনা আসবে যে, আমার অপরাধ হয়েছে, আমার ভুল হয়েছে, তাই আমাকে মার খেতে হয়েছে। কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে অনুশোচনা আসবে না বরং জিদ পয়দা হবে। শরীয়তে প্রতেকটা আমল যেভাবে করতে বলা হয়েছে, সেভাবে করলেই ফায়দা হয়, অন্যথায় ফায়দা হয় না।

নিম্নে সংক্ষেপে স্বামীর জন্য স্ত্রীর করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করা হল—

* স্বামীর আনুগত্য ও খেদমত করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের পরে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকারই সবচেয়ে বেশী। তবে স্ত্রী কোন পাপকাজে স্বামীর আনুগত্য করবে না। যেমন—নামায না পড়া, যাকাত না দেয়া, পর্দায় না থাকা বা পিছনের রাস্তায় যৌন সঙ্গম করতে দেয়া ইত্যাদি ব্যাপারে স্বামী হুকুম দিলে তা মান্য করা হারাম হবে। সেসব ব্যাপারে (নম্রভাবে এবং কৌশলে ও হেকমতের সাথে) স্বামীর বিরোধিতা করা ফরয। এমনিভাবে স্বামী যে কোন ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুআক্কাদা লঙ্ঘনের ব্যাপারে তথা হারাম বা মাকরূহ তাহরীমী করার ব্যাপারে হুকুম দিলে বা বললে তার বিরোধিতা করতে হবে আর কোন মোস্তাহাব ও নফল কাজের ব্যাপারে না করার হুকুম দিলে সে ব্যাপারে স্বামীর কথা মেনে চলা ওয়াজিব। স্ত্রী এমন কোন মোবাহ কাজে লিপ্ত হতে পারবে না যাতে স্বামীর খেদমতের ব্যাপারে ক্রটি হয়। স্বামীর যে হুকুম না মানলে স্বামীর কষ্ট হবে—এরূপ হুকুম মানতে হবে (যদি সেটা পাপের হুকুম না হয়)। স্বামী কাছে থাকা অবস্থায় নফল নামায ও নফল রোযা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত করবে না, তবে স্বামী সফরে বা বাইরে থাকলে তার অনুমতি ব্যতীত করায়ও ক্ষতি নেই।

* স্বামীর নিকট তাঁর সাধ্যের বাইরে কোন খাদ্য-খাবার বা পোশাক-পরিচ্ছদের আবদার করবে না বরং স্বামীর সাধ্য থাকলেও নিজের থেকে কোন কিছুর ফরমায়েশ না করাই উত্তম। স্বামী নিজের থেকেই তার খাহেশ জিজ্ঞেস করে সে মোতাবেক ব্যবস্থা করবে—এটাই সুন্দর পন্থা।

* স্বামী অপছন্দ করে— এরূপ কোন পুরুষ বা নারীকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরে আসতে দিবে না, নিজের নিকট আনবে না এবং নিজের কাছে রাখবে না।

* স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ি বা ঘর থেকে বের হবে না।

* স্বামীর টাকা-পয়সা ও মাল-সামান হেফাজত এবং সংরক্ষণ করা স্ত্রীর দায়িত্ব। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর টাকা-পয়সা ও মাল-সামান থেকে কাউকে (মা-বাপ, ভাই বোন হলেও) কোন কিছু দিবে না। এমনকি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার টাকা-পয়সা থেকে ঘরের আসবাব-পত্রও ক্রয় করতে পারবে না। স্বামীর টাকা-পয়সা থেকে গোপনে কিছু কিছু নিজে সঞ্চয় করা এবং নিজেকেই সেটার মালিক মনে করা এবং সেভাবে সে অর্থ অন্যত্র পাচার করা বা ব্যবহার করাও জায়েয নয়। সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্যও এরূপ করতে পারবে না, করতে চাইলে তার জন্য স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। এমনিভাবে স্বামীর স্পষ্ট অনুমতি বা অনুমতি দেয়ার প্রবল ধারণা না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর মাল-দৌলত থেকে কাউকে চাঁদা প্রদান বা দান-খয়রাত করতে পারবে না। অবশ্য দুই-চার পয়সা যা ফকীরকে দেয়া হয় বা এরূপ যৎসামান্য বিষয়—যে ব্যাপারে স্বামীর অনুমতি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা—সেরূপ বিষয় ভিন্ন কথা, সেটা অনুমতি ছাড়াও জায়েয। স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রেও স্বামীর সাথে পরামর্শ করে নেয়া প্রয়োজন এবং সেটাই উত্তম।

* স্বামী যৌন চাহিদা পূরণ করার জন্য আহবান করলে স্ত্রীর পক্ষে তাতে সাড়া দেয়া কর্তব্য, ফরয। অবশ্য শরীয়তসম্মত ওযর থাকলে ভিন্ন কথা। যেমন— হায়েয-নেফাসের অবস্থা থাকলে।

* স্বামীর মধ্যে শরীয়তের খেলাফ কোন কিছু দেখলে আদবের সাথে তাঁকে সংশোধনের চেষ্টা করা এবং স্বামীকে দ্বীনদার বানানোর চেষ্টা চালানো স্ত্রীর কর্তব্য। এর জন্য প্রথমে স্ত্রীকে শরীয়তের অনুগত ও দ্বীনদার হতে হবে, তাহলে তার প্রচেষ্টা বেশী সফল হবে।

* স্বামীর নাম ধরে না ডাকা। এটা বে-আদবী। তবে প্রয়োজনের সময় স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করা যায়।

* স্বামীর উদ্দেশ্যে সেজে-গুজে পরিপাটি হয়ে এবং হাসি-খুশি থাকা কর্তব্য। এটা স্বামীর অধিকার।

* স্বামী সফর থেকে এলে বা বাইরে থেকে কর্মক্লান্ত হয়ে এলে তার তাৎক্ষণিক যত্ন নেয়া, সুবিধা-অসুবিধা দেখা ও খোঁজ-খবর নেয়া জরুরী। শুধু সফর থেকে ফিরলেই নয় সর্বদাই স্বামীর স্বাস্থ্য শরীরের প্রতি খেয়াল রাখা ও যত্ন নেয়া স্ত্রীর দায়িত্ব।

* স্বামীর না শোকরী করবে না। যেমন কোন এক সময় তাঁর আনীত কোন দ্রব্য অপছন্দ হলে এরূপ বলবে না যে, কোন দিন তুমি একটা পছন্দসই জিনিস দিলে না... ইত্যাদি।

* স্বামীর আদব-এহ্তেরাম ও সম্মান রক্ষা করে চলা। চড়া গলায় ঝাঁজালো স্বরে স্বামীর সাথে কথা না বলা, তাকে শক্ত কথা না বলা। স্বামী কখনও স্ত্রীর হাত-পা দাবিয়ে দিতে গেলে স্ত্রী সেটা করতে দিবে না। ভেবে দেখুন তো মাতা-পিতা বা যাদের সাথে আদব রক্ষা করে চলতে হয় তারা এরূপ করতে চাইলে তখন কীরূপ করা হয়। অবশ্য অনন্যোপায় অবস্থার কথা ভিন্ন। মোটকথা কথা-বার্তায়, উঠা-বসায়, আচার-আচরণে সর্বদা স্বামীর আদব রক্ষা করে চলা কর্তব্য।

* সতীত্ব রক্ষা করা স্ত্রীর দায়িত্ব। স্ত্রীর সতীত্ব স্বামীর সম্পদ। অতএব সতীত্ব রক্ষা না করলে স্ত্রীর দ্বিগুণ পাপ হবে। এক হল সতীত্বহীনতার অপরাধ। দ্বিতীয় হল স্বামীর অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ।[১]

❖ ❖ ❖

২৮. জায়গা যমীর আইল (সীমানা) নষ্ট করা কবীরা গোনাহ।

২৯. শ্রমিক থেকে কাজ পূর্ণ নিয়ে তার পূর্ণ মজুরি না দেয়া বা পূর্ণ মজুরি দিতে টাল-বাহানা করা কবীরা গোনাহ।

৩০. মাপে কম দেয়া, মালে মিশাল দেয়া বা যে কোনভাবে খরীদ্দারকে ধোঁকা দেয়া কবীরা গোনাহ।

৩১. দাইয়ূছিয়াত অর্থাৎ নিজের বিবিকে বা অধীনস্থ কোন নারীকে পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেয়া, পর পুরুষের বিছানায় যেতে দেয়া, এসবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা কবীরা গোনাহ।

৩২. চোগলখুরী করা কবীরা গোনাহ। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল :

---

১. স্বামীর অধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য معارف القرآن، مفتاح الجنان، تحفۂ زوجین ও بہشتی زیور থেকে গৃহীত।

চোগলখোরী (কোটনাগিরি)

চোগলখোরী অর্থ কোটনাগিরি। অর্থাৎ, কারও এমন কথা বা কাজ সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করে দেয়া, যা সে তার কাছে গোপন করতে ও গোপন রাখতে চায় এবং তার শ্রুতিগোচর হওয়াকে অপছন্দ করে। এটা কোন দোষের কথা বা দোষের কাজ হলে চোগলখোরীর সাথে সাথে গীবতও হয়ে যাবে, তাহলে তা একই সাথে দুটো পাপের হবে। আর প্রকৃতপক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে বুহতান বা মিথ্যা অপবাদের গোনাহও হবে। চোগলখোরী করা কবীরা গোনাহ, যা মানুষের পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ককে ধ্বংস করে দেয় এবং সামাজিক ফ্যাসাদ ঘটায়।

❖ ❖ ❖

৩৩. গণকের কাছে যাওয়া কবীরা গোনাহ।

৩৪. মানুষ বা অন্য কোন জীবের ফটো আদর বা সম্মান করে ঘরে রাখা কবীরা গোনাহ। মাতা-পিতা, মুরব্বী, নেতা যে কেউ হোকনা কেন তাদের ফটো বা মূর্তি সম্মান করে ঘরে রাখা নিষেধ। কোন সন্তানের ছবি আদর করে ঘরে রাখাও নিষেধ।

৩৫. পুরুষের জন্য সোনার আংটি পরিধান করা কবীরা গোনাহ।

৩৬. পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা কবীরা গোনাহ।

৩৭. শরীরের রূপ ঝলকে উঠে— মেয়েলোকদের জন্য এমন পাতলা পোশাক পরিধান করা কবীরা গোনাহ।

৩৮. মহিলার জন্য পুরুষের এবং পুরুষের জন্য মহিলার পোশাক পরিধান করা কবীরা গোনাহ।

৩৯. গর্বভরে লুঙ্গি, পায়জামা, জামা ও প্যান্ট পায়ের নীচে ঝুলিয়ে চলা কবীরা গোনাহ। তবে মহিলাগণ এ হুকুমের ব্যতিক্রম।

৪০. বংশ বদলানো অর্থাৎ, পিতৃপরিচয় বদলে দেয়া কবীরা গোনাহ।

৪১. মিথ্যা মোকাদ্দমা করা, মিথ্যা মোকাদ্দমার পরামর্শ প্রদান, তদবীর ও পায়রবী করাও কবীরা গোনাহ।

৪২. মৃত ব্যক্তির শরীয়তসম্মত অছিয়ত পালন না করা কবীরা গোনাহ।

৪৩. কোন মুসলমানকে ধোঁকা দেয়া কবীরা গোনাহ।

৪৪. দেশের জরুরী রসদ, খাদ্য বা হাতিয়ার চোরাচালান বা পাচার করা কবীরা গোনাহ।

৪৫. রাস্তা-ঘাটে, ছায়াদার কিংবা ফলদার বৃক্ষের নীচে মল-মূত্র ত্যাগ করা কবীরা গোনাহ।

৪৬. বাড়ি-ঘর, আনাচ-কানাচ, থালা-বাসন, কাপড়-চোপড় নোংরা ও গান্ধা করে রাখা কবীরা গোনাহ।

৪৭. হায়েয বা নেফাস অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা, স্বামীকে করতে দেয়া কবীরা গোনাহ।

৪৮. মলদ্বারে স্ত্রী সহবাস করা কবীরা গোনাহ। স্বামী এরূপ করতে চাইলে নরমে তাকে মাসআলা বুঝিয়ে বিরত রাখতে হবে।

৪৯. সহবাস করে গোসল না করা কবীরা গোনাহ।

৫০. যাকাত না দেয়া কবীরা গোনাহ।

৫১. ইচ্ছাপূর্বক ওয়াক্তিয়া নামায কাযা করা কবীরা গোনাহ।

৫২. পুরুষের জন্য জুমুআর নামায না পড়া কবীরা গোনাহ।

৫৩. বিনা ওজরে রোযা ভাঙ্গা কবীরা গোনাহ।

৫৪. হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা। তবে মৃত্যুর সময় হজ্জের অছিয়ত বা ব্যবস্থা সম্পন্ন করে গেলে পাপমুক্ত হতে পারবে।

৫৫. রিয়া তথা লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করা কবীরা গোনাহ।

৫৬. মানুষের কষ্ট হয় এমন খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি দেখে খুশী হওয়া।

৫৭. ষাঁড় বা পাঠার দ্বারা গাভী বা ছাগী পাল দিতে না দেয়া। পাল দেয়ার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়।

৫৮. প্রতিবেশীকে (ভিন্ন জাতির হলেও) কষ্ট দেয়া কবীরা গোনাহ।

৫৯. পাড়া প্রতিবেশীর ঝি-বউকে কুনযরে দেখা কবীরা গোনাহ।

৬০. মাল থাকা বা মাল উপার্জনের শক্তি থাকা সত্ত্বেও লোভের বশবর্তী হয়ে সওয়াল করা কবীরা গোনাহ।

৬১. কারণ ছাড়াই স্ত্রীর স্বামী সহবাসে অসম্মত হওয়া কবীরা গোনাহ।

৬২. পরের দোষ দেখে বেড়ানো কবীরা গোনাহ।

৬৩. কারও জান, মাল বা ইজ্জতের হানি করা কবীরা গোনাহ।

৬৪. নিজের প্রশংসা নিজে করা কবীরা গোনাহ।

৬৫. বিনা দলীলে কারও প্রতি বদগোমানী করা। এ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন : পৃষ্ঠা নং ২৫২।

৬৬. ইল্‌মে দ্বীনকে তুচ্ছ মনে করে ইল্‌মে দ্বীন হাছেল না করা বা হাছেল করে আমল না করা কবীরা গোনাহ।

৬৭. এমন কথা যা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি বা এমন কোন কাজ, যা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি— সে সম্পর্কে এরূপ বলা যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। এরূপ বলা কবীরা গোনাহ।

৬৮. কোন সাহাবীকে মন্দ বলা, সাহাবীদের সমালোচনা করা কবীরা গোনাহ।

৬৯. হযরত আলী (রাযি.)-কে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) থেকে শ্রেষ্ঠ বলা।

৭০. কোন নারীকে তার স্বামীর কাছে গমন ও স্বামীর হক আদায়ে বাধা দেয়া কবীরা গোনাহ।

৭১. কোন অন্ধকে ভুল পথ দেখিয়ে দেয়া কবীরা গোনাহ।

৭২. কাউকে কোন পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করা ও পাপ কাজে সহযোগিতা করা কবীরা গোনাহ।

৭৩. কোন গোনাহে সগীরার উপর হটকারিতা করা কবীরা গোনাহ।

৭৪. পেশাবের ছিটা থেকে সাবধান সতর্ক না থাকা কবীরা গোনাহ।

৭৫. কোন দান-সদকা করে বা হাদিয়া উপঢৌকন দিয়ে খোঁটা দেয়া কবীরা গোনাহ।

৭৬. অনুগ্রহকারীর না-শোকরী করা কবীরা গোনাহ।

৭৭. কোন মুসলমান ভাইকে ছুরি, চাকু, তলোয়ার ইত্যাদি লৌহাস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ভয় দেখানো কবীরা গোনাহ।

৭৮. দাবা ও ছক্কা পাঞ্জা খেলা। আরও কতিপয় খেলা রয়েছে যা হারাম ও কবীরা গোনাহ। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

৭৯. বিনা প্রয়োজনে লোকের সামনে সতর খোলা কবীরা গোনাহ।

৮০. মেহমানের খাতির ও আদর যত্ন না করা কবীরা গোনাহ। নিম্নে মেহমানদারী বা অতিথি পরায়ণতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল:

অতিথি পরায়ণতা

অতিথি পরায়ণতা মূলত একটি মনের চরিত্র। মেহমানকে শুধু পর্যাপ্ত আপ্যায়ন করানোর নাম অতিথি পরায়ণতা নয়, বরং সাধ্য অনুযায়ী মেহমানকে আপ্যায়নতো রয়েছেই, সেই সাথে প্রফুল্লচিত্তে এবং বিকশিত

মনে মেহমানকে গ্রহণ করা ও তার সাথে সম্মানজনক আচরণ করাই হল সত্যিকার অতিথি পরায়ণতা।

মেহমান এলে আমার পানাহারে শরীক হবে, আর্থিক ক্ষতি হবে, ঝামেলা বাড়বে— এরূপ দুশ্চিন্তা মনকে বিকশিত হতে দেয় না, আর এটাই অতিথি পরায়ণতার গুণ সৃষ্টি হওয়ার পথে বাধা। পক্ষান্তরে যদি কেউ চিন্তা করে যে, তাকদীরের বিশ্বাস অনুসারে মেহমান তারই হিস্যা ভোগ করবে— আমার নয়, তদুপরি আমি মেজবানের প্রতি মেহমানের হক বা অধিকার রয়েছে, তাহলে আতিথ্যের জন্য মন আর সংকুচিত হবে না বরং বিকশিত হবে এবং তখনই সৃষ্টি হবে অতিথি পরায়ণতা চরিত্র। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ - (متفق عليه)

অর্থাৎ, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের প্রতি যার ঈমান আছে সে যেন মেহমানের যত্ন নেয়।

❖ ❖ ❖

৮১. হাসি-ঠাট্টা করে কাউকে অপমানিত করা কবীরা গোনাহ।

৮২. স্বজন-প্রীতি করা বা অন্যায় বিচার করা কবীরা গোনাহ।

৮৩. নিজে ইচ্ছা করে, দাবি করে পদপ্রার্থী হওয়া বা পদ গ্রহণ করা।

৮৪. পুরুষের জন্য খৎনা না করা মহাপাপ।

৮৫. অসৎ ও অন্যায় কাজ দেখে পারতপক্ষে তাতে বাধা না দেয়া। কবীরা গোনাহ।

৮৬. যালেমের প্রশংসা বা তোষামোদ ও চাটুকারিতা করা কবীরা গোনাহ।

৮৭. অন্যায়ের সমর্থন করা কবীরা গোনাহ।

৮৮. আত্মহত্যা করা, বা স্বেচ্ছায় নিজের কোন অঙ্গ নষ্ট করা কবীরা গোনাহ।

৮৯. প্রিয়জন বিয়োগে সীনা পিটিয়ে বা চিৎকার করে কাঁদা কবীরা গোনাহ।

৯০. স্ত্রী-পুরুষের নাভির নীচের পশম, বগলের পশম বর্ধিত করে রাখা কবীরা গোনাহ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৫৩৬ পৃষ্ঠা।

৯১. উস্তাদ ও পীরের সঙ্গে বে-আদবী করা, হাফেজ ও আলেমের অমর্যাদা করা, তাদের সাথে বে-আদবী করা কবীরা গোনাহ।

৯২. প্রাণীর ছবি তৈরি করা বা ব্যবহার করা কবীরা গোনাহ।

৯৩. কোন হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করা কবীরা গোনাহ। যেমন শূকরের গোশ্ত খাওয়া, মৃত প্রাণী খাওয়া, হালাল জীবকে আল্লাহ্‌র নামে যবাই না করে অন্য কারও নামে জবাই করে বা অন্য কোন উপায়ে মেরে খাওয়া।

৯৪. ষাঁড়, কবুতর বা মোরগ ইত্যাদির লড়াই দেয়া।

৯৫. কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া কবীরা গোনাহ। (কোন রোগের কারণে হলে তা ভিন্ন কথা) কেউ কেউ বলেছেন ভুলে যাওয়ার অর্থ এমন হয়ে যাওয়া যে, দেখেও আর পড়তে পারে না।

৯৬. কোন জীবকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে হত্যা করা কবীরা গোনাহ। (তবে সাপ, বিচ্ছু, ভীমরুল ইত্যাদি কষ্টদায়ক জীব থেকে বাঁচার আর কোন উপায় না থাকলে ভিন্ন কথা।)

৯৭. অপব্যয় করা কবীরা গোনাহ। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল:

অপব্যয় প্রসঙ্গ

শরী'আতের আলোকে যে ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষেধ সে ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে বলা হয় তাবযীর বা অপব্যয়। কুরআনে কারীমে অপব্যয়কারীকে 'শয়তানের ভাই' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অপব্যয় করা গোনাহে কবীরা। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই। (বনী ইসরাঈল: ২৭)

৯৮. অপব্যয়ের মত আর একটি বিষয় রয়েছে অমিতব্যয়। নিম্নে অমিতব্যয় সম্পর্কেও আলোচনা পেশ করা হল:

অমিতব্যয়

যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা জায়েয, সে সব ক্ষেত্রেও প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করাকে বলা হয় এছরাফ বা অমিতব্যয়। এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ। এটাকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন বা অতিরিক্ত ব্যয় বলেও আখ্যায়িত করা যায়। 'প্রয়োজন' বলতে বোঝায় এতটুকু পরিমাণ, যা না হলে কোন দ্বীনের কাজ বা দুনিয়ার কাজ করা সম্ভব হয় না বা অত্যন্ত কষ্ট ও পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় কল্পিত প্রয়োজনকে আমরা জরুরত বা প্রয়োজন মনে করে বসি; অথচ সেটা জরুরত বা প্রয়োজন নয়

বরং তা হল খাহেশাত বা লোভ। মালের মহব্বত এবং লোভ প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা, অমিতব্যয়ের বদ অভ্যাস প্রতিকারের জন্যও তা-ই গ্রহণ করতে হবে। (দেখুন ২৪৯ নং মালের মহব্বত ও ২৫০ পৃ: যুহ্দ বা দুনিয়া ত্যাগ)

❖ ❖ ❖

৯৯. বখীলী বা কৃপণতা করা কবীরা গোনাহ। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

বুখ্‌ল বা কৃপণতা

শরীয়তের আলোকে যেখানে ব্যয় করা জরুরী বা মানবিক কারণে যেখানে ব্যয় করা জরুরী, সেখানে ব্যয় করতে সংকীর্ণতা করাকে বলা হয় বুখ্‌ল বা কার্পণ্য। প্রথম স্থানে ব্যয় না করা গোনাহ আর শেষোক্ত স্থানে ব্যয় না করা গোনাহ নয় তবে খেলাফে আওলা বা অনুত্তম।

এই কৃপণতা এত খারাপ জিনিস যে, এর কারণে অনেক ফরয-ওয়াজিব পর্যন্ত আদায় হয় না। যেমন যাকাত দেয়া, কুরবানী করা, অভাবীকে সাহায্য করা, গরীব আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা ইত্যাদি। এগুলো হল দ্বীনী ক্ষতি। আর কৃপণকে সকলে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এটা হল পার্থিব একটা বড় ক্ষতি। এ রোগের প্রতিকার হল:

১. দুনিয়ার মহব্বত ও মালের মহব্বত অন্তর থেকে বের করতে হবে। (দেখুন: ২৪৯ ও ২৫০ নং পৃষ্ঠা)
২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস মনে না চাইলেও মনের উপর জোর দিয়ে সেটা কাউকে দিয়ে দেয়া। কৃপণতা দূর না হওয়া পর্যন্ত এরূপ করতে থাকা।

❖ ❖ ❖

১০০. ছোট জাত, ছোট পেশাদার বলে বা জোলা, তেলি, কুমার, কামার, বান্দীর বাচ্চা ইত্যাদি বলে কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বা খোঁটা দেয়া কবীরা গোনাহ।

১০১. বিনা এজাযতে কারও বাড়ির ভেতরে বা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করা কিংবা তাকানো কবীরা গোনাহ।

১০২. লুকিয়ে কারও কথা শোনা কবীরা গোনাহ।

১০৩. সূরত-শেকেলের কারণে বা গরীব হওয়ার কারণে কোন মুসলমানকে টিটকারি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা উপহাস করা।

১০৪. কোন মুসলমানকে কাফের বলা কবীরা গোনাহ।
১০৫ একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা কবীরা গোনাহ।
১০৬. কোন খাদ্যকে মন্দ বলা কবীরা গোনাহ। (তবে রান্নার ত্রুটি বর্ণনা করা হলে তা খাদ্যকে মন্দ বলার অন্তর্ভুক্ত নয়।)
১০৭. পুরুষের জন্য গায়রে মাহ্রাম স্ত্রী লোকের নিকট বা নারীর জন্য গায়রে মাহরাম পুরুষের নিকট নির্জনে একা একা বসা কবীরা গোনাহ।
১০৮. কাফেরদের রীতিনীতি পছন্দ করা কবীরা গোনাহ।[১]

সগীরা গোনাহ

সগীরা গোনাহের বিবরণ ও তার একটি তালিকা

নিম্নে সগীরা বা ছোট গোনাহের একটি মোটামুটি তালিকা পেশ করা হল। তবে উল্লেখ্য যে, এই তালিকার মধ্যকার অনেক গোনাহকে অনেকে কবীরা গোনাহ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। আবার পূর্বে উল্লেখিত কবীরা গোনাহের তালিকায় উল্লেখিত কোন কোন গোনাহকে সগীরা গোনাহ বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। আসলে একটি গোনাহকে তার চেয়ে বড় গোনাহের তুলনায় ছোট বলা যায়, আবার তার চেয়ে ছোট গোনাহের তুলনায় তাকে বড় গোনাহও বলা যায়। আবার এক হিসেবে কোন গোনাহই ছোট নয়, কেননা সেটাওতো আল্লাহ্রই নাফরমানী। যেমন ছোট সাপও ধ্বংসকারী, বড় সাপও জীবন ধ্বংসকারী—এরূপ বিচারে কোন সাপই ছোট অর্থাৎ, অবহেলার নয়। অতএব এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পাপকেই তুচ্ছ বা ছোট মনে করতে নেই। আর সগীরা বা ছোট গোনাহের উপর হটকারিতা করলে তা কবীরা হয়ে দাঁড়ায়। যাহোক স্বাভাবিকভাবে যেগুলোকে সগীরা গোনাহ বলা হয় তার একটি মোটামুটি তালিকা এই :

২৭. কোন মানুষ বা প্রাণীকে লা'নত (অভিশাপ) দেয়া।
২৭. না জেনে কোন পক্ষে ঝগড়া করা কিংবা জানার পর অন্যায় পক্ষে ঝগড়া করা।
২৭. ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে হাসা বা কোন বিপদের কারণে নামাযের মধ্যে ক্রন্দন করা।

---

১. কবীরা গুনাহ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে فروع الایمان، تعلیم الدین، گناہ بے لذت، انذار العشائر من الصغائر والکبائر وغیرہ গ্রন্থাদি থেকে সংগৃহীত।

২৭. ফাসেক লোকদের সাথে উঠাবসা করা।

২৭. মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়া।

২৭. পেশাব-পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসা।

২৭. উলঙ্গ হয়ে গোসল করা, যদিও আটকা স্থানে লোকদের আগোচরে হয়।

২৭. মাহরাম পুরুষ ব্যতীত নারীর জন্য সফর করা।

২৭. কেউ ক্রয়ের জন্য কথা-বার্তা বলছে বা বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে এখনও উত্তর মেলেনি, এরই মধ্যে অন্য কারও দর বলা বা বিবাহের প্রস্তাব দেয়া।

২৭. শখ করে কুকুর লালন-পালন করা। তবে মালামাল ও ফসল সংরক্ষণের জন্য কিংবা শিকারের উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করলে গোনাহ হবে না।

২৭. অতি নগণ্য বস্তু চুরি করা।

২৭. দাঁড়িয়ে পেশাব করা।

২৭. গোসলখানায় কিংবা পানির ঘাটে পেশাব করা।

২৭. নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো।

২৭. নামাযে লম্বা চাদর এমনভাবে শরীরে জড়ানো, যাতে হাত বের করা মুশকিল হয়।

২৭. নামাযে অযথা শরীর নিয়ে খেলা করা অর্থাৎ, বিনা প্রয়োজনে কোন অঙ্গ নাড়াচাড়া করা বা কাপড় ওলট-পালট করা।

২৭. নামাযীর সামনে তার দিকে তাকিয়ে বসা বা দাঁড়ানো।

২৭. নামাযে ডানে-বামে অথবা উপরের দিকে তাকানো।

২৭. রোযা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী একসাথে নিরাবরণ হয়ে জড়াজড়ি করা।

২৭. রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেয়া। (যদি আরও আগে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে)।

২৭. গলার পশ্চাদ্দিক থেকে প্রাণী যবেহ করা।

২৭. পঁচা মাছ অথবা মরে ভেসে উঠা মাছ খাওয়া।

২৭. বালেগা বোধসম্পন্ন নারীর পক্ষে ওলীর এজাযত ব্যতীত বিবাহ বসা (যদি ওলী অহেতুক বিবাহে বাধা দেয়ার না হয়)।

২৭. সন্তানদেরকে কোন মাল ইত্যাদি দেয়ার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা না করা। (জীবদ্দশায় সন্তানাদিকে সম্পদ দিয়ে যেতে হলে সব সন্তানকে সমান দিয়ে যাওয়া উত্তম। তবে কোন সন্তান পঙ্গু হলে বা কোন সন্তান দ্বীনের রাস্তায় থাকলে তাকে কিছু বেশী দেয়া যেতে পারে।)

২৭. যার হালাল সম্পদের পরিমাণ কম, হারামের পরিমাণ বেশী, বিনা ওজরে তাহকীক ছাড়া তার দাওয়াত কবূল করা।
২৭. হাদিয়া গ্রহণ করা।
২৭. কোন প্রাণীর নাক-কান প্রভৃতি কেটে দেয়া।
২৮. জবর-দখলকৃত জমিতে প্রবেশ করা। এমনকি নামাযের জন্য হলেও।
২৯. নামাযে পাঠ করার জন্য কোন বিশেষ সূরা নির্ধারিত করা। এমনভাবে যে, সর্বদা সেই সূরাই পাঠ করা হয়, অন্য সূরা পাঠ করা হয় না।
৩০. নামাযে যে সাজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হয়, সেটাকে বিলম্বিত করা বা ছেড়ে দেয়া।
৩১. ডানে কিংবা বামে ফটো রেখে নামায পড়া।
৩২. ফটোর উপর সাজদা করা।
৩৩. স্বর্ণের তার দিয়ে দাঁত বাঁধাই করা।
৩৪. মৃত ব্যক্তির চেহারায় চুমু দেয়া।
৩৫. বালেগদের জন্য নিষিদ্ধ—এমন কোন পোশাক শিশুদেরকে পরিধান করানো। যেমন প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাক, ছেলেদের জন্য রেশমী পোশাক, হারাম উপায়ে অর্জিত পোশাক ইত্যাদি।
৩৬. স্ত্রীর সাথে এমন কারও সামনে সঙ্গম করা যে বোঝে এবং হুশ রাখে। যদিও সে ঘুমিয়ে থাকে। (খুব ছোট শিশুর বেলায় ভিন্ন কথা)
৩৭. রাস্তায় এমন স্থানে দাঁড়ানো বা বসা, যাতে অন্যদের চলতে অসুবিধা হয়।
৩৮. পুরুষদের জন্য আযান শোনার পর ওজর বা জরুরী কাজ ব্যতীত ঘরে বসে বসে ইকামতের অপেক্ষা করতে থাকা।
৩৯. পেট ভরার পরও অতিরিক্ত খাওয়া। (রোযা বা মেহমানের কারণে কিছু বেশী খাওয়া হলে তা ব্যতিক্রম)
৪০. ক্ষুধা লাগা ছাড়াও খাওয়া। (রোগের অবস্থা ব্যতিক্রম)
৪১. মানুষের চলার পথে নাপাকী ফেলা।
৪২. মসজিদের ছাদে নাপাকী ফেলা।
৪৩. নিজের সাত বৎসরের চেয়ে অধিক বয়স্ক ছেলের সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করা।
৪৪. অহেতুক কাজে ও কথায় সময় নষ্ট করা।
৪৫. কারও প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা অর্থাৎ, বাড়িয়ে প্রশংসা করা।
৪৬. কথা বলতে গিয়ে ছন্দ মিলানোর কসরৎ করা।

৪৭. হাসি-ফুর্তিতে সীমালঙ্ঘন করা।
৪৮. কারও গুপ্ত কথা ফাঁস করা।
৪৯. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপনজন ও বন্ধু-বান্ধবকে যুলুম থেকে বিরত না রাখা।
৫০. বিনা ওজরে হজ্জ বা যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা। কেউ কেউ এটাকে কবীরা গোনাহের তালিকাভুক্ত করেছেন।[১]

কালিমা

কালিমায়ে তাইয়্যেবা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই (অর্থাৎ, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদত ও বন্দেগী লাভের উপযুক্ত নয়) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর (সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ) রাসূল।

কালিমায়ে শাহাদাত—

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।

কালিমায়ে তাওহীদ—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَانِیَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

অর্থ : (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তুমি এক— তোমার দ্বিতীয় কেউ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, মুত্তাকীদের ইমাম (সরদার), সমস্ত জাহানের প্রতিপালকের প্রেরিত মহামানব।

কালিমায়ে তামজীদ—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِی اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ۔

---

১. সগীরা গোনাহ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য گناہ بے لذت থেকে গৃহীত।

অর্থ : (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তুমি নূর। আল্লাহ নিজ নূর দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সব রাসূলদের সর্দার এবং সর্বশেষ নবী।

* কালিমায়ে তাইয়্যেবা, কালিমায়ে শাহাদাত, কালিমায়ে তাওহীদ, কালিময়ে তামজীদ প্রভৃতি কালিমাসমূহ মুখস্থ করা জরুরী নয়, শুধু তার বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট।[১]

* কালিমার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যে একত্ববাদ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে রেসালাত (রাসূল হওয়া) সম্বন্ধে স্বীকৃতি রয়েছে, তা জেনে বুঝে মেনে নিতে হবে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে তা গ্রহণ করতে হবে। কালিমার এই অর্থ ও বিষয়বস্তু উপলব্ধি ব্যতিরেকে কেবল মুখে মুখে কালিমা উচ্চারণ করে নিলেই সে আল্লাহ্‌র কাছে মু'মিন ও মুসলমান বলে গণ্য হবে না।[২]

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

---

১. دین کیا ہے ، ।। ২. خیر الفتاوی ج/۱ ।।

بسم الله الرحمن الرحيم

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইবাদত ও সংশ্লিষ্ট ফাযায়েল-মাসায়েল বিষয়ক

ইবাদতের গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ তাআলা জ্বিন এবং ইনসানসহ সমস্ত মাখলূককে সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টি করার পেছনে নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে। কারণ উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কাজ করা নির্বোধের কাজ। উদ্দেশ্যহীনভাবে কাজ করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যারা উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন কাজ করে, যেমন : উদ্দেশ্যহীনভাবে চলা-ফেরা করে বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে যা মনে আসে তা-ই বলে, তাদেরকে আমরা বলি পাগল। কাজেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই যে আসমান-যমীন ও পৃথিবী সহ মহাজগত সৃষ্টি করেছেন, এটা উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। এই মহাবিশ্বের কোন্ মাখলূককে আল্লাহ কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তার বিস্তারিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌রই রয়েছে। কোন্‌টার কী উদ্দেশ্য, আল্লাহ পাক তা সবটা খুলে বলেননি বরং শুধু এতটুকু বলেছেন যে, সবকিছু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে মানুষ এবং জ্বিনকে কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আল্লাহ পাক পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ-(الذاريات: ٥٦)

অর্থাৎ, জ্বিন ও ইনসানকে আমি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। অতএব পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আমাদেরকে সৃষ্টি করার পেছনে উদ্দেশ্য হল—আমরা যেন আল্লাহ্‌র ইবাদত করি।

দুনিয়াতে মানুষকে খাওয়া-পরার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাদের অনেকের জীবন এরকম চলছে যে, দেখলে মনে হবে আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল খাওয়া পরা। কীভাবে টাকা-পয়সা হবে, কিভাবে গাড়ি-বাড়ি হবে—এটাই যেন আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ পাক এই উদ্দেশ্যে আমাদেরকে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ পাক মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেরা সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তাদেরকে সেরা বানানো হয়েছে, তাদের কাজও সেরা। যেহেতু শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই তারা শ্রেষ্ঠ মাখলূক। যদি খাওয়া-পরাই জীবনের বড় উদ্দেশ্য হত, তাহলে গরু-ছাগলই শ্রেষ্ঠ মাখলূক হয়ে যেত, তারাই আশরাফুল মাখলূকাত হয়ে যেত। কারণ গরু-ছাগলরা মানুষের চেয়ে বেশী খেতে পারে। হাতি আর তিমি হত সেই আশরাফুল মাখলূকাতের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ তারাই সবচেয়ে বেশী খেতে পারে! যদি আমরা একথা ভাবি যে, আমরা খাই উন্নতমানের জিনিস যেমন মাছ, গোশ্‌ত ইত্যাদি, আর গরু-ছাগলরা খায় ঘাস-পাতা, খড়-কুটা, ভুষি ইত্যাদি নিম্নমানের জিনিস। কাজেই আমরা শ্রেষ্ঠ মাখলূক। তাহলে যেসব প্রাণী মাছ গোশত খায়, যেমন কুমির, সিংহ, বাঘ ইত্যাদি প্রাণী মাছ-গোশত খায়, তাহলে ওরাই আশরাফুল মাখলূকাত হয়ে যাবে। আমাদের চেয়ে ওরা মাছ-গোশত পরিমাণে বেশী খায়। কাজেই ওদেরই আশরাফুল মাখলূকাত হওয়া উচিত। যদি কেউ বলে ওরাতো মাছ, গোশত খায় কাঁচা, আর আমরা সুন্দর করে মসলা দিয়ে রান্না করে খাই, তাহলে কি মসলাপাতিই জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয়ে গেল?

বস্তুত : সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে খাওয়া-পরা জীবনের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ খাওয়া-পরা হল জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, তাহলে জীবন কিসের জন্য? নিশ্চয়ই জীবন খাওয়া-পরার জন্য নয় বরং অন্য কিছুর জন্য। সেই অন্য কিছু কী? সেটা হল আল্লাহর ইবাদত। এই ইবাদতের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমাদের জীবন হল আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য। ইবাদত অর্থ দাসত্ব। অর্থাৎ জীবনের সর্বস্তরে চরম নতি স্বীকার করা। কিসের সামনে নতি স্বীকার করা? আল্লাহর হুকুম-আহকামের সামনে নতি স্বীকার করা। আমার জীবনের সব কিছু আল্লাহর হুকুমের সামনে নত হয়ে যাবে— আমার কথা-বার্তা বলা, আমার কাজ-কর্ম করা, আমার হাঁটা-চলা করা, আমার শয়ন-স্বপন, আমার জাগরণ, সব কিছু আল্লাহর হুকুমের

সামনে চরমভাবে নতি স্বীকার করবে। অর্থাৎ, আমার কোন কিছুই আমার নিজের ইচ্ছা মত চলবে না বরং চলবে আমার আল্লাহর হুকুম মত। এটাকেই বলা হয় দাসত্ব। এটাই হল ইবাদত।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব চলবে না, এমনকি নিজের পছন্দ-অপছন্দের দাসত্বও চলবে না, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাসত্বও চলবে না। শুধু চলবে এক আল্লাহ্র দাসত্ব অর্থাৎ, এক আল্লাহ্র ইবাদত। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ : (يوسف : ٤٠)

অর্থাৎ, তিনি হুকুম দিয়েছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য। এ আয়াতে একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব করার জন্যই মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় ইবাদত করতে হবে। শুধু সুখের অবস্থায় থাকলে নামায-রোযা ইত্যাদি ইবাদত করব, কিন্তু বিপদ-আপদ আসলে আল্লাহর হুকুম থেকে সরে যাব এরকম না হওয়া চাই। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে কুরআনে কারীমে তিরস্কার করে বলা হয়েছে :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ اطْمَاَنَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ۔

অর্থাৎ, কিছু লোক এমন আছে, যারা সুখে থাকলে আল্লাহর ইবাদত করে, কিন্তু কষ্ট-ক্লেশে বা বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকা ছেড়ে দেয়। (সূরা হজ্জ : ১১)

এদের অবস্থাতো এই দাঁড়াল যে, দুনিয়াতেও কষ্ট-ক্লেশে থাকল, আবার আল্লাহকে ছেড়ে দেয়ার কারণে পরকালেও কষ্ট-ক্লেশে থাকতে হবে। তাই আল্লাহ পাক এদের সম্পর্কে বলেছেন :

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ۔

অর্থাৎ, তাদের দুনিয়াও বরবাদ হল আখেরাতও বরবাদ হল। (সূরা হজ্জ : ১১)

গ্রামদেশের এবং শহরেরও বহু মানুষের অবস্থা এরকম যে, তারা দুনিয়াতে নামমাত্র বেঁচে আছে—খাওয়া নেই, পরা নেই, আরাম-আয়েশের কোন ব্যবস্থা নেই, আবার আল্লাহকেও তারা ডাকছে না। এরূপ লোকদেরকে দেখলেও মনে হয় এদের অবস্থাও হল

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ۔

অর্থাৎ, এদের দুনিয়াও বরবাদ আখেরাতও বরবাদ।

এসব লোকদের মনে রাখা দরকার— বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশে থাকার কারণে যে তারা আল্লাহকে ডাকছে না, এই বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ দূর করতে পারেন তো একমাত্র আল্লাহ। অতএব বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশে থাকলে তো আল্লাহকে বেশী ডাকা দরকার। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন:

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ۔

অর্থাৎ, আমি ছাড়া আর কে আছে, যে অসহায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তার কষ্ট-ক্লেশ দূর করতে পারে? (সূরা নাম্‌ল : ৬২)

এর বিপরীত আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশে পড়লে আল্লাহকে ডাকে, আবার বিপদ দূর হয়ে গেলে আল্লাহকে ভুলে যায়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন:

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ۔

অর্থাৎ, কিছু লোক আছে, যারা বিপদে পড়লে উঠতে-বসতে আমাকে ডাকতে থাকে, তারপর যখন আমি বিপদ দূর করে দেই, তখন তাদের ভাবখানা এমন হয় যেন, সেই বিপদে পড়ে সে আমাকে ডাকেইনি। (সূরা ইউনুস : ১২)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন:

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ۔

অর্থাৎ, যখন আমি মানুষকে নেয়ামত দান করি, তখন সে আমার থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং পূর্বের নাফরমানির অবস্থায় ফিরে যায়।

(হা-মীম আস-সাজদাহ : ৫১)

এভাবে আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে আল্লাহর হুকুম থেকে দূরে সরে গেলে আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরী করা হয়। এসব লোকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন:

تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ۔ (سورة الزمر : ٨)

অর্থাৎ, আমার নেয়ামত পেয়ে ভোগে মত্ত আছ, ঠিক আছে ভোগ করতে থাক, তবে অল্পদিনই ভোগ করতে পারবে। তারপর তোমার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

এই সব আয়াত মিলালে বোঝা যায়— আল্লাহর ইবাদত করতে হবে সর্বাবস্থায়। সুখে থাকলে আল্লাহকে ডাকব আর দুঃখে থাকলে ডাকব না তা নয়, বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ডাকতে হবে।

ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল নামায। কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব হবে। যে ব্যক্তি নামাযের হিসাবে পার হতে পারবে, সে অন্যান্য হিসাব থেকেও সহজে পার হতে পারবে।

এই নামায সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য অনেকগুলো শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে একটা হল পবিত্রতা। তাই প্রথমে পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল। পবিত্রতা অর্থ নাপাকি থেকে শরীর, কাপড় ইত্যাদি পাক হওয়া। এ জন্য প্রথমে নাপাকীর বর্ণনা পেশ করা হল। তারপর নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তারপর নামায সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হবে।

পবিত্রতা

নাপাকীর বর্ণনা

* যে সমস্ত নাপাকী চক্ষু দ্বারা দেখা যায় এবং যা থেকে শরীর, কাপড় ও খাদ্যবস্তু পাক রাখা উচিত তা দুই ধরনের :

১. নাজাছাতে গলীজা বা শক্ত নাপাকী। অর্থাৎ, যে নাপাকীর হুকুম শক্ত।

২. নাজাছাতে খফীফা অর্থাৎ, যে নাপাকীর হুমুক কিছুটা হালকা।

* মানুষের মল-মূত্র, মানুষ ও প্রাণীর রক্ত, বীর্য, মদ, সব ধরনের পশুর পায়খানা, সব ধরনের হারাম পশুর পেশাব এবং পাখির মধ্যে শুধু হাঁস ও মুরগির বিষ্ঠা হল নাজাছাতে গলীজা বা শক্ত নাপাকী।

* গরু, মহিষ, বকরী ইত্যাদি সকল হালাল পশুর পেশাব, কাক-চিল ইত্যাদি সকল হারাম পাখির বিষ্ঠা এবং ঘোড়ার পেশাব হল নাজাছাতে খফীফা।

* হাঁস, মুরগি ও পানকৌড়ি ব্যতীত অন্যান্য হালাল পাখির বিষ্ঠা (যেমন কবুতর, চড়ুই, শালিক ইত্যাদির বিষ্ঠা) এবং বাদুর ও চামচিকার পেশাব পায়খানা পাক। এমনিভাবে মশা, মাছি, ছারপোকা এবং মাছের রক্তও পাক।

* নাজাছাতে গলীজার মধ্যে যেগুলো তরল, যেমন রক্ত-পেশাব ইত্যাদি তা এক দেরহাম (গোলাকৃতিভাবে একটা কাঁচা টাকা অর্থাৎ, হাতের তালুর নীচু স্থান পরিমাণের সমান) পর্যন্ত শরীর বা কাপড়ে লাগলে মাফ আছে

অর্থাৎ তা না ধুয়ে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে, তবে বিনা ওজরে স্বেচ্ছায় এরূপ করা মাকরূহ। আর এক দেরহাম পরিমাণের চেয়ে বেশী হলে তা মাফ নয় অর্থাৎ তা পাক না করে নামায পড়া জায়েয নয়।

* নাজাছাতে গলীজার মধ্যে যেগুলো গাঢ় যেমন গোবর, পায়খানা ইত্যাদি তা এক সিকি পরিমাণ পর্যন্ত (অর্থাৎ ৪.৮৬ গ্রাম পর্যন্ত) কাপড় বা শরীরে লাগলে মাফ কিন্তু তার চেয়ে অধিক পরিমাণ লাগলে মাফ নয়।

* নাজাছাতে খফীফা শরীর বা কাপড়ে লাগলে যে অঙ্গে লেগেছে তার চার ভাগের এক ভাগের কম হলে মাফ, আর পূর্ণ চার ভাগের এক ভাগ বা আরও বেশী হলে মাফ নয়। জামার হাতা, কলি, কাপড়ের আঁচল, পায়জামার দুই মুহরীর প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ (অংশ) বলে গণ্য হবে।

* নাজাছাত কম হোক বা বেশী হোক পানিতে পড়লে সেই পানি নাজাছাত বা নাপাক হয়ে যাবে— নাজাছাতে গলীজা পড়লে পানি নাজাছাতে গলীজা হয়ে যাবে এবং নাজাছাতে খফীফা পড়লে নাজাছাতে খফীফা হবে। তবে প্রবাহিত পানিতে বা ১০০ বর্গহাত কিংবা তার চেয়ে বড় কোন কুয়া-হাউজ ইত্যাদিতে নাপাকী পড়লে তা নাপাক হবে না। তবে নাপাকী পড়ার কারণে পানির রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত হয়ে গেলে নাপাক হয়ে যাবে।

* যে পানি দ্বারা কোন নাপাক জিনিস ধৌত করা হয়, সে পানি নাপাক হয়ে যায়।

* মুরদাকে যে পানি দ্বারা গোসল দেয়া হয়, সে পানিও নাপাক।

* রাস্তা-ঘাটে বা বাজারে যে পানি বা কাদার ছিটা শরীরে লাগে তাতে স্পষ্টতঃ কোন নাপাক জিনিস দেখা গেলে তা নাপাক, আর স্পষ্টতঃ কোন নাপাক জিনিস দেখা না গেলে নাপাক নয়। এটাই ফতওয়া; তবে মুত্তাকী লোকদের জন্য— যাদের হাটে-বাজারে যাওয়ার অভ্যাস নয়, যারা সাধারণতঃ খুব পাক সাফ থাকেন— তাদের শরীরে বা কাপড়ে এই পানি কাদা লাগলে তাতে কোন নাপাক জিনিস দেখা না গেলেও ধুয়ে নেয়া উচিৎ।

* পেশাবের অতি ক্ষুদ্র ফোটা যা চোখে দেখা যায় না, তার কারণে শরীর বা কাপড় অপবিত্র হয় না। অতএব তা ধোয়া জরুরী নয়।

* গাভী, বকরী দহন করার সময় যদি দুই-একটি লেদা বা সামান্য গোবর দুধের মধ্যে পড়ে এবং সাথে সাথে তা বের করে ফেলা হয়, তাহলে তা মাফ। কিন্তু যদি লেদা বা গোবর দুধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়, তাহলে সম্পূর্ণ দুধ নাপাক হয়ে যাবে, তা খাওয়া জায়েয হবে না।

* উৎপন্ন ফসল মাড়াই করার সময় গরু অথবা অন্য কোন পশু তার উপর পেশাব করলে তা নাপাক হবে না। তবে মাড়াবার সময় ব্যতীত অন্য সময় পেশাব করলে নাপাক হয়ে যাবে।

* কুকুর, শোকর, বানর এবং বাঘ, চিতাবাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর ঝুটা নাপাক। (খাদ্য বা পানীয় বস্তুতে মুখ লাগিয়ে ত্যাগ করলে তাকে ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট বলা হয়)।

* বিড়ালের ঝুটা পাক, তবে মাকরূহ। কোন পানিতে বিড়াল মুখ দিয়ে থাকলে তা দ্বারা উযূ করবে না। অবশ্য যদি অন্য পানি না পাওয়া যায়, তবে ঐ পানির দ্বারাই উযূ করবে। আর দুধ বা তরকারী ইত্যাদি খাদ্য-খাবারের মধ্যে মুখ দিয়ে থাকলে যদি মালিক অবস্থাপন্ন হয়, তাহলে তা খাবে না— খাওয়া মাকরূহ হবে। যদি গরীব হয়, তবে তার জন্য তা খাওয়া মাকরূহ নয়। তবে বিড়াল যদি সদ্য ইঁদুর ধরে এসে তৎক্ষণাৎ কোন পানি বা খাদ্য খাবারে মুখ দেয়, তবে তা নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি কিছুক্ষণ দেরী করে নিজের মুখ চেটে-চুষে পরিষ্কার করে তারপর মুখ দেয়, তখন নাপাক হবে না— এখন পূর্বের মাসআলার ন্যায় মাকরূহ হবে।

* যে সব প্রাণী ঘরে থাকে যেমন সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, তেলাপোকা, টিকটিকি এবং মুরগি— যেগুলো সর্বত্র ছাড়া থাকে- এদের ঝুটা মাকরূহ তানযীহী। ইঁদুর যদি রুটির কিছু অংশ খেয়ে থাকে তাহলে সেদিক দিয়ে কিছুটা ছিড়ে ফেলে অবশিষ্ট অংশ খাবে।

* হালাল পশু ও হালাল পাখীর ঝুটা পাক। ঘোড়ার ঝুটাও পাক। যে কোন রকম পোষা পাখি যদি মরা না খায় এবং তার ঠোঁটে কোন রকম নাপাকী থাকার সন্দেহ না থাকে তবে তাদের ঝুটাও পাক।

* হালাল পশু ও হালাল জানোয়ারের ঝুটা পাক। তাদের ঘামও পাক। যাদের ঝুটা মাকরূহ তাদের ঘামও মাকরূহ।

* মুসলমান-অমুসলমান সব লোকের ঝুটা পাক, তবে কোন নাপাক বস্তু তার মুখে থাকা অবস্থায় পানি উচ্ছিষ্ট করলে ঐ পানি নাপাক হয়ে যাবে।

* জানা অবস্থায় বেগানা পুরুষের ঝুটাখাদ্য ও পানি নারীর জন্য খাওয়া মাকরূহ। অনুরূপ বেগানা নারীর ঝুটাও পুরুষের জন্য মাকরূহ। অবশ্য না জানা অবস্থায় খেয়ে ফেললে মাকরূহ হবে না।

শরীর ও কাপড় পাক করার নিয়ম

* গাঢ় নাজাছাত (যা দেখা যায়, যেমন পায়খানা, রক্ত) শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা পাক করার নিয়ম হল নাজাছাতকে এমনভাবে ধৌত করবে যেন দাগ না থাকে। একবার বা দুইবার ধোয়ায় দাগ চলে গেলেও পাক হয়ে যাবে, তবে তিনবার ধোয়া মোস্তাহাব। তিনবার ধোয়া সত্ত্বেও এবং নাজাছাত চলে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যদি কিছু দাগ বা দুর্গন্ধ থেকে যায় তাতে কোন দোষ নেই, সাবান প্রভৃতি লাগিয়ে দাগ বা দুর্গন্ধ দূর করা ওয়াজিব নয়।

* পানির মত তরল নাজাছাত শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা পাক করার নিয়ম হল তিনবার ধৌত করা এবং প্রত্যেক বার কাপড় ভাল করে নিংড়ানো। তৃতীয়বার খুব জোরে নিংড়াতে হবে। ভালমত না নিংড়ালে কাপড় পাক হবেনা।

* কাপড় বা শরীরে গাঢ় কিংবা তরল নাজাছাত লাগলে ধোয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পাক করা যায় না। পানির দ্বারা ধুয়ে যেরূপ পাক করা যায়, তদ্রূপ পানির ন্যায় তরল এবং পাক (যেমন গোলাপ জল, রস, সিরকা প্রভৃতি) জিনিস দ্বারাও ধুয়ে পাক করা যায়। কিন্তু যেসব জিনিস তৈলাক্ত তা দ্বারা ধুলে পাক হবে না যেমন দুধ, ঘি, তেল ইত্যাদি।

* ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়া হলে মেশিন যেহেতু নিয়ম মত কাপড় নিংড়াতে পারে না এবং নাপাক কাপড়ের সাথে থাকা পাক কাপড় একত্রে ভিজানোর কারণে পাক কাপড়ও নাপাক হয়ে যায়, অতএব মেশিনে কাপড় ধোয়ার পূর্বে নাপাক কাপড়গুলো আগে পৃথকভাবে নিয়ম মত ধুয়ে পাক করে নিতে হবে। কিংবা পরে সব কাপড়গুলিকে পৃথকভাবে নিয়ম মত ধুয়ে পাক করে নিতে হবে।

* ধোপাগণ সাধারণতঃ অনেক কাপড় একসাথে ভিজিয়ে রাখে। এর মধ্যে কোন কাপড় নাপাক থাকলে পাক কাপড়গুলিও নাপাক হয়ে যাবে, তখন সবগুলিকে নিয়ম মত ধুয়ে পাক করা প্রয়োজন। ধোপাগণ সেরূপ করেন কি না তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তাই লন্ড্রির মাধ্যমে কাপড় ধোলাই করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তবে একান্তই কেউ পাক কাপড় দিলে তা নাপাক হয়েছে ধরা হবে না। পক্ষান্তরে নাপাক কাপড় দিলে তা পাকও ধরা হবে না। ড্রাই ওয়াশ-এর হুকুমও অনুরূপ।[১]

১. احسن الفتاوى ج/٢ ।

* দুই পাল্লাবিশিষ্ট কাপড়ের এক পাল্লা বা তুলা ভরা কাপড়ের এক দিক যদি নাপাক এবং অন্য পাল্লা বা অন্য দিক পাক হয়, এমতাবস্থায় উভয় পাল্লা যদি একত্রে সেলাই করা হয় তাহলে পাক পাল্লার উপর নামায পড়া দুরস্ত হবে না। সেলাই করা না হলে নাপাক পাল্লা নীচে রেখে পাক পাল্লার উপর নামায পড়া দুরস্ত হবে; তবে শর্ত এই যে, পাক পাল্লা এত মোটা হওয়া চাই যাতে পাক পাল্লার উপর থেকে নাপাকীর রং দেখা না যায় এবং গন্ধও টের না পাওয়া যায়।

* বিছানার এক কোণ নাপাক এবং বাকী অংশ পাক হলে পাক অংশে নামায পড়া দুরস্ত আছে।

* না ধুয়ে কাফেরদের কাপড়ে বা বিছানায় নামায পড়া মাকরূহ।

* তুলার গদি, তোষক, সোফা অথবা লেপে যদি মল-মূত্র বা অন্য কোন প্রকার নাজাছাত লাগে, তাহলে পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। যদি নিংড়ানো কঠিন হয়, তাহলে ভাল করে তিনবার পানি প্রবাহিত করতে হবে। প্রতিবার পানি প্রবাহিত করার পর এমনভাবে রেখে দিবে যেন সমস্ত পানি ঝরে যায়, তারপর আবার পানি প্রবাহিত করবে। এভাবে তিনবার করলেই পাক হয়ে যাবে— তুলা, ফোম ইত্যাদি বের করে ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

আসবাব/দ্রব্য পাক করার নিয়ম

* যদি এমন জিনিসে নাজাছাত (নাপাকী) লাগে যা নিংড়ানো যায় না, যেমন থালা-বাসন, কলস, খাট, মাদুর, জুতা ইত্যাদি, তাহলে তা পাক করার নিয়ম হল একবার তা ধুয়ে এমনভাবে রেখে দিবে যেন সমস্ত পানি ঝরে যায় এবং পানির ফোঁটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়, তারপর অনুরূপ আর একবার করবে, এভাবে তিনবার ধৌত করলে ঐ জিনিস পাক হয়ে যাবে।

* জুতা বা চামড়ার মোজায় গাঢ় বীর্য, রক্ত, পায়খানা, গোবর ইত্যাদি গাঢ় নাজাছাত লাগলে তা যদি মাটিতে খুব ভালমত ঘষে বা শুকনা হলে নখ বা ছুরি/চাকু দিয়ে খুঁটে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ফেলা যায় এবং বিন্দুমাত্র নাজাছাত না থাকে তাহলেও তা পাক হয়ে যাবে— না ধৌত করলেও চলবে। কিন্তু পেশাবের ন্যায় তরল নাজাছাত লাগলে পূর্বোক্ত নিয়মে ধোয়া ব্যতীত পাক হবেনা।

* আয়না, ছুরি, চাকু, স্বর্ণ-রূপার অলংকার, থালা-বাসন, বদনা, কলস ইত্যাদি নাপাক হলে ভালমত ঘষে বা মাটি দ্বারা মেজে ফেললেও পাক হয়ে

যায়। কিন্তু এই তৃতীয় জিনিস নকশীদার হলে উপরোক্ত নিয়মে পানি দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত পাক হবে না।

* নাপাক ছুরি, চাকু বা হাড়ি-পাতিল জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে পোড়ালেও পাক হয়ে যায়।

* কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা নাপাক হয়ে যায়। তিনবার ধৌত করলেও তা পাক হয়ে যায়, কিন্তু সাত বার ধোয়া উত্তম। আর একবার মাটি দ্বারা মেজে ফেললে আরও বেশী উত্তম।

যমীন পাক করার নিয়ম

* যমীন/মাটিতে কোন নাজাছাত লাগলে তিন বার পানি প্রবাহিত করে দিলে তা পাক হয়ে যাবে।

* যমীন/ মাটির উপর কোন নাজাছাত লেগে যদি এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে, নাজাছাতের কোন চিহ্ন না থাকে, তবুও তা পাক হয়ে যায়— তার উপর নামায পড়া দুরস্ত আছে। তবে ঐ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা দোরস্ত নয়।

* ইট, সিমেন্ট বা পাথর প্রভৃতি দ্বারা পাকা করা স্থানও যমীনের হুকুমে, তবে শুধু খালি ইট বিছানো থাকলে তা পূর্বের নিয়মে ধোয়া ব্যতীত পাক হবেনা।

* যমীনের সঙ্গে যে ঘাস লাগা আছে তাও যমীনেরই মত অর্থাৎ, শুধু শুকালে এবং নাজাছাতের চিহ্ন চলে গেলে পাক হয়ে যাবে এবং তার উপর নামায পড়া দুরস্ত হবে। কিন্তু কাটা ঘাস ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না।

খাদ্যদ্রব্য পাক করার নিয়ম

মধু, চিনি, মিছরি, শিরা, তেল, ঘি, ডালডা ইত্যাদি নাপাক হলে তা পাক করার দুইটি নিয়ম :

১. যে পরিমাণ তেল, শিরা ইত্যাদি, সেই পরিমাণ পানি তাতে মিশ্রিত করে আগুনে জ্বাল দিবে। যখন সমস্ত পানি উড়ে যাবে তখন আবার ঐ পরিমাণ পানি মিশ্রিত করে জ্বাল দিবে, এভাবে তিনবার করলে পাক হয়ে যাবে।

২. তেল, ঘি ইত্যাদির সঙ্গে সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করে তাতে নাড়াচাড়া দিলে তেলটা উপরে উঠে আসবে; তারপর আস্তে আস্তে কোন উপায়ে উপর থেকে তেলটা তুলে নিয়ে আবার সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করে আবার অনুরূপভাবে তেলটা তুলে নিবে। এভাবে তিনবার করলে পাক হয়ে

হবে। যদি ঘি, ডালডা, তেল জমাট হয় তাহলে তাতে পানি মিশ্রিত করে রৌদ্র বা আগুনের আঁচের উপর রাখবে। এভাবে গলে তেল, ঘি ইত্যাদি উপরে ভেসে উঠলে তারপর উপরোক্ত নিয়মে তিনবার তুলে নিলে পাক হয়ে যাবে।

* দুধ বা তরকারী ইত্যাদি তরল জিনিসে বিড়াল মুখ দিলে দেখতে হবে যদি বিড়াল সদ্য ইঁদুর ধরে এসে তৎক্ষণাৎ সেই খাদ্য খাবারে মুখ দিয়ে থাকে, তবে তা নাপাক হয়ে যাবে। তা খাওয়া জায়েয হবে না। আর যদি কিছুক্ষণ দেরী করে নিজের মুখ চেটে-চুষে পরিষ্কার করে তারপর মুখ দিয়ে থাকে, তাহলে নাপাক হবে না—এমতাবস্থায় যদি মালিক অবস্থাপন্ন হয়, তাহলে তা খাবে না, খাওয়া মাকরূহ হবে। যদি গরীব হয়, তবে তার জন্য তা খাওয়া মাকরূহ নয়।

* যে সব প্রাণীর ঝুটা হারাম বা মাকরূহ, তারা যদি রুটি, পাউরুটি, ভাত ইত্যাদি শক্ত খাবারে মুখ দেয় বা খায়, তাহলে মুখ দেয়ার স্থান থেকে কিছুটা ফেলে দিয়ে অবশিষ্ট অংশ খাওয়া যায়।

পেশাব/পায়খানার মাসায়েল

* পেশাব বা পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে মাথা ঢেকে নেয়া মোস্তাহাব।

* শাড়ি, উড়না বা কোন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকার সময় বিসমিল্লাহ বলে নিবে।

* জুতা/স্যান্ডেল পরিধানপূর্বক পেশাব বা পায়খানা করা।

* বিসমিল্লাহসহ পেশাব বা পায়খানায় প্রবেশের দুআ পড়া। খোলা স্থান হলে কাপড় উঁচু করার সময় দুআ পড়তে হয়। আর মনে না থাকলে প্রবেশের পর বা কাপড় উঠানোর পর মনে মনে দুআ পড়া যায়, মুখে উচ্চারণ করে নয়। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের নাম, ফেরেশ্তার নাম বা কুরআনের কিছু লিখিত বস্তু নিয়ে পেশাব বা পায়খানায় যাওয়া মাকরূহ। পেশাব বা পায়খানার মধ্যে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের নাম, ফেরেশ্তার নাম উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ।

* বিসমিল্লাহসহ পেশাব বা পায়খানায় প্রবেশের দুআটি এই-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ۔(ترمذی)

অর্থ : হে আল্লাহ! দুষ্ট পুরুষ জ্বিন এবং দুষ্ট মহিলা জ্বিনদের অত্যাচার থেকে তোমার পানাহ চাই।

* প্রথমে বাম পা দিয়ে এস্তেনজায় প্রবেশ করা।

* বসার সময় পা দানিতে প্রথমে ডান পা রাখবে এবং নামার সময় প্রথম বাম পা নামাবে।[১]

* প্রয়োজনের অতিরিক্ত সতর না খোলা। (এর সহজ উপায় হল— বসতে বসতে কাপড় উঠানো। দাঁড়ানো অবস্থাতেই সতর খোলা নিষিদ্ধ)

* বসে পেশাব বা পায়খানা করা।

* বাম পায়ে ভর করে বসাই আদব।[২]

* উভয় পায়ের মাঝে বেশ ফাঁক রেখে বসা আদব।[৩]

* কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে না বসা। এমনিভাবে সূর্যের দিকে মুখ করে, বায়ুর বিপরীতে, চলার পথে, কবরস্থানে, ছায়াদার বা ফলদার গাছের নীচে, প্রবাহিত নদী নালায়, বদ্ধ পানিতে, বা মানুষ বসতে পারে এমন ঘাসের উপর ইস্তেনজা না করা।

* নজরকে সংযত রাখা অর্থাৎ যৌনাঙ্গের দিকে, মল-মূত্রের দিকে, এমনিভাবে আকাশের দিকে নজর না দেয়া এবং এদিক সেদিক বেশী না তাকানো।

* মল-মূত্রের উপর থুতু, কফ, শিকনি না ফেলা।[৪]

* ডান হাত দিয়ে যৌনাঙ্গ স্পর্শ না করা।

* ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা।

* বাম হাত দিয়ে ঢিলা/কুলুখ ব্যবহার করবে।

* পায়খানার পর তিন বার ঢিলা/কুলুখ ব্যবহার করা মোস্তাহাব। মহিলাদের জন্য পেশাবের পর ঢিলা/কুলুখ নিয়ে হাঁটা চলা করা কিংবা কাশি দিয়ে বা নড়াচড়া করে পেশাবের কাতরা বন্ধ হয়েছে এরূপ নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ নিয়ম পুরুষদের জন্য।

* প্রথম ঢিলা/কুলুখ সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে, দ্বিতীয়টি পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে, তৃতীয়টা সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে— এ নিয়মে ঢিলা/কুলুখ ব্যবহার করা অধিক পবিত্রতার অনুকূল।

* পানি ব্যবহারের পূর্বে বাম হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করা। এক হাদীছের বর্ণনার ভিত্তিতে এ স্থলে উভয় হাত ধৌত করার একটি মতও পাওয়া যায়।[৫]

---

১. তোহফায়ে আবরার। ২. نور الایضاح। ৩. طحطاوی। ৪. شرح الاسلام। ৫. مراقی الفلاح।

* তারপর পানি দ্বারা ইস্তেনজার স্থান ধৌত করা সুন্নাত। নাপাকী এক দেরহামের (হাতের তালুর নীচ স্থান সমপরিমাণ বিস্তৃত) বেশী পরিমাণ স্থান ছড়িয়ে পড়লে পানি দ্বারা এস্তেনজা করা ওয়াজিব।

* পানি ব্যবহার করার সময় প্রথমে বাম হাতের মধ্যমা ও অনামিকা আঙ্গুল-এর পেট দ্বারা মর্দন করা নিয়ম। তারপর প্রয়োজনে আরও দুই এক আঙ্গুল ব্যবহার করা।[১]

* রোযা অবস্থায় না হলে পেছনের রাস্তা খুব ঢিলা করে বসে পানি ব্যবহার করা।[২]

* দুর্গন্ধ সম্পূর্ণ দূর না হওয়া পর্যন্ত পরিষ্কার করতে থাকবে।

* প্রথমে পেছনের রাস্তা তারপর সামনের রাস্তা ধৌত করা।[৩] দুই রাস্তার মধ্যখানের স্থানটুকুও মধ্যমা বা কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা মর্দন করে ধৌত করা।[৪]

* শৌচ কার্যের পর মাটি বা সাবান ইত্যাদি দ্বারা পুনরায় হাত পরিষ্কার করে নেয়া উত্তম।

* রোযা অবস্থায় হলে সতর্কতার জন্য উঠার পূর্বে কাপড় (বা এ জাতীয় কিছু) ব্যবহার করে কিংবা বাম হাত দ্বারা বার বার ঘষে পেছনের রাস্তার পানি মুছে ফেলা উচিৎ। আর যাদের রোগের কারণে মলদ্বার বের হয়ে যায় তাদের জন্য জরুরী। রোযাদার না হলেও এরূপ করা মোস্তাহাব।[৫]

* যথা সম্ভব দ্রুত এস্তেনজা সেরে বের হয়ে আসা।[৬]

* বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা বের করা সুন্নাত।

* বের হয়ে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে—

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنِّىَ الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

অথবা শুধু غُفْرَانَكَ

অর্থ : তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ আমার থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে শান্তি দান করেছেন।

* বের হয়ে প্রথমে বা পায়ের জুতা/স্যান্ডেল খোলা সুন্নাত।

---

১. محيط ونور الايضاح ॥ ২. نور الايضاح ॥ ৩. مراقي الفلاح ॥ ৪. مفتاح الجنان ॥ ৫. طحطاوي وشامي ॥
৬. مراقي الفلاح

উযূ, গোসল, মেসওয়াক ও তায়াম্মুম

উযূ করার তরীকা

(ধারাবাহিকভাবে উযূর মধ্যে যা যা করতে হয়, তার বর্ণনা প্রদান করা হল)

* ওয়াক্ত আসার পূর্বেই উযূর সামান প্রস্তুত রাখা উত্তম।[১] মা'যূর নন এমন ব্যক্তির পক্ষে ওয়াক্ত আসার পূর্বে উযূ করে নেয়া উত্তম।

* উযূর পূর্বে পেশাব-পায়খানার হাজত থেকে ফারেগ হয়ে নেয়া উত্তম।

* উঁচু এবং পবিত্র স্থানে কেবলামুখী হয়ে বসে উযূ করা আদব।

* পানি ঢেলে নিতে হয় এমন হলে সে পানির পাত্রটি বাম দিকে রাখা আর পানি হাত দিয়ে তুলে নিতে হয় এমন পাত্র হলে ডান দিকে রাখা আদব।[২]

* নাপাকী দূর করার কিংবা পবিত্রতা অর্জন করার বা নামায জায়েয হওয়ার অথবা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করার নিয়ত করবে। নিয়ত করা সুন্নাত। নিয়ত মুখেও উচ্চারণ করা মোস্তাহাব।[৩] নিয়ত আরবীতে হওয়া উত্তম। আরবীতে হওয়া জরুরী নয়।

* নিয়ত আরবীতে এভাবে করা যায়।

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةٍ لِلصَّلَاةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللهِ تَعَالٰى۔

* উযূর শুরুতে اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ পড়বে।[৪] তারপর বিসমিল্লাহ পড়বে। বিসমিল্লাহ এভাবে পড়া উত্তম—[৫]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ۔

* তারপর বিসমিল্লাহসহ হাতের কবজি ধোয়ার দুআ পাঠ করবে। এটা মোস্তাহাব।[৬] বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلَكَةِ۔

---

১. مراقی الفلاح ॥ ২. طحطاوی ॥ ৩. احسن الفتاوی ج/২ ॥ ৪. مراقی الفلاح ॥ ৫. مراقی الفلاح ॥

৬. উল্লেখ্য যে, উযূর অঙ্গগুলো ধোয়া বা মাসেহ করার যে সব দুআ বর্ণিত হয়েছে তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এগুলো পড়াকে সুন্নাত মনে করা যাবে না। তবে এ দুআগুলোর অর্থ ভাল, এ হিসাবে বুযুর্গানে দ্বীন এগুলো পাঠ করেছেন এবং করেন। এ হিসেবে এগুলো পাঠ করাকে মোস্তাহাব বা উত্তম বলা হয়। ॥

* তারপর উভয় হাতের কবজি ধৌত করবে। তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। হাতের নখে নেল পলিশ থাকলে ভালভাবে তা তুলে নিতে হবে। নতুবা উযূ হবে না।

* মেসওয়াক করা সুন্নাত। মেসওয়াক উযূ শুরু করার পূর্বেও করা যায়। মেসওয়াক না থাকলে কিংবা মুখে ওজর থাকলে বা দাঁত না থাকলে আঙ্গুল দিয়ে হলেও ঘষে নেয়া।

* কবজি ধৌত করার পর বিসমিল্লাহসহ কুলি করার দুআ পাঠ করবে। এটা মোস্তাহাব। বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ۔

* দুআ পড়ার পর কুলি করবে। উযূতে কুলি করা সুন্নাত এবং তিনবার কুলি করা সুন্নাত। তিনবার কুলি করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে তিনবার পানি নেয়া উত্তম। কুলি করার সময় মুখে কোন কৃত্রিম দাঁত থাকলে তা খুলে নেয়া যেতে পারে তবে খুলে নেয়া জরুরী নয়।[১] ডান হাতে কুলির পানি নেয়া মোস্তাহাব। রোযাদার না হলে কুলি করার সময় গড়গড়া করা সুন্নাত।

* কুলি করার পর বিসমিল্লাহসহ নাকে পানি দেয়ার দুআ পাঠ করবে। এটা মোস্তাহাব। বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِيْ رَائِحَةَ النَّارِ۔

* দুআ পাঠ করার পর নাকে পানি দেয়া সুন্নাত। ডান হাত দিয়ে নাকে পানি দিবে এবং বাম হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলবে। এটাই আদব।[২] রোযাদার না হলে নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি টেনে নেয়া উত্তম। নাকের নথের ছিদ্র যদি বড় ও ঢিলা হয়, তাহলে নেড়ে-চেড়ে ধোয়া মোস্তাহাব। আর যদি ছিদ্র সংকীর্ণ হয়, তাহলে ভালভাবে নেড়ে-চেড়ে ভিতরে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব।[৩] ভালভাবে নেড়েচেড়ে ভিতরে পানি না পৌঁছালে উযূ সঠিক হবেনা। বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে নাকের মধ্যে পরিষ্কার করা আদব। এরূপ তিনবার নাকে পানি দেয়া এবং ঝেড়ে ফেলা সুন্নাত। তিনবারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে তিনবার পানি নেয়া উত্তম।

* নাকে পানি দেয়ার পর বিসমিল্লাহ সহ মুখমণ্ডল ধৌত করার দুআ পাঠ করবে। এটা মোস্তাহাব। বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়-

১. آپ کے مسائل اور ان کا حل ج/۲ ॥ ২. طحاوی ৩. বেহেশতী জেওর ॥

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ۔

* দুআ পড়ার পর মুখমণ্ডল ধৌত করবে। মুখমন্ডল ধৌত করা ফরয। কপালের উপরিভাগের চুলের গোড়া থেকে চিবুক (থুতনি) পর্যন্ত এবং দুই কানের লতি পর্যন্ত হল মুখমণ্ডলের সীমানা। এই পুরো স্থান ধৌত করতে হবে। লিপস্টিকের কারণে ঠোঁটের উপর একটা পাতলা আবরণ পড়ে যায় এ কারণে ঠোঁটে লিপস্টিক থাকলে তা ভালভাবে তুলে নিতে হবে। ডান হাতে পানি নিয়ে তার সাথে বাম হাত মিলিয়ে কপালের উপরিভাগ থেকে ধোয়া আরম্ভ করা আদব।[১] মুখে পানি আস্তে লাগাবে। জোরে পানি মারা মাকরূহ। এরূপ তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করা সুন্নাত। প্রতিবার পুরো মুখমণ্ডলে ভাল করে হাত বুলাবে।

* মুখমণ্ডল ধৌত করার পর বিসমিল্লাহসহ ডান হাত ধোয়ার দুআ পাঠ করবে। এটা মোস্তাহাব। বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا۔

* দুআ পড়ার পর ডান হাত কনুইসহ ধৌত করবে। এটা ফরয। আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে ধোয়া আরম্ভ করা সুন্নাত।[২] ধোয়ার সময় হাতের অগ্রভাগ নীচু করবে; যাতে করে ধোয়া পানি আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।[৩] এভাবে তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। প্রতিবার ধৌত করার সময় পুরো অঙ্গ ভালভাবে মর্দন করবে। হাতের আংটি, চুড়ি, বালা যদি এতটা ঢিলা হয় যে,[৪] নাড়া-চাড়া ছাড়াই তার নীচে পানি পৌঁছে যায়, তাহলে নাড়া-চাড়া করা মোস্তাহাব। আর যদি এমন হয় যে, নাড়া না দিলে নীচে পানি পৌঁছবে না, তাহলে ভাল করে নেড়ে-চেড়ে নীচে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। নাকের অলংকারের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

* তারপর উপরোক্ত নিয়মে বাম হাত ধৌত করবে। তবে বাম হাত ধৌত করার দুআটি (বিসমিল্লাহসহ) এই—

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ وَلَا مِنْ وَّرَاۤءِ ظَهْرِىْ۔

---

১. مراقى الفلاح ॥ ২. طحطاوى ॥ ৩. এখানে কনুইয়ের দিক থেকে ধোয়া আরম্ভ করার একটি মতও রয়েছে যেন আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে পানি গড়াতে পারে। তবে উপরোক্ত তরীকায় হাত ধোয়া হলে উভয় মতের উপর আমল হয়ে যায়। ॥ ৪. দুররে মুখতার, ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃঃ ॥

* বাম হাত তিনবার ধৌত করার পর উভয় হাতের আঙ্গুল খেলাল করবে। এটা সুন্নাত।[১] আঙ্গুল খেলাল করার তরীকা হল : এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুল সমূহের মধ্যে প্রবেশ করাবে কিংবা বাম হাতের আঙ্গুলগুলো এক সাথে ডান হাতের পিঠের দিক থেকে ডান হাতের আঙ্গুলগুলোতে প্রবেশ করাবে। এমনিভাবে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে বাম হাতের আঙ্গুল খেলাল করবে।

* উভয় হাত ধৌত করার পর বিসমিল্লাহসহ মাথা মাসেহ করার দুআ পাঠ করবে। এটা মোস্তাহাব। বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ۔

* দুআ পাঠ করার পর মাথা মাসেহ করবে। মাথা মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নাত।[২] পুরো মাথায় মাসেহ করা সুন্নাত। অন্ততঃ মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা ফরয। মাথায় মাসেহ করার তরীকা হল : দুই হাতের পুরো তালু আঙ্গুলের পেটসহ মাথার অগ্রভাগে রেখে পুরো মাথা জুড়ে পেছনের দিকে টেনে আনা।[৩] মাথার অগ্রভাগ থেকে মাসেহ শুরু করা সুন্নাত।[৪] উভয় হাত দ্বারা মাথা মাসেহ করা সুন্নাত। এক হাত দ্বারা মাসেহ করা সুন্নাতের খেলাফ।[৫]

* মাথা মাসেহ করার পর বিসমিল্লাহসহ কান মাসেহের দুআ পাঠ করবে। এটা মোস্তাহাব। বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ۔

* দুআ পাঠ করার পর কান মাসেহ করবে। কান মাসেহ করা (উভয় কান এক সাথে) সুন্নাত।[৬] উভয় হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের অগ্রভাগ কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে একটু নাড়াচাড়া দেয়া নিয়ম।[৭] তারপর তর্জনী (শাহাদাত আঙ্গুল)-এর অগ্রভাগ দ্বারা কানের ভিতরের দিক মাসেহ করবে। তারপর বৃদ্ধ আঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের পেছনের ভাগ মাসেহ করবে। কান মাসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নাত।[৮]

---

১. حاشیہ شرح وقایہ ॥ ২. کبیری ॥ ৩. মাসেহ করার এই তরীকাটি সহজ। মাসেহ করার অন্য একটি তরীকাও বর্ণিত আছে, তা হল— উভয় হাতের তিন আঙ্গুলের পেট (শাহাদাত ও বৃদ্ধা আঙ্গুল ব্যতীত) মাথার অগ্রভাগের উপরে রেখে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তারপর দুই হাতের তালু মাথার দুই পার্শ্বে রেখে পেছন দিক থেকে সামনে টেনে নিয়ে আসবে। ॥ ৪. شامی ج۱/ ৭. مراقی الفلاح ৭. طحطاوی ৬. فتاوی دار العلوم ج۱/ ৫. ॥ طحطاوی

* কান মাসেহ করার পর বিসমিল্লাহসহ গর্দান মাসেহের দুআ পাঠ করবে। এটা মোস্তাহাব। বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ۔

* দুআ পাঠ করার পর গর্দান মাসেহ করবে। গর্দান মাসেহ করা মোস্তাহাব। উভয় হাতের তিন আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা গর্দান মাসেহ করবে।[১]

* গর্দান মাসেহ করার পর বিসমিল্লাহসহ ডান পা ধোয়ার দুআ পাঠ করবে। এটা মোস্তাহাব। বিসমিল্লাহসহ দুআটি এভাবে পড়া যায়—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ۔

* দুআ পাঠ করার পর পা ধৌত করবে। পা ধৌত করা ফরয। পা ধৌত করার সময় প্রথমে পায়ের অগ্রভাগের দিক থেকে পানি ঢালা সুন্নাত। বাম হাত দিয়ে পা বিশেষভাবে পায়ের তলা মর্দন করা আদব। এভাবে তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। প্রতিবার পুরো অঙ্গ ভাল করে মর্দন করবে। পায়ের নখে নেল পালিশ থাকলে তা ভালভাবে তুলে নিতে হবে নতুবা উযূ হবে না। পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা সুন্নাত। বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা খেলাল করা আদব। ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে খেলাল আরম্ভ করা নিয়ম। কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে বৃদ্ধ আঙ্গুলের দিকে আসবে। খেলাল করার সময় পায়ের আঙ্গুলের নীচের দিক থেকে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে খেলাল করবে।[২]

* ডান পা ধোয়ার পর বিসমিল্লাহসহ বাম পা ধোয়ার দুআ পাঠ করবে। এটা মোস্তাহাব। বিসমিল্লাহসহ বাম পা ধোয়ার দুআটি এভাবে পড়া যায়—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَسَعْيِيْ مَشْكُوْرًا وَتِجَارَتِيْ لَنْ تَبُوْرَ۔

* দুআ পাঠ করার পর ডান পায়ের নিয়মে বাম পা ধৌত করবে। তবে বাম পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার সময় বৃদ্ধ আঙ্গুল থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের দিক খেলাল করা নিয়ম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উযূর মধ্যে প্রত্যেকটা অঙ্গের আমলের শুরুতে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া, বিসমিল্লাহ পড়া এবং শেষে দুরূদ শরীফ পড়া মোস্তাহাব। কোন কোন ফকীহ এর যে কোন একটি পড়লেও চলবে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

---

১. كبيرى ۱ ২. مراقى الفلاح ۱

* উযূর অঙ্গগুলো ধোয়ার সময় জোড়া ও ভাঁজগুলোতে বিশেষ যত্ন সহকারে পানি পৌঁছাতে হবে।

* উযূর মাঝে মাঝে নিম্নোক্ত দুআ পড়া সুন্নাত[১]—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ۔

* উযূর প্রয়োজনের চেয়ে পানি কম বা বেশী ব্যবহার করবে না।

* উযূর মধ্যে কোন দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা আদবের খেলাফ।

উযূ শেষ হওয়ার পর করণীয় কয়েকটি আমল

* রোযাদার না হলে উযূর অবশিষ্ট পানি বা তার কিয়দাংশ পান করা মোস্তাহাব। এ পানি পান করা অনেক রোগের শেফা। এ পানি কেবলামুখী হয়ে পান করা উত্তম। দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয়ভাবে পান করা যায়।[২]

* এ পানি পান করার দুআ[৩]—

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ بِشِفَائِكَ وَدَاوِنِىْ بِدَوَائِكَ وَاعْصِمْنِىْ مِنَ الْوَهْنِ وَالْاَمْرَاضِ وَالْاَوْجَاعِ۔

* উযূর শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া মোস্তাহাব[৪] এবং এটা দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে, আকাশের দিকে নজর করে পড়া মোস্তাহাব।

* তারপর (দাঁড়িয়ে, কেবলামুখী হয়ে এবং আকাশের দিকে নযর করে) নিম্নোক্ত দুআটি পড়া মোস্তাহাব—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ. وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ. وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের থাকবে না কোন ভয় এবং যারা হবে না দুঃখিত।

* নিম্নোক্ত দুআটি পড়াও উত্তম[৫] (দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে এবং আকাশের দিকে নজর দিয়ে)।

---

১. کتاب الاذکار للنووی ২. احسن الفتاوی ج/۱، طحطاوی ৩. طحطاوی ৪. مراقی الفلاح ৫. ایضا

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ۔

* সূরা ক্বদর পড়াও উত্তম। যে ব্যক্তি উযূর পর সূরা ক্বদর একবার পড়বে সে সিদ্দীকিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। দুইবার পড়লে তাকে শহীদের তালিকাভুক্ত করা হবে। আর তিনবার পড়লে নবীদের সঙ্গে তার হাশর হবে।[১]

* উযূর পর রুমাল, তোয়ালে, গামছা ইত্যাদি দ্বারা উযূর পানি অঙ্গ থেকে মুছে নেয়ায় ক্ষতি নেই। তবে খুব মর্দন করে নয় বরং উত্তম হল হালকাভাবে মুছে নেয়া।[২]

* উযূর পর মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল উযূ নামায পড়ে নেয়া উত্তম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৪৫ নং পৃষ্ঠা।

উযূ মাকরূহ হওয়ার কারণসমূহ

নিম্নলিখিত কার্যগুলো উযূতে করলে উযূ মাকরূহ হয় অর্থাৎ, করলে উযূ ভঙ্গ হয় না, ছওয়াবও হয় না।

১. তারতীব অনুযায়ী উযূ না করলে।
২. অপবিত্র স্থানে বসে উযূ করলে।
৩. অতিরিক্ত পানি ব্যয় করলে।
৪. উযূতে রত থাকা অবস্থায় জাগতিক কথা-বার্তা বললে। তবে কোন বিশেষ প্রয়োজনে দু-একটি কথা বললে কোন আপত্তি নেই।
৫. মুখ অথবা অন্য কোন অঙ্গে জোরে পানি মারলে।
৬. মুখে পানি দেয়ার সময় সুরসুর শব্দ বেরিয়ে আসলে।
৭. তিনবারের অধিক কোন অঙ্গ ধৌত করলে কিংবা অঙ্গগুলো একবার ধুয়ে ধুয়ে মুছে ফেললে। তবে কোন কারণবশতঃ এরূপ করলে কোন দোষ নেই। বিনা কারণে করা ঠিক নয়।
৮. ডান হাতে নাক পরিষ্কার করা।
৯. প্রথমে বাম হাত অথবা বাম পা ধৌত করা।

যে সব কারণে উযূ ভাঙ্গে না কোন কোন কারণে উযূ ভঙ্গ হয় না, তবে সাধারণতঃ উযূ ভঙ্গ হয় বলে খ্যাত। যেমন :

১. বসে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে উযূ ভঙ্গ হয় না।

---

١. مسند الفردوس للديلمی ٢. مراق الفلاح عن احسن الفتاوی ج/١

২. নামাযের মধ্যে মুচকি হাসি দিলে উযূ ভঙ্গ হয় না।
৩. উযূ করার পর স্ত্রীলোক তার সন্তানকে দুধ পান করালে অথবা স্তন থেকে দুধ নিংড়িয়ে ফেললেও উযূ ভঙ্গ হয় না।
৪. পুরুষের শরীর স্পর্শ করলে অথবা চুম্বন করলে উযূ ভঙ্গ হয় না।
৫. উযূ করার পর লজ্জাস্থানে হাত লাগালে উযূ নষ্ট হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা মাকরূহ।
৬. উযূ করার পর নখ কাটলে অথবা পায়ের চামড়া কাটলে অথবা উপড়ালে উযূ ভঙ্গ হয় না।
৭. বিড়ি-সিগারেট সেবন করলে উযূ ভঙ্গ হয় না।
৮. সতর খুললে উযূ ভঙ্গ হয় না। তবে যেখানে সতর খোলা জায়েয নেই সেখানে সতর খোলা গোনাহ সেটা স্বতন্ত্র কথা।
৯. কারও সতর দেখলে উযূ ভঙ্গ হয় না। তবে যার সতর দেখা যায় না তার সতর দেখলে গোনাহ হবে সেটা স্বতন্ত্র কথা।
১০. টেলিভিশন দেখলে উযূ ভঙ্গ হয় না, তবে টেলিভিশন দেখা বা কোন গোনাহ করার পর উযূ করে নেয়া মোস্তাহাব।[১]

উযূ ভাঙ্গার কারণসমূহ

১. প্রস্রাব-পায়খানা করা।
২. পিছনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বেরিয়ে আসা।
৩. প্রস্রাব-পায়খানা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু যেমন কেঁচো, ক্রিমি, পাথরকণা ইত্যাদি অথবা এগুলো ছাড়াও যদি অন্য কোন বস্তু পেশাব অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত হয়, তখন উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।
৪. শরীরের অন্য কোন স্থান থেকে রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি বেরিয়ে গড়িয়ে গেলে।
৫. বমি ছাড়াও রক্ত, পিত্ত, খাদ্য অথবা পানি মুখ ভরে নির্গত হলে উযূ ভঙ্গ হবে। এসমস্ত বস্তু অল্প অল্প করে কয়েক বার নির্গত হলেও উযূ ভঙ্গ হবে যদি সব বারেরটা একত্রে হলে মুখ ভরা পরিমাণ হত বলে মনে হয়।
৬. থুতুতে রক্তের পরিমাণ বেশী হলে কিংবা উযূ করার সময় দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বেরিয়ে আসলে উযূ ভঙ্গ হবে। রক্তের পরিমাণ অল্প হলে কোন ক্ষতি নেই তবে রক্ত অধিক পরিমাণে হলে অর্থাৎ, থুতু থেকে রক্তের পরিমাণ বেশী হলে রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত উযূ করতে পারবে না।

---

১. آپ کے مسائل اور انکا حل ج/۲ ۱

৭. বীর্য, মযী অথবা হায়েযের রক্ত দেখা দিলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, বীর্য ও মযীতে পার্থক্য আছে। যৌনসম্ভোগের সময় তৃপ্তি হওয়ার প্রাক্কালে অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে যা নির্গত হয় তা হলো বীর্য বা মনী। আর যৌন উত্তেজনার মুহূর্তে অথবা কোন খারাপ ধারণার বশবর্তী হলে যৌনাঙ্গ থেকে পানির মত যে বস্তু বেরিয়ে আসে, তা হল মযী। বীর্য বের হলে শুধু উযূ ভঙ্গই হয় না, তাতে গোসল করা আবশ্যক হয়। কিন্তু মযী বের হলে গোসল করা আবশ্যক হয় না তবে উযূ ভেঙ্গে যায়।

৮. স্ত্রীলোকের স্তন থেকে বুকের দুধ ব্যতীত অন্য বস্তু বেরিয়ে আসলে এবং ব্যথা হলে উযূ ভঙ্গ হবে।

৯. যোনির মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করালে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।

১০. বেহুঁশ বা পাগল হলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।

১১. নামাযের মধ্যে এরকম শব্দ সহকারে হাসা যে, পার্শ্বের লোক সে শব্দ শুনতে পায়, এতেও উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।

১২. নামাযের সাজদায় তন্দ্রাভূত হয়ে পড়লে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।

মা'যূর ব্যক্তির উযূর বয়ান

* যার নাক বা অন্য কোন যখম থেকে অনবরত রক্ত বইতে থাকে বা অনর্গল পেশাবের ফোঁটা আসতে থাকে, এমনকি নামাযের সম্পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সময়ও বিরতি হয় না, যার মধ্যে সে শুধু উযূর ফরয অঙ্গগুলো ধুয়ে সংক্ষেপে ফরয নামায আদায় করতে পারে, এরূপ ব্যক্তিকে মা'যূর বলে।

* মা'যূর ব্যক্তিকে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে নতুন উযূ করতে হবে। যে পর্যন্ত ঐ ওয়াক্ত থাকবে সে পর্যন্ত তার উযূ থাকবে অর্থাৎ, ঐ ওজরের কারণে উযূ যাবে না। তবে ঐ কারণ ছাড়া উযূ ভঙ্গের অন্য কোন কারণ ঘটলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

* মা'যূর ব্যক্তি যে কারণে মা'যূর হয়েছে সে কারণ বন্ধ থাকার সময় উযূ ভঙ্গের অন্য কোন কারণ ঘটায় যদি উযূ করে, তারপর মা'যূর যে কারণে হয়েছে সে কারণ ঘটে, তাহলেও উযূ চলে যাবে। অবশ্য মা'যূর যে কারণে হয়েছে সে কারণে যে উযূ করবে সেই উযূ ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত থাকবে, যদি উযূ ভঙ্গের অন্য কোন কারণ না পাওয়া যায়।

* যদি এই রক্ত ইত্যাদি (অর্থাৎ, যে কারণে মা'যূর হয়েছে) কাপড়ে লাগে এবং এরূপ মনে হয় যে, নামায শেষ হওয়ার পূর্বে আবার লেগে যাবে,

তাহলে ঐ রক্ত ধোয়া ওয়াজিব নয়। অন্যথায় ধুয়ে নিয়ে পাক কাপড়েই নামায পড়তে হবে। তবে রক্ত এক দেরহাম পরিমাণের কম হলে তা না ধুয়েও নামায হয়ে যাবে। হাতের তালু সম্পূর্ণ খুলে তাতে পানি রাখলে যে পরিমাণ স্থানে পানি থাকে তাকে এক দেরহাম-এর পরিমাণ বলা হয়।

(বেহেশতী জেওর)

* মা'যূর বলে গণ্য হওয়ার জন্য শর্ত হল নামাযের যে কোন পূর্ণ এক ওয়াক্তের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন অতিবাহিত হওয়া, যার মধ্যে সে ওজর থেকে এতটুকু বিরতি পায় না যাতে উযূর ফরযগুলো আদায় করে ফরয নামায পড়ে নিতে পারে। এরপর প্রতি ওয়াক্তে সারাক্ষণ সেই ওজর থাকা জরুরী নয় বরং ওয়াক্তের মধ্যে এক বারও যদি সে ওজর পাওয়া যায় তবুও সে মাযূর বলে গণ্য থাকবে। অবশ্য যদি এমন একটা ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়, যার মধ্যে একবারও সে ওজর দেখা যায়নি, তাহলে সে আর মা'যূর থাকল না।

মেসওয়াকের মাসায়েল ও দুআ

* মেসওয়াক পীলু বা যয়তুনের ডালের হওয়া উত্তম।
* মেসওয়াক কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মত মোটা হওয়া উত্তম।
* মেসওয়াক প্রথমে এক বিঘত পরিমাণ লম্বা হওয়া উত্তম।
* মেসওয়াক নরম হওয়া মোনাসেব।
* মেসওয়াক কম গিরা সম্পন্ন হওয়া উত্তম।
* মেসওয়াকের ডাল কাঁচা হওয়া উত্তম।
* মেসওয়াক ডান হাতে ধরা মোস্তাহাব।
* মেসওয়াক ধরার তরীকা হল : কনিষ্ঠ আঙ্গুল মেসওয়াকের নীচে, বৃদ্ধা আঙ্গুলের অগ্রভাব মেসওয়াকের উপরের দিকে নীচে এবং অবশিষ্ট আঙ্গুলগুলো (মধ্যের তিন আঙ্গুল) মেসওয়াকের উপরে রাখবে।
* বিসমিল্লাহ বলে মেসওয়াক শুরু করবে।
* মেসওয়াক শুরু করার সময় দুআ পড়া মোস্তাহাব। দুআটি এই-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِوَاكِيْ هٰذَا مَحِيْصًا لِذُنُوْبِيْ وَمَرْضَاةً لَكَ وَبَيِّضْ بِهٖ وَجْهِيْ كَمَا بَيَّضْتَ اَسْنَانِيْ

অর্থ : হে আল্লাহ! এই মেসওয়াক করা.ক আমার পাপ মোচনকারী ও তোমার রেযামন্দীর ওছীলা বানাও, আর তামার দাঁতগুলিকে যেমনি তুমি উজ্জ্বল করেছ, তেমনি আমার চেহারাকেও উজ্জ্বল কর।

* মেসওয়াক শুরু করার পূর্বে মেসওয়াক ভিজিয়ে নেয়া উত্তম।

* মেসওয়াক করার সময় প্রথমে উপরের দাঁতের ডান দিক অতঃপর বাম দিক, তারপর নীচের দাঁতের ডান দিকে অতঃপর বাম দিকে, তারপর দাঁতের ভিতরের দিকে অনুরূপভাবে ঘষতে হবে।[১] এভাবে তিনবার ঘষা উত্তম। প্রতিবারেই নতুন পানি দিয়ে মেসওয়াক ধুয়ে নেয়া মোস্তাহাব।[২]

* মেসওয়াক দাঁতের অগ্রভাগে, উপর ও নীচের তালুর অগ্রভাগে এবং জিহ্বার উপরিভাগেও করা উত্তম।

* মেসওয়াক দাঁতের উপর চওড়াভাবে ঘষা নিয়ম। ইমাম গাযালী (রহ.) উপর-নীচভাবে ঘষার কথাও বলেছেন। কমপক্ষে চওড়াভাবে ঘষতে হবে।[৩]

* শোয়া অবস্থায় মেসওয়াক করা মাকরূহ।

* মেসওয়াক করার পর মেসওয়াক ধুয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবে।[৪]

* মেসওয়াক না থাকলে মেসওয়াকের বিকল্প হিসেবে ব্রাশ ব্যবহার করা যায়। এতে মেসওয়াকের ডাল বিষয়ক সুন্নাত আদায় না হলেও মাজা ও পরিষ্কার করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।[৫] অন্যথায় হাত দিয়ে বা মোটা কাপড় দিয়ে দাঁত মেজে নিতে হবে। হাত দিয়ে মাজার তরীকা হল : ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে ডান পাশের দাঁতের উপরে অতঃপর নীচে, তারপর শাহাদাত (তর্জনী) আঙ্গুল দিয়ে বাম পাশের দাঁতের উপরে অতঃপর নীচে ঘষতে হবে।[৬]

গোসলে যা যা করতে হয়

(গোসলের যাবতীয় আমল ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হল)

* গোসলখানা নোংরা থাকলে কিংবা গোসলখানার মধ্যে পায়খানা থাকলে বাম পা দিয়ে গোসলখানায় প্রবেশ করবে। আর তার মধ্যে পায়খানা না থাকলে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে যে কোন পা দিয়ে প্রবেশ করা যায়।

* গোসলের জন্য কাপড় খোলার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে—

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔(عمل اليوم و الليلة)

* তবে গোসলখানা নোংরা থাকলে বা গোসলখানার মধ্যে পায়খানা থাকলে এ দুআটি বাইরে থেকেই কাপড় খোলার সময় পড়বে।[৭]

---

১. رد المحتار ج/١ । ২. شامی ج/١ । ৩. مفتاح الجنان نقلا عن احیاء علوم الدین । ৪. الدر المختار । ৫. درس ترمذی । ৬. احسن الفتاوی ج/١ । ৭. احسن الفتاوی/٢ ।

* গোসলের নিয়ত করা সুন্নাত।[১]

* নিয়ত আরবীতে এভাবে করা যায়—

نَوَيْتُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ.

অর্থ : আমি জানাবাত থেকে পবিত্রতা হাছেল করার জন্য গোসলের নিয়ত করছি।

* বসে গোসল করা উত্তম।[২]

* আড়াল স্থানে এবং সতর ঢেকে গোসল করা মোস্তাহাব। আড়াল স্থান হলে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয তবে মোস্তাহাবের খেলাফ।

* কেবলামুখী হয়ে গোসল না করা উত্তম।

* গোসলের শুরুতে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত।

* তারপর পেশাব-পায়খানার রাস্তা (তাতে নাপাকী না থাকলেও) ধৌত করা সুন্নাত।

* তারপর শরীরের কোন স্থানে নাপাকী থাকলে তা ধৌত করা সুন্নাত।

* তারপর নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করবে। এই উযূর মধ্যে উযূর অঙ্গসমূহের দুআ পাঠ করাটা বিতর্কিত, তবে গোসলখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে এবং তার মধ্যে পায়খানা না থাকলে দুআগুলো পাঠ করা যায়।[৩]

গোসলের ফরযসমূহ

১. কুলি করা ফরয। রোযাদার না হলে গড়গড়া করা সুন্নাত এবং তিনবার এরূপ গড়গড়াসহ কুলি করা সুন্নাত। দাঁতের মধ্যে খাদ্যকণা আটকে থাকলে তা অপসারণ করবে। কৃত্রিম দাঁত থাকলে তা অপসারণ করে নেয়া জরুরী নয়।

২. নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ফরয। নাকের মধ্যে শুকনো ময়লা থাকলে তা-ও দূরীভূত করবে। তিনবার এরূপ পানি পৌঁছানো সুন্নাত। এভাবে নাকে পানি পৌঁছানোর তরীকা হল নাকের মধ্যে পানি দিয়ে হালকাভাবে একটু টেনে নিবে। খুব জোরে টানবেনা তাহলে পানি মস্তকে উঠে যাবে।

৩. সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো ফরয। নাকের ও কানের ছিদ্রে অলংকার না থাকলে তার মধ্যেও পানি পৌঁছাতে হবে। অলংকার থাকলে নাড়াচাড়া দিয়ে

---

১. رد المحتار । ২. احسن الفتاوى/٢ । ৩. الفقه على المذاهب الاربعة/٢، احسن الفتاوى/٢ ।

ছিদ্রের ভিতরে পানি প্রবেশ করাবে। চুলের বেণী ও খোপা খুলে সমস্ত চুল ভিজাতে হবে। শুধু চুলের গোড়ায় পানি পৌছালে ফরয গোসল আদায় হবে না। ঠোঁটে লিপস্টিকের কারণে কোন আবরণ পড়ে থাকলে তা-ও ভালভাবে তুলে নিতে হবে।

* গোসলের স্থানে পানি জমা হয় এমন স্থানে গোসল করলে গোসলের পরে অন্যত্র সরে গিয়ে পা ধোয়া সুন্নাত।

* সমস্ত শরীরে পানি পৌছানোর সুন্নাত তরীকা হল— প্রথমে ভিজা হাত দ্বারা সমস্ত শরীর ভিজিয়ে নিবে। তারপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে। তারপর তিনবার ডান কাঁধে পানি ঢালবে। তারপর বাম কাঁধে তিনবার পানি ঢালবে। প্রতিবার পানি ঢেলে ভাল করে শরীর মর্দন করে পরিষ্কার করা সুন্নাত।

* গোসলের পর পানি মুছে ফেলার কিছু থাকলে তা দিয়ে শরীর মুছে ফেলবে।

* তারপর যথাসম্ভব দ্রুত কাপড় দ্বারা শরীর আবৃত করবে।

* গোসলখানা থেকে বের হওয়ার সময় যদি বাম পা দিয়ে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে ডান পা দিয়ে বের হবে।

* বের হওয়ার পর উযূর শেষে যে সব দুআ পড়া মোস্তাহাব এখানেও সেগুলো পড়বে।

* গোসলের পর মনে হল যে, কোন অঙ্গ ধোয়া হয়নি বা কোথাও শুকনো রয়ে গেছে, তাহলে শুধু সেটা ধুয়ে নিলেই চলবে, পুরো গোসল দোহরানোর প্রয়োজন নেই।

যে সব কারণে গোসল ফরয হয়

১. যৌনসম্ভোগ দ্বারা অথবা অন্য কোন কারণে জোশের সাথে মনী (বীর্য) বের হলে।

২. স্বপ্ন দেখুক বা না দেখুক রাতে অথবা দিনে ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হলে। তবে শয়নের কাপড়ে বা শরীরে মনীর চিহ্ন না দেখা গেলে গোসল ফরয হয় না।

৩. স্বামীর লিঙ্গের শুধু অগ্রভাগ অর্থাৎ, খৎনার স্থানটুকু স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে প্রবেশ করলে গোসল ফরয হয়, যদিও কিছু বের না হয়। যেমন সামনের রাস্তায় এই হুকুম, তদ্রূপ মহাপাপ হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ পেছনের রাস্তায় প্রবেশ করায় তবুও গোসল ফরয হবে।

৪. কোন মেয়েলোক যদি যৌন আবেগবশতঃ নিজের যৌনাঙ্গে আঙ্গুল প্রবেশ করায়, বা স্বামী যৌনাবেগবশতঃ আঙ্গুল প্রবেশ করায় তাহলে স্ত্রীর বীর্যপাত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় গোসল ফরয হবে। এটাই গ্রহণযোগ্য ফতওয়া। তবে কোন নারী যদি যৌন আবেগবশতঃ ছাড়া অন্য কোন কারণে যৌনাঙ্গে আঙ্গুল প্রবেশ করায় বা কোন মহিলা ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আঙ্গুল প্রবেশ করায় আর মহিলার তাতে যৌন উত্তেজনাবশতঃ বীর্যপাত না হয়, তাহলে তাতে গোসল ফরয হয় না।[১]

৫. যখন হায়েয শেষ হয়, তখন গোসল ফরয হয়।

৬. নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হলে পাক হওয়ার জন্য গোসল ফরয হয়।

* নাবালিকা মেয়ের সাথে সহবাস করলে তার ওপর গোসল ওয়াজিব হয়না বটে। তবুও অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাকে গোসল করতে বলবে এটা জরুরী।[২]

* ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখল, স্বামীর পাশে শুয়ে আছে। সহবাস হচ্ছে। স্বাদও অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু জেগে দেখল, মনী নেই, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না।[৩] মনী পাওয়া গেলে গোসল ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ কাপড়ের উপর ভেজা ভেজা লাগছে, কিন্তু সেটাকে মনী মনে হয় না, বড় জোর মযী বলা যায়, এমতাবস্থায় গোসল করা ওয়াজিব।

* সামান্য মনী বের হওয়ার পর গোসল করে ফেলেছে, গোসল সমাপ্ত হওয়ার পর আবার মনী বের হল, তাহলে পুনরায় গোসল করা ওয়াজিব। হ্যাঁ, যদি স্ত্রীর যোনি থেকে স্বামীর মনী বের হয়, তাহলে আর নতুন করে গোসল করার দরকার নেই।[৪]

* স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একই বিছানায় শুয়ে আছে। জাগ্রত হওয়ার পর বিছানায় মনী দেখা গেল। কিন্তু কারোরই কোন স্বপ্ন দেখার কথা মনে পড়ছে না, তাহলে সাবধানতাবশতঃ উভয়েই গোসল করে নিবে। কারণ, মনী কার সেটা জানা নেই।[৫]

* গোসল ওয়াজিব হওয়ার পর যদি গোসলের পূর্বেই কিছু খেতে চায়, তাহলে হাত-মুখ ধুয়ে কুলি করে খেয়ে নিতে পারে কোন অসুবিধা নেই। হাত-মুখ ধোয়া ব্যতীত খেলেও কোন অসুবিধা নেই। তবে সেটা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপার হবে না।[৬]

---

১. فتاوی رحیمیہ ج/ ۲ ॥ ২. عالمگیری ج/۱ ॥ ৩. بہشتی زیور ॥ ৪. ایضا ॥ ৫. بہشتی گوہر ॥ ৬. ایضا ॥

যে সব কারণে গোসল ফরয হয় না

১. যদি কোন রোগের কারণে ধাতু পাতলা হয়ে বা কোন আঘাত খেয়ে বিনা উত্তেজনায় ধাতু নির্গত হয়, তাতে গোসল ফরয হয় না। তবে উযূ ভেঙ্গে যায়।

২. স্বামী-স্ত্রী শুধু লিঙ্গ স্পর্শ করে যদি ছেড়ে দেয়— কিছুমাত্র ভিতরে প্রবেশ না করায় এবং মনীও বের না হয়, তাতে গোসল ফরয হয় না।

৩. শুধু মযী বের হলে তাতে কেবল উযূ ভঙ্গ হয়, গোসল ফরয হয় না।

৪. ঘুম থেকে উঠার পর যদি স্বপ্ন স্মরণ থাকে কিন্তু কাপড়ে বা শরীরে কোন কিছু দেখা না যায়, তবে তাতে গোসল ফরয হয় না।

৫. এস্তেহাযার রক্তের কারণে গোসল ফরয হয় না।

বি: দ্র: মনী ও মযী কাকে বলে তা পূর্বে ৩৭৫ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যে সব কারণে গোসল মোস্তাহাব

* কাফের মুসলমান হওয়ার পর গোসল করা মোস্তাহাব।[১]

* লাশ গোসল দেয়ার পর গোসলদাতার জন্য গোসল করা মোস্তাহাব।[২]

তায়াম্মুম

কোন্ অপবিত্রতায় তায়াম্মুম করা যায়

ছোট-বড় যে কোন অপ্রকৃত নাপাকী (নাজাছাতে হুকমী তথা বে-উযূ বে-গোসল হওয়ার অবস্থা) অবস্থায় তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়। তবে প্রকৃত নাপাকীর বেলায় অর্থাৎ, যে সব নাজাছাত দেহবিশিষ্ট তা লাগলে তায়াম্মুম করলে যথেষ্ট হবে না বরং ধৌত করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, উযূ ও গোসলের জন্য এক রকম তায়াম্মুমই করতে হবে। এক তায়াম্মুমই উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।

কখন তায়াম্মুম করতে হবে

* নিম্নলিখিত কারণগুলো ব্যতীত তায়াম্মুম জায়েয নয়:

১. পানি এক মাইল অথবা তদূর্ধ্ব অথবা এর চেয়েও দূর হতে হবে।

২. পানির কূপ আছে, কিন্তু পানি উঠাবার কোন ব্যবস্থা না থাকলে।

---

১. ايضا ॥ ২. الدر المختار ١/ج ॥

৩. পানির নিকট কোন ক্ষতিকর প্রাণী অথবা কোন শত্রু থাকলে এবং কাছে গেলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকলে।

৪. রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ অথবা মোটর গাড়ীতে আরোহণ অবস্থায় পানি না পাওয়া গেলে অথবা উযূ করার সুযোগ না থাকলে বা উযূ করতে গেলে গাড়ী ছেড়ে দেয়ার ভয় থাকলে। তবে রেলগাড়ী বা মোটরে তায়াম্মুমের জন্য শর্ত হল (এক) রেলগাড়ীর অন্য কোন ডাব্বায় (বগিতে) পানি নেই (দুই) পথিমধ্যে এক মাইলের (১.৮৩ কি.মি.)-এর মধ্যে পানি অর্জন করা যাবে— এরূপ জানা নেই।

৫. পানি ব্যবহার করলে রোগ বৃদ্ধি অথবা রোগ সৃষ্টি অথবা স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ভয় হলে। অবশ্য এসব ব্যাপারে অনর্থক সন্দেহ করে তায়াম্মুম না করা চাই। তবে রোগ বৃদ্ধি পাবার অথবা রোগ সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে, যেমন, সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত লোক শীতকালে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করলে ক্ষতি হয়, এমতাবস্থায় গরম পানি দিয়ে গোসল অথবা উযূ করা দরকার। গরম পানি সংগ্রহ করতে না পারলে অথবা গরম পানি ব্যবহার করলেও ক্ষতির আশঙ্কা হলে তায়াম্মুম করবে।

৬. অল্প পানি থাকায় উযূ করলে পিপাসায় কষ্ট করতে হবে অথবা খাবার পাক করতে অসুবিধার সম্ভাবনা আছে।

৭. পানি আছে, কিন্তু নিজে উঠে গিয়ে আনতে সক্ষম নয়, আর পানি এনে দেয়ার জন্য অন্য লোকও না পাওয়া যায়।

* কোন লোকের গোসলের প্রয়োজন, কিন্তু গোসল করলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, উযূ করলে কোন ক্ষতি হবে না, তখন সে গোসলের জন্য তায়াম্মুম করে নিবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন করে উযূ করে নামায পড়বে।

* পানির পরিমাণ যদি অল্প হয় ও মাত্র একবার করে মুখ হাত ও পা ধৌত করা যায়, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করবে না— উযূর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করলেই হবে, উযূর সুন্নাত অর্থাৎ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ছেড়ে দিতে হবে।

* তায়াম্মুম করে নামায আদায় করার পর কোন লোক জানতে পারল যে পানি নিকটেই আছে, তখন তাকে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে না। পানি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে থাকলে তখন এ হুকুম প্রযোজ্য হবে নতুবা উযূ করে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে।

* নামাযের শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে শেষ ওয়াক্তেই নামায পড়া মোস্তাহাব। যেমন রেলগাড়ী অথবা মোটরে আরোহণ করার পর জানতে পারল যে, নামাযের শেষ ওয়াক্তে রেলগাড়ী অথবা মোটর গাড়ী এমন স্থানে পৌঁছে যাবে যেখানে পানি আছে, তখন বিলম্ব করেই নামায পড়বে। তবে গাড়ী পৌঁছার ব্যাপারে সন্দেহ হলে তায়াম্মুম করেই নামায পড়বে।

* কোন লোক পানি অনুসন্ধান করে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করল, অথচ নামাযের সময় থাকতেই পানি পাওয়া গেল, তখন তাকে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে না।

* রেলগাড়ীতে বা উড়োজাহাজে ভ্রমণ করলে মাটি ও পানি না পাওয়া গেলে উযূ ও তায়াম্মুম ব্যতীত নামায পড়ে নিবে অর্থাৎ, নামাযের নিয়ত ছাড়া শুধু নামাযের মত উঠা-বসা ইত্যাদি করবে। এমনিভাবে কোন লোক জেলখানায় থাকাকালীন পানি ও মাটি না পেলে, উযূ ও তায়াম্মুমবিহীন অনুরূপভাবে নামাযের ন্যায় করবে। তবে উভয় অবস্থায় পানি পাওয়ার পর দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে।

* মানুষের সৃষ্ট কোন অপারগতায় কেউ উপনীত হলে এর হুকুমও পূর্ববৎ। যেমন কোন লোকের জেলখানায় থাকা অবস্থায় অন্য কেউ তার উযূর পানি বন্ধ করে দেয়, তখন সে উযূবিহীন নামায পড়বে।

* পানি না পাওয়ার কারণে যাকে তায়াম্মুম করতে হবে পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা থাকলে মোস্তাহাব ওয়াক্ত পার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার জন্য মোস্তাহাব। আর কেউ পানি দেয়ার ওয়াদা করলে অবশ্যই তাকে অপেক্ষা করতে হবে, যদিও ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশঙ্কা হয়।

তায়াম্মুম করার তরীকা

(ধারাবাহিকভাবে তায়াম্মুমের আমলসমূহ বর্ণনা করা হল)

* তায়াম্মুমের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত।

* মেসওয়াক করা উযূর ন্যায় তায়াম্মুমেরও সুন্নাত।[১]

* নিয়ত করা ফরয। (পবিত্রতা অর্জন করা বা নাপাকী দূর করার নিয়ত করবে। কিংবা নামায, সাজদায়ে তেলাওয়াত প্রভৃতি এমন মৌলিক ইবাদতের নিয়ত করবে যা পবিত্রতা ব্যতীত সহীহ হয় না।

* নিয়ত মুখেও উচ্চারণ করা উত্তম।

---

১. الفقه على المذاهب الاربعة।

এরূপ বাক্যে নিয়ত করা যায়—

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى.

অর্থ : আমি নাপাকী দূর করার, নামায বৈধ করার এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে তায়াম্মুমের নিয়ত করছি।

* নিয়ত করার পর পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু (যার উপর তায়াম্মুম করা যায়)-এর উপর উভয় হাতের তালু মারবে।

* হাত মারার সময় আঙ্গুলগুলো খোলা রাখা সুন্নাত।

* হাত মারার পর উভয় হাত ঐ স্থানে রাখা অবস্থায় একবার সামনের দিকে একবার পেছনের দিকে নিবে। এটা তায়াম্মুমের সুন্নাত।

* হাত এমনভাবে ঝাড়বে, যেন আলগা ধুলা ঝরে যায়।

* পুরো মুখ ঐ হাত দ্বারা মাসেহ করবে। এটা তায়াম্মুমের ফরয।

* আবার মাটিতে অনুরূপভাবে হাত মারবে। (আঙ্গুলের মধ্যে ফাঁক রেখে)

* হাত সামনে এবং পেছনের দিকে নিবে। এটা তায়াম্মুমের সুন্নাত।

* এখানেও (হাত মাসেহের 'পূর্বেই) উযূর মত উভয় হাতের আঙ্গুল খেলাল করবে। এটা সুন্নাত।[১]

* পূর্বের ন্যায় হাত ঝাড়বে।

* প্রথমে ডান হাত কনুইসহ মাসেহ করবে।

* তারপর বাম হাত কনুইসহ মাসেহ করবে। (ডান ও বাম উভয় হাত মাসেহ করা ফরয)

* মাসেহ করার সুন্নাত তরীকা হল : বাম হাতের চার আঙ্গুলের পেট (বৃদ্ধ আঙ্গুল ছাড়া) ডান হাতের চার আঙ্গুলের পিঠে রাখবে। তারপর ডান হাতের পিঠের উপর দিয়ে কনুইর দিকে টেনে নিয়ে যাবে। অতঃপর বাম হাতকে উল্টে বাম হাতের তালু এবং বৃদ্ধ আঙ্গুলের পেট দিয়ে ডান হাতের পেটের দিক থেকে হাত আঙ্গুলের দিকে এমনভাবে টেনে নিয়ে যাবে যেন বাম হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের পেট ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের পিঠের উপর দিয়ে চলে যায়। অনুরূপভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ করবে।[২]

---

১. ৬/১৪৮ ॥ ৩. ২৮ গ্রন্থকার মাসেহ করার এই তরীকা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বলে দাবি করেছেন, অন্য অনেকে তা অস্বীকার করলেও এরূপ করা সুন্নাত তরীকার খেলাফ হবে বলে মন্তব্য করেননি। তবে কোনরূপে পুরো হাত মাসেহ করা সম্পন্ন হলেই তায়াম্মুমের ফরয আদায় হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। ॥

* আংটি-চুড়ি ইত্যাদিকে তার স্থান থেকে সরিয়ে এমনভাবে হাত মাসেহ করবে যেন সব স্থানে মাসেহ করা হয়।

* তায়াম্মুমের এই তারতীব রক্ষা করা সুন্নাত।

* তায়াম্মুমের মধ্যেও উযূর ন্যায় একের পর এক অঙ্গগুলো লাগাতার (অর্থাৎ, বেশী বিরতি না দিয়ে) করে যাওয়া সুন্নাত।

* তায়াম্মুম উযূর ন্যায়, তাই উযূর মধ্যে মুখ ও হাত ধোয়ার যে দুআ পড়া হয়, এমনিভাবে উযূর শেষে যে সব দুআ পড়া হয়, তায়াম্মুমের বেলায়ও সেগুলো পড়ার হুকুম একই হবে।[১]

কী কী বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয

পাক মাটি, কংকর, বালি, চুনা, মাটির তৈরী কাঁচা অথবা পাকা ইট, ধুলা-বালি, মাটি, পাথর, ইটের তৈরী দেওয়াল, পাকা বাসন, (তৈল লেগে না থাকলে)। লাকড়ি বা কাপড়ে অথবা অন্য কোন পাক বস্তুতে ধুলাবালি লেগে থাকলে এসব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে।[২]

কোন্ কোন্ কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়

১. যে যে কারণে উযূ নষ্ট হয় তায়াম্মুমও ঐসব কারণে ভঙ্গ হয়।
২. যে সমস্ত কারণে গোসল ফরয হয় ঐ সমস্ত কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়। যেমন স্বপ্নদোষ হলে বা স্ত্রী সঙ্গম করলে ইত্যাদি।
৩. যে সব কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিল, ঐসব কারণ রহিত হয়ে গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।
৪. পানি পাওয়ার পর তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

মোজায় মাসেহ

উযূ করার সময় মোজা পরিহিত থাকলে মোজা খুলে পা না ধুয়ে মোজার উপর মাসেহ করে নিলেও চলে, তবে তার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

মোজায় মাসেহের শর্তসমূহ

১. পা ধোয়ার পর মোজা পরিধান করবে। চাই পূর্ণ উযূ করার পর শেষে পা ধুয়ে মোজা পরিধান করুক কিংবা আগেই পা ধুয়ে মোজা পরিধান করে তারপর উযূ ভঙ্গকারী কিছু ঘটার পূর্বেই উযূ পূর্ণ করে নেয়া হোক।

---

১. كتاب الآثار। ২. আলমগীরী ও দুররে মুখতার।।

২. মোজা পায়ের টাখনু গিরা ঢাকা হতে হবে।
৩. মোজা এমন হতে হবে যা পরিধান করে উপর্যুপরি অন্ততঃ তিনমাইল পথ চলা যায়।
৪. একটি মোজায় পায়ের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী ফাটা ছেড়া থাকতে পারবে না, চলার সময় এ পরিমাণ খুললেও চলবে না।
৫. মোজা এমন শক্ত হতে হবে যা বাঁধা ছাড়াই পায়ের উপর আটকে থাকে।
৬. মোজা এমন হতে হবে যার ভিতর দিয়ে পানি ভেদ করে শরীরে লাগে না।
৭. কমপক্ষে হাতের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ পায়ের অগ্রভাগ থাকতে হবে। অতএব কোন এক পা টাখনু গিরার উপর থেকে কাটা গেলে আর অপর পা ঠিক থাকলে সে অবস্থায় মোজায় মাসেহ করা জায়েয হবেনা।
৮. গোসল ফরয হলে মোজায় মাসেহ করা জায়েয নয় বরং তখন মোজা খুলে পা ধৌত করতে হবে।

কোন্ ধরনের মোজায় মাসেহ করা জায়েয

* চামড়ার মোজা এবং পশম ও কাতান প্রভৃতির পায়ের এমন মোটা মোজা, যা অন্ততঃ পায়ের টাখনু গিরা ঢাকা হবে এবং বাঁধা ছাড়াই পায়ের উপর খাড়া থাকতে পারে এমন হবে, যা পায়ে দিয়ে অন্ততঃ তিন মাইল হাঁটা যাবে তাতে ফাটবে না এবং যা ভেদ করে পানি ভিতরে ঢুকবে না এবং যা দিয়ে পায়ের চামড়া দেখা যাবে না— এমন মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয। হাত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নয়।

মোজায় কত দিন মাসেহ করা জায়েয

* শরঈ সফরের অবস্থায় তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত এবং এরূপ সফর না হলে এক দিন এক রাত পর্যন্ত মাসেহ করা যায়। যে উযূ করে মোজা পরিধান করা হবে সে উযূ ভঙ্গ হওয়ার সময় থেকে এই তিন দিন তিন রাত ও এক দিন এক রাতের হিসাব ধরা হবে।

* বাড়িতে থাকা অবস্থায় মাসেহ শুরু হয়েছিল এবং একদিন এক রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সফর আরম্ভ হয়েছে, তাহলে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসেহ করতে পারবে।

* পক্ষান্তরে সফরে থাকা অবস্থায় মাসেহ শুরু করা হয়েছিল ও
একদিন এক রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বাড়িতে চলে এসেছে তাহলে এ
এক রাত পূর্ণ হওয়ার পর আর মাসেহ করতে পারবে না।

মোজায় মাসেহের তরীকা

উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পানিতে ভিজিয়ে উভয় পায়ের
অগ্রভাগে রাখবে, যেন সম্পূর্ণ মোজার উপর আঙ্গুলগুলোর ছাপ
অতঃপর হাতের পাতা শূন্যে রেখে এবং আঙ্গুলগুলোর মাঝে সামান্য
রেখে ক্রমশঃ আঙ্গুলগুলো টেনে পায়ের টাখনা (গোড়ালির উপরের হাড়
দিকে আনবে। পুরো হাতের পাতাসহ মোজার উপর রেখে টেনে আ
দুরন্ত আছে।

যেসব কারণে মোজায় মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যায়

১. যে যে কারণে উযূ ভেঙ্গে যায় তাতে মাসেহও ভেঙ্গে যায়।
২. উভয় মোজা বা একটি মোজা খুললেও মাসেহ ভেঙ্গে যায়। এরূপ অ
উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে আবার মোজা পরিধান করে নিলেই চলে,
উযূ দোহরানোর প্রয়োজন হয় না।
৩. মাসেহের মেয়াদ— তিন দিন তিন রাত বা এক দিন এক রাত পূর্ণ
গেলেও মাসেহ ভেঙ্গে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে নি
৪. মোজার ভিতরে পানি ঢুকে সম্পূর্ণ পা বা পায়ের অর্ধেকের বেশী
গেলে। এ ক্ষেত্রেও উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে নিবে।
৫. মা'যূর ব্যক্তি যদি মাসেহ করে, তাহলে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর
তার উযূ ভেঙ্গে যায়, তদ্রূপ তার মাসেহও ভেঙ্গে যাবে। তবে উযূ
সময় এবং মোজা পরিধান করার সময় ওজর না থাকলে অন্যান্য
লোকের ন্যায় সেও মাসেহ করতে পারবে।[১]

হায়েয নেফাস ও ইস্তেহাযা ইত্যাদি

হায়েযের পরিচয়

প্রতি মাসে বালেগা মেয়েদের যৌনাঙ্গ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে যে রক্ত
হয়, তাকে হায়েয বলে। কুরআন ও হাদীছে এই রক্তকে নাপাক বলা হয়ে

---

১. ماخوذ از نور الایضاح - بہشتی زیور، الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۔

* সাধারণতঃ ৯ বৎসরের পূর্বে এ রক্ত দেখা দেয় না। ৯ বৎসর বয়সের পূর্বে এ ধরনের রক্ত দেখা দিলে তা হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে না বরং ইস্তেহাযার রক্ত হিসেবে গণ্য হবে।[১] অনুরূপভাবে ৫৫ বৎসর বয়সের পর সাধারণতঃ হায়েযের রক্ত আসে না। অতএব ৫৫ বৎসর পার হওয়ার পরও কোন মেয়েলোকের রক্তস্রাব দেখা দিলে তার রং যদি লাল অথবা কালো হয় তাহলে তাকে হায়েযই মনে করতে হবে। রং যদি হলুদ বা সবুজ বা মেটে হয়, তাহলে তাকে হায়েয গণ্য করা হবে না বরং সেটা ইস্তেহাযা বলে গণ্য হবে। অবশ্য ঐ মেয়েলোকের যদি পূর্বেও হলুদ, সবুজ বা মেটে বর্ণের রক্তস্রাব হওয়ার অভ্যাস থেকে থাকে তাহলে ৫৫ বৎসরের পরও অনুরূপ বর্ণের রক্তকে হায়েয ধরা হবে।[২]

* হায়েযের সময়সীমার মধ্যে লাল, হলুদে, মেটে, সবুজ, কাল যে কোন প্রকার রং-এর রক্তকে হায়েযের রক্ত বলে গণ্য করা হবে। যখন সম্পূর্ণ সাদা রং দেখা দিবে তখন মনে করতে হবে যে, হায়েয বন্ধ হয়েছে। সাদা রংয়ের পূর্বে সব ধরনের রঙই হায়েযের রং।[৩]

* রক্ত যোনির ছিদ্রের বাইরে আসার পর (যোনি মুখের চামড়ার বাইরে না এলেও) থেকেই হায়েযের শুরু ধরা হবে। রক্ত ভিতরে থাকার কোন ধর্তব্য নেই। যদি ছিদ্রের মুখে তুলা দিয়ে রাখে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরের তুলায় রক্তের দাগ দেখা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে পবিত্র মনে করবে। যখন রক্তের চিহ্ন বাইরে ছড়িয়ে পড়বে অথবা ছিদ্রের তুলা সরিয়ে দেয়ার পর রক্ত বের হতে শুরু করবে, তখন থেকে হায়েযের শুরু ধরতে হবে।[৪]

* পবিত্র অবস্থায় যোনির ভেতরে তুলা ঢুকিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। সকালে উঠে তার মধ্যে রক্তের দাগ নজরে পড়ল, তাহলে যখন থেকে দাগ নজরে পড়েছে তখন থেকে হায়েযের হিসাব শুরু হবে।[৫]

হায়েযের সময়সীমা

হায়েযের সময়সীমা কমপক্ষে ৩ দিন ৩ রাত এবং সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন ১০ রাত।

* হায়েযের সময়ে অর্থাৎ হায়েযের দিনগুলোতে সর্বক্ষণ রক্ত আসা জরুরী নয় বরং নিয়মমত রক্ত আসার পর অভ্যাসের দিনগুলিতে বা ১০ দিন

১. تحفۂ خواتین । ২. خواتین کے شرعی احکام । ৩. ایضا । ৪. شرح وقایہ ج/۱ । ৫. شرح وقایہ ।

১০ রাতের ভিতরে মাঝে মধ্যে দুই-চার ঘণ্টা বা এক দিন আধ দিন রক্ত
থেকে আবার এলেও সেই মাঝখানের সময়কেও হায়েযের সময় ধরা হবে

হায়েযের মাসায়েল

যেহেতু হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা কমপক্ষে ৩ দিন ৩ রাত। সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন ১০ রাত। অতএব কোন স্ত্রীলোকের ৩ দি রাতের কম রক্তস্রাব হলে তখন হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে না, তাকে হাযার রক্ত ধরা হবে। এমনিভাবে ১০ দিন ১০ রাতের অধিক রক্তস্রাব সর্বশেষ যে হায়েয এসেছিল তার চেয়ে যে কয়দিন বেশী হবে সে কয়দি রক্ত হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে না, তাকে ইস্তেহাযার রক্ত ধরা হবে। হাযার মাসায়েল পরে আলোচনা করা হয়েছে।

* যদি কোন মেয়েলোকের জীবনের প্রথম রক্তস্রাব শুরু হয়েই ১০ দি চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তাহলে তার ক্ষেত্রে মাসআলা হল সে ১০ দিন ১০ হায়েয গণ্য করবে, অবশিষ্ট দিনগুলো এস্তেহাযা গণ্য করবে। আর যদি এ মেয়েলোকের রক্ত বরাবর জারী থাকে মোটেই বন্ধ না হয়, তাহলে প্রতি ১০ দিন ১০ রাত হায়েয এবং মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো এস্তেহাযা করবে।[২]

দুই হায়েযের মধ্যবর্তী স্রাব বা পবিত্রতার কিছু মাসায়েল

* দুই হায়েযের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ১৫ দিন পবিত্র থ সময়। অতিরিক্ত কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই। অতএব যদি মেয়েলোকের ১ অথবা ২ দিন রক্তস্রাব দেখা দেয়ার পর ১৫ দিন পাক এবং আবার ১ অথবা ২ দিন রক্ত দেখে তাহলে মাঝখানের ১৫ পবিত্রতার সময় আর এদিক-ওদিক যে ১ বা ২ দিন রক্ত দেখেছে তা হ নয় বরং তা ইস্তেহাযা। কারণ ৩ দিনের কম হায়েয হয় না।[৩]

* যদি কোন মেয়েলোকের ৩ দিন ৩ রাত রক্ত দেখা দেয়, তারপর দিন পাক থাকে; আবার ৩ দিন ৩ রাত রক্ত দেখে, তাহলে পূর্বের ৩ দি রাত এবং পরের ৩ দিন ৩ রাত হায়েয ধরা হবে আর মধ্যকার দিনগুলি থাকার সময়।[৪]

---

১. تحفہ خواتین । ২. تحفہ خواتین । ৩. خواتین کے شرعی احکام । ৪. ایضا ।

* কোন স্ত্রীলোকের ৩ দিনের কম ১ অথবা ২ দিন রক্তস্রাব হয়ে পুনরায় ১ অথবা ২দিন পাক থাকার পর আবারও যদি রক্তস্রাব দেখা দেয়, সবগুলোকে হায়েয ধরে নিতে হবে।

* কারও ১ অথবা ২ দিন রক্তস্রাব দেখা দেয়ার পর পুনরায় ১৫ দিনের কম অর্থাৎ, ১০/১২ দিন রক্তস্রাব বন্ধ রইল, তারপর আবার রক্তস্রাব দেখা দিল, এমতাবস্থায় যত দিন অভ্যাসের দিন ছিল, ততদিন হায়েয গণনা করা হবে, অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তেহাযা হিসেবে ধরে নিতে হবে।

* যদি কোন মেয়েলোকের এক হায়েয শেষ হওয়ার পর ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবার রক্ত দেখা দেয় এবং সে এটাকে হায়েয মনে করে নামায ছেড়ে দিতে থাকে আর ৩ দিন ৩ রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং তারপর আবার ১৫/২০ দিন কোন রক্ত দেখা না যায়, তাহলে (বুঝতে হবে এই রক্ত হায়েযের রক্ত নয়; কেননা ৩ দিন ৩ রাতের কম হায়েয হয় না। অতএব) হায়েয মনে করে যে নামাযগুলো ছেড়ে দিয়েছিল তার কাযা করতে হবে।[১]

* দুই হায়েযের মধ্যবর্তী কয়েক মাস বা বৎসর পর্যন্ত যদি রক্ত দেখা না দেয়, তবুও পুরো সময়কে পাক ধরতে হবে।[২]

লিকুরিয়া বা সাদা স্রাবের মাসায়েল

স্ত্রীলোকের জরায়ু প্রবাহনের ফলে যে রস বা সাদা স্রাব (লিকুরিয়া) নির্গত হয়, এতে উযূ নষ্ট হয়, গোসল করা আবশ্যক হয় না। আজকাল অনেক মহিলাই এ রোগ দেখা যায়। তাই এর মাসায়েল ভালভাবে বুঝে নেয়া চাই।

* যদি সর্বক্ষণ এই স্রাব বের হতে থাকে এবং পুরো ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সময়ও না পায় যাতে পবিত্র হয়ে নামায পড়ে নিতে পারে, তাহলে সে মাযূর বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সে প্রত্যেক নামাযের সময় নতুন উযূ করে নামায আদায় করে নিবে এবং উযূর পূর্বে স্রাব ধৌত করে নিবে। এমতাবস্থায় নামাযের মধ্যে স্রাব দেখা দিলেও সে অবস্থায় সে কাপড়েই নামায হয়ে যাবে। আর যদি মাঝে-মধ্যে এই স্রাব দেখা দেয় এবং মাঝে-মধ্যে বন্ধ থাকে, তাহলে সে বন্ধ থাকার সময়ে নামায পড়ে নিবে। এমতাবস্থায় নামাযের মধ্যে স্রাব দেখা দিলে নামায ছেড়ে দিয়ে পুনরায় উযূ করে নামায পড়বে এবং কাপড়ে লেগে থাকলে কাপড়ও পরিবর্তন করে নিবে।[৩]

---

১. تحفۂ خواتین । ২. تحفۂ خواتین । ৩. آپ کے مسائل اور ان کا حل ج/۲ ।

হায়েযের অভ্যাস পরিবর্তন হওয়া সংক্রান্ত মাসায়েল

* কোন স্ত্রীলোকের সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে ৩ দিন রক্তস্রাব হ তার হায়েযের সময়সীমা ৩ দিন ধরে নিতে হবে, এটাই তার অভ্যাস। যে মাসে তার ৭ দিন রক্তস্রাব হলে সেটাকেও হায়েয মনে করতে হবে, কেন হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা ১০ দিন। তবে পরবর্তী কোন মাসে তার রক্তস্রাব দিনের বেশী হলে যেমন ১২ দিন অথবা ১৫ দিন হলে, তখন পূর্ববর্তী মা যে কয়দিন রক্ত এসেছিল ঐদিনগুলো হায়েয হিসেবে পরিগণিত হবে অবশিষ্ট দিনগুলোকে ইস্তেহাযা ধরে নিতে হবে।

* কোন স্ত্রীলোকের হায়েযের অভ্যাস ৩ দিন, কিন্তু একমাসে তার ৪ দি স্রাব হলো। তার পরবর্তী মাসে ১৫ দিন স্রাব হল, এমতাবস্থায় যেহে এক মাসে তার ৪ দিন রক্ত এসেছিল, সে জন্য তার অভ্যাস ৪ দিনই মনে কর নিতে হবে। অবশিষ্ট দিনগুলোর নামায কাযা করতে হবে। তবে এ কা আদায় করার জন্য ১০ দিন বিলম্ব করতে হবে। কেননা ১০ দিন পর্য অভ্যাস পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ১০ দিন চলে যাওয়ার পর রক্ত বন্ধ না হওয়ায় পরিষ্কার ধরে নিতে হবে যে, ৪ দিনের চেয়ে যতগুলে দিন বেশী রক্তস্রাব হয়েছে সেগুলো ইস্তেহাযার রক্ত। আর যে মাসে তার দিন অথবা ৯ দিন অথবা ১০ দিন রক্তস্রাব হয়, তখন পূর্ববর্তী অভ্যাস ধর্তব হবে না। বরং এই ৮ অথবা ৯ অথবা ১০ দিনই তার হায়েয। কেননা ১ দিন পর্যন্ত হায়েযের সর্বোচ্চ মেয়াদ। মনে করতে হবে তার অভ্যাস পরিবর্ত হয়েছে। অবশ্য ১০ দিনের বেশী রক্তস্রাব হলে পূর্বের মাসের ঐ ৪ দিনকে তার অভ্যাসের দিন বলে মনে রাখতে হবে।

* কারও অভ্যাস ৩ দিনের। হঠাৎ এক মাসে দেখা গেল ৩ দিনের পর স্রাব বন্ধ হয়নি, তাহলে গোসল করার দরকার নেই। নামাযও পড়তে হবে না। যদি ১০ দিনের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেটা হায়েয এবং সব নামায মাফ। মনে করতে হবে অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। আর যদি ১০ দিনের পরে একাদশ দিনে বা দ্বাদশ দিনে বা আরও পরে রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে মনে করতে হবে ৩ দিন হায়েয ছিল, বাকিটা ইস্তেহাযা। তাই গোসল করে ৩ দিন বাদ দিয়ে বাকি ৭ দিনের নামায কাযা করতে হবে।[১]

সার কথা এই যে, ১০ দিন পার হয়ে গেলে অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্তস্রাবকে নিঃসন্দেহে ইস্তেহাযা মনে করতে হবে। কিন্তু ১০ দিনের মধ্যে

---

১. شامى।

রক্তস্রাবের অভ্যাস সর্বদা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন সর্বদা ৪ দিন রক্তস্রাব হতো, মুহাররম মাসে ৫ দিন আসলো, আবার সফর মাসে ১২ দিন আসলো, তখন ঐ ৫ দিনকেই তার অভ্যাস মনে করতে হবে। কিন্তু সফর মাসে ৯ দিন এসে থাকলে মনে করতে হবে যে, তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। কেননা ১০ দিনের মধ্যে অভ্যাস পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

হায়েয চলাকালীন ও হায়েয শেষে নামায-রোযার মাসায়েল

* হায়েযের সময়গুলোতে নামায পড়া, রোযা রাখা নিষেধ। তবে নামায ও রোযার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। নামায পরিপূর্ণভাবে মাফ হয়ে যায়, আর কখনো কাযা করতে হয় না। কিন্তু রোযা সাময়িক মাফ হয়। হায়েয শেষে আবার রোযার কাযা করতে হয়।[১]

* ফরয নামায পড়াকালে যদি হায়েয দেখা দেয়, তাহলে সেই নামায ফাসেদ হয়ে যাবে, সেই চলতি নামাযও মাফ হয়ে যাবে। হায়েয শেষে সেটার কাযা পড়তে হবে না।[২]

* নফল বা সুন্নাত নামায পড়াকালে রক্ত দেখা দিলে সে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং সেটা পরে কাযা করতে হবে।[৩]

* ওয়াক্তের নামায এখনো পড়েনি, কিন্তু নামায পড়ার মত সময় এখনো আছে, এমতাবস্থায় যদি হায়েয শুরু হয়, তাহলে সেই ওয়াক্তের নামাযও মাফ হয়ে যাবে।[৪]

* রোযা শুরু করার পর যদি হায়েয দেখা দেয়, তাহলে সেটারও পরে কাযা করতে হবে, চাই সেটা ফরয হোক বা নফল রোযা।[৫]

* নামাযের শেষ ওয়াক্তে হায়েয এসেছে ; যদি এখনও নামায না পড়ে থাকে তাহলে এটাও কাযা পড়তে হবে না।[৬]

* যদি কারও ১০ দিনের কম সময় স্রাব হয় এবং এমন সময় গিয়ে রক্ত বন্ধ হয়, যদি খুব তাড়াহুড়া করে গোসল করে নেয়, তাহলে পবিত্রতার পর এতটুকু সময় থাকবে, যার মধ্যে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযের নিয়ত বাঁধা যায়, তাহলেও সেই ওয়াক্তের নামায ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় নামায শুরু করার পর যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়, তবুও নামায পুরা করে নিবে। তবে ফজরের ওয়াক্ত হলে যদি নামায শুরু করার পর সূর্য উদিত হয়ে

১. بحرالرائق ۱/۲۰۱ । ২. الجوہرۃ النیرۃ، تحفہ خواتین । ৩. تحفہ خواتین । ৪. خواتین کے شرعی احکام । ৫. تحفہ خواتین । ৬. ایضا ।

যায়, তাহলে সে নামায কাযা করতে হবে। আর যদি সময় তার চেয়ে কম হয়, অর্থাৎ এমন সময় গিয়ে রক্ত বন্ধ হয়, যে খুব তাড়াহুড়া করে গোসল করে নিয়ে পবিত্রতা অর্জনের পর এতটুকু সময় থাকবে না, যার মধ্যে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযের নিয়ত বাঁধা যায়, তাহলে সেই ওয়াক্তের নামায মাফ, তার কাযা করতে হবে না।[১]

* যদি পরিপূর্ণ ১০ দিন ১০ রাত হায়েয হয় এবং এমন সময় রক্ত বন্ধ হয়, যার মধ্যে শুধু একবার 'আল্লাহু আকবার' বলার সময় আছে, তার পরেই নামাযের সময় শেষ, গোসলেরও সময় নেই। তবুও ঐ ওয়াক্তের নামায ওয়াজিব হবে। পরে কাযা পড়তে হবে।[১]

* যদি রমযান মাসে দিনের বেলায় হায়েয বন্ধ হয়, তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযাদারের মতই থাকতে হবে, পানাহার করতে পারবে না। অবশ্য পরে এ দিনটির রোযারও কাযা করতে হবে।[২]

* যদি কেউ পূর্ণ ১০ দিন ১০ রাত পর রাতের শেষভাগে গিয়ে পবিত্র হয়, যখন পাক হয়েছে তখন রাতের এতটুকু সময়ও হাতে নেই, যার মধ্যে একবার আল্লাহু আকবার বলতে পারে। তবুও পরের দিনের রোযা ওয়াজিব। আর যদি ১০ দিনের কমেই হায়েয বন্ধ হয় এবং এতটুকু রাত অবশিষ্ট থাকে, যার মধ্যে তড়িঘড়ি করে গোসল করে নিতে পারে তবে একবার 'আল্লাহু আকবার'ও বলা যায় না, তবুও পরের দিনের রোযা ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় গোসল না করে থাকলে গোসল ছাড়াই রোযার নিয়ত করে নিবে। সকাল বেলায় গোসল করে নিবে। আর যদি সময় তার চেয়েও কম থাকে, অর্থাৎ গোসল করা পরিমাণ সময়ও না থাকে, তাহলে রোযা জায়েয হবে না। তাই সে রোযা রাখবে না, তবে সারাদিন তাকে রোযাদারের মতই থাকতে হবে। পরে কাযা করতে হবে।[৩]

* ১/২ দিন হায়েয হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল ওয়াজিব হয় না। উযূ করে নামায পড়তে থাকবে। তবে এখনই সহবাস করা দোরস্ত নয়। যদি ১৫ দিনের মধ্যে আবার স্রাব শুরু হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে সেটা হায়েযের সময় ছিল। এমতাবস্থায় হিসাব করে যত দিন হায়েযের সেটাকে হায়েয মনে করবে। এবং এখন গোসল করে নামায পড়তে শুরু করবে। আর যদি পূর্ণ ১৫ দিন রক্ত দেখা না যায়, তাহলে মনে করতে হবে সেটা

---

১. تحفۂ خواتین ১. شرح وقایہ ۱/۱۲۰ । ২. شرح وقایہ । ৩. تحفۂ خواتین ।

ইস্তেহাযার রক্ত ছিল। সুতরাং সেই সময়ে বাদ পড়া নামাযগুলোর কাযা পড়তে হবে।[১]

* যদি কোন মেয়েলোকের এক হায়েয শেষ হওয়ার পর ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবার রক্ত দেখা দেয় এবং সে এটাকে হায়েয মনে করে নামায ছেড়ে দিতে থাকে আর ৩ দিন ৩ রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সে রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং তারপর আবার ১৫/২০ দিন কোন রক্ত দেখা না যায়, তাহলে হায়েয মনে করে যে নামাযগুলো ছেড়ে দিয়েছিল তার কাযা করতে হবে।[২]

* হায়েযের অবস্থায় যে কাপড় পরিহিত ছিল, সে কাপড়ে যদি হায়েযের নাপাকী বা অন্য কোন নাপাকী না লেগে থাকে, তাহলে সে কাপড় ব্যবহার করে নামায আদায় করাতে কোন ক্ষতি নেই। যদি কোন স্থানে নাপাকী লেগে থাকে, তাহলে সে স্থানটুকু ধৌত করে তাতে নামায পড়া যাবে, পুরো কাপড় ধৌত করা জরুরী নয়।[৩]

হায়েয চলাকালীন ও হায়েয শেষে সহবাসের মাসায়েল

* হায়েযকালীন সময়ে সহবাস জায়েয নেই। সহবাস ছাড়া সবকিছুই জায়েয। অর্থাৎ একসাথে খানা-পিনা বিশ্রাম ও শয্যাগ্রহণ সবই জায়েয।[৪] তবে স্বামী স্ত্রীর হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত স্থানে তার কোন অঙ্গ স্পর্শ করে লজ্জত হাসেল করতে পারবে না। এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী যৌন তৃপ্তি মেটাতে পারে না, শরীয়ত মতে তা হারাম, হেকিমী মতেও এমন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। স্বামী এরূপ করতে চাইলে তাকে নরমে বুঝিয়ে বিরত রাখবে। হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সম্মতিতে সহবাস হলে স্ত্রীও গোনাহগার হবে।

* স্বামী তার হায়েযা স্ত্রীর নাভির নীচ হতে হাঁটু পর্যন্ত স্থানে হাত বা কোন অঙ্গ লাগাবে না, নাভির উপর থেকে মাথা পর্যন্ত অন্যান্য স্থানে হাত লাগাতে পারবে, চুমু দিতে পারবে।[৫]

* হায়েয অবস্থায় মহিলার শরীর ও মুখের লালা পবিত্র। হ্যাঁ, যদি শরীরে রক্ত বা অন্য কোন নাপাকী লাগে তাহলে ভিন্ন কথা। তাহলে শরীর নাপাক হবে। অন্যথায় শুধু হায়েযের কারণে তার শরীর নাপাক বলে গণ্য হবে না। অতএব হায়েয অবস্থায় তার শরীরের সাথে ছোঁয়া লাগলে বা স্বামী স্ত্রীর মুখের মধ্যে জিহ্বা প্রবেশ করালে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

---

১. কুরআনে বলা হয়েছে ঃ لا يقربوهن حتى يطهرن, অর্থাৎ 'তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কাছেও যেও না।' - بهشتی زیور। ২. تحفۂ خواتین। ৩. ایضا। ৪. امداد الفتاوی ج۱। ৫. تحفۂ خواتین।

* যদি কারও ১০ দিনের মধ্যেই অভ্যাস মোতাবেক ৫ দিন, ৬ দিন, ৭ দিন, ৮ দিন অথবা ৯ দিনে হায়েয বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসল না করা পর্যন্ত তার সাথে সহবাস জায়েয হবে না। হ্যাঁ, যদি এক ওয়াক্ত নামাযের সময় চলে যায় (অর্থাৎ, এতটুকু সময় অতিবাহিত হয়ে যায় যার মধ্যে গোসল সেরে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধতে পারা যায়) এবং তার ওপর এক ওয়াক্ত নামাযের কাযা ওয়াজিব হয়, তারপর গোসলের পূর্বেও সহবাস জায়েয হবে।[১]

* যদি কারও অভ্যাস অনুযায়ী হায়েযের যে কয়দিন ছিল তার পূর্বেই স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, যেমন অভ্যাস ছিল ৫ দিনের; ৪ দিনেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় গোসল করে নামায পড়া ওয়াজিব। কিন্তু সহবাস জায়েয হবে না। কারণ, হতে পারে আবার স্রাব শুরু হয়ে যাবে। ৫ দিন পার হওয়ার পর সহবাস জায়েয হবে।[২]

* যদি পরিপূর্ণ ১০ দিন ১০ রাত হায়েয হয় এবং হায়েয বন্ধ হওয়ার পরও অলসতাবশতঃ স্ত্রী গোসল না করে, তাহলে গোসলের পূর্বেও সহবাস জায়েয হবে। তবে গোসলের পূর্বে সহবাস থেকে বিরত থাকা উত্তম।[৩] এটাই পবিত্র মানসিকতার পরিচায়ক।

* ১ বা ২ দিন হায়েয হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল ওয়াজিব হয় না। উযূ করে নামায পড়তে থাকবে। কেননা হায়েযের সর্বনিম্ন সময় ৩ দিন ৩ রাত। ৩ দিন ৩ রাতের কম স্রাব হলে তা হায়েয বলে গণ্য হয় না। তবে এখনই সহবাস করা দোরস্ত হবে না। কেননা যদি ১৫ দিনের মধ্যে আবার স্রাব শুরু হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে সেটা হায়েযের সময় ছিল।[৪]

নেফাস কাকে বলে?

সন্তান প্রসব হওয়ার পর স্ত্রীলোকের যোনি থেকে যে রক্তস্রাব হয়, তাকে নেফাস বলে।

* এক গর্ভে কয়েকটা সন্তান হলে (৬ মাসের মধ্যে) প্রথম বাচ্চা প্রসবের পর থেকেই নেফাসের মেয়াদ গণনা করা শুরু করা হবে। দ্বিতীয় সন্তান থেকে নয়।[৫]

---

১. البحر الرائق ج/۱ تحفہ خواتین ২. البحر الرائق ج/۱ ৩. تحفہ خواتین البحر الرائق ج/۱ ৪. بہشتی زیور ।
৫. خواتین کے شرعی احکام ।

নেফাসের সময়সীমা

* নেফাসের সময়সীমা সর্বোচ্চ ৪০ দিন। ৪০ দিনের পরেও রক্ত আসতে থাকলে সেটা নেফাসের রক্ত বলে গণ্য হবেনা বরং সেটাকে ইস্তেহাযার রক্ত বলে গণ্য করা হবে। ইস্তেহাযা সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

* নেফাসের সর্বনিম্ন সময়ের কোন সীমা নেই। দুই চার ঘণ্টা বা দুই-চার দিন বা পাঁচ দশ দিন ইত্যাদি যে কোন পরিমাণ সময়ের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এমনকি সন্তান প্রসবের পর রক্ত একেবারেই না-ও আসতে পারে।

* প্রসবের পর যদি কারও একেবারেই রক্ত না যায়, তবুও তাকে গোসল করতে হবে। এই গোসল ফরয।[১]

* নেফাসের সময়সীমার মধ্যে সর্বক্ষণ রক্ত আসা জরুরী নয় বরং মেয়াদের ভিতরে মাঝে-মধ্যে দুই-চার ঘণ্টা বা দুই এক দিন রক্ত বন্ধ থেকে আবার এলেও সেই মাঝখানের সময়কেও নেফাসের সময় ধরা হবে।[২]

নেফাসের মাসায়েল

* ৪০ দিনের কম সময়ের মধ্যে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করে নিতে হবে। নিজেকে পাক মনে করে নামায পড়া আরম্ভ করতে হবে। কোন কোন এলাকায় মহিলাদের মধ্যে প্রচলন আছে যে, ৪০ দিনের আগে বন্ধ হলেও ৪০ দিন পর্যন্ত নামায থেকে বিরত থাকে, এটা ঠিক নয়।

* ৪০ দিনেও রক্ত বন্ধ না হলে এবং এটা মহিলার জীবনের প্রথম নেফাস হয়ে থাকলে ৪০ দিনে নেফাস শেষ ধরা হবে এবং গোসল করে নিয়ে নামায পড়া শুরু করতে হবে। ৪০ দিনের অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্তস্রাব ইস্তেহাযা হিসেবে ধরে নিতে হবে। সেমতে এস্তেহাযার মাসায়েল অনুযায়ী প্রতি ওয়াক্তে উযূ করে নামায পড়তে থাকবে। আর এটা মহিলার জীবনে প্রথম নেফাস না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী নেফাসে যে কয়দিন রক্তস্রাব এসেছিল সে কয়দিন পরই তাকে পবিত্র ধরা হবে। তার চেয়ে অতিরিক্ত সব দিনগুলোকে এস্তেহাযা ধরে নিতে হবে। অভ্যাসের অতিরিক্ত যে কয়দিনকে সে নেফাস মনে করে নামায ছেড়ে দিয়েছে তার কাযা করতে হবে।[৩]

* কোন মেয়েলোকের হয়তো ৩০ দিন রক্ত যাওয়ার অভ্যাস ছিল, কিন্তু একবার ৩০ দিন অতিক্রম হওয়ার পরও রক্ত বন্ধ হল না; এমতাবস্থায় এই মেয়েলোক এখন গোসল না করে অপেক্ষা করবে। অতপর যদি পূর্ণ ৪০ দিন শেষে বা ৪০ দিনের ভিতর রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে এই সব কয় দিনই নেফাসের

---

১. شرح وقایہ ج/۱ ۔ ২. تحفہ خواتین ۔ ৩. ایضا ۔

মধ্যে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ৪০ দিনের বেশী রক্ত জারী থাকে, তাহলে পূর্বের অভ্যাস মোতাবেক ৩০ দিন নেফাসের মধ্যে গণ্য হবে এবং অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তেহাযা বলে গণ্য হবে। ৪০ দিন পর গোসল করে নামায পড়তে থাকবে। এবং ৩০ দিনের পরের ১০ দিনের নামাযের কাযা করবে।[১]

* নেফাসের অবস্থায় সহবাস ও হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত স্থান ভোগ করা জায়েয নেই। তবে একসাথে খানা-পিনা বিশ্রাম ও শয্যাগ্রহণ সবই জায়েয।[২]

হায়েয ও নেফাস উভয়টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মাসায়েল

(নিম্নের মাসআলাগুলো হায়েয ও নেফাস উভয় অবস্থার জন্য প্রযোজ্য)

* হায়েয, নেফাস অথবা অন্য যে কোন কারণে যে নারীর ওপর গোসল ওয়াজিব হয়ে পড়েছে তার জন্য মসজিদে যাওয়া হারাম। সে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে পারবে না; কুরআন শরীফ পড়তে পারবে না, স্পর্শ করতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি কুরআন শরীফের উপর জুযদান লাগানো থাকে অথবা রুমাল দিয়ে জড়ানো থাকে তাহলে জুযদান অথবা রুমালের উপর দিয়ে স্পর্শ করা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে যদি কাগজ বা চামড়ার আস্তর থাকে এবং যদি সেটা কুরআন শরীফের সাথে সেলাই করা না হয় কিংবা আঠা দিয়ে আটকানো না থাকে, তাহলে তার উপর স্পর্শ করা জয়েয আছে।[৩]

* যার উযূ নেই সেও কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে পারবে না। তবে মুখস্থ পড়তে পারবে।[৪]

* যে টাকা-পয়সা বা বরতনে বা তাবীজে কুরআনের কোন আয়াত লেখা আছে উল্লেখিত জনেরা সেই টাকা-পয়সা, তাবীজ এবং বরতনও স্পর্শ করতে পারবে না। হ্যাঁ, কোন থলি বা পাত্রে রাখলে সে থলি বা পাত্র স্পর্শ করতে পারবে এবং থলি বা পাত্রের গায়ে ধরে উঠাতেও পারবে।[৫]

* গায়ের জামা এবং ওড়না দিয়েও কুরআন শরীফ স্পর্শ করা এবং উঠানো জায়েয নয়। হ্যাঁ, গা থেকে আলাদা কাপড় দিয়ে ধরতে ও উঠাতে পারবে। যেমন রুমাল দিয়ে ধরে উঠাতে পারবে।[৬]

* যদি পরিপূর্ণ আয়াত তেলাওয়াত না করে বরং কোন একটি শব্দ অথবা আয়াতের অর্ধেকটা তেলাওয়াত করে তাহলে জায়েয আছে। অবশ্য সেই অর্ধেক আয়াতটিও ছোট কোন আয়াতের সমান হতে পারবে না।[৭]

---

১. خواتین کے شرعی احکام । ২. تحفہ خواتین । ৩. بہشتی زیور نقلا عن مجمع الانہر ج/۱ । ৪. بہشتی زیور । ৫. البحر الرائق ج/۱ । ৬. ایضا । ৭. ایضا ।

* কোন মেয়ে হেফ্জ করা অবস্থায় হায়েয এসে গেলে এবং মুখস্থ করার জন্য তেলাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে বা কোন হাফেজা মেয়ে হায়েয অবস্থায় কুরআন হেফজ্ রাখার জন্য তেলাওয়াত জারী রাখতে চাইলে মনে মনে তেলাওয়াত করবে, মুখে উচ্চারণ করে নয়।[১]

* সূরা ফাতেহা অথবা কুরআনে কারীমের অন্য কোন দু'আর আয়াত যদি তেলাওয়াতের নিয়তে না পড়ে বরং দু'আর নিয়তে পড়ে, তাহলে কোন গোনাহ নেই।[২]

* দু'আ কুনূত পড়াও জায়েয আছে।[৩]

* যদি কোন মহিলা বাচ্চাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেন তাহলে তিনি বানান করে পড়াতে পারবেন এবং রিডিং পড়ানোর সময় এক-দুই শব্দ করে ভেঙ্গে আলাদা আলাদা শ্বাসে পড়তে পারবেন।[৪]

* হায়েয-নেফাস অবস্থায় কালিমা, দুরূদ শরীফ, এস্তেগফার, আল্লাহর নাম নেয়া জায়েয। لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ইত্যাদির ওযীফাও পাঠ করা যায়।[৫]

* হায়েয-নেফাসের অবস্থায় নামাযের সময়ে উযূ করে নামাযের স্থানে নামায আদায় পরিমাণ সময় বসে থেকে সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে থাকবে, যেন ইবাদতের অভ্যাস বজায় থাকে। এটা মোস্তাহাব।[৬]

* হায়েয অবস্থায় মহিলারা প্রতি নামাযের ওয়াক্তে সত্তর বার এস্তেগফার পাঠ করলে এক হাজার রাকআত নফল নামাযের ছওয়াব পাবে।[৭]

* গোসল ফরয ছিল। গোসলের পানি ছিল না। যখন পানি পাওয়া গেছে তখন হায়েয-নেফাস শুরু হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় আর গোসলের প্রয়োজন নেই। স্রাব থেকে পাক হওয়ার পর একবারেই গোসল করে নিতে পারবে।[৮]

* কোন মহিলার বাচ্চা প্রসব হচ্ছে। কিছু (অর্ধেকের কম) বের হয়েছে। এমন অবস্থায় যদি হুঁশ থাকে, বিবেক সুস্থ থাকে তাহলে নামায পড়া ওয়াজিব। কাযা করতে পারবে না। আর যদি বাচ্চার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে নামায পড়বে না। পরে কাযা পড়বে। অনুরূপভাবে ধাত্রী যদি মনে করে সে

---

১. آپ کے مسائل اور انکا حل ج/۲ ॥ ২. بحر الرائق ج/۱ ॥ ৩. ایضا ॥ ৪. ایضا ॥ ৫. ایضا ॥ ৬. ایضا ॥ ৭. এতে এক হাজার রাকআত নামাযের ছওয়াব হবে, সত্তরটা গোনাহ মাফ হবে এবং দরজা বুলন্দ হবে ইত্যাদি। تاتارخانیہ ॥ ৮. بہشتی زیور ॥

নামায পড়তে গেলে সদ্য প্রসূত শিশুটির ক্ষতি হবে, তাহলে সেও নামায কাযা করতে পারবে।[১] সিজারকারী ডাক্তারও এই মাসআলা অনুযায়ী আমল করবেন।

* হায়েয ও নেফাসের পর সত্বর গোসল করে নামায আরম্ভ করতে হবে। রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর যত ওয়াক্তের নামায ছুটবে, তার জন্য পাপ হবে।

* হায়েয ও নেফাস অবস্থায় নামায, রোযা ও কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি নিষিদ্ধ। অবশ্য নামায ও রোযার মধ্যে পার্থক্য এই যে, হায়েয ও নেফাস অবস্থায় যে নামায ছুটে গিয়েছিল ঐগুলোর কাযা করতে হবে না, মাফ হয়ে যাবে। তবে পবিত্র হওয়ার পর রোযার কাযা করা আবশ্যক। হায়েয ও নেফাস অবস্থায় যিক্‌র, দুরূদ, দুআ, এস্তেগফার ও কুরআন শরীফে যে দুআ আছে এগুলো পড়া যায়। স্বামী-স্ত্রী একত্রে উঠা-বসা ও খানা-পিনা করতে পারে, তবে যৌন তৃপ্তি মেটাতে পারে না, শরীয়ত মতে তা হারাম, হেকিমী মতেও এমন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

ইস্তেহাযা কাকে বলে

* স্ত্রী-লোকের যৌনাঙ্গ থেকে হায়েযের সর্বনিম্ন সময় ৩ দিন থেকে কম অথবা অভ্যাসের অতিরিক্ত ১০ দিনের চেয়ে বেশী যে রক্তস্রাব হয়, তাকে ইস্তেহাযা বলে।

* ৯ বৎসর বয়সের পূর্বে যদি রক্ত আসে, সেটাও ইস্তেহাযা বলে গণ্য।

* গর্ভাবস্থায় যদি রক্ত বের হয় সেটাও ইস্তেহাযা বলে গণ্য।

* প্রস্রবকালীন সময়ে বাচ্চা প্রসবের পূর্বে যে রক্ত বা পানি বের হয়, সেটাও ইস্তেহাযা। বাচ্চার অর্ধেকটা বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে রক্ত বের হবে সেটাও ইস্তেহাযা।

* নেফাসের সর্বোচ্চ সময় ৪০ দিন পার হওয়ার পরও রক্ত আসতে থাকলে সেই রক্তকেও ইস্তেহাযা বলে গণ্য করা হবে।

ইস্তেহাযার হুকুম ও মাসায়েল

* ইস্তেহাযার রক্ত এরূপ, যেমন নাক অথবা দাঁত দিয়ে পড়া রক্ত। রোগের কারণেই সাধারণতঃ এরূপ হয়ে থাকে। নাক অথবা দাঁত দিয়ে রক্ত পড়লে যেমন নামায-রোযা মাফ হয় না, তদ্রূপ ইস্তেহাযার রক্তের কারণেও নামায রোযা মাফ হয় না।

---

১. بحر الرائق ج۱ص۲۰۵ ه

* ইস্তেহাযার কারণে নামায-রোযা মাফ হয় না। অতএব ইস্তেহাযার কারণে নামায-রোযা কাযা করতে পারবে না।[১]

* ইস্তেহাযা অবস্থায় নামায ত্যাগ করা যাবে না। তবে প্রত্যেক নামাযে নতুন করে উযূ করতে হবে। উযূ করে নামায শুরু করার পর নামাযের মধ্যে রক্ত এসে শরীর বা কাপড়ে লাগলে বা জায়নামাযে লাগলে সে অবস্থায়ই নামায পড়ে নিবে।

* এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করতে পারবে না। অবশ্য কয়েক ওয়াক্তের কাযা নামায এক উযূ দ্বারা আদায় করা যাবে।

* যদি ইস্তেহাযা অবস্থায় সর্বক্ষণ রক্ত না আসে বরং এরকম হয় যে, মাঝে মধ্যে আসে, মাঝে মধ্যে বন্ধও থাকে, তাহলে ওয়াক্ত আসার পর অপেক্ষা করবে, যখন রক্ত বন্ধ থাকবে সে সময় উযূ করে নামায পড়ে নিবে।

* ইস্তেহাযা অবস্থায় উযূ করে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে পারবে, কুরআন শরীফও স্পর্শ করতে পারবে।

* ইস্তেহাযা অবস্থায় স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।[২]

গর্ভপাত ও এম আর বিষয়ক মাসায়েল

* দৈব কোন কারণে গর্ভ পড়ে গেলে তার জন্য গোনাহ হয় না।

* 'এম আর' অর্থ মাসিক নিয়মিতকরণ অর্থাৎ, যে কোন কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে যান্ত্রিক উপায়ে গর্ভস্থ রক্ত ইত্যাদি বের করে দেয়ার মাধ্যমে মাসিক নিয়মিতকরণ। গর্ভে সন্তান আসার পর গর্ভপাত হলে বা এম আর করলে তার মাসআলা হল :

* গর্ভপাত হলে বা এম আর করা হলে যদি সন্তানের মধ্যে হাত, পা, নখ, প্রভৃতি মানবের কোন অঙ্গ তৈরী হয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে বাচ্চা ধরা হবে এবং যে রক্ত বের হবে সেটাকে নেফাসের রক্ত বলে গণ্য করা হবে। এ অবস্থায় নেফাসের আহকাম চালু হবে এবং সন্তানকে গোসল ও কাফন-দাফন দিতে হবে। আর যদি কোন অঙ্গ প্রকাশ না হয়ে থাকে তাহলে সেটার গোসল ও কাফনের প্রয়োজন নেই বা নিয়ম মত দাফনও করা হবে না। তবে যেহেতু সেটা মানুষের অঙ্গ তাই যেখানে সেখানে ফেলে না দিয়ে সম্মানের সাথে কোথাও মাটিতে গেড়ে দেয়া উচিত। আর এ অবস্থায় যে রক্ত বের হবে সেটা নেফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে না বরং দেখতে হবে এর পূর্বে যে হায়েয হয়েছে

---

১. [illegible] । ২. ایضا ।

তা যদি পনের দিন বা বেশী পূর্বে হয়ে থাকে এবং এখনকার রক্ত কমপক্ষে তিন দিন দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে এটা হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি এর পূর্বের হায়েয পনের দিনের কম সময় আগে হয়ে থাকে বা এখনকার রক্ত তিন দিনের কম দীর্ঘায়িত হয় তাহলে এটা এস্তেহাযার রক্ত বলে গণ্য হবে এবং এ অবস্থায় এস্তেহাযার হুকুম জারী হবে।[১]

* উল্লেখ্য যে, বাচ্চার অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার পর (যার মেয়াদ ১২০ দিন) গর্ভপাত করানো জায়েয নয়।[২]

প্রসবকালীন সময়ের কয়েকটি মাসআলা

* প্রসবের সময় প্রসব কাজে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত ধাত্রী বা নার্সের সামনে শরীরের এতটুকু খোলা জায়েয, যতটুকু না খুললে নয়। এমনিভাবে প্রসবের সময় বা অন্য কোন সময় ঔষধ লাগানোর স্বার্থেও ততটুকু পরিমাণই খোলা জায়েয—সম্পূর্ণ উলঙ্গ হওয়া জায়েয নয়। এর জন্য উত্তম সূরত হল চাদর দ্বারা প্রসূতির শরীর ঢেকে দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় স্থানটুকু ধাত্রী খুলে প্রয়োজন সেরে নিবে।

* প্রসব কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়—এমন কারও সামনে শরীর খোলা জায়েয নয়। অন্যান্য মহিলাদের জন্যও সামনে এসে তার সতর দেখা হারাম।

* ধাত্রীর দ্বারা পেট মর্দন করাতে হলে চাদর বা কাপড়ের নীচ দিয়ে হাত প্রবেশ করিয়ে মর্দন করাবে। নাভির নীচে কাপড় উন্মুক্ত করে দেয়া জায়েয নয়।

* ধাত্রী বা নার্স যদি অমুসলিম হয়, তাহলে অমুসলিম মহিলাদের সামনে যেহেতু মুখ, হাতের কবজি পর্যন্ত এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ব্যতীত শরীরের অন্য স্থান খোলা জায়েয নয়, তাই প্রসবের প্রয়োজনে যতটুকু না খুললে নয় তা ব্যতীত মাথা, হাত, চুল প্রভৃতি কোন অঙ্গ পর্দা—মুক্ত করা জায়েয হবে না।[৩]

* নিম্নোক্ত আয়াত লিখে প্রসূতির বাম রানে বেঁধে দিলে আল্লাহ চাহেতো আছানীর সাথে প্রসব হবে। প্রসব হওয়ার সাথে সাথে সেটি খুলে দিবে।[৪] আয়াতটি এই-

---

১. امداد الفتاوى ج/١ ॥ ২. فتاوى رحيميه ج/٢ ॥ ৩. تربيت اولاد اور اسكے متعلقات ॥ ৪. اعمال قرآنى ॥

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝

(সূরা ইন্‌শিকাক : ১-৪)

প্রসূতি সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা

* প্রসূতিকে অচ্ছ্যুৎ মনে করা ভিত্তিহীন। প্রসূতি কোন পাত্রে পানাহার করলে বা কোন পাত্র স্পর্শ করলে সেটা না ধুয়ে তাতে পানাহার করা যাবে না—এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন।

* নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলেও ৪০ দিন পর্যন্ত নামায পড়া যাবে না—এটাও ভুল ধারণা। ৪০ দিন হল নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ, এর পূর্বেও রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করে নামায পড়া শুরু করবে। গোসলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে। অনেকে মনে করে ৪০ দিন যাওয়ার পূর্বে নামায পড়তে হয় না— এ ধারণা ভুল।

* প্রসূতি গোসল না করা পর্যন্ত তার হাতের কোন কিছু খাওয়া যাবে না—এই ধারণা ভুল।

* ৪০ দিন পর্যন্ত স্বামী প্রসূতি-ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না— এটা আমাদের সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা।

* যে স্থান দেখা জায়েয নয় প্রসূতিকে গোসল দেয়ার সময় ধাত্রী বা অন্য কোন নারীও সে স্থানে সরাসরি হাত লাগিয়ে মর্দন করে দিতে পারবে না বা সে স্থান দেখতে পারবে না। প্রয়োজনে হাতে গেলাফ লাগিয়ে বা কোন কাপড় পেঁচিয়ে কাপড়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মর্দন করে দিতে পারবে।

* প্রসূতিকে গোসল দেয়ার সময় ধুমধাম করা, নাচ-গান করা বা হৈ হুল্লোড় করা সবই কুসংস্কার ও গোনাহের কাজ।

* অনেক স্থানে প্রচলন আছে ৬ দিনের দিন প্রসূতিকে গোসল দিতেই হবে। এই প্রচলন ভিত্তিহীন।

* অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রসূতি ঘরে প্রসূতি নারী মারা গেলে তার আত্মা প্রেতাত্মা হয়ে যায়। এ ধারণা ভুল। বরং হাদীছে এসেছে এ অবস্থায় মৃত্যু হওয়া ফযীলতের। এ অবস্থায় মারা গেলে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে। অতএব যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ হয়, সেটা কখনও খারাপ অবস্থা হতে পারে না।

আযান, নামায ও জামাআত

আযান ও ইকামতের জওয়াব প্রসঙ্গ

* আযান ও ইকামতের জওয়াব দেয়া মোস্তাহাব। নারী-পুরুষ সব জন্যই আযানের জওয়াব দেয়া মোস্তাহাব। পাক-নাপাক সকলেরই আযানের জওয়াব দেয়া মোস্তাহাব। অবশ্য ঋতুবতী মহিলা ও নেফাসও মহিলার জন্য আযানের জওয়াব দেয়ার হুকুম নেই।

* কয়েক স্থানের আযান শোনা গেলে সর্বপ্রথম যে আযান শোনা (নিজের মহল্লার হোক বা ভিন্ন মহল্লার) তার জওয়াব দিলেই যথেষ্ট। সবটার জওয়াব দিতে পারলে ভাল।

* যদি কেউ আযানের জওয়াব না দিয়ে থাকেন এবং বেশ অতিবাহিত না হয়ে থাকে, তাহলে তখন জওয়াব দিবে।

* উযূ করতে থাকা অবস্থায় হলে উযূও করতে থাকবে আয জওয়াবও দিতে থাকবে।[1]

* নিম্নোক্ত অবস্থাগুলিতে আযানের জওয়াব দিবেনা।

১. নামাযের অবস্থায়।

২. হায়েয অবস্থায়।

৩. নেফাসের অবস্থায়।

৪. দ্বীনি ইল্‌ম বা শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল শিখবার বা f দেওয়ার সময়। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতের সময় আযান হলে তেলাও বন্ধ করে তার জওয়াব দেয়া উত্তম বলা হয়েছে।[2]

৫. সহবাস অবস্থায়।

৬. পেশাব-পায়খানার সময়।

৭. খানা খাওয়ার সময়।

* আযানের সময় মুযাজ্জিন যে যে শব্দ বলবে তার জওয়াবে সেই শব্দ বলবে। শুধু حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর জওয়াবে ব لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ আর ফজরের আযানে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ -এর জওয় বলবে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ এবং ইকামতের قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ এর জওয়াবে ব اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا।

---

১. فتاوی محمودیہ ج/۲ ॥ ২. ایضا ॥

* আযানের বাক্যগুলোর জওয়াব দেয়ার পর (আযান শেষ হওয়ার পর) দুরূদ শরীফ পড়বে। তারপর নিম্নোক্ত দুআ পড়া মোস্তাহাব—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَهٗ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান ও অনুষ্ঠিতব্য নামাযের রব, তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দান কর ওছীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁকে পৌঁছাও মাকামে মাহমূদে (প্রশংসনীয় স্থানে) যার ওয়াদা তুমি তাঁর সাথে করেছ, নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না।

* উপরোল্লেখিত দুআ (আযান পরবর্তী দুআ) পড়ার সময় হাত উঠানোর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১] অতএব হাত উঠানো ছাড়াই শুধু মুখে মুখে দুআটি পাঠ করে নিবে।

আযানের সময়কার বিশেষ কয়েকটি আমল

আযানের সময় (বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে) কথা-বার্তা না বলাই উত্তম। চুপ থাকাই মোস্তাহাব।[২]

* আযান শুরু হওয়ার পর ইস্তেন্‌জায় লিপ্ত হবে না, ইস্তেন্‌জাখানায় প্রবেশ করবে না।[৩]

নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা :

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নামায। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত—

اَىُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللهِ ؟ قَالَ اَلصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا. قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম— কোন্ আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নামায। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন্ আমল বেশী প্রিয়? বললেন : মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

---

১. احسن الفتاوى ج/٢ ॥ ২. ايضا ॥ ৩. فتاوى دار العلوم ॥

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর কোন আমল বেশী প্রিয়? বললেন : জেহাদ।

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেছেন আলেমগণের মতে এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের পরে নামাযই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অন্য এক হাদীছে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَلصَّلٰوةُ خَيْرُ مَوْضُوْعٍ . فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرْ . (رواه الطبراني في الاوسط . كذا في كشف الخفاء ومزيل الالباس)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত সর্বোত্তম আমল হল নামায। অতএব যে বেশী বেশী নামায পড়তে সক্ষম সে যেন বেশী বেশী নামায পড়ে।

নামাযের ফযীলত সম্পর্কে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِى الشِّتَآءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ . فَاَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ شَجَرَةٍ . قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ ! قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ : اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتُ ذُنُوْبُهٗ كَمَا تَهَافَتُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ . (رواه احمد باسناد حسن كذا في الترغيب)

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর গিফারী (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময়ে শীতকালে বাইরে তাশরীফ আনলেন। তখন গাছ থেকে পাতা ঝরার মওসুম ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের একটি ডাল হাত দিয়ে ধরলেন ফলে তার পাতা আরও বেশী করে ঝরতে লাগল। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবূ যর! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির আছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন : মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামায আদায় করে, তখন তার থেকে পাপসমূহ ঝরে পড়ে, যেমন এই গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। (আহমদ)

ফায়েদা : শীতকালে গাছের পাতা এত বেশী ঝরে পড়ে যে, কোন কোন গাছের একটি পাতাও অবশিষ্ট থাকে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, এখলাছের সাথে নামায পড়লে এরূপ

সগীরা কোন গোনাহ-ই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এখানে একটি কথা লক্ষণীয় যে, উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, নামাযের দ্বারা শুধু সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়। কবীরা গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। তাই সব ধরনের গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নামাযের সাথে সাথে তওবা-এস্তেগফারের প্রতিও যত্নবান হতে হবে।

ফরয নামাযের ফযীলত ও ফায়দা সম্বন্ধে আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন যে, আমি নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি :

اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ؟ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ . قَالَ فَكَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا . (رواه البخاري ومسلم)

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন : আচ্ছা বল দেখি তোমাদের কারও বাড়ীর সামনে যদি একটি নহর থাকে এবং সেই ব্যক্তি উক্ত নহরে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবাগণ আরয করলেন জ্বি না, কিছুই থাকতে পারে না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও অনুরূপ। আল্লাহ পাক পাঁচ ওয়াক্ত নামায দ্বারা নামাযীর যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেন। (বোখারী ও মুসলিম)

এর বিপরীতে যারা নামায না পড়ে, তাদের সম্পর্কে হাদীছে এসেছে যে, তাদের হাশর হবে ফেরআউন, হামান ও উবাই ইব্‌নে খাল্‌ফ প্রমুখ জঘন্য কাফেরদের সাথে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আম্‌র (রাযি.) বর্ণনা করেন : একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের বিষয় উল্লেখ করে বললেন :

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرٌ وَبُرْهَانٌ وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهٗ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ ابْنِ خَلَفٍ . (اخرجه احمد وابن حبان والطبراني كذا في الدر المنثور للسيوطي)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে, কেয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য নূর হবে এবং হিসেবের সময় নামায তার জন্য দলীল হবে

এবং নামায তার জন্য নাজাতের কারণ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান হবে না। কেয়ামতের দিন তার জন্য কোন নূর ও দলীল হবে না, তার জন্য নাজাতের কোন সনদও থাকবে না; বরং ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খাল্ফ (প্রমুখ জঘন্য কাফেরগণ)-এর সাথে তার হাশর হবে।[১]

আল্লাহ্‌র নিকট নামায গ্রহণযোগ্য করতে হলে সহীহ তরীকায় নামায আদায় করতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক নামায মাসায়েল ও নিয়ম-কানূন অনুযায়ী হতে হবে। নিম্নে নামায পড়ার তরীকা সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হল। তারপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তার সাথে সম্পর্কিত বিশেষ-বিশেষ মাসায়েল ও নিয়ম-কানূন সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হবে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামায পড়ার তরীকা

নিম্নে নামাযে যা যা করতে হয় এবং যেভাবে যেভাবে করতে হয় তার ধারাবাহিক বর্ণনা প্রদান করা হল।

* নামায পড়তে হলে পবিত্র স্থানে দাঁড়ানো ফরয। কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ফরয। দাঁড়ানোর সময় পা দুটো সোজা কেবলামুখী করে রাখা সুন্নাত। দুই পায়ের মাঝখানে ফাঁক না রেখে মিলিত রাখবে।[২] নামাযের নিয়ত বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত হাত ছাড়া অবস্থায় রাখবে। (বাঁধা মাকরূহ)

* উভয় পায়ের উপর সমান ভর করে দাঁড়াবে। শুধু এক পায়ের উপর সম্পূর্ণ ভর করে দাঁড়ানো মাকরূহ।[৩]

* নিয়ত করা[৪] ফরয। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। নিয়ত আরবীতে বলা ভাল।[৫] আরবীতেই নিয়ত করতে হবে— এমন জরুরী মনে করা ঠিক নয়। নিয়তের ক্ষেত্রে প্রচলিত লম্বা চওড়া বাক্য বলা নিষ্প্রয়োজনীয়। যেমন আমাদের দেশে বোগদাদী কায়দা/আমপারায় বিস্তারিত লম্বা চওড়া নিয়ত লিখে দেয়া হয়েছে। এতে মানুষের শরীয়ত কঠিন বলে মনে হয়। এরূপ লম্বা চওড়া নিয়ত বলা প্রয়োজনীয় নয়। বরং ফরযের ক্ষেত্রে শুধু কোন ওয়াক্তের ফরয তার উল্লেখ এবং সুন্নাত নফলের ক্ষেত্রে শুধু নামাযের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট।[৬] নিয়ত বাঁধার সময় কাপড়ের মধ্য থেকে হাত বের করবে না। নিয়ত বাঁধার জন্য হাত সিনা পর্যন্ত উঠাবে এমনভাবে যেন আঙ্গুলের অগ্রভাগ কাঁধ পর্যন্ত উঠে।[৭] হাতের তালু আঙ্গুলের পেটসহ কেবলামুখী রাখা (উপর দিকে নয়)

১. احمد وابن حبان وغیرہ ॥ ২. آپ کے مسائل اور ان کا حل ج/۲ ॥ ৩. شامی ج/۱ ॥ ৫. বেহেশতী জেওর, হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) ॥ ৬. احسن الفتاوی ج/۳ ॥ ৭. شرح منیہ ॥

সুন্নাত। হাতের আঙ্গুলসমূহকে মিলাবে না বরং আঙ্গুলসমূহের মাঝে স্বাভাবিক ফাঁক থাকবে, এটাই সুন্নাত। আল্লাহু আকবার (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলে নিয়ত বাঁধবে। এই তাকবীর (অর্থাৎ, আল্লাহু আকবার) বলা ফরয। এটাকে তাকবীরে তাহরীমা বলে। হাত সিনা পর্যন্ত উঠানোর পর আল্লাহু আকবার বলতে শুরু করা উত্তম। হাত উঠাতে উঠাতে বা হাত উঠানো শুরু করার পূর্বেও 'আল্লাহু আকবার' বলে নেয়া যায়।

* সিনার উপর ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রেখে নিয়ত বাঁধবে। এটা সুন্নাত। সিনার উপর হাত রাখা সম্পূর্ণ হবে, আল্লাহু আকবার বলাও শেষ হবে—এভাবে 'আল্লাহু আকবার' বলা উত্তম। তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় স্বাভাবিকভাবে সোজা দাঁড়ানো থাকবে—মাথা নীচের দিকে ঝুঁকাবে না।

* নিয়ত বাঁধার পর ছানা পড়বে। ছানা পড়া সুন্নাত। ছানা এই :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ.

* ছানা পড়ার পর সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম পড়া সুন্নাত। বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহীম পড়াও সুন্নাত। তারপর সূরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াতে ওয়াকফ করে পড়া উত্তম। সূরা ফাতিহার শেষে 'আমীন' বলা সুন্নাত। আমীন আস্তে বলা সুন্নাত।[১]

* সূরা ফাতেহা পড়ার পর সূরা/কিরাত মিলানোর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া মোস্তাহাব। তারপর সূরা/কিরাত মিলানো ওয়াজিব। 'কেরাত' বলতে বোঝানো হচ্ছে যে কোন সূরার অংশবিশেষ পড়া, পূর্ণাঙ্গ সূরা পড়া নয়।

* প্রতি পরবর্তী রাকআতের সূরা/কিরাত তারতীব অনুযায়ী পড়া অর্থাৎ, সামনের থেকে কোন সূরা/কিরাত পড়া, পেছন দিক থেকে না পড়া। এই তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। এর বিপরীত করলে নামায মাকরূহ হবে তবে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে না। অধিক সহীহ মতানুসারে এতটুকু শব্দে কিরাত পড়তে হবে যেন নিজের পড়ার শব্দ নিজে শুনতে পায়, অন্যথায় সেটা কিরাত বা পড়া বলে গণ্য হবে না। তাকবীর ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ মাসআলা প্রযোজ্য। সূরা اِذَا زُلْزِلَتْ থেকে সূরা নাছ পর্যন্ত এই ছোট সূরাগুলোর ক্ষেত্রে

১. الدر المختار ۱/۳ ॥

পূর্ববর্তী রাকআতে যেটা পড়া হয়েছে পরবর্তী রাকআতে একটা বাদ দিয়ে তার পরেরটা পড়বে না। ফরয এবং ওয়াজিব নামাযে এরূপ করা মাকরূহ। বাদ দিয়ে পড়তে হলে কমপক্ষে দু'টি বাদ দিয়ে পরেরটা পড়া যাবে।

* সূরা/কিরাত শেষ করার পর একটু বিরতি যোগে দম নিয়ে রুকূতে যাবে।[১] রুকূতে যাওয়ার তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা সুন্নাত। আল্লাহু আকবার বলে হাত রুকূতে হাঁটুর দিকে নিয়ে যাবে। হাত সোজা ছেড়ে দিবে না বা পেছনের দিকে ঝাড়া দিবে না। রুকূর জন্য ঝোঁকার সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বলা শুরু করবে এবং রুকূতে যাওয়া পূর্ণ হওয়ার সাথে বলা শেষ হবে। এভাবে আল্লাহু আকবার বলা সুন্নাত। রুকূতে উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিত রেখে হাঁটুর উপর হাত রাখবে, হাঁটু ধরবে না এবং হাতের বাহু পাঁজরের সাথে মিলিত রেখে অল্প ঝুঁকে রুকূ করবে এবং হাঁটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখবে আর পিঠ সামান্য বাঁকা রাখবে।[২] রুকূতে নযর উভয় পায়ের বা পায়ের আঙ্গুলের প্রতি নিবদ্ধ রাখা আদব। রুকূতে দুই পা ও দুই টাখনুকে মিলিয়ে রাখবে।[৩] রুকূতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়া সুন্নাত। এই তাসবীহ তিন/পাঁচ/সাত এরূপ বেজোড় সংখ্যায় পড়া সুন্নাত।

* রুকূর তাসবীহ পড়ে উঠবে। উঠার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে উঠবে। এটা বলা সুন্নাত। সোজা হওয়ার সাথে حَمِدَهٗ বলা শেষ হবে। এভাবে বলা সুন্নাত। রুকূ থেকে সোজা স্থির হয়ে দাঁড়ানো ওয়াজিব। অনেকে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই সাজদায় চলে যায়, এতে ওয়াজিব তরক হয়। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা সুন্নাত।

* তারপর সাজদায় যাবে। সাজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলা সুন্নাত। সাজদার জন্য যখনই ঝোঁকা শুরু করবে, তখন "আল্লাহু" বলা শুরু করবে, আর যমীনে কপাল লাগানোর সাথে "আকবার" বলা শেষ করবে। এভাবে বলা সুন্নাত। সাজদায় যাওয়ার সময় উভয় হাঁটু একত্রে, তারপর উভয় হাত একত্রে, তারপর নাক এবং তারপর কপাল যমীনে রাখবে। এই তারতীব সুন্নাত। ওজরের সময় হাঁটুর পূর্বে হাত রাখতে হলে প্রথমে ডান হাত, তারপর বাম হাত, তারপর উভয় হাঁটু একত্রে রাখবে।[৪] সাজদায় যেতে হাঁটু যমীনে লাগার পূর্বে কোমর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকানো মাকরূহ বরং কোমর সোজা রাখবে।[৫] সাজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ভর

---

১. درس ترمذی ২. احسن الفتاوی ج/٣ ৩. آپ کے مسائل اور ان کا حل ج/٢، بہشتی زیور। ৪. احسن الفتاوی ج/٣। ৫. احسن الفتاوی ج/٣।

করবে না, এতে হাঁটু মাটিতে লাগার পূর্বেই কোমর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে যায়। তদুপরি অনেকে এটাকে সুন্নাত মনে করে বিধায় এ থেকে বিরত থাকা উচিত। সাজদায় যাওয়ার সময় কাপড় নাড়াচাড়া বা টানাটানি করবে না এরূপ করা মাকরূহ। সাজদায় উভয় হাতের মাঝে চেহারার চওড়া পরিমাণ ফাঁক রাখবে। উভয় হাতের সমস্ত আঙ্গুল খুব মিলিয়ে রাখা সুন্নাত। উভয় হাতের সমস্ত আঙ্গুলের অগ্রভাগ কেবলামুখী রাখা সুন্নাত। উভয় হাতের মধ্যখানে বৃদ্ধ আঙ্গুলদ্বয়ের নখ বরাবর নাক রাখবে। কপালের অধিকাংশ ও নাক যমীনের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা ওয়াজিব।[১] সাজদার সময় যদি নাক ও কপাল উভয়টি জমিনে না ঠেকিয়ে শুধু কপাল ঠেকায় তবুও নামায হয়ে যাবে। আর যদি শুধু নাক লাগিয়ে সাজদা করে, কপাল না লাগায়, তাহলে নামায হবে না। হ্যাঁ, কোন সমস্যা থাকলে হয়ে যাবে।[২] মহিলাগণ পুরুষের ন্যায় পা খাড়া রাখবে না বরং তারা উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে[৩] এবং যথাসম্ভব আঙ্গুলের অগ্রভাগ কেবলামুখী করে রাখবে এবং পেট দুই রানের সঙ্গে এবং বাহু পাজরের সঙ্গে মিলিয়ে ও কনুই পর্যন্ত হাত যমীনের সঙ্গে লাগিয়ে খুব চেপে সাজদা করবে। পুরুষের মত সাজদা করবে না। এটা মারাত্মক ভুল। সাজদা অবস্থায় নজর নাকের উপর রাখা আদব। সাজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى পড়া সুন্নাত। এই তাসবীহ তিন/পাঁচ/ সাত—এরূপ বেজোড় সংখ্যায় পড়া সুন্নাত।

* সাজদার তাসবীহ পড়ার পর সাজদা থেকে উঠবে। উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলে উঠা সুন্নাত। উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত যমীন থেকে উঠানো সুন্নাত। কপাল উঠানো থেকে আল্লাহু বলা শুরু করবে এবং সোজা হয়ে বসার সাথে সাথে আকবার বলা শেষ করবে। এটাই সুন্নাত তরীকা।

* বসার সময় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং দুই নিতম্বের উপর বসবে। বসার সময় হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক না রেখে মিলিয়ে রাখা মোস্তাহাব।[৪] হাতের আঙ্গুলগুলো সোজা কেবলামুখী করে রাখা মোস্তাহাব।[৫] হাতের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ হাঁটুর কিনারা বরাবর রাখবে। বসার সময় নযর কোলের উপর নিবদ্ধ রাখা আদব। দুই সাজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা ওয়াজিব। অনেকে স্থির হয়ে না বসেই তাড়াতাড়ি সাজদায়

১. ایضا ৷ ২. البحر الرائق ج/٢ ৷ ৩. شرح منیہ ৷ ১. বেহেশতী জেওর ৷ ২. شرح وقایہ و شرح منیہ ৷

চলে যায়, তাদের ওয়াজিব তরক হয়। দুই সাজদার মাঝখানে নিম্নোক্ত দুআ পড়া মোস্তাহাব :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ۔

* প্রথম সাজদার ন্যায় দ্বিতীয় সাজদা করবে এবং প্রথম সাজদার ন্যায় দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠবে।

* দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে বসা ছাড়াই দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া সুন্নাত। যদি কেউ উঠে বসে তারপর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠে, তাতেও নামাযের কোন ক্ষতি নেই। দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠার সময় হাঁটুর উপর হাতে ভর করে উঠা মোস্তাহাব।[১] সাজদা থেকে কপাল উঠানোর সাথে আল্লাহু বলা শুরু হবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সাথে আকবার শব্দের উচ্চারণ শেষ করবে। এটা সুন্নাত তরীকা।

* দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে বসে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব। এই বসার সময়ও উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং দুই নিতম্বের উপর বসবে এবং হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক না রেখে মিলিয়ে রাখবে।

তাশাহহুদ এই :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ۔

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ۔

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ۔

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

* তাশাহহুদ-এর মধ্যে اَشْهَدُ বলতে বলতে হাতের হলকা বাঁধা অর্থাৎ, ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের অগ্রভাগ এবং মধ্যমার অগ্রভাগকে মিলানো এবং কনিষ্ঠ ও অনামিকাকে হাতের তালুর সঙ্গে মিলানো। এটা মোস্তাহাব। 'লা ইলাহা' বলতে বলতে শাহাদাত আঙ্গুলকে উপর দিকে উঠানো, এতটুকু উঠানো যেন তার অগ্রভাগ কেবলামুখী হয়ে যায়। 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় নীচের দিকে নামানো। তবে বৈঠকের শেষ পর্যন্ত রানের সাথে না মিলিয়ে উঁচু করে রাখা নিয়ম।[২] এই হলকা বৈঠকের শেষ পর্যন্ত রাখবে।[৩]

---

১. احسن الفتاوی ج/٣ ॥ ২. احسن الفتاوی ج/١ ॥ ৩. بہشتی زیور ॥

* দুই রাকআত বিশিষ্ট নামায হলে তাশাহ্হুদের পর দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত। তারপর দুআয়ে মাছূরা পড়া মোস্তাহাব। দুআয়ে মাছূরা পড়ার পর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে উভয় দিকে সালাম ফিরানো ওয়াজিব।[১] সালাম ফিরানোর সময় নযর কাঁধের উপর রাখা মোস্তাহাব।

* ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় ডান দিকের ফেরেশতাকে সালাম করার নিয়ত করবে। অনুরূপ বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের ফেরেশতাকে সালামের নিয়ত করবে। উভয় সালাম চেহারা কেবলামুখী থাকা অবস্থায় শুরু করবে এবং কাঁধে নযর করে শেষ করবে। সালামের সময় ঘাড় এতটুকু ফিরানো যেন পিছনে কেউ থাকলে তার চেহারার উক্ত পাশ দেখতে পারে।[২]

* তিন/চার রাকআত বিশিষ্ট নামায হলে দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠকে শুধু তাশাহ্হুদ পড়ে তৃতীয় রাকআতের জন্য আল্লাহু আকবার বলে উঠবে। আর সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা বা নফল নামায হলে প্রথম বৈঠকে দুরূদ এবং দুআয়ে মাছূরাও পড়ে তারপর উঠা উত্তম। উল্লেখ্য যে, এ নিয়ম অনুযায়ী প্রথম বৈঠকে দুরূদ এবং দুআয়ে মাছূরা পড়ে উঠলে তৃতীয় রাকআতে ছানা এবং সূরা ফাতেহার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়াও উত্তম।

* তিন/চার রাকআত বিশিষ্ট নামায ফরয হলে তৃতীয়/চতুর্থ রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া উত্তম। আর ফরয ব্যতীত অন্যান্য নামাযে তৃতীয়/চতুর্থ রাকআতে সূরা/কিরাত মিলানো ওয়াজিব।

* শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দুরূদ পড়া সুন্নাত এবং দুআয়ে মাছূরা পড়া মোস্তাহাব।

মহিলাদের জামাআত প্রসঙ্গ

মহিলাদের জন্য মসজিদে নয় বরং ঘরেই নামায পড়া উত্তম। মহিলাদের জন্য মসজিদ বা ঈদগাহে জামা'আতে নামায পড়তে যাওয়া মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। সাহাবাদের যুগ থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা চলে আসছে।[৩] তবে কখনও যদি স্বামী, পিতা বা ছেলে প্রমুখ মাহরাম পুরুষ ঘরে জামাআতের সাথে নামায পড়েন, তাহলে তাদের পিছনে এক্তেদা করে নামায পড়তে পারবে। মহিলাগণ ইমামতি করতে পারেন না। উপরোক্ত ক্ষেত্রে তারা মুক্তাদী হয়ে নামায পড়তে

---

১. احسن الفتاوى ج/٣ । ২. بدائع الصنائع ج/١ । ৩. فتاوى دار العلوم ج/٣ نقلا من الدر المختار ।

পারেন। সেক্ষেত্রে মুক্তাদীর জন্য যে সব মাসায়েল রয়েছে, সেগুলো তাদের জানতে হবে। নিম্নে সে সব মাসায়েল পেশ করা হল—

মুক্তাদীর জন্য খাস মাসায়েল

* মুক্তাদী যদি একজন স্ত্রীলোক বা একটি নাবালেগা বালিকা হয় তাহলেও তাকে ইমামের পিছনে দাঁড়াতে হবে; ইমামের পার্শ্বে নয়।

* মুক্তাদীদের মধ্যে বালেগ পুরুষ, নাবালেগ, বালেগা নারী—এরূপ বিভিন্ন প্রকারের লোক থাকলে নিম্নোক্ত নিয়ম ও তারতীব অনুসারে কাতার বাঁধতে হবে। প্রথম পুরুষগণের কাতার, তারপর নাবালেগ ছেলেদের কাতার, তারপর নাবালেগা মেয়েদের কাতার, তারপর বালেগা নারীদের কাতার।

* মুক্তাদী ইমামের পিছনে এক্তেদা করার নিয়ত করবে। এক্তেদার নিয়ত ব্যতীত মুক্তাদীর নামায সহীহ হয় না।

* ইমামের তাকবীরে তাহ্‌রীমা— 'আল্লাহু আকবার' শেষ হওয়ার পূর্বে মুক্তাদীর তাকবীর যেন শেষ না হয়।

* ইমামের তাকবীরে তাহরীমা শেষ হওয়ার পর সাথে সাথে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা উত্তম।

* ইমাম সূরা/কিরাত শুরু করলে মুক্তাদী ছানা পড়বে না।

* মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা বা কিরাত কোনটা পাঠ করবে না। সূরা ফাতিহার পূর্বে শুরুতে পঠিতব্য বিসমিল্লাহও পাঠ করবে না।

* মুক্তাদী سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ না বলে তদস্থলে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতে বলতে উঠবে।[1]

* সালাম ফিরানোর সময় ইমামের আস্‌সালামু বলার পূর্বে মুক্তাদীর আস্‌সালামু বলা যেন শেষ না হয়।

* ইমামের সালাম ফিরানোর পর সাথে সাথে মুক্তাদীর সালাম ফিরানো উত্তম।

* ইমাম ডান দিকে থাকলে ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় ফেরেশতাদের সালাম দেয়ার নিয়তের সাথে সাথে ইমামকে সালাম দেয়ার নিয়তও করবে, বাম দিকে থাকলে বাম সালামে আর সোজা বরাবর থাকলে উভয় সালামেই তাঁর নিয়ত করবে। মহিলাগণ যেহেতু সাধারণভাবে একাকী নামায পড়বেন, তাই তারা একাকী নামায পড়ার সময় শুধু ফেরেশতাদের নিয়ত করবেন।

---

১. مسلم।

দুআ ও মুনাজাত

হাদীছে দুআকে ইবাদতের মগজ বলা হয়। দুআ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তাআলা বান্দার চাওয়াকে খুব পছন্দ করেন। তাই বেশী বেশী আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করা চাই। হাদীছে এসেছে তোমরা সবকিছুই আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে নাও, এমনকি তোমার জুতা/স্যান্ডেলের ফিতা ছিড়ে গেলে তা-ও আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে নাও। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : তোমরা আমার কাছে দুআ কর, আমি কবুল করব।

* দুআ কবুল হওয়ার জন্য খাদ্য-খাবার হালাল হওয়া চাই। মাতা-পিতার নাফরমানী থেকে বিরত থাকা চাই। গীবত, হাছাদ, আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা চাই এবং আদব-তাওয়াজু ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করা চাই।

* দুআর মধ্যে হাত উঠানোর নিয়ম হল হাত-সীনা বা কাঁধ বরাবর উঠাবে। উভয় হাতের তালু আসমানের দিকে রাখবে এবং উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী রাখবে। দুই হাতের মাঝে সামান্য ফাঁক রাখবে।

* দুআর শুরু এবং শেষে আল্লাহ্‌র হামদ ও ছানা (প্রশংসা) বয়ান করবে এবং দুআর শুরু এবং শেষে দুরূদ ও সালাম পাঠ করবে। এ দুটি আমলের জন্য নিম্নোক্ত বাক্য দিয়ে দুআ শুরু করা যায়—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۔

এবং শেষে নিম্নোক্ত বাক্য বলা যায়—

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

* 'আমীন' বলে দুআ শেষ করবে।

* দুআ কবুল হওয়ার জন্য ওলী বা মুত্তাকী হওয়া শর্ত নয়—পাপীদের দুআও আল্লাহ কবুল করে থাকেন। অবশ্য আল্লাহর খাস বান্দাদের দুআ আল্লাহ বেশী কবুল করে থাকেন। অতএব আমি পাপী বা আমি নগণ্য এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে দুআ করা ছেড়ে দেয়া সমীচীন নয়। বরং যত বেশী পাপ হবে, তত বেশী আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমার দুআ করা চাই।

* কয়েকবার দুআ করে হতাশ হয়ে দুআ করা ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। কেননা মানুষের কল্যাণের জন্যই কখনো কখনো দুআ বিলম্বে কবুল হয়।

* দুআ কখনো বৃথা যায় না। কখনও এমন হয় যে, মানুষ যা দুআ করে হুবহু তা পায়। কখনও যা চাওয়া হয় তা না দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য কোন নেয়ামত প্রদান করা হয় অথবা তার থেকে কোন বিপদকে হটিয়ে দেয়া হয় বা দুআর ওছীলায় তার গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় কিংবা দুনিয়াতে যা চাওয়া হয় তা না দিয়ে পরকালের সঞ্চয় হিসেবে তা রেখে দেয়া হয়। মোটকথা দুআ কখনো বৃথা যায় না, তবে তা কবূল হওয়ার প্রক্রিয়া এক নয়।

* সব সময়ই দুআ কবূল করা হয়, তবে এমন কিছু সময় রয়েছে যখন দুআ করলে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে কবূল করে থাকেন। নিম্নে দুআ কবূল হওয়ার এরূপ বিশেষ কিছু মুহূর্তের কথা উল্লেখ করা হল :

দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত

১। ফরয নামাযের পর।
২। শেষ রাতে।
৩। রমযান মাসের দিবারাত্রির সব সময়, বিশেষভাবে ইফতারের সময়।
৪। কোন নেক কাজ সম্পাদনের পর।
৫। সফরের অবস্থায়। বিশেষভাবে যদি আল্লাহর দ্বীনের রাস্তায় সফর হয়।
৬। শবে কদর।
৭। আরাফার দিন।
৮। জুমুআর রাত।
৯। জুমুআর দিন বিশেষ কোন এক মুহূর্তে। অনেকের মতে এ সময়টি জুমুআর দিন আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যে রয়েছে।

কুরআনে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি মুনাজাত

(١) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ۔

(১) হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি রহম না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ : ২৩)

(٢) رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ۔

(২) হে আমাদের রব! আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দাও। আর আমাদেরকে মৃত্যু দাও নেককার লোকদের সাথে। (সূরা আল-ইমরান : ১৯৩)

(৩) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔

(৩) হে আমাদের রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সমস্ত মুমিনকে ক্ষমা কর, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (সূরা ইবরাহীম : ৪১)

(৪) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔

(৪) হে আমার রব! তাদের (মাতা-পিতা) উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন। (বনী ইসরাঈল : ২৪)

(৫) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔

(৫) হে আমাদের রব! আমাদেরকে হেদায়েত করার পর তুমি আমাদের অন্তর সমূহকে বক্র করে দিও না। তুমি তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। (আলু-ইমরান : ৮)

(৬) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ۔

(৬) হে আমার রব! আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে নামায কায়েমকারী বানাও। (সূরা ইবরাহীম : ৪০)

(৭) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔

(৭) হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের স্ত্রীদের থেকে এবং আমাদের সন্তানাদি থেকে আমাদেরকে শান্তি দান কর। আর মুত্তাকীদের জন্য আমাদেরকে নেতা (আদর্শ স্বরূপ) বানিয়ে দাও। (সূরা ফুরকান : ৭৪)

(৮) رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

(৮) হে আমাদের রব! তুমি দুনিয়াতেও আমাদেরকে কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও। আর জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (বাকারা : ২০১)

হাদীছে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি মুনাজাত

(১) اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى۔

(১) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়েত, তাকওয়া, অন্যায় থেকে বিরত থাকার তওফীক এবং মনে অভাববোধ না থাকা ও সম্পদের স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।

(২) اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا۔

(২) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই এমন ইল্‌ম যা উপকার দিবে, এমন আমল যা কবূল হবে এবং হালাল রিযিক।

(৩) اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَآءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ.

(৩) হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র করে দাও, আমার অন্তরকে মুনাফেকী থেকে, আমলকে রিয়া থেকে, যবানকে মিথ্যা থেকে এবং দৃষ্টিকে অন্যায় নজর থেকে। তুমিতো চোখের ফাঁকি এবং অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে খুবই ওয়াকেফহাল।

(৪) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَمَالِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ.

(৪) হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চাই তোমার ভালবাসা এবং তোমাকে যে ভালবাসে তার ভালবাসা। আর এমন আমল, যে আমল আমাকে তোমার ভালবাসায় উপনীত করবে। হে আল্লাহ! আমার জীবন, আমার ধন-সম্পদ এবং আমার পরিবার-পরিজনের চেয়ে এবং ঠাণ্ডা পানির চেয়েও তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে অধিক প্রিয় বানিয়ে দাও।

(৫) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

(৫) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কুফরী থেকে, অভাব-অনটন থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।[১]

নামাযে মনোযোগ সৃষ্টি করার উপায়

১. নামাযে সূরা/কিরাত, দুআ, দুরূদ, ইত্যাদি যা যা পড়া হয় তার প্রত্যেকটা শব্দে শব্দে খেয়াল করে পড়া; বে-খেয়ালীর সাথে মুখস্থ থেকে না পড়া।
২. নামাযের প্রত্যেক রুকন ও কাজ মাসআলা অনুযায়ী হচ্ছে কি না তার প্রতি খুব খেয়াল রেখে আদায় করা।
৩. আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি, আল্লাহ আমার নামাযের সব কিছু দেখছেন, কিয়ামতের দিন এই নামাযের সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তার কাছে দিতে হবে—এই ধ্যান জাগ্রত রাখা।

---

১. হাদীছে বর্ণিত মুনাজাতসমূহ [illegible]।

বুযুর্গানে দ্বীন নামাযে মনোযোগ আনার জন্য কী রকম চিন্তা মনে উপস্থিত করে নামায পড়তেন তা জানার জন্য একটা ঘটনা শুনুন। হযরত হাতেম বলখী (রহ.) একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। একবার হযরত এছাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কীরূপে নামায পড়েন? তিনি বললেন : নামাযের সময় হলে আমি ধীরে-সুস্থে উযূ করি। তারপর জায়নামাযে গিয়ে মনোযোগ সহকারে দাঁড়াই এবং মনে করি যেন কা'বা শরীফ আমার সম্মুখে, আমি পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে আছি, ডান দিকে বেহেশ্ত আর বাম দিকে দোযখ। আযরাঈল আমার মাথার উপর এবং মনে করি এটাই আমার জীবনের শেষ নামায, হয়ত আর কখনও আমার নামায পড়ার সুযোগ হবে না। অতঃপর খুব বিনয়ের সাথে আল্লাহু আকবার বলি এবং অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে কেরাত পড়ি। নম্রতার সাথে রুকূ করি এবং বিনয়ের সাথে সাজদা করি। এভাবে ধীরস্থিরভাবে নামায সমাপ্ত করি এবং আল্লাহ্‌র রহমতের ওছীলায় কবূল হওয়ার আশা রাখি। নিজের বদ আমলের দরুন উহা অগ্রাহ্য হওয়ার আশঙ্কাও করি। হযরত এছাম জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কত বছর যাবত এভাবে নামায পড়ছেন? হাতেম উত্তরে বললেন : ত্রিশ বৎসর যাবত। হযরত এছাম কেঁদে বললেন, আমার একটি নামাযও এভাবে পড়ার সৌভাগ্য হয়নি। (فضائل اعمال)

আমরা নামায পড়তে গেলেই অনেক সময় আমাদের মনে ঘর-সংসারের চিন্তা এসে উপস্থিত হয়, ছেলে-মেয়েদের চিন্তা এসে যায়, অনেক আজে বাজে কল্পনাও এসে যায়। এ জন্য বেশী ঘাবড়ানোর প্রয়োজন নেই। নামাযের সব কিছু ঠিকমত পড়া হচ্ছে কি-না, সবকিছু মাসআলা মোতাবেক হচেছ কি-না সেদিকে চিন্তা নিবেদিত করলেই ধীরে ধীরে অন্য সব চিন্তা দূর হয়ে যাবে এবং মনোযোগিতা এসে যাবে।

ফরয ও ওয়াজিব নামায এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়

ওয়াক্তিয়া নামায

* প্রতিদিন মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। যথা : ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। বিতর নামায ওয়াজিব। নিম্নে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ জরুরী মাসায়েল পেশ করা হল :

ফজরের নামায

* ফজরে দুই রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং দুই রাকআত ফরয।

* সুব্‌হে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত হল ফজরের নামা ওয়াক্ত। তবে আলো পরিষ্কার হওয়ার পর সূর্যোদয়ের এতটুকু পূর্বে না শুরু করা উত্তম যে, সুন্নাত পরিমাণ কিরাত সহকারে নামায আদায় করার যদি নামায ফাসেদ হওয়ার কারণে পুনরায় পড়তে হয়, তাহলে যেন পুন মাছনূন কিরাত যোগে নামায আদায় করা যায়। অর্থাৎ, মোটামুটি সূর্যোদ আধঘণ্টা পূর্বে নামায শুরু করলে উত্তম হয়।

* ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যায়, তবে ন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস দ্বা পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বরকতের নিয়তে এরূপ করা যায়, ত মাঝে-মধ্যে অন্য সূরা দ্বারাও পড়বে যেন ঐ দুই সূরা দ্বারা পড় জরুরী—এরূপ বোধগম্য না হয়।[১]

* ফযরের নামাযে সময় কম থাকার কারণে যদি সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে ফরয পড়ে নেয়া হয়, তাহলে এরূপ ছেড়ে দেয়া সুন্নাত সূর্যোদয়ের পূর্বে প জায়েয নেই। সূর্যোদয়ের পর এবং সূর্য ঢলার পূর্বে পড়ে নেয়া উত্তম, জরু নয়।[২] আর যদি ফজরের ফরযসহ সুন্নাত কাযা হয়ে থাকে এবং সূর্য ঢল পূর্বেই কাযা আদায় করা হয়, তাহলে সুন্নাতসহ কাযা করবে।[৩]

* ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّ رَكْعَتَىْ سُنَّةِ الْفَجْرِ

বাংলায় : ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়ত করছি।

* ফজরের দুই রাকআত ফরযের নিয়ত এভাবে করা যায়।

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّ رَكْعَتَىْ فَرْضِ الْفَجْرِ

বাংলায় : ফজরের দুই রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

যোহরের নামায

* যোহরের নামাযে প্রথমে চার রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, তারপর চার রাকআত ফরয, তারপর দুই রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। সর্বমোট দশ রাকআত।

* সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলার পর থেকে প্রতিটা বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। তবে শীতের মওসুমে ওয়াক্তের শুরুভাগে এবং

১. احسن الفتاوی ج/٣ । ২. احسن الفتاوی ج/٣ । ৩. احسن الفتاوی ج/٣ ।

গরমের মওসুমে দেরীতে পড়া উত্তম। প্রতিটা বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যোহরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত।[১]

* যোহরের চার আকআত সুন্নাতের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكْعَاتِ سُنَّةِ الظُّهْرِ

বাংলায় : যোহরের চার রাকআত সুন্নাতের নিয়ত করছি।

* অসুস্থ ও মা'যূর ব্যক্তিদের জন্য মোস্তাহাব হল জুমুআর জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর যোহরের নামায পড়া (আযান-ইকামত ও জামা'আত ব্যতীত)। মহিলাগণ জুমুআর জামা'আতের পূর্বেও যোহর পড়ে নিতে পারে।[২]

* যোহরের ফরযের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আবরীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ فَرْضَ الظُّهْرِ

বাংলায় : যোহরের ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

আসরের নামায

* আসরে প্রথমে চার রাকআত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা, তারপর চার রাকআত ফরয।

* যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আসরের সময়। তবে সূর্যের হলুদ হয়ে যাওয়ার পর আসরের ওয়াক্ত মাকরূহ হয়ে যায়। এর পূর্ব পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত।

* আসরের ফরয নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ فَرْضَ الْعَصْرِ

বাংলায় : আসরের ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

মাগরিবের নামায

* মাগরিবে তিন রাকআত ফরয, তারপর দুই রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদা।

* সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া থেকে নিয়ে পশ্চিম আকাশের লাল বর্ণ শেষ হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত (অর্থাৎ, প্রায় সোয়া ঘণ্টা)। তবে মাগরিবের নামায দেরী করে পড়া মাকরূহ। আযানের সাথে সাথেই মাগরিবের নামায পড়ে নেয়া উত্তম।[৩]

১. বেহেশতী জেওর: ১ম ॥ ২. احسن الفتاوی ۳/۱۵۶ ॥ ৩. نماز مسنون ও বেহেশতী জেওর ॥

* মাগরিবের ফরয নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ فَرْضَ الْمَغْرِبِ

বাংলায় : মাগরিবের ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

ইশার নামায

* ইশার নামাযে প্রথম চার রাকআত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা, তারপর চার রাকআত ফরয, তারপর দুই রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং দুই রাকআত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ।

* মাগরিবের ওয়াক্তে বর্ণিত "পশ্চিমাকাশের লালবর্ণ" শেষ হওয়ার পর সাদা বর্ণ দেখা যায়, তারপর কালবর্ণ দেখা যায়, হযরত ইমাম আবূ হানীফার মতে এখান থেকে শুরু করে সুব্‌হে সাদেক পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত। কিন্তু রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মোবাহ ওয়াক্ত আর রাত্রের দ্বিপ্রহরের পর থেকে সুব্‌হে সাদেক পর্যন্ত ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত।

* ইশার ফরয নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ فَرْضَ الْعِشَاءِ

বাংলায় : ইশার ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

বিত্‌র নামায

* বিত্‌র নামায ওয়াজিব এবং তিন রাকআত।

* ইশার নামাযের পর থেকে সুব্‌হে সাদেক পর্যন্ত বিত্‌র নামাযের সময়। তবে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পরে পড়া উত্তম। কিন্তু যার শেষ রাতে উঠার অভ্যাস নেই বা উঠতে পারার বিশ্বাস নেই, তার জন্য ইশার পর বিত্‌র পড়ে নেয়া উচিত। প্রথম রাতে পড়ে নিলে আর শেষ রাতে পড়ার অনুমতি নেই।[১]

* বিত্‌র নামাযে সব রাকআতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা/কেরাত মিলানো ওয়াজিব। যে কোন সূরা/কেরাত মিলানো যায়, তবে সূরা আ'লা, কাফেরূন ও ইখলাস দ্বারা পড়া উত্তম। মাঝে-মধ্যে ব্যতিক্রমও করবে।[২]

* বিতরে তৃতীয় রাকআতে সূরা মিলানোর পর তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে আবার হাত বেঁধে দুআয়ে কুনূত পড়তে

১. نماز مسنون । ২. احسن الفتاوى ج/٣ ।

হবে। তারপর রুকু-সাজদা ও বৈঠকপূর্বক নামায শেষ করবে। দুআয়ে কুনূত পড়া ওয়াজিব। দুআয়ে কুনূত এই—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔

* দুআয়ে কুনূত মুখস্থ না থাকলে মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত তদস্থলে নিম্নোক্ত দুআটি পড়বে :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

* বিতরের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ ثَلَاثَ رَكْعَاتِ الْوِتْرِ۔

বাংলায় : তিন রাকআত বিতর পড়ছি।

কছরের নামায

* যদি কোন ব্যক্তি মোটামুটি ৪৮ মাইল (৭৭. ২৪৬৪ অর্থাৎ প্রায় সোয়া সাতাত্তর কিলোমিটার) রাস্তা অতিক্রম করে কোন স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ এলাকার লোকালয় থেকে বের হয়, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় মুসাফির বলা হয়।

* মুসাফির ব্যক্তি পথিমধ্যে ৪ রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামায (অর্থাৎ যোহর, আসর ও ইশার ফরয নামায)-কে ২ রাকআত পড়বে। একে কছরের নামায বলে। ৩ রাকআত বা ২ রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামায, ওয়াজিব নামায এমনিভাবে সুন্নাত নামাযকে পূর্ণ পড়তে হবে। এ হল পথিমধ্যে থাকাকালীন সময়ের বিধান। আর গন্তব্যস্থানে পৌঁছার পর যদি সেখানে ১৫ দিন বা তদূর্ধ্বকাল থাকার নিয়ত হয়, তাহলে কছর হবে না— নামায পূর্ণ পড়তে হবে। আর যদি ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত থাকে, তাহলে কছর হবে। গন্তব্যস্থান নিজের বাড়ি হলে কছর হবে না চাই যে কয় দিনই থাকার নিয়ত হোক।

* মুসাফির ব্যক্তি মুকীম ইমামের পিছনে এক্তেদা করলে পূর্ণ নামাযই পড়তে হয়।

* মুসাফির ব্যক্তির ব্যস্ততা থাকলে ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাত ছেড়ে দেয়া দুরস্ত আছে। ব্যস্ততা না থাকলে সব সুন্নাত পড়তে হবে।

* ১৫ দিন বা তার বেশী থাকার নিয়ত হয়নি এবং পূর্বেই চলে যাবে চলে যাবে করেও যাওয়া হচ্ছে না—এভাবে ১৫ দিন বা তার বেশী থাকা হলেও কছর পড়তে হবে।

নামাযের ফরযসমূহ

নামাযে ১৩ টি ফরয। নামায আরম্ভ করার পূর্বে ৭ টি ও নামায আরম্ভ করার পর ৬ টি কাজ ফরয। নামাযের পূর্বের ৭ টিকে নামাযের শর্ত বলে আর মধ্যের ৬ টিকে নামাযের আরকান বলে। এই শর্ত বা আরকানসমূহের কোন একটিও ছুটে গেলে নামায হবে না। অর্থাৎ, নামাযের কোন একটি ফরয কাজ ছুটে গেলে নামায হবে না, দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে। যেমন: কেউ তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) বলল না কিংবা সাজদা করল না, বা রুকূ করতে ভুলে গেল, এ সমস্ত অবস্থায় নামায হবেই না।

নামাযের শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. সময় মত নামায পড়া। নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে নামায পড়লে নামায হবে না।
২. সর্বপ্রকার নাপাকী থেকে শরীর পবিত্র হতে হবে। অর্থাৎ, উযূ না থাকলে উযূ করে নিতে হবে। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করে নিতে হবে। শরীরে কোন নাপাকী লেগে থাকলে তা ধৌত করতে হবে।
৩. পোশাক-পরিচ্ছদ পাক হতে হবে। কাপড়ে গাঢ় অথবা পাতলা যে কোন প্রকারের নাপাকী লেগে থাকলে ধৌত করতে হবে।
৪. যে জায়গায় নামায পড়বে তা পাক হতে হবে।
৫. সতর বা ঢাকবার স্থান ঢাকতে হবে অর্থাৎ, নামাযীর শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতে হবে। স্ত্রীলোক এমন কাপড় পরিধান করবে যেন দু হাতের কব্জি দু পা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত হয়ে যায়। যে উড়না এত পাতলা যে, তাতে চুল দেখা যায়, তাতে নামায হবে না। স্ত্রীলোকের পায়ের গিট অনাবৃত থাকলে নামায মাকরূহ হবে।
৬. কেবলার দিকে মুখ করতে হয়।
৭. নামাযের নিয়ত করতে হবে। হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা অমুক নামায পড়ছি বলে ইচ্ছে করলে এতেই যথেষ্ট হবে, তবে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা উত্তম, এতে হৃদয়ের আকর্ষণ বেড়ে যায়।

নামাযের আরকান নিম্নরূপ :
১. তাকরীরে তাহরীমা বলা : অর্থাৎ, নামাযের নিয়ত করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা।
২. কিয়াম করা : অর্থাৎ, কোন অসুবিধা না থাকলে দাঁড়িয়ে নামায পড়া।
৩. কিরাত পাঠ করা : পবিত্র কুরআন থেকে কমপক্ষে ৩ ছোট আয়াত অথবা ১ টা বড় আয়াত বা কমপক্ষে যে কোন একটি সূরা পাঠ করতে হবে।
৪. রুকূ করা।
৫. দুই সাজদা করা।
৬. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ বিলম্ব করা।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

* ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযের কোন একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিলে নামায হবে না, সে নামায পুনরায় পড়তে হবে।

* নামাযের কোন একটি ওয়াজিব কাজ ইচ্ছাকৃত নয় বরং ভুলে ছুটে গেলে নামায পুরোপুরি ভঙ্গ হবে না, তবে নামাযের একটি কাজ বাদ পড়ায় এ ঘাটতি মোচন করার জন্য শরীয়ত সাজদায়ে সাহো বা ভুলের সাজদা দেয়ার নিয়ম করেছে। সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হলে সে সাজদা আদায় না করলে দ্বিতীয়বার নামায পড়ে নেয়া ওয়াজিব। সাজদায়ে সাহো আদায় করার নিয়মাবলী সামনে আলোচনা করা হবে।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ নিম্নরূপ :
১. ফরযের প্রথম দুই রাকআত কিরাত পাঠের জন্যে নির্দিষ্ট করা।
২. সূরা ফাতিহা পাঠ করা অর্থাৎ, ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকআতে এবং সুন্নাত ও নফল নামাযের সকল রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।
৩. নফল অথবা বিতর নামাযের সমস্ত রাকআতে সূরা ফাতিহাসহ কোন সূরা বা তিন আয়াত পাঠ করা ওয়াজিব এবং ফরয নামযের শুধু প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহাসহ কোন সূরা বা তিন আয়াত পাঠ করা ওয়াজিব।
৪. প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়া তারপর সূরা-কিরাত পড়া।
৫. নামাযের অঙ্গগুলো ক্রমাগত আদায় করা . অর্থাৎ, অমনোযোগিতা অথবা ভুলবশতঃ নামাযের এক অঙ্গ আদায় করার পর অন্য অঙ্গ আদায় করতে যদি তিন তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব হয়, তখন সাজদায়ে সহো দেয়া

ওয়াজিব হবে। দুআ ইত্যাদি পড়ার মধ্যে যত বিলম্বই হোক না কেন সাজদায়ে সহো দিতে হবে না।

৬. কিয়াম, রুকূ, কিরাত ও সাজদার মধ্যে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে হবে। অর্থাৎ, রুকূর আগে সাজদা অথবা সাজদার আগে কা'দা করলে সাজদায়ে সাহো দেয়া ওয়াজিব হবে।

৭. রুকূ ও সাজদার মধ্যে এতটুকু বিলম্ব করা যাতে একবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى অথবা سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পাঠ করতে পারে। অতি তাড়াতাড়ি করে রুকূ সাজদা করলে নামায হবে না।

৮. কওমা করা। অর্থাৎ, রুকূ করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো। এতে বহুলোক তাড়াহুড়া করে অর্থাৎ, সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই সাজদায় চলে যায়, এরূপ করলে নামায হবে না।

৯. জলসা করা। অর্থাৎ, এক সাজদা করার পর ভাল করে বসা, অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করা।

১০.প্রথম বৈঠকে অর্থাৎ, তিন অথবা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের দুই রাকআত পড়ার পর তাশাহ্হুদ পাঠ করতে পারা যায় এতটুকু সময় বসা।

১১.উভয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ করা। অর্থাৎ, দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযে দ্বিতীয় রাকআতে, তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতে তাশাহ্হুদ পড়তে হবে।

১২.তা'দিলে আরকান। অর্থাৎ, নামাযের অঙ্গগুলো ধীরস্থিরভাবে আদায় করা। কওমা, রুকূ, সাজদা ও জলসা ইত্যাদি শান্ত-শিষ্টভাবে আদায় করা। নামাযের দুআগুলোও ধীরস্থিরভাবে পড়তে হবে যেন কোন কিছু ছুটতে না পারে।

১৩.যে নামাযে কুরআন পাঠ আস্তে করার বিধান আছে, যেমন : যোহর ও আসরের নামাযের কিরাত, আর যে নামাযে জোরে কিরাত পাঠ করার বিধান আছে, যেমন : ফজর, মাগরিব ও ইশা, এগুলোতে যথাক্রমে আস্তে ও জোরে পড়তে হবে। নারীগণ সব নামাযেই কিরাত আস্তে পাঠ করবে।

১৪.'আসসালামু আলাইকুম' বলে নামায শেষ করতে হবে।

১৫.বিতরের তৃতীয় রাকআতে দুআ কুনূত পড়া।

১৬.দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা। তবে জামা'আত অতি বড় হলে তাকবীর ছুটে গেলে অথবা অন্য কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে সাজদায়ে সাহো দিতে হবে না।

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

নামাযের মধ্যে যে সমস্ত কাজ দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায় ও পুনরায় নামায পড়তে হয়, সে কাজগুলো হল :

১. ভুলে বা ইচ্ছা করে কথা বলা ।
২. নামাযরত অবস্থায় সালাম দেয়া অথবা উত্তর দেয়া ।
৩. কেউ হাঁচি দিলে হাঁচির উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা । তবে নামাযে নিজের হাঁচি আসলে ভুল করে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে নামায হয়ে যাবে কিন্তু ইচ্ছে করে এরূপ বলা ঠিক নয় ।
৪. নামাযের বাইরে দুআ করা হলে নামাযের মধ্যে তার উত্তরে 'আমীন' বলা ।
৫. রোগ অথবা অন্য কোন দুঃসংবাদ শুনে 'ইন্নালিল্লাহ' বলা বা অন্য কোন দুআ বলা ।
৬. কোন সুসংবাদ শুনে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা অথবা অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করা ।
৭. আশ্চর্যজনক কোন কথা শুনে 'সুবহানাল্লাহ' বলা অথবা অন্য কোন বাক্য উচ্চারণ করা ।
৮. উহ্-আহ্ শব্দ করা বা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা ।
৯. নামাযে থাকাকালীন নামাযের বাইরে কোন ব্যক্তির কুরআন পাঠে লোকমা দেয়া অর্থাৎ ভুল ধরে দেয়া ।
১০. নামাযের মধ্যে দেখে দেখে কুরআন পাঠ করা ।
১১. কোন পুস্তক অথবা লিখিত বস্তু দেখে পাঠ করা । তবে মনে মনে লিখিত বস্তুর মর্ম বুঝে নিলে নামায ভঙ্গ হবে না, কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয় ।
১২. "আমলে কাছীর" করা অর্থাৎ এমন কোন কাজ করা যা অন্য লোক দেখলে নামাযী বলে বুঝতে না পারে, যেমন দু'হাতে শরীর চুলকানো অথবা পরিধানের কাপড় দু'হাতে ঠিক করা ।
১৩. বিনা প্রয়োজনে জোরে কাশি দেয়া অথবা গলা পরিষ্কার করা ।
১৪. ইচ্ছে করে অথবা ভুল করে কোন বস্তু খাওয়া অথবা পান করা ।
১৫. কুরআন পাঠে ভীষণভাবে অর্থ বিকৃত হয়ে যায় এমন ভুল পড়া ।
১৬. নামাযের ভিতর হাঁটা । তবে প্রয়োজনে দুই-এক কদম আগে-পিছে সরা যায় । সাজদার জায়গা থেকেও আগে বেড়ে গেলে নামায হবে না ।
১৭. কেবলার দিক থেকে অন্য দিকে সীনা ফিরানো । কোন কারণ ব্যতীত মুখ ফিরিয়ে নিলেও নামায মাকরূহ হয়ে যাবে ।

১৮. এক-চতুর্থাংশ সতর এতটুকু সময় খুলে রাখা যতক্ষণ তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা যায়।

১৯. সরাসরি আল্লাহর নিকট এমন বস্তু চাওয়া যা মানুষের নিকট চাওয়া যায়। যেমন খাদ্য-খাবার চাওয়া, টাকা-পয়সা চাওয়া ইত্যাদি।

২০. আল্লাহু এবং আকবার শব্দের আলিফ বা আকবার শব্দের 'বা'-কে লম্বা করা।

২১. জানাযার নামায ব্যতীত অন্য নামাযে অট্টহাসি হাসা।

২২. ইমামের আগে রুকু অথবা সাজদা করে নেয়া।

২৩. একই নামাযে নারী-পুরুষ একত্রে দণ্ডায়মান হওয়া, আর এই দাঁড়ানো এতটুকু বিলম্ব হওয়া যার মধ্যে একবার সাজদা করা যেতে পারে।

২৪. তায়াম্মুমকারী পানি পেয়ে ফেললে।

২৫. পূর্ণ সাজদার মধ্যে উভয় পা যদি মোটেই মাটিতে লাগানো না হয়। তবে পা উঠে গেলে আবার মাটিতে রাখলে অসুবিধা নেই।

২৬. নামাযের মধ্যে সন্তান দুধ পান করলে। তবে দুধ বের না হলে নামায ভাঙবে না, কিন্তু তিন বা ততোধিক বার টানলে দুধ বের না হলেও নামায ভেঙ্গে যাবে।

২৭. স্ত্রী নামাযে থাকা অবস্থায় স্বামী তাকে চুম্বন করলে।

নামাযের মাকরূহসমূহ

যে সমস্ত কাজ দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না, তবে দূষণীয়, সে কাজগুলো নিম্নরূপ :

১. শরীরে চাদর না জড়িয়ে উভয় কাঁধে লটকিয়ে ছেড়ে দেয়া অথবা জামার হাতায় হাত না ঢুকিয়ে কাঁধে নিক্ষেপ করা।

২. কাপড় অথবা কপালে ধুলাবালি লাগার ভয়ে কাপড় টেনে ধরা অথবা মুখে ফুঁক দিয়ে ধুলাবালি সরানো। সাজদার জায়গায় পাথর-কণা থাকলে হাত দিয়ে প্রয়োজনে দু-একবার সরালে কোন দোষ নেই।

৩. নিজের শরীর, কাপড় অথবা চুল নিয়ে খেলা করলে।

৪. এমন কাপড় পরিধান করে নামায পড়া যে কাপড় পরে বাজারে অথবা সভা-সমিতিতে যাওয়া অপছন্দনীয় বোধ হয়।

৫. মুখে এমন জিনিস রেখে নামায পড়া যে বস্তু রাখার ফলে কুরআন পাঠ করা কষ্টকর হয়।

৬. আঙ্গুল মটকানো অথবা এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলে ঢুকিয়ে দেয়া।
৭. বিনা প্রয়োজনে কোমরে হাত ঢুকিয়ে দেয়া কিংবা বিনা প্রয়োজনে কোমরে হাত রাখা।
৮. এদিক-সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।
৯. এমন লোকের দিকে মুখ করে নামায পড়া, যে ব্যক্তি তার দিকে মুখ করে আছে বা এমন স্থানে নামায পড়া যেখানে কেউ হাসিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা আছে।
১০. হাত অথবা মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করে কারও কথার উত্তর দেয়া।
১১. কোন অসুবিধা ব্যতীত হামাগুড়ি দিয়ে বসা বা দুই পা খাড়া রেখে বসা বা আসন গেড়ে বসা। কোন ওজর থাকলে যে রকম সম্ভব বসা চলে।
১২. ইচ্ছে করে হাই তোলা অথবা হাই বন্ধ করার চেষ্টা না করা।
১৩. কোন প্রাণীর ছবি যুক্ত কাপড় পরা অবস্থায় নামায পড়া।
১৪. প্রথম রাকআত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকআতের কিরাত তিন আয়াত বা ততোধিক পরিমাণ লম্বা করা।
১৫. এমনভাবে চাদর জড়িয়ে নামায পড়া, যাতে হাত বের করতে অসুবিধে হয়।
১৬. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোচড়ানো।
১৭. কোন নামাযে বিশেষ সূরা নির্দিষ্ট করে সব সময় সেটা পড়া।
১৮. কুরআনের রীতির বিপরীত কুরআন পাঠ করা। অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের সূরাগুলো যে তারতীবে লেখা হয়েছে এর ব্যতিক্রম পাঠ করা।
১৯. পেশাব-পায়খানার জোর চাপ হওয়া সত্ত্বেও সে অবস্থায় নামায পড়া।
২০. খুব ক্ষুধা অনুভব হলে এবং খাবার তৈরী হলে না খেয়ে নামায পড়া।
২১. নামাযরত অবস্থায় ছারপোকা, মাছি ও পিপড়া মারা। তবে ছারপোকা অথবা পিপড়ায় কামড় দিলে তা ধরে ছেড়ে দেয়া যায়। কামড় না দিলে ধরাও মাকরূহ।
২২. টেলিভিশন (ভিসিআর) চলাকালীন সেখানে নামায পড়া মাকরূহ।[১]
২৩. মূর্তি সামনে রেখে নামায পড়া নাজায়েয।[২]

---

১. آپ کے مسائل اور ان کا حل ج/۲ ۔ ২. ایضا

যে সব অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া যায়

কোন কোন অবস্থায় নিজেই নামায ছেড়ে দিতে হয়, ছেড়ে না দিলে কবীরা গোনাহ হয়। আবার কোন কোন অবস্থায় নামায ছেড়ে না দিলে সামান্য গোনাহ হয়। এগুলো নিম্নরূপ :

১. কোন অনিষ্টকারী প্রাণীর ভয় থাকলে। যেমন নামাযরত অবস্থায় সাপ সামনে আসলে নামায ছেড়ে দিয়ে মারতে হবে অথবা বিচ্ছু ও ভীমরুল কাপড়ের ভিতর ঢুকে গেলে তা দংশন করার ভয় থাকলে এ অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি রয়েছে। তদ্রূপ বিড়ালে মুরগি ধরলে অথবা ধরে ফেলার সম্ভাবনা থাকলে তখন নামায ছেড়ে দেয়া যায়।

২. যদি এমন কোন বস্তুর ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, যার মূল্য অন্ততঃ সাড়ে ৪ রত্তি[১] রূপার সমান, যেমন চুলায় হাঁড়ি থাকলে তা জ্বলে যাওয়ার ভয় থাকলে আর এর মূল্য উক্ত পরিমাণ অথবা তার চেয়ে অধিক হলে তখন নামায ছেড়ে দিয়ে হাঁড়ি নামিয়ে নিতে হবে। এভাবে কুকুর, বিড়াল ও বানর ঘরে ঢুকলে আটা, ডাল, দুধ, ঘি ইত্যাদি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে নামায ছেড়ে দেয়া যাবে। মসজিদে অথবা ঘরে নামায পড়ছে, অথচ কোন বস্তু ভুলবশতঃ এমন স্থানে রেখে এসেছে যেখান থেকে চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তখন নামায ছেড়ে দিয়ে আসবাবপত্র রক্ষা করবে। তবে নামাযীকে নামায আরম্ভ করার পূর্বেই এগুলো রক্ষা করার ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

৩. নামায পড়লে যানবাহন ছেড়ে দেয়ার সম্ভাবনা থাকলে আর গাড়ীতে আসবাবপত্র ও শিশু সন্তান থাকলে বা গাড়ী চলে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে নামায ছেড়ে দিতে পারবে।

৪. নামাযরত অবস্থায় পেশাব-পায়খানার চাপ অসহ্য মনে হলে।

৫. নামাযরত অবস্থায় কাউকে বিপদ বা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন হলে নামায ছেড়ে দেয়া ফরয, নামায ছেড়ে না দিলে কঠিন গোনাহগার হবে। যেমন কোন অন্ধ যাচ্ছে এবং তার সম্মুখে কূপ অথবা গভীর গর্ত রয়েছে অথবা মোটরগাড়ী বা রেলগাড়ীতে পিষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে, অথবা কারও কাপড়ে আগুন লেগে তাতে জ্বলে যাওয়ার অথবা পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে অথবা পানিতে কেউ ডুবে যাচ্ছে অথবা চোর অথবা শত্রু ভীষণভাবে প্রহার করছে এবং সে সাহায্যের জন্য ডাকছে— এসব অবস্থায় নামায ছেড়ে দিয়ে তাকে উদ্ধার করা কর্তব্য, তা না হলে গোনাহগার হতে হবে।

১. ৬ রত্তিতে ১ আনা এবং ১৬ আনায় ১ ভরি হয়ে থাকে ।

৬. মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী কোন বিপদে পড়ে ডাকলে নামায ছেড়ে দিয়ে তাদের কাছে যাওয়া কর্তব্য। যেমন : তাদের কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল অথবা আঘাত পেল এবং তারা ডাকল, এমতাবস্থায় তাদের উদ্ধার করার জন্যে কেউ না থাকলে নামায ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করতে হবে। যদি তাদের কেউ পায়খানা অথবা পেশাব করতে যাচ্ছে, অথচ তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ নেই, তাহলে নামায ছেড়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করতে হবে। তবে তাকে সাহায্য করার লোক রয়েছে অথবা অনর্থক চিৎকার করছে, তখন নামায ছেড়ে দেয়া যাবে না। যদি সে নফল অথবা সুন্নাত নামায পড়তে থাকে আর সে নামায পড়ছে বলে তারা না জানে (বিপদের সময় ডাকুক কিংবা এমনি ডাকুক) তাহলে এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দিয়ে উত্তর দিতে হবে। তবে নামায পড়ছে বলে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও ডাকলে তখন কোন বিপদের ভয় না হলে নামায ছাড়া যাবে না, নতুবা ছেড়ে দিবে।[১]

সাজদায়ে সাহোর মাসায়েল

* নামাযের ওয়াজিবগুলোর মধ্যে কোন একটি বা কয়েকটি ভুলে ছুটে গেলে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হয়। সাজদায়ে সাহো করতেও ভুলে গেলে নামায আবার পড়া ওয়াজিব। এমনিভাবে কোন ফরয ছুটে গেলে বা কোন ওয়াজিব ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলেও নামায আবার পড়তে হবে— সাজদায়ে সাহো দিলে চলবে না।

* সাজদায়ে সাহো করার নিয়ম হল : শেষ রাকআতে তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু...) পড়ে ডান দিকে সালাম ফিরাবে, তারপর নিয়ম মত দুটো সাজদা করে আবার তাশাহ্হুদ দুরূদ ও দুআয়ে মাছূরা পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

* ভুলবশতঃ এক রাকআতে দুই রুকূ বা তিন সাজদা করে ফেললে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে সূরা মিলাতে ভুলে গেলে শেষের দুই রাকআতে সূরা মিলাবে বা প্রথম দুই রাকআতের যে কোন এক রাকআতে সূরা মিলাতে ভুলে গেলে শেষের যে কোন এক রাকআতে সূরা মিলাবে এবং উভয় অবস্থায় সাজদায়ে সাহো করবে। এ নিয়মে শেষের দুই রাকআত বা এক রাকআতে সূরা মিলাতেও যদি ভুলে যায় তবুও সাজদায়ে সাহো করলে নামায হয়ে যাবে।

---

১. مراقی الفلاح مع الطحطاوی ۱

* সূরা ফাতিহা পড়ে কোন্ সূরা মিলাবে এই চিন্তা করতে করতে যদি চুপচাপ অবস্থায় তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে নামাযের যে কোন স্থানে ভুলে বা চিন্তা করার কারণে কোন ফরয বা ওয়াজিব আদায় করতে তিন তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট ওয়াজিব বা ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহ্হুদ এর পর ভুলবশতঃ দুরূদ পড়া শুরু করলে যদি اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ পর্যন্ত বা আরও বেশী পড়ে ফেলে, তাহলে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে। এর কম পড়লে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে না। তবে সুন্নাত ও নফলে প্রথম বৈঠকে দুরূদ পড়াও জায়েয আছে; কাজেই তাতে দুরূদ পড়লে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে না।

* যে কোন নামাযের প্রথম বৈঠকে ভুলে পূর্ণ তাশাহ্হুদ দুই বার পড়লে বা তার এতটুকু অংশ দ্বিতীয়বার পড়লে যা তিন তাসবীহ পরিমাণ হয়ে যায় তাতে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* তাশাহ্হুদের স্থলে ভুলে ছানা বা দুআয়ে কুনূত বা সূরা ফাতিহা পড়লে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* ভুলে সূরা ফাতিহার স্থলে তাশাহহুদ পড়লে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* দুআয়ে কুনূতের স্থলে সূরা ফাতিহা বা তাশাহহুদ পড়লে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হয় না।

* মাসবূক ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেললে সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হবে।

* ফরয নামাযের প্রথম বৈঠক না করেই যদি তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াতে উদ্যত হয় এবং শরীরের নীচের অর্ধেক সোজা হওয়ার পূর্বে বসে পড়ে, তাহলে সাজদায়ে সাহো করতে হবে না। আর নীচের অর্ধেক সোজা হয়ে গেলে আর বসবে না—তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআত পড়ে শেষ বৈঠকে সাজদায়ে সাহো করবে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর বসে তাশাহ্হুদ পড়লে গোনাহ্গার হবে তবে নামায হয়ে যাবে এবং সাজদায়ে সাহো করতে হবে।

* সুন্নাত বা নফল নামাযের প্রথম বৈঠক না করে ভুলে উঠে গেলে তৃতীয় রাকআতের সাজদা না করা পর্যন্ত স্মরণ আসলে বসে যাবে। আর তৃতীয়

রাকআতের সাজদা করার পর স্মরণ এল বসবে না—চার রাকআত পূর্ণ করে বসবে এবং এই উভয় অবস্থায় সাজদায়ে সাহো করলে নামায হয়ে যাবে।

* ফরয নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে শরীরের নীচের অর্ধেক সোজা হওয়ার পূর্বে বসে পড়লে সাজদায়ে সাহো করতে হবে না। আর নীচের অর্ধেক সোজা হয়ে গেলেও বসে যাবে, এমনকি ঐ রাকআতের সাজদা করার আগ পর্যন্ত স্মরণ এলেও বসে পড়বে এবং বসে সাথে সাথে সাজদায়ে সাহো করবে। আর যদি ঐ রাকআতের সাজদা করার পর স্মরণ হয় তাহলে আরও এক রাকআত মিলাবে; তাহলে প্রথম দুই/চার রাকআত ফরয এবং শেষ দুই রাকআত নফল হবে। এ অবস্থায় সাজদায়ে সাহোও করতে হবে। আর যদি ঐ রাকআতে সালাম ফিরায় এবং সাজদায়ে সাহো করে তাহলেও নামায হবে কিন্তু অন্যায় হবে। এ অবস্থায় প্রথম দুই/চার রাকআত ফরয হবে এবং শেষের এক রাকআত বৃথা যাবে।

* শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পূর্বে ভুলে উঠে গেলে শরীরের নীচের অর্ধের সোজা হওয়ার পূর্বে বসে পড়লে সাজদায়ে সাহো করতে হবে না। আর নীচের অর্ধেক সোজা হওয়ার পর স্মরণ এলেও বসে পড়বে, এমনকি আর এক রাকআতের সাজদা করার আগ পর্যন্ত স্মরণ এলেও বসে পড়বে এবং সাজদায়ে সাহো করবে। কিন্তু আর এক রাকআতের সাজদা করে ফেললে আর বসবে না বরং আরও এক রাকআত মিলাবে এবং শেষে সাজদায়ে সহো করবে না এ অবস্থায় সব রাকআত নফল হয়ে যাবে, ফরয পুনরায় পড়তে হবে।

নামাযের মধ্যে রাকআত নিয়ে সন্দেহ হলে তার মাসায়েল

* যদি নামাযের মধ্যে এরূপ সন্দেহ হয় যে, প্রথম রাকআত নাকি দ্বিতীয় রাকআত? তাহলে যে দিকে মন ঝুঁকবে সে দিককে গ্রহণ করবে। যদি কোন এক দিকে মন না ঝুঁকে, তাহলে এক রাকআতই (অর্থাৎ, কমটাই) ধরতে হবে, কিন্তু এই প্রথম রাকআতে বসে তাশাহ্হুদ পড়বে, কেননা হতে পারে প্রকৃতপক্ষে এটাই দ্বিতীয় রাকআত। দ্বিতীয় রাকআতেও বসে তাশাহ্হুদ পড়বে, তৃতীয় রাকআতেও বসে তাশাহ্হুদ পড়বে, (কেননা, হতে পারে প্রকৃতপক্ষে এটাই চতুর্থ রাকআত) তারপর চতুর্থ রাকআতে সাজদায়ে সহো করবে।

* যদি কারও সন্দেহ হয় যে, দ্বিতীয় রাকআত না তৃতীয় রাকআত, তার হুকুমও এইরূপ— যদি মন কোন দিকে না ঝুঁকে তাহলে দ্বিতীয় রাকআত

ধরে নিবে এবং এই রাকআতে বসে তাশাহ্হুদ পড়বে এবং এটা বিতর নামায হলে এ রাকআতেও দুআয়ে কুনূত পড়বে। তৃতীয় রাকআতেও বসবে। তারপর চতুর্থ রাকআতে সাজদায়ে সাহো সহকারে নামায শেষ করবে।

* যদি কারও সন্দেহ হয় যে, তৃতীয় রাকআত না চতুর্থ রাকআত, তাহলে তার হুকুম অনুরূপ— কোন দিকে মন না ঝুঁকলে তিন রাকআত ধরে নিবে কিন্তু এই তৃতীয় রাকআতেও বসে তাশাহ্হুদ পড়তে হবে। তারপর চতুর্থ রাকআতে সাজদায়ে সাহো সহকারে নামায শেষ করবে।

* যদি নামায শেষ করার পর সন্দেহ হয় যে, এক রাকআত কম রয়ে গেল কিনা? তাহলে এই সন্দেহের কোন মূল্য দিবে না, নামায হয়ে গেছে। অবশ্য যদি সঠিকভাবে স্মরণ আসে যে, এক রাকআত কম রয়ে গেছে, তাহলে দাঁড়িয়ে আর এক রাকআত পড়ে নিবে এবং সাজদায়ে সাহো সহকারে নামায শেষ করবে। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে এমন কোন কাজ করে থাকে যাতে নামায ভঙ্গ হয়ে যায় (যেমন কেবলা থেকে ঘুরে বসে থাকা বা কথা বলে থাকা) তাহলে নতুন নিয়ত বেঁধে সম্পূর্ণ নামায পুনরায় পড়তে হবে। আর প্রথম অবস্থায়ও নতুনভাবে নামায দোহরায়ে নেয়া উত্তম, জরুরী নয়।

বিঃদ্রঃ রাকআতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হওয়ার ব্যাপার যদি কারও ক্ষেত্রে কদাচিৎ হয়ে থাকে, তাহলে তার ক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে না বরং তাকে নতুন নিয়ত বেঁধে নামায পড়তে হবে।

* সাজদায়ে সাহো করার পরও যদি সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হওয়ার মত আবার কোন ভুল হয়, তাহলে পুনর্বার সাজদায়ে সাহো করতে হবে না—ঐ পূর্বের সাজদাই যথেষ্ট হবে।

* সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ সাজদায়ে সাহো করে, তাহলে নামায হয়ে যাবে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা ঠিক নয়।

* সাজদায়ে সাহো ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যদি সাজদায়ে সাহো না করে উভয় সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তারপর কোন কথা বলার পূর্বে বা নামায ভঙ্গ হয়—এমন কোন কিছু করার পূর্বে সাজদায়ে সাহোর কথা স্মরণ হয় তাহলে তখনই যদি 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদায়ে সাহো করে তারপর তাশাহ্হুদ, দুরূদ শরীফ ও দুআয়ে মাছুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নেয়, তবুও নামায হয়ে যাবে।

* শেষ বৈঠকে দুরূদ শরীফ পড়ার পর বা দুআয়ে মাছুরা পড়ার পর সালাম ফিরানোর পূর্বে যদি সাজদায়ে সাহোর কথা স্মরণ হয়, তখনই সাজদায়ে সাহো করে নিবে।

কাযা নামাযের মাসায়েল

* কারও কোন ফরয নামায ছুটে গেলে স্মরণ আসামাত্রই কাযা পড়া ওয়াজিব; বিনা ওজরে কাযা করতে বিলম্ব করা পাপ।

* কাযা নামায পড়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই— হারাম ও মাকরূহ ওয়াক্ত ছাড়া যে কোন সময় পড়া যায়।

* কারও যদি এক, দুই, তিন, চার বা পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাযা হয় এবং এর পূর্বে তার কোন কাযা নেই, তাহলে তাকে "ছাহেবে তারতীব" বলে। তাকে দুই ধরনের তারতীব রক্ষা করতে হবে—

(১) ওয়াক্তিয়া নামাযের পূর্বে এই কাযাগুলো পড়ে নিতে হবে, অন্যথায় ওয়াক্তিয়া নামায শুদ্ধ হবে না।

(২) এই কাযা নামাযগুলোও ধারাবাহিকভাবে (আগেরটা আগে এবং পরেরটা পরে) পড়তে হবে। ছাহেবে তারতীবের জন্য এই ধরনের তারতীব রক্ষা করা ফরয। যদি কারও যিম্মায় ছয় বা আরও বেশী ওয়াক্তের কাযা থাকে তাহলে সে কাযা রেখে ওয়াক্তিয়া নামায পড়তে পারে এবং কাযা নামাযগুলিও তারতীব ছাড়া পড়তে পারে, সে ছাহেবে তারতীব থাকে না।

* কারও যিম্মায় ছয় বা ততোধিক নামায কাযা ছিল, সে কারণে সে ছাহেবে তারতীব ছিল না, সে সব কাযা পড়ে ফেলল, তাহলে সে এখন থেকে আবার ছাহেবে তারতীব হবে। অতএব আবার যদি পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত কাযা হয় তাহলে আবার তারতীব রক্ষা করা ফরয হবে।

* বহু সংখ্যক নামাযের অল্প অল্প করে কাযা পড়তে পড়তে পাঁচ ওয়াক্ত বা তার কম চলে আসলেও তারতীব ওয়াজিব হবে না।

* তিন কারণে তারতীব মাফ হয়ে যায়।

(১) ওয়াক্ত যদি এত সংকীর্ণ হয় যে, আগে কাযা পড়তে গেলে ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় থাকে না, তাহলে আগে ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে নিবে।

(২) কাযা নামায যদি পাঁচ ওয়াক্তের অধিক হয়।

(৩) যদি আগে কাযা পড়তে ভুলে যায়।

* শুধু ফরয এবং বিতরের কাযা পড়ার নিয়ম। নফল বা সুন্নাতের কাযা হয় না। তবে কোন নফল বা সুন্নাত শুরু করে পূর্ণ না করেই ছেড়ে দিলে তার কাযা করতে হবে।

উমরী কাযার মাসায়েল

* যদি কোন লোক শয়তানের ধোঁকায় পড়ে জীবনের প্রথম দিকে ক কোন একটা দীর্ঘ সময় বহু নামায ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে সে নিয়মিত নামায পড়া শুরু করে, তাহলে বিগত জীবনের এই ছেড়ে দেয় নামাযগুলো শুধু তওবা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে না, বরং সব নামাযের কাযা পড় ওয়াজিব। সাধারণভাবে জীবনের এরূপ দীর্ঘ ছুটে যাওয়া নামাযের কাযাকে 'উমরী কাযা' বলা হয়।

* বালেগ হওয়ার পর থেকে কত নামায ছুটে গিয়েছে তার একটা হিসাব করে সবগুলোর কাযা করতে হবে। যথাশীঘ্রই সম্ভব এবং যতবেশী করে সম্ভব এই কাযাগুলো পড়ে নিবে। এক এক ওয়াক্তে কয়েক ওয়াক্তের কাযা পড়ে নিতে পারলেও পড়ে নিবে। এক এক ওয়াক্তে কয়েক ওয়াক্তের কাযা পড়ে নিতে পারলে ভাল। যোহরের কাযা যোহরের ওয়াক্তে, আসরের কাযা আসরের ওয়াক্তে এমনিভাবে ওয়াক্তের কাযা সেই ওয়াক্তেই পড়া জরুরী নয়।

* উমরী কাযার নিয়তের মধ্যেও কোন্ নামাযের কাযা করছে তা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। সাধারণভাবে কোন্ দিন কোন্ তারিখের নামায কাযা পড়া হচ্ছে তা মনে করা এবং নির্দিষ্ট করা মুশকিল, তাই নিয়তের মধ্যে নির্দিষ্ট করার সহজ উপায় হল এরূপ নিয়ত করবে—আমার যিম্মায় যতগুলো ফজরের নামায কাযা রয়েছে তার প্রথমটা কাযা করার নিয়ত করছি। এমনিভাবে যোহরের নামাযের কাযা করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ত করবে যে, আমার যিম্মায় যতগুলি যোহরের নামাযের কাযা রয়েছে তার প্রথমটা কাযা করার নিয়ত করছি। এরূপ প্রত্যেক ওয়াক্তের কাযা করার ক্ষেত্রে এ রকম নিয়ত করে কাযা করতে থাকবে।

* আজকাল এক শ্রেণীর লোক বলতে শুরু করেছে উমরী কাযা না পড়লেও চলে, তাদের কথা মারাত্মক ভ্রান্ত।

মাযূর বা অসুস্থ ব্যক্তির নামায

* অসুস্থ থাকার কারণে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম না হলে বসে নামায পড়বে, বসে রুকু করবে এবং উভয় সাজদা করবে। রুকুর জন্য এতটুকু ঝুঁকবে যেন কপাল হাঁটুর কিনারা বরাবর হয়ে যায়।

* রুকু-সাজদা করার ক্ষমতা না থাকলে মাথার ইশারায় রুক-সাজদা করবে। রুকুর তুলনায় সাজদার জন্য মাথা বেশী ঝুঁকাবে। সাজদার জন্য

বালিশ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই, বরং বালিশ ইত্যাদি উঁচু বস্তুর উপর সাজদা করা ভাল নয়।

* দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অনেক কষ্ট হলে বা রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকলে বসে নামায পড়া দুরস্ত আছে।

* কেউ দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকূ-সাজদা করতে সক্ষম নয়, তাহলে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে এবং রুকূ-সাজদার জন্য ইশারা করতে পারে। তবে তার জন্য বসে নামায পড়া উত্তম। রুকূ-সাজদার জন্য ইশারা করবে।

* যদি নিজ ক্ষমতায় বসতে সক্ষম না হয়, কিছুতে হেলান দিয়ে বা টেক দিয়ে বসতে সক্ষম হয়, তাহলে হেলান দিয়ে বসে নামায পড়বে। হাঁটু খাড়া রাখতে পারলে খাড়া রাখবে, নতুবা হাঁটুর নীচে বালিশ দিয়ে হাঁটু উঁচু করে রাখবে, যেন যথাসম্ভব কেবলার দিক থেকে পা ফিরে থাকে।

* যদি হেলান দিয়েও বসতে সক্ষম না হয়, তাহলে মাথার নীচে বালিশ ইত্যাদি দিয়ে মাথা উঁচু করে কেবলামুখী করে দিয়ে নামায পড়বে। এরূপ অবস্থায় মাথা উত্তর দিকে দিয়ে ডান কাতে শুয়ে বা মাথা দক্ষিণ দিকে বাম কাতে শুয়ে কেবলার দিকে মুখ করেও নামায পড়া দুরস্ত আছে। এসব অবস্থায়ই মাথার ইশারায় রুকূ-সাজদা করবে।

* যদি মাথা দ্বারা রুকূ-সাজদার জন্য ইশারা করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে চক্ষুর দ্বারা ইশারায় নামায আদায় হবে না। এরূপ অবস্থায় নামায ফরযও থাকে না। এরূপ অবস্থা ৫ ওয়াক্তের বেশী স্থায়ী হলে তার কাযাও করতে হবে না।

* কারও বেহুশ থাকা অবস্থায় ৫ ওয়াক্তের বেশী নামায ছুটে গেলে তার কাযা করতে হবে না।

* দাঁড়িয়ে নামায শুরু করার পর যদি এমন হয়ে যায় যে, দাঁড়ানোর শক্তি রইল না, তাহলে অবশিষ্ট নামায বসে পড়বে। রুকূ-সাজদা করতে পারলে করবে নতুবা ইশারায় রুকূ-সাজদা করবে। এমনকি বসতে না পারলে শুয়ে শুয়ে অবশিষ্ট নামায আদায় করে নিবে।

* কেউ বসে নামায শুরু করার পর নামাযের মধ্যেই দাঁড়ানোর শক্তি এসে গেছে, তাহলে অবশিষ্ট নামায দাঁড়িয়ে পূর্ণ করবে।

* যদি কেউ মাথার ইশারায় পড়া শুরু করার পর বসে বা দাঁড়িয়ে রুকূ-সাজদা করার মত শক্তি পায়, তাহলে নতুন নিয়ত বেঁধে নতুন করে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে—পূর্বের নামাযের নিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

* রোগী পেশাব-পায়খানার পর পানি দ্বারা এস্তেন্জা করতে সক্ষম না হলে পুরুষ হলে তার স্ত্রী কিংবা স্ত্রী হলে তার স্বামী পানি দ্বারা এস্তেন্জা করিয়ে দিলে ভাল। নতুবা নেকড়ার দ্বারা মুছে ঐ অবস্থায়ই নামায পড়ে নিবে। যদি নেকড়ার দ্বারা মুছবার মত শক্তি না থাকে (এবং পুরুষের স্ত্রী বা স্ত্রীর স্বামী না থাকে) তাহলেও ঐ অবস্থায় নামায পড়ে নিবে।

* রোগীর বিছানা যদি নাপাক হয় এবং বিছানা বদলাতে যদি রোগীর অতিশয় কষ্ট হয় বা ক্ষতি হয়, তাহলে ঐ বিছানাতেই নামায পড়ে নিবে।

* ডাক্তার চক্ষু অপারেশনের পর নড়াচড়া করতে নিষেধ করলে এমতাবস্থায় শুয়ে শুয়ে হলেও নামায পড়ে নিবে।

নামাযের ফেদিয়ার মাসায়েল

* যদি কারও নামায ছুটে গিয়ে থাকে এবং তার কাযা করার পূর্বে মৃত্যু এসে পড়ে, তাহলে মৃত্যুর পূর্বে ঐ সব নামাযের জন্য ফেদিয়া দেয়ার ওছিয়াত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। সাধারণত এই ফেদিয়াকে অনেকে নামাযের ফেতরা বলে থাকে। মাইয়্যেত এই ফেদিয়া দেয়ার ওছিয়াত করে গেলে ওয়ারিছগণ তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এই ফেদিয়া আদায় করবে। পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে ফেদিয়া আদায় হলে তা আদায় করা ওয়ারিছদের উপর ওয়াজিব। এক তৃতীয়াংশের মধ্যে আদায় না হলে যতটুকু অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে তা সকল ওয়ারিছদের সম্মতিতে হতে হবে। তবে না বালেগদের সম্মতি হলেও তার অংশ থেকে নেয়া যাবে না।

* সদকায়ে ফিত্‌র বা ফিতরার পরিমাণ যা, নামাযের ফেদিয়ার পরিমাণও তাই। প্রতি ওয়াক্ত ফরয নামায এবং বিতর নামাযের বদলে এক একটা ফেদিয়া আদায় করতে হবে। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং বিতর নামায এই ছয়টা নামাযের অর্থাৎ, প্রতিদিনের ছয়টা ফেদিয়া আদায় করতে হবে।

* সদকায়ে ফিতির যাদেরকে দেয়া যায়, নামাযের ফেদিয়াও তাদেরকে দেয়া যায়।

* মৃত ব্যক্তির যিম্মায় কাযা রয়ে গেছে, কিন্তু তিনি ওসিয়ত করে যাননি, এমতাবস্থায় তার বালেগ উত্তরসূরিগণ যদি নিজেদের সম্পত্তি থেকে স্বেচ্ছায় তার ফেদিয়া আদায় করেন, তাহলেও আশা করা যায় আল্লাহ এর ওছীলায় মৃতকে ক্ষমা করবেন।

সুন্নাত ও নফল নামায

তারাবীহ্‌র নামায ও তার মাসায়েল

* রমযান মাসে ইশার নামাযের পর ইশার ওয়াক্তের মধ্যে যে বিশ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়তে হয়, তাকে তারাবীহ্‌র নামায বলে ।

* তারাবীহ্‌র নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা ।

* বিশ রাকআত তারাবীহ্ পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা—আট রাকআত নয় ।

* মহিলাদের তারাবীহ্‌র জামা'আত করা মাকরূহ তাহরীমী । মহিলাগণ তারাবীহ্‌র নামায একাকী পড়বেন ।[১]

* প্রতি চার রাকআত তারাবীহ্‌র পর এবং বিশ রাকআতের পর বিতরের পূর্বে চার রাকআত পরিমাণ বিশ্রাম করা মোস্তাহাব । এর কম সময় বিশ্রাম নেয়াও জায়েয আছে ।

* এই বিশ্রামের সময় চুপ করে বসে থাকা জায়েয, তাসবীহ-তাহলীল, তেলাওয়াত, দুরূদ পড়া বা নফল নামায পড়া সবই জায়েয । আমাদের দেশে যে সুবহানা যিল মুলকে ওয়াল মালাকূতি .... তিনবার পড়ার প্রচলন আছে তাও জায়েয, তবে তা-ই পড়া জরুরী নয় বরং এই দুআ কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় । এর চেয়ে سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ বারবার পড়তে থাকা উত্তম । এবং এসব দুআ চিৎকার করে নয় বরং নীরবে (কিংবা স্বল্প শব্দে) পড়া মোনাসেব ।[২]

* প্রত্যেক চতুর্থ রাকআতে মুনাজাত করা জায়েয আছে কিন্তু বিশ রাকআতের পর বিতরের পূর্বে দু'আ করাই উত্তম ।[৩]

* সাধারণতঃ তারাবীহ-এর শেষে মুনাজাত করা হয়

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔الخ

এ মুনাজাত হাদীছের শিখানো মোনাজাত নয় । তবে এর অর্থ ভাল, কেউ চাইলে এটা মুখস্থ করতে পারেন এবং পাঠ করতে পারেন, তবে জরুরী নয় ।

দেখা গেল শরীয়তে তারাবীহ-এর দুআ, তারাবীহ, নামাযের নিয়ত সবই সহজ । শরীয়তে মাসআলাগুলো সহজ রাখা হয়েছিল, অথচ আমরা এগুলোকে কঠিন মনে করে বসেছি । যার ফলে আমাদের মধ্যে অনেক মা-বোনের মনে হতাশা আসছে যে, তারাবীহ-এর দু'আ জানিনা, মুনাজাত জানি

---

১. الدر المختار ॥ ২. فتاوى دار العلوم ج/٤ ॥ ৩. বেহেশতী জেওর ॥

না, কী করে তারাবীহ পড়ব! অথচ এ সব ব্যাপারে শরীয়ত কত সহজ তা জানলে এরকম সমস্যা মনে হত না।

নফল নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা

ফরয নামাযের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। এই হিসাবে পার হতে না পারলে নাজাত পাওয়া যাবে না। তবে ফরয নামাযে যদি কোন ত্রুটি থাকে আর তার নফল নামায পড়া থাকে, তাহলে তার নফল দ্বারা তার ফরযের ত্রুটি পূর্ণ করে দিয়ে তার নাজাতের ব্যবস্থা করা হবে। নফল দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হয়। আমাদের কার নামায এমন হয়, যার মধ্যে কোনই ত্রুটি থাকে না? তাই ফরয নামাযের সাথে নফল নামাযও পড়া চাই। যাতে আমাদের আদায়কৃত নফল দ্বারা আমাদের ফরযের ত্রুটি পূর্ণ হতে পারে এবং আমরা নাজাত পেতে পারি। তদুপরি নফল নামায দ্বারা আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার নৈকট্য লাভ হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلٰوتُهُ . فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ . وَإِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ . وَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ قَالَ الرَّبُّ انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ ـ (رواه الترمذی وحسنه والحاکم وصححه)

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ফরয নামাযের হিসাব হবে। তার নামায ঠিক হলে সে কামিয়াব হবে এবং তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। আর যদি তার নামায ঠিক না হয়, তাহলে সে ব্যর্থ হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয নামাযে কিছুটা ত্রুটি বের হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এই বান্দার কিছু নফল আছে কি না দেখ। যদ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর বান্দার অন্যান্য আমলেরও এই নীতিতে হিসাব হবে।

তাই নফল নামায বেশী বেশী পড়া চাই। বুযুর্গানে দ্বীন কী পরিমাণ নফল পড়তেন তা চিন্তা করতেও অবাক লাগে। হযরত মুয়াযাহ্ আদাবিয়া (রহ.) এক আশ্চর্য রকমের বুযুর্গ মহিলা ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে তিনি হাদীছ শ্রবণ করেছেন। যখন সকাল হত তখন হযরত মুয়াযাহ্ আদাবিয়া

(রহ.) ভাবতেন আজই আমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। এই চিন্তা করে সারা দিন তিনি ঘুমাতেন না। নফল নামায পড়তে থাকতেন। তিনি ভাবতেন যদি ঘুম যাই আর এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তো আমি আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলাম। যখন রাত্রি আসত, তখন তিনি ভাবতেন হয়ত এই রাতেই আমার মৃত্যু এসে যেতে পারে। অতএব যদি ঘুমের অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়, তাহলে তো মৃত্যুর সময় আল্লাহর নামও নিতে পারব না। তাই সারা রাত তিনি জেগে থাকতেন এবং নফল নামায পড়তে থাকতেন। আর নিজের নফসকে বলতেন, "একটু অপেক্ষা কর। ঘুমের সময় তো সামনে আসছে।" অর্থাৎ, মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত ঘুমাতে পারবে। এভাবে তিনি রাত-দিন জাগ্রত থেকে রাত্রদিনে ৬ শত রাকআত নফল নামায পড়তেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আর কোন দিন বিছানায় যাননি।[১]

অতএব বেশী বেশী নফল নামায পড়া চাই। নিম্নে কতিপয় নফল নামাযের বিবরণ প্রদান করা হল :

তাহাজ্জুদের নামায

তাহাজ্জুদ নামাযের অনেক ফযীলত। এক হাদীছে এসেছে :

اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلٰوةٌ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ۔ (رواه احمد. مشكاة)

অর্থাৎ, ফরয নামাযের পর সমস্ত নফল নামাযের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার নামায হল তাহাজ্জুদের নামায।

যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে যেতে পারবেন, তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হলেন তারা, যারা যত্নের সাথে তাহাজ্জুদের নামায পড়েন। কুরআন শরীফে সূরা আলিফ-লাম-সাজদায় খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মু'মিনদের একটা বিশেষ গুণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ۔

অর্থাৎ, তাদের পার্শ্ব বিছানা থেকে আলাদা থাকে। (সূরা সাজদা)

অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এখানে বোঝানো হয়েছে যারা তাহাজ্জুদের নামায পড়েন। ইব্নে কাছীরের এক রেওয়ায়েতে আছে- হাশরের ময়দানে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সব লোককে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেয়া হবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে বিনা হিসেবে জান্নাতে পৌছে দিবেন।

---

১. بہشتی زیور از ترجمہ طبقات شعرانی ۱

বুযুর্গানে দ্বীন সকলেই তাহাজ্জুদের নামাযে যত্নবান থাকেন। হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) একজন বিখ্যাত আল্লাহ্‌র অলী ছিলেন। তিনি সারা রাত ঘুমাতেন। ফর্সা হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি উঠে নিজেকে তিরস্কার করে বলতেন আর কতকাল শয়ন করবে? শীঘ্রই কবরে ঘুমানোর সময় পাবে, সিঙ্গার ফুঁক পর্যন্ত শয়ন করার সময় পাবে। এন্তেকালের সময় তিনি একজন খাদেমকে ওসিয়ত করেছিলেন, আমি যে পশমী পুরাতন কাপড় খানা পরে তাহাজ্জুদ পড়তাম তা দ্বারাই যেন আমার দাফন করা হয়। ওসিয়ত মোতাবেক তাকে সেই পুরাতন কাপড়ে দাফন করা হয়। তারপর একদিন সেই খাদেম স্বপ্নে দেখেন যে, হযরত রাবেয়া বসরী বহু মূল্যবান কাপড়ে সজ্জিত আছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সেই পুরাতন কাফনের কাপড় কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন, আমার আমলের সাথে তা ভাঁজ করে রেখে দেয়া হয়েছে। খাদেমা বলল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন, যত বেশী সম্ভব আল্লাহ্‌র যিকির করতে থাক। কেননা তা দ্বারা তুমি কবরে প্রচুর শান্তি পাবে।[১]

আর এক বুযুর্গ নারীর ঘটনা শুনুন। হযরত উম্মে হারূন (রহ.) আল্লাহ তাআলাকে খুব বেশী ভয় করতেন। শুকনো রুটি খেতেন। আর বলতেন, রাত এলে আমার ভাল লাগে। দিন এলেই অস্থির লাগে। তিনি সারা রাত জাগ্রত থেকে ইবাদতে কাটাতেন। ৩০ বছর পর্যন্ত তিনি মাথায় তেল ব্যবহার করেননি। কিন্তু তিনি যখনই চুল আঁচড়াতেন মাথা তৈলাক্ত মনে হত। এটা ছিল তার কারামত। তার আরও কারামতের কথা জানা যায়। একবার কোন এক জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার সামনে একটা বাঘ এসে পড়ল। বাঘটি সামনে আসতেই তিনি বাঘকে লক্ষ্য করে বললেন: আমি যদি তোমার খাদ্য হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে খেয়ে ফেল। নতুবা আমার পথ ছেড়ে দাও। একথা বলতেই বাঘটি সরে পড়ল। তার মধ্যে আল্লাহ এবং পরকালের ভয় এত বেশী ছিল যে, একবার তিনি বাড়ি থেকে কোন কাজে বের হয়েছেন। এমন সময় কে যেন তাকে বলেছে: ধর। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে কিয়ামতের কথা স্মরণ এসে গেল এবং বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।[২]

নিম্নে তাহাজ্জুদ নামাযের জরুরী মাসায়েল বর্ণনা করা হল:

১. بہشتی زیور وتحفۃ الصالحین । ২. بہشتی زیور ।

* ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত যে নফল নামায পড়া হয় তাকে 'সালাতুল লাইল' বা 'তাহাজ্জুদের নামায' বলা হয়। নফল নামাযের মধ্যে এই প্রকার নফল অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের ফযীলত সবচেয়ে অধিক।

* ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সময়। তবে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়া উত্তম।

* তাহাজ্জুদের নামায ২ থেকে ১২ রাকআত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণতঃ ৮ রাকআত পড়তেন বিধায় এটাকেই উত্তম বলা হয়েছে। পারলে ৮ রাকআত নতুবা ৪ রাকআত আর তা-ও হিম্মত না হলে ২ রাকআত হলেও পড়বে।

* তাহাজ্জুদের নামাযের কাযা নেই, তবে রাতে পড়তে না পারলে পরের দিন দুপুরের পূর্বে অনুরূপ পরিমাণ নফল পড়ে নেয়া উত্তম।[১]

* তাহাজ্জুদের নামায যে কোন সূরা দিয়ে পাঠ করা যায়, তবে কিরাত লম্বা হওয়া উত্তম।

* দুই রাকআত তাহাজ্জুদের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ التَّهَجُّدِ.

বাংলায় : দুই রাকআত তাহাজ্জুদের নিয়ত করছি।

তাহিয়্যাতুল উযূ নামায

* উযূ করার পর অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই[২] দুই রাকআত নফল নামায পড়া উত্তম। এই নামাযকে "তাহিয়্যাতুল উযূ" বা 'শুক্‌রুল উযূ'ও বলা হয়। এই নামাযের অনেক ফযীলত, এমনকি এই নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার কথাও সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযি.)কে বলেছিলেন, কী ব্যাপার জান্নাতে তোমার স্যান্ডেলের আওয়াজ শুনতে পেলাম। অর্থাৎ, তুমি আমার আগেই জান্নাতে পৌঁছে গেলে! হযরত বেলাল (রাযি.) বললেন, আমার তেমন কোন আমল নেই, তবে যখনই আমি উযূ করি, দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল উযূ নামায পড়ে নেই।[৩]

* ফজরের নামাযের ওয়াক্তে বা কোন মাকরূহ কিংবা হারাম ওয়াক্তে এই নামায পড়বে না।

---

১. فتاوی دار العلوم ج ٤ ۲. شامی ۳. بخاری و مسلم

* এই নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ الْوُضُوْءِ

বাংলায় : দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল উযূর নিয়ত করছি ।

* মনে মনে নিয়ত করলেও চলে, তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম ।

ইশ্‌রাক এর নামায

* সূর্য উদয়ের পর যে দুই বা চার রাকআত নফল নামায পড়া হয়, তাকে ইশ্‌রাক-এর নামায বলে । এই নামায দ্বারা এক হজ্ব ও এক উমরার ছওয়াব পাওয়া যায় ।[১]

* সূর্য উদয়ের আনুমানিক ১০/১২ মিনিট পর[২] থেকে ইশ্‌রাকের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকী থাকে । তবে ওয়াক্তের শুরুতেই পড়ে নেয়া উত্তম ।

* ফজরের নামায আদায়ের পর সেই স্থানেই বসে থেকে দুআ দরূদ, যিকির-আযকার ও তাসবীহ তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে; দুনিয়াবী কোন কথা বা কাজে লিপ্ত হবে না এবং সময় হয়ে গেলে ইশ্‌রাকের নামায আদায় করবে । এভাবে ইশ্‌রাক এর নামায আদায় করাতে ছওয়াব বেশী । দুনিয়াবী কথাবার্তা বা কাজে লিপ্ত হয়ে গেলেও সময় হওয়ার পর ইশ্‌রাকের নামায আদায় করা যায়, তবে তাতে ছওয়াব কিছু কমে যায় ।

* ইশ্‌রাকের নামায যে কোন সূরা/কিরাত দিয়ে পড়া যায় ।

* এই নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ الْاِشْرَاقِ

বাংলায় : দুই রাকআত ইশ্‌রাক নামাযের নিয়ত করছি ।

চাশ্‌ত এর নামায

* আনুমানিক ৯/১০ টার দিকে যে নফল নামায পড়া হয়, তাকে সালাতুয যোহা বা চাশ্‌তের নামায (বা আওয়াবীনের নামাযও) বলা হয় । এই নামায ২ রাকআত করে পড়লে তাকে গাফেলদের তালিকাভুক্ত করা হয় না । ৪ রাকআত পড়লে তাকে আবিদীন বা ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত করা হয় । ৬ রাকআত পড়লে ঐ দিন তার (নফল ইবাদতের) জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় ।

---

১. مشکوۃ عن الترمذی । ২. احسن الفتاوی ج/۲ ও نماز مسنون -এর বর্ণনা অনুযায়ী ইশ্‌রাকের ওয়াক্তের এই বিবরণ পেশ করা হল । যদিও সাধারণভাবে সূর্যদয়ের ২৩ মিনিট পরের কথা প্রসিদ্ধ আছে ।

৮ রাকআত পড়লে আল্লাহ তাকে আনুগত্যকারীদের তালিকাভুক্ত করেন, আর ১২ রাকআত পড়লে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর তৈরি করেন।[১]

* ইশ্‌রাক আদায়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত এই নামাযের ওয়াক্ত। তবে দিনের এক-চতুর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অর্থাৎ, আনুমানিক ৯/১০ টার দিকে পড়া উত্তম।

* এই নামায দুই থেকে বার রাকআত। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণতঃ চার রাকআত পড়তেন। মাঝে-মধ্যে বেশীও পড়তেন।

* চাশ্‌ত এর নামায যে কোন সূরা/কিরাত দিয়ে পড়া যায়।

* চাশ্‌তের নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الضُّحٰى

বাংলায় : দুই রাকআত চাশ্‌তের নামাযের নিয়ত করছি।

যাওয়াল বা সূর্য ঢলার নামায

* দুপুরে পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলার পর ৪ রাকআত নফল আদায় করা হয়, তাকে বলা হয় যাওয়ালের নামায বা সূর্য ঢলার নামায। রাসূল (সাঃ) সর্বদা এই নফল আদায় করতেন। সূর্য ঢলার সময় আসমানের রহমতের দরজা খোলা হয় বিধায় তখন এই নফল পড়ার ফযীলত অধিক।[২]

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সালামেই এই ৪ রাকআত নফল আদায় করতেন।[৩]

* চার রাকআত যাওয়াল নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكْعَاتِ الزَّوَالِ

বাংলায় : চার রাকআত যাওয়াল নামাযের নিয়ত করছি।

আওয়াবীন নামায

* মাগরিবের ফরয এবং সুন্নাতের পর কমপক্ষে ৬ রাকআত এবং সর্বাপেক্ষা ২০ রাকআত নফলকে আওয়াবীনের নামায বলা হয়। হাদীছে এই ৬ রাকআত আওয়াবীনের ফযীলতে বার বৎসর ইবাদত করার ছওয়াব অর্জিত

---

১. مجمع الزوائد بحوالہ طبرانی ॥ ২. نماز مسنون ॥ ৩. ایضا ॥

হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। অপর এক হাদীছে ২০ রাকআত পড়লে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর তৈরি করবেন বলা হয়েছে।

* দুই রাকআত আওয়াবীনের নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْاَوَّابِيْنَ

বাংলায় : দুই রাকআত আওয়াবীনের নিয়ত করছি।

সালাতুত তাসবীহ

সালাতুত্ তাসবীহ নামায সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে "শবে বরাত" শীর্ষক আলোচনার মধ্যে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।

এস্তেখারার নামায

* যখন কোন মোবাহ ও জায়েয কাজের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয় (ফরয-ওয়াজিব কিংবা নাজায়েয কাজের জন্য এস্তেখারা নেই।) যেমন কোথায় বিবাহ শাদী করব, বিদেশ যাত্রা করব কিনা, বা হজ্জে কোন্ তারিখে যাব (হজ্জে যাব কি না—এরূপ এস্তেখারা হয় না, কেননা হজ্জ একটা নিশ্চিত ভাল কাজ, অতএব হজ্জে যাব কিনা এরূপ এস্তেখারা হয় না।) ইত্যাদি বিষয়ে মন স্থির করতে না পারলে বিশেষ এক পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করাকে এস্তেখারা বলে।

* **এস্তেখারার তরীকা হল :** দুই রাকআত নফল নামায পড়ে মনোযোগের সাথে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করা, তারপর মনের মাঝে যে দিকে ঝোঁক সৃষ্টি হয় কিংবা যে বিষয়টা অধিক কল্যাণজনক মনে হয়, তাতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে মনে করে সেটা করা। এক দিনে মনের অবস্থা এরূপ না হলে সাত দিন করা। তারপরও মন কোন দিকে না ঝুঁকলে ভাল-মন্দ বিবেচনা পূর্বক কাজ করে ফেললে এস্তেখারার বরকতে এবং আল্লাহ্‌র রহমতে মঙ্গল হবে।

এস্তেখারার দুআ এই :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ . اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ -

(এইখানে هٰذَا الْاَمْرَ বলার সময় নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করবে)

خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ.
وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ.

(এইখানেও هٰذَا الْاَمْرَ বলার সময় নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করবে)

شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ
الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ.

* এস্তেখারার এই লম্বা দু'আ মুখস্থ না থাকলে সংক্ষিপ্ত এই দু'আটি পড়ে নিবে—

اَللّٰهُمَّ خِرْ لِيْ وَاخْتَرْ لِيْ.

* এস্তেখারার উপরোক্ত আরবীতে বর্ণিত দুআটি পড়া উত্তম, না পারলে নিজের ভাষায়ও দু'আ করা যায়।[১]

বি:দ্র: এস্তেখারা রাতের বেলায় করা এবং এস্তেখারার পর শয়ন করা এবং স্বপ্নের মাধ্যমেই এস্তেখারার ফল জানা যাবে—এরূপ জরুরী নয়। এস্তেখারা যে কোন সময় করা যায়। দিনে-রাতে সব সময় এস্তেখারা করা যায়। এস্তেখারার পর শয়ন করাও জরুরী নয়—জাগ্রত অবস্থায়ও তার মন যে কোন এক দিকে ঝুঁকে যেতে পারে, আবার স্বপ্নের মাধ্যমেও কিছু জানতে পারে।[২]

* এস্তেখারার নামায পড়ার সময় না পেলে শুধু দুআ পড়াই যথেষ্ট।

তওবার নামায

কারও থেকে কোন পাপ সংঘটিত হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ পবিত্রতা অর্জন করে ২ রাকআত নফল নামায পাঠপূর্বক আল্লাহ্র নিকট অনুনয়-বিনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিজের পাপের প্রতি অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য পোক্তা ইরাদা করবে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার পাপকে ক্ষমা করবেন। এই নামাযকে 'সালাতুত্তাওবা' অর্থাৎ, তওবার নামায বলে। এই নামাযের জন্য গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব।[৩]

সালাতুল হাজাত নামায

আল্লাহ্র নিকট বা বান্দার নিকট বিশেষ কোন প্রয়োজন হলে কিংবা শারীরিক মানসিক যে কোন পেরেশানী দেখা দিলে উত্তমভাবে উযূ করে

১. اغلاط العلوم । ২. ايضا । ৩. بہشتی زیور ونماز مسنون ।

দুই রাকআত নফল নামায পড়বে। অতঃপর আল্লাহর হামদ ও ছানা (প্রশংসা) এবং দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহর নিকট দুআ করবে। ইনশাআল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ হবে।[১] নিম্নের দুআ পাঠ করতে হবে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ . سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ . لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

সালাতুল হাজতের মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায় তার একটি ঘটনা শুনুন। হযরত যাকারিয়া (রহ.) "নুযহাতুল মাজালিছ" কিতাবের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, বর্ণিত আছে— কুফা নগরে একজন জনপ্রিয় বিশ্বস্ত কুলি ছিল। তার বিশ্বস্ততার কারণে ব্যবসায়ীরা তার মাধ্যমে এক শহর থেকে অন্য শহরে মাল-আসবাব প্রেরণ করত। একবার সেই কুলি কোথাও এক সফরে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একজন লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। লোকটি কুলির নিকট থেকে তার গন্তব্যস্থল জেনে বলল, আমিও সেই শহরে যাব। তবে পায়ে হেঁটে চলা আমার পক্ষে একটু অসম্ভব, আপনি দয়া করে যদি আমাকে আপনার খচ্চরের উপর সওয়ার করে নেন, তাহলে ভাড়াস্বরূপ আমি আপনাকে একটা স্বর্ণমুদ্রা দিব। কুলি লোকটি সম্মত হয়ে তাকে নিজের খচ্চরে উঠিয়ে নিল। পথে একটা বিমুখী রাস্তার মোড়ে পৌঁছে সেই লোকটি কুলিকে জিজ্ঞাসা করল, ভাই কোন্ পথে যাবেন? কুলি পরিচিত পথের কথা জানিয়ে বলল যে, আমি এই পথে যেতে চাই। সেই ব্যক্তি অন্য একটা পথের ব্যাপারে বলল অল্প সময়ে যেতে হলে এই পথে চলুন। তদুপরি খচ্চরের জন্য এ পথে বেশ ঘাসেরও ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে কুলি লোকটি সেই অপরিচিত পথে যেতে সম্মত হল। কিন্তু সেই রাস্তা দিয়ে কিছু পথ অতিক্রম করার পর দেখা গেল সেই রাস্তাটি একটা ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মাথায় শেষ হয়ে গিয়েছে। কুলি আরও দেখতে পেল সেখানে অনেকগুলো মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। উক্ত স্থানে পৌঁছা মাত্রই আরোহী লোকটি খচ্চরের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল এবং তলোয়ার বের করে কুলিকে

১. فضائل نماز للشيخ زكريا ۔١

হত্যা করতে উদ্যত হল। অবস্থা বুঝে কুলি বেচারা লোকটির নিকট জীবন ভিক্ষা চাইল এবং বলল, আমার জীবনের বিনিময়ে আমার খচ্চর এবং ধন-সম্পদ সব নিয়ে নাও, তবুও আমাকে হত্যা করোনা। কিন্তু সেই নির্দয় লোকটি তার কোন কথাই শুনল না। বরং বলল, আমি কছম করে বলছি— প্রথমে তোমাকে হত্যা করব, তারপর তোমার সব কিছু লুণ্ঠন করে নিব। কুলি বেচারা নিরুপায় হয়ে কাতর কণ্ঠে বলল, তাহলে আমাকে শেষ বারের মত দুই রাকআত নামায পড়তে দাও। দস্যু লোকটি তাতে সম্মত হয়ে বলল, ঠিক আছে নামায পড়তে পার, তবে তাড়াতাড়ি পড়ে নাও। কিন্তু মনে রেখ নামায পড়লে তোমার রক্ষা হবে না। তুমি এই সামনে যেসব মৃত লাশ দেখ, তারাও শেষ নামায পড়েছিল কিন্তু নামায তাদেরকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। কুলি বেচারা নামায শুরু করল। কিন্তু কোন আয়াতই তার মনে আসছিল না। ওদিকে সেই দস্যু তাড়াতাড়ি নামায শেষ করার জন্য তা'কীদ দিচ্ছিল। এরূপ চরম সঙ্কটের মুহূর্তে হঠাৎ তার যবান থেকে এই আয়াত উচ্চারিত হল :

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ.

এ আয়াতের অর্থ হল আল্লাহ বলছেন : অসহায় মানুষ যখন আহবান করে, তখন আমি ব্যতীত আর কে তার আহবানে সাড়া দেয়? (সূরা নামল : ৬২)

কুলি কাঁদো-কাঁদো স্বরে এই আয়াত পাঠ করছিল। হঠাৎ সেখানে লোহার পোশাক পরিহিত একজন আরোহীর আবির্ভাব ঘটল। আরোহীটির হাতে ছিল বল্লম। সেই বল্লমের সাহায্যে সে উক্ত দস্যুকে হত্যা করে দিল। দস্যুর মৃতদেহ যেখানে লুটিয়ে পড়ল সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। নামাযরত কুলি তখন বে-এখতিয়ার হয়ে সাজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং আল্লাহর শোকর আদায় করল। তারপর দৌড়ে গিয়ে সেই আরোহীকে জিজ্ঞেস করল, মেহেরবানী করে বলুন, আপনার পরিচয় কী? তিনি বললেন আমি امن يجيب المضطر - আয়াতের গোলাম। এখন তুমি নিরাপদে যথা ইচ্ছা যেতে পার। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

দেখা গেল সালাতুল হাজত নামাযের মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়। হাদীছে এসেছে—

كَانَ اِذَا حَزَبَهٗ اَمْرٌ بَادَرَ اِلَى الصَّلٰوةِ.

অর্থাৎ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যখনই কোন পেরেশানী বা সমস্যা দেখা দিত, তখনই তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য মানুষের দ্বারস্থ না হয়ে আল্লাহ্‌র দ্বারস্থ হতেন। এটা হল নামাযের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের যিন্দেগী।

শোকরের নামায

কোন বিশেষ নেয়ামত পাওয়া বা কোন বিশেষ খুশীর খবর প্রাপ্ত হওয়ার মুহূর্তে শোকরস্বরূপ দুই রাকআত নামায পড়ার প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাওয়া যায়। একে শোকরের নামায বলা হয়। একে 'সাজদায়ে শোকর'ও বলা হয়। আমাদের ইমাম হযরত আবূ হানীফা (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী "সাজদায়ে শোকর" কথাটির মধ্যে 'সাজদা' দ্বারা শুধু সাজদা উদ্দেশ্য নয়, বরং সাজদা বলে রূপক অর্থে নামাযকে বোঝানো হয়েছে। শোকরস্বরূপ এই দুই রাকআত নামায পড়ে নিবে, শুধু সাজদা করা সুন্নাত নয়।[১] তবে সাধারণ ফতওয়া গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী উযূ সহকারে কেবলামুখী হয়ে একটা সাজদা দেয়ার মাধ্যমেও শোকর আদায় করা যায়। যখনই কোন বিশেষ নেয়ামত পাওয়া বা কোন বিশেষ খুশীর খবর পাওয়া যাবে, তখনই উযূ সহকারে কেবলামুখী হয়ে একটা সাজদা প্রদান করবে, তাহলে এই নেয়ামতের শোকর আদায় হয়ে যাবে।

এটা হল আমলের মাধ্যমে শোকর। নেয়ামতের মৌখিক শোকরও রয়েছে, অন্তরের দ্বারাও শোকর আদায় করতে হয়। নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। সবভাবেই নেয়ামতের শোকর আদায় করতে হয়।

সালাতুল খুছূফ (চন্দ্রগ্রহণের নামায)

* চন্দ্রগ্রহণের সময় দুই রাকআত নামায পড়া সুন্নাত। এই নামায নারী পুরুষ প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ ঘরে থেকে পড়বে।

* চন্দ্রগ্রহণের নামাযের জন্য গোসল করা মোস্তাহাব।

* দুই রাকআত সালাতুল খুছূফের নিয়ত এভাবে করা যায়-

আরবীতে : نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْخُسُوْفِ

বাংলায় : দুই রাকআত খুছূফের নামায পড়ছি।

---

১. نماز مسنون ‖

রমযান ও রোযা

রমযান মাসের ফযীলত ও করণীয় বিষয় প্রসঙ্গ

রমযান মাস বছরের সমস্ত মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাস, সবচেয়ে বেশী ফযীলতের মাস, সবচেয়ে বেশী ছওয়াব অর্জন করার মাস। রমযান মাস হল মুসলমানদের ছওয়াব অর্জন করার মৌসুম।

ব্যবসায়ীদের যেমন ব্যবসার সিজন থাকে, যখন তাদের ব্যবসা খুব বেশী হয়, মুনাফা বেশী হয়। তদ্রূপ মু'মিনের জন্য রমযান মাস হল ছওয়াবের মৌসুম, যখন একটা নফল ইবাদতের ছওয়াব একটা ফরযের সমতুল্য হয়ে যায় এবং একটা ফরযের ছওয়াব ৭০ টা ফরযের সমান হয়ে যায়। এমনিতে নফল আর ফরযের মধ্যে কোন তুলনা হয় না। একজন মানুষ যদি এক ওয়াক্ত নামায কাযা করে অর্থাৎ, ওয়াক্ত মত না পড়ে, তাহলে সারা জীবন যদি সে নফল নামায পড়ে, তবুও ঐ ওয়াক্তিয়া ফরয নামাযের সমতুল্য হতে পারবে না। ফরযের মর্যাদাতো এত বেশী। তা সত্ত্বেও বলা হচ্ছে রমযান মাসে একটা নফল ইবাদত করলে একটা ফরযের সমতুল্য হয়ে যাবে। এ হিসেবে চিন্তা করলে বোঝা যায় রমযান মাসে এক একটা আমলের ছওয়াব কত গুণে বর্ধিত হয় তা হিসাব করা কঠিন। তাই রমযান হল ছওয়াব অর্জন করার সময়, রমযান হল ছওয়াব অর্জন করার মৌসুম।

ব্যবসায়ী তার ব্যবসার মৌসুম (সিজন) আসার আগে মনে মনে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নেয় যে, সামনে সিজন আসছে, সিজনকে আমার কাজে লাগাতে হবে, অন্য কোন কাজ আমি বুঝি না, অন্য কোথাও বেড়ানো, অন্য কোথাও ঘোরাঘুরি আমি বুঝি না। সিজনকে আমার কাজে লাগাতে হবে। সিজনের সময় আমি ব্যবসা ছাড়া আর কিছু বুঝি না। রমযানের জন্যও এরকম মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। দুনিয়ার যত ঝামেলা আছে, রমযান আসার পূর্বেই সেসব ঝামেলা থেকে আমরা মুক্ত হয়ে যাব। অন্ততঃ এতটুকু মুক্ত হয়ে যাব যে, রমযানে রোযা রাখতে, রমযানের অন্যান্য ইবাদত যেমন: তারাবীহ পড়া, বিশেষ তেলাওয়াত করা ইত্যাদির জন্য যেন কোন বাধা না থাকে। ঝামেলাগুলি আগেই আমরা সেরে নিব, সব বাধাগুলি আগেই দূর করে নিব।

রমযানের জন্য আগে থেকেই এরকম প্রস্তুতি নেয়ার দিকে ইঙ্গিত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ - الترمذي والحاكم

অর্থাৎ, তোমরা শা'বান মাসের চাঁদ ঠিকমত গণনা করে রাখ। শা'বানের কয় দিন যাচ্ছে আর কয়দিন রমযান আসতে বাকি আছে ঠিকমত খেয়াল রাখ। রমযানের খাতিরে তোমরা এটা কর।

এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, সামনে রমযান আসছে, রমযান আসার আগেই যেন রমযানের জন্য তোমার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে যায়। কেউ যদি আগে থেকেই মনে মনে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তাহলে রোযার সময় আর কোন সমস্যা তার থাকবে না। মনের ইরাদা এবং মনের প্রস্তুতিই হচ্ছে বড় জিনিস। মানুষ যখন মনে মনে কোন বিষয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তখন সে বিষয়টা যত কঠিনই হোক সে করতে পারে। মনের হিম্মত কঠিন কাজকেও সহজ করে দেয়। তাই বলা হয়:

الهِمَّةُ مِنَ الاِسْمِ الأَعْظَمِ

অর্থাৎ, হিম্মত বা মনের সাহস হল এস্‌মে আযম। অর্থাৎ, এক মহা শক্তি। মানুষের মনের পাক্কা ইরাদা বা হিম্মত হল এস্‌মে আযমের মত। কারও ইরাদা যদি মজবুত হয়ে যায়, কেউ যদি হিম্মত করে, তাহলে অনেক কঠিন কাজও সে করে ফেলতে পারে।

রমযানের রোযা রাখার ব্যাপারটাও এরকম। কেউ যদি হিম্মত করে আমি রোযা রাখবই, তাহলে সামান্য একটু গ্যাষ্ট্রিকের ব্যথা, একটু স্বাস্থ্যের দুর্বলতা, এই সব অজুহাত কোন বাধা হতে পারবে না। এই সমস্ত অজুহাত দিয়ে রমযানের রোযা তরক করার কোন অবকাশ নেই। তবে বাস্তবিকই যদি কেউ অসুস্থ হন এবং কোন দ্বীনদার-পরহেজগার ডাক্তার তাকে রোযা না রাখার পরামর্শ দেন, তাহলে রোযা ছাড়া যাবে। তবে এরকম রোযাও পরে সুস্থ হলে কাযা করে নিতে হবে। অনেক সময় ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও হয় না, নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করলেই মন থেকে উত্তর পাওয়া যায় যে, বাস্তবেই আমি রোযা ছাড়ার মত মা'যূর, না কি অসুখের কথা বলি রোযা ছাড়ার বাহানা বের করার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক ব্যাপারে বলতেন: استفت قلبك। অর্থাৎ, তোমার মনের কাছে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করে দেখ। অতএব আমি রোযা রাখতে সক্ষম না অক্ষম তা নিজের মনের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পেয়ে যাব। মানুষকে অনেক কিছু বলে বোঝানো যায় যে, আমার এই ওযর সেই ওযর, কিন্তু মনের ভিতরে চোর

ঢুকানো আছে কিনা তা অন্য কোন মানুষ না দেখলেও আল্লাহ পাক তো দেখবেন।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ, আল্লাহ মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবগত। তাই কোন অহেতুক অজুহাত বের করে রোযা ছাড়লে আল্লাহর কাছে ধরা পড়তে হবে। হাদীছে এসেছে : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَّلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَاِنْ صَامَهُ۔ (ترمذی . ابو داود)

অর্থাৎ, প্রকৃত পক্ষে অসুস্থ নয়, শরীয়ত তাকে রোযা ছাড়ার অনুমতি দেয়নি- এ অবস্থায় কেউ যদি রমযানের রোযা ছাড়ে, তাহলে সারা জীবন সেই রোযা কাযা করতে থাকলেও ঐ ঘাটতি পূরণ হবে না।

এ হাদীছে অনেক কড়া কথা বলা হয়েছে— একটা রোযা কাযা করলে সারা জীবন রোযা রাখলেও সেই ক্ষতিপূরণ হবে না। তাই রোযা রাখার হিম্মত করতে হবে। হিম্মত করলে রোযা রাখা সহজ। হিম্মত না থাকলে কঠিন।

অনেকে এই হিম্মতের অভাবেই তারাবীহও পড়তে পারে না। মনে করে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়তে হবে; ওরে বাবারে, সম্ভব নয়! এভাবে তারা হিম্মত হারিয়ে ফেলে। হিম্মত হারালে চলবে না। তারাবীহ পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং বিশ রাকআত তারাবীহ পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা। বিনা ওজরে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা তরক করা গোনাহ।

বিশ রাকআত তারাবীহ পড়তে আমাদের কত কষ্ট বোধ হয়! অথচ- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা কী ছিল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে হাদীছে স্পষ্ট এসেছে। নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা মোবারক ফুলে যেত। সাহাবায়ে কেরাম তারাবীহর জন্য মসজিদে বসে আছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা থেকে বের হচ্ছেন না, বসতে বসতে মধ্য রাত হয়ে গেছে, সাহাবায়ে কেরাম বসে আছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হবেন, তিনিই তারাবীহ পড়াবেন। এরকম বহু রাতে ঘটেছে। দেখা যায় প্রায় সারাটা রাতই তারাবীহ্ এর জন্য জাগ্রত থাকতে হয়েছে। এই ছিল সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা। আর আমরা কত

দ্রুত তারাবীহ পড়া যায়, কত অল্প সময়ে তারাবীহ শেষ করা যায় সেই চিন্তা করি। আমাদের হিম্মতের অভাবেই এরকম হয়। হিম্মত করলে রোযা রাখাও সহজ, হিম্মত করলে তারাবীহ বড় বড় সূরা দিয়ে ধীরে সুস্থে পড়াও সহজ। হিম্মত করলে ঘরে হাফেজ মাহরামদের দিয়ে খতম তারাবীহ পড়াও সহজ।

হিম্মত না করার কী আছে? কষ্ট মনে করার কী আছে? শুধু আমরা নই। আগের যুগের উম্মতরাও রোযা রেখেছে। তাহলে আমরা কেন পারব না? কুরআন শরীফে তাই বলা হয়েছে :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা, তোমাদের উপর রোযার বিধান দেয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যও এই বিধান দেয়া হয়েছিল। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

মুফাস্সিরীনে কেরাম বলেছেন : এখানে পূর্ববর্তী লোকদের রোযা রাখার কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মানুষ রোযা রাখতে কষ্ট বোধ না করে। কারণ এটা শুধু আমরা নই আগের যুগের লোকেরাও করে আসছে। যখন মানুষ কোন একটা কষ্টের বিষয়ে আরও অনেককে শরীক দেখতে পায়, তখন সে বিষয়টা তার কাছে আর কষ্টকর বোধ হয় না। যেমন ধরুন, একজন মানুষের সামান্য একটু রোগ-ব্যাধি হয়েছে। সে ঘরে বসে কাতরাচ্ছে। ছটফট করছে। তাকে কোন রকমে ধরে একটা হাসপাতালে নিয়ে যান। যখন সে হাসপাতালে গিয়ে দেখবে যে, আমার আর কী অসুবিধা, কত মানুষ আমার চেয়ে জটিল অবস্থায় পড়ে আছে! তখন সে নিজের রোগের কথা ভুলে যাবে। তখন সে মনে করবে যে, আমার রোগতো কিছুই না, এইতো কত লোক কত কষ্টে পড়ে আছে! রোযার ব্যাপারেও তাই বলা হয়েছে : রোযাকে তোমরা কষ্টের মনে করবে কেন? আগের যুগের মানুষওতো রোযা রেখেছে।

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে—যদি কেউ কোন ভাল কাজ করতে চায়, সেটা সে করতে পারে, আল্লাহ পাকই তাকে সেটা করার তাওফীক দান করেন। হাদীছে এসেছে :

وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ. وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللهُ . وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ-

الحديث-(الترمذى)

অর্থাৎ, কেউ যদি চায়, যদি কেউ মনে মনে মজবুত ইরাদা রাখে যে, আমি মানুষের কাছে হাত পাতব না, তাহলে আল্লাহ পাক তাকে মানুষের দ্বারস্থ করেন না। কেউ যদি গোনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়, আল্লাহ্ পাক তাকে গোনাহ মুক্ত পবিত্র জীবন যাপন করার তাওফীক দেন। যদি কেউ ইবাদতের উপর অটল থাকতে চায়, আল্লাহ পাক তাকে ইবাদতের উপর অটল থাকার তাওফীক দান করেন।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে আমরা কোন নেক কাজের মজবুত ইরাদা করলে আল্লাহ পাকই আমাদের জন্য সব ব্যবস্থা করে দিবেন, আল্লাহ পাকই আমাদেরকে সেটা করার তাওফীক দিবেন। কাজেই আমরা যদি মজবুত ইরাদা করে নেই যে, ঠিক মত রোযা রাখব, ঠিকমত তারাবীহ্ আদায় করব, রমযানের হক আদায় করে কুরআন তেলাওয়াত করব, তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এগুলো করার তাওফীক দান করবেন।

রমযান মাস হল মানুষের জীবন গঠন করার মাস। এ মাসে বেশী বেশী ইবাদত করে, বেশী বেশী ছওয়াব অর্জন করে জীবনের গতিকে পরিবর্তন করে দিতে হবে। এ মাসে আল্লাহ ইবাদত-বন্দেগীও বেশী রেখেছেন, ছওয়াবও বেশী বেশী রেখেছেন, যাতে মানুষ নতুনভাবে জীবনকে গঠন করে নিতে পারে। আর মানুষের জীবন গঠন করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল শয়তান, তাই শয়তানকে এ মাসে বেধে রাখা হয়। মানুষকে জীবন গঠন করার বিশেষ সুযোগ দেয়ার জন্যই এটা করা হয়। তাই এ মাসে গোনাহের ওয়াছওয়াছাও অন্য সময়ের তুলনায় কম হয়। কিন্তু বড় শয়তান বাধা থাকলেও নফ্‌ছ শয়তান তো মনের ভিতরে রয়েছে, যাকে নফ্‌ছে আম্মারা বলা হয়। এই নফ্‌ছে আম্মারার পক্ষ থেকে ওয়াছওয়াছা আসতে পারে। ওয়াছওয়াছা আসলে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম' পড়ে নিতে হবে, আল্লাহর কাছে ইবাদত করার তাওফীক চেয়ে নিতে হবে এবং হিম্মত করে আমল শুরু করে দিতে হবে, ইনশাআল্লাহ্ আমল করা আছান হয়ে যাবে।

যদি একান্তই কেউ রোযা রাখতে অপারগ হয়ে থাকেন, রোযা রাখতে না পারেন, তারপরেও বলা হয়েছে : রমযান মাসের সম্মান রক্ষার খাতিরে তিনি প্রকাশ্যে পানাহার করতে পারবেন না এবং এটা প্রকাশ করতে পারবেন না যে, আমি রোযাদার নই। বাস্তবে যে অপারগ, তার জন্যই যেখানে এমন হুকুম, সেখানে কেউ যদি বাস্তবে অপারগ না হয় বরং বাস্তবে সে রোযা রাখতে সক্ষম,

এরপরেও রোযা না রাখে, আবার প্রকাশ্যে পানাহার করে এটা যাহের করে যে, আমি রোযাদার নই, তাহলে এটা রমযানকে চরম অবমাননা করা হয়। এতে তার তিনগুণ পাপ হবে। একটা হল রোযা ছাড়ার পাপ, আরেকটা হল পাপ প্রকাশ করার পাপ, আরেকটা হল রমযানকে অবমাননা করার পাপ।

রমযানে রোযা রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটা মাসআলায় ভুল হয়ে থাকে, এগুলির প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। একটা হল মিসওয়াকের মাসআলা। হাদীছে এসেছে :

মিসওয়াকের মাসআলা

وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّآئِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ۔ (رواه احمد والبيهقى)

অর্থাৎ, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মেশ্‌ক আম্বরের চেয়েও প্রিয়। এ হাদীছ থেকে অনেকে ভুল বুঝে বসেছেন যে, রোযা রাখা অবস্থায় মেসওয়াক করা ভাল নয়, কারণ মেসওয়াক করলে মুখের গন্ধ দূর হয়ে যায়, অথচ এই গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়। তাই মেসওয়াক করা ভাল নয়। আসলে এ হাদীছের উদ্দেশ্য এটা নয় বরং মেসওয়াক করা সুন্নাত, এটা রোযা রাখা অবস্থায় সকালেও যেমন সুন্নাত, দুপুরেও সুন্নাত, বিকালেও সুন্নাত, সব সময়ই সুন্নাত।

ব্রাশ-পেস্টের মাসআলা

আর একটা হল ব্রাশ করার মাসআলা। সাধারণভাবে ব্রাশের সাথে মানুষ পেস্ট ব্যবহার করে থাকে। রোযা অবস্থায় পেস্ট, গুল, মাজন, কয়লা, এই ধরনের জিনিস দ্বারা দাঁত মাজা মাকরূহ্। কারণ, এগুলো গলার ভিতরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি ভিতরে চলে নাও যায়, তবুও মাকরূহ্। আর চলে গেলেতো রোযাই ভেঙ্গে যাবে। অতএব কেউ ব্রাশ করলে পেস্ট ছাড়া ব্রাশ করতে পারেন। তবে উত্তম হল মেসওয়াক ব্যবহার করা। তাহলে মিসওয়াক করার সুন্নাতও আদায় হবে, ডাল ব্যবহার করার সুন্নাতও আদায় হবে। ব্রাশ ব্যবহার করলে মেসওয়াক করার সুন্নাত আদায় হলেও ডাল ব্যবহার করার সুন্নাত আদায় হয় না। তাই মেসওয়াক করাই উত্তম। মেসওয়াক তিতা হলেও কোন অসুবিধা নেই, সেই তিতা গলার মধ্যে অনুভব হলেও কোন অসুবিধা নেই।

বমি করার মাসআলা

আর একটা মাসআলা হল বমি করার মাসআলা। অনেকের রোযা অবস্থায় বমি হয়ে যায়। তখন তিনি মনে করেন যে, আমার রোযা ভেঙ্গে গেছে। এই মনে করে তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি খাওয়া-দাওয়া শুরু করেন। অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। যেমন অনিচ্ছাকৃত কেউ খেয়ে ফেললে রোযা ভাঙ্গে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে রোজা নষ্ট হয়ে যায়।

থুতুর মাসআলা

আর একটা মাসআলা হল থুতুর মাসআলা। স্বাভাবিকভাবে মুখে যে থুতু আসে, সেটা গিলে ফেললে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। অনেক মা-বোনেরা এই মাসআলা না জানার কারণে থুতু ফেলতে ফেলতে বারান্দা-উঠান একাকার করে ফেলেন। এভাবে রোযাকে অহেতুক কষ্টকর বানিয়ে ফেলা হয়। এর কোন প্রয়োজন নেই।

তারাবীহের মাসআলা

তারাবীহ্-এর ক্ষেত্রেও আমরা কিছু মাসআলায় ভুল ধারণার শিকার। যেমন বিশেষভাবে মহিলারা অনেকে তারাবীহ পড়েন না এই অজুহাতে যে, তারাবীহর দুআ মুখস্থ নেই, মুনাজাত মুখস্থ নেই, কীভাবে তারাবীহ পড়ব? চার রাকআত পরপর যে দুআ পড়া হ—সুবহানা যিল মুল্‌কি ওয়াল মালাকূতি ...এই দুআ এবং তারাবীহর শেষে যে মুনাজাত পড়া হয়—আল্লাহুম্মা ইন্না নাছআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযু বিকা মিনান্নার... এই মুনাজাত। এটা মুখস্থ না থাকার কারণে তারা তারাবীহই ছেড়ে দেন। অথচ চার রাকআত পরের এই দুআ এবং এই মুনাজাত কোন জরুরী কিছু নয়। তারাবীহের মধ্যে চার রাকআত পরপর কিছুক্ষণ বিরতি নেয়া মোস্তাহাব। এই বিরতির সময় যে কোন দুআ পড়া যায়। সুবহানাল্লাহ্ পড়া যায়, আলহামদুলিল্লাহ পড়া যায়, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়া যায়, আল্লাহু আক্‌বার পড়া যায়। বরং এগুলিই পড়া উত্তম। কারণ এগুলি হাদীছের শেখানো দুআ। সুব্‌হানাযিল মুল্‌কি ওয়াল মালাকূতি... এই দুআ সাধারণভাবে আমরা অনেকে যেটা পড়ি, এটা হাদীছে আসেনি। এটা এক বুযুর্গ ভাল অর্থ দেখে তৈরি করেছেন। অনেকের পছন্দ লেগেছে তাই পড়ে থাকেন। এটা পড়লে পড়া যায়, কিন্তু এটাই পড়া জরুরী

নয়। আমরা যে কোন দুআ পড়তে পারি। এমনকি কেউ যদি কিছুই না পড়ে চুপচাপ বসে থাকেন, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। আর তারাবীহ শেষে যে মুনাজাত করা হয়—এই মুনাজাতের মধ্যে যে কোন দুআ করা যায়, যে কোন কিছু আল্লাহর কাছে চাওয়া যায়। এখানে নির্দিষ্ট কোন মুনাজাত নেই যে, সেটাই করতে হবে। আরবীতে না পারি নিজের ভাষায়—বাংলাতেও আল্লাহর কাছে দুআ করা যায়। কাজেই তারাবীহর দুআ জানি না, মুনাজাত জানি না— এই অজুহাতে তারাবীহ ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে না। আসলে ইচ্ছা থাকলে মানুষ অজুহাত খোঁজে না, বরং উপায় তালাশ করে।

তারাবীহ এবং রোযা সম্পর্কিত জরুরী আরও অনেক মাসআলা রয়েছে। নিম্নে জরুরী কিছু মাসায়েল লিখে দেয়া হল :

রমযানের রোযা

* সুবহে সাদেক (সেহ্‌রীর শেষ সময় ও ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সময়) থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে ইচ্ছাকৃতভাবে পান, আহার ও যৌনতৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়। প্রত্যেক আকেল (বোধ সম্পন্ন), বালেগ ও সুস্থ নর-নারীর উপর রমযানের রোযা রাখা ফরয।

* ছেলে-মেয়ে দশ বৎসরের হয়ে গেলে তাদের দ্বারা (শাস্তি দিয়ে হলেও) রোযা রাখানো কর্তব্য। এর পূর্বেও শক্তি হলে রোযা রাখার অভ্যাস করানো উচিত।

রোযার নিয়তের মাসায়েল

* রমযানের রোযার জন্য নিয়ত করা ফরয। নিয়ত ব্যতীত সারাদিন পানাহার ও যৌনতৃপ্তি থেকে বিরত থাকলেও রোযা হবে না।

* মুখে নিয়ত করা জরুরী নয়। অন্তরে নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে, তবে মুখে নিয়ত করা উত্তম।

* মুখে নিয়ত করলেও আরবীতে হওয়া জরুরী নয়— যে কোন ভাষায় নিয়ত করা যায়। নিয়ত এভাবে করা যায়—

আরবীতে : بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ অথবা نَوَيْتُ بِصَوْمِ الْيَوْمِ

বাংলায় : আমি আজ রোযা রাখার নিয়ত করলাম।

* সূর্য ঢলার দেড় ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত রমযানের রোযার নিয়ত করা দুরস্ত আছে, তবে রাতেই নিয়ত করে নেয়া উত্তম।[১]

* রমযান মাসে অন্য যে কোন প্রকার রোযা বা কাযা রোযার নিয়ত করলেও এই রমযানের রোযা আদায় হবে— অন্য যে রোযার নিয়ত করবে সেটা আদায় হবে না।

* রাতে নিয়ত করার পরও সুব্হে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও যৌনকর্ম জায়েয।

সেহ্রীর মাসায়েল

* সেহ্রী খাওয়া জরুরী নয় তবে সেহ্রী খাওয়া সুন্নাত, অনেক ফযীলতের আমল। তাই ক্ষুধা না লাগলে বা খেতে ইচ্ছে না করলেও সেহ্রীর ফযীলত হাছেল করার নিয়তে যা-ই হোক কিছু পানাহার করে নিবে।

* নিদ্রার কারণে সেহ্রী খেতে না পারলেও রোযা রাখতে হবে। সেহ্রী না খেতে পারায় রোযা না রাখা অত্যন্ত পাপের কাজ।

* সেহ্রীর সময় আছে বা নেই— এ নিয়ে সন্দেহ হলে সেহ্রী না খাওয়া উচিত। এরূপ সময়ে খেলে রোযা কাযা করা ভাল। আর যদি পরে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন সেহ্রীর সময় ছিল না, তাহলে কাযা করা ওয়াজিব।

* সেহ্রীর সময় আছে মনে করে পানাহার করল, অথচ পরে জানা গেল যে, তখন সেহ্রীর সময় ছিল না, তাহলে রোযা হবে না; তবে সারাদিন তাকে রোযাদারের ন্যায় থাকতে হবে এবং রমযানের পর ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে।

* বিলম্বে সেহ্রী খাওয়া উত্তম। আগে খাওয়া হয়ে গেলেও শেষ সময় নাগাদ কিছু চা-পানি ইত্যাদি পানাহার করতে থাকলেও বিলম্বে সেহ্রী করার ফযীলত অর্জিত হবে।

ইফ্তার-এর মাসায়েল

* সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ইফতার করা মোস্তাহাব। বিলম্বে ইফতার করা মাকরূহ।

---

১. جواہر الفقہ ج/۱ ।

* মেঘের দিনে কিছু দেরী করে ইফতার করা ভাল। মেঘের দিনে ঈমানদার ব্যক্তির অন্তরে সূর্য অস্ত গিয়েছে বলে সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত সবর করা ভাল। শুধু ঘড়ি বা আযানের উপর নির্ভর করা ভাল নয়, কারণ তাতে ভুলও হতে পারে।

* সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা পর্যন্ত ইফতার করা দুরস্ত নেই। সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরই ইফতার করতে হবে।

* সবচেয়ে উত্তম হল খোরমার দ্বারা ইফতার করা, তারপর কোন মিষ্টি জিনিস দ্বারা, তারপর পানি দ্বারা।

* অনেকে মনে করেন নেমক (লবণ) দ্বারা ইফতার শুরু করা উত্তম— এই ধারণা ভুল।

* ইফতার করার পূর্বে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে। দু'আ পাঠ করা মোস্তাহাব।

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

* ইফতার করার পর নিম্নের দু'আ পাঠ করবে—

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَآءَ اللهُ

* ইফতার-এর সময় দুআ কবূল হয়, তাই ইফতারের পূর্বে বা কিছু ইফতার করে বা ইফতার থেকে সম্পূর্ণ ফারেগ হয়ে দু'আ করা মোস্তাহাব।[১]

* পশ্চিম দিকে প্লেনে সফর শুরু করার কারণে যদি দিন লম্বা হয়ে যায় তাহলে সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূর্যাস্ত ঘটলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইফতার বিলম্ব করতে হবে, আর ২৪ ঘন্টার মধ্যেও সূর্যাস্ত না ঘটলে ২৪ ঘন্টা পূর্ণ হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে ইফতার করে নিবে।[২]

* পূর্বদিকে প্লেনে সফর করলে যখনই সূর্যাস্ত পাবে তখনই ইফতার করবে।

যে সব কারণে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না

১. মেসওয়াক করা। যে কোন সময় হোক, কাঁচা হোক বা শুষ্ক।

২. শরীর বা মাথায় তেল লাগানো।

৩. চোখে সুরমা লাগানো বা কোন ঔষধ দেয়া।[৩]

৪. খুশবু লাগানো বা তার ঘ্রাণ নেয়া।

---

১. جواہر الفتاوی ج/۱ ॥ ২. احسن الفتاوی ج/۴ ॥ ৩. احسن الفتاوی ॥

৫. ভুলে কিছু পান করা বা আহার করা।

৬. গরম বা পিপাসার কারণে গোসল করা বা বারবার কুলি করা।

৭. অনিচ্ছাবশতঃ গলার মধ্যে ধোঁয়া, ধুলাবালি বা মাছি ইত্যাদি প্রবেশ করা।

৮. কানে পানি দেয়া বা অনিচ্ছাবশতঃ চলে যাওয়ার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে সতর্কতা হল সে রোযা কাযা করে নেয়া।[১]

৯. অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হওয়া। ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প বমি করলে মাকরূহ হয় না, তবে এরূপ করা ঠিক নয়।

১০. স্বপ্নদোষ হওয়া।

১১. মুখে থুতু আসলে গিলে ফেলা।

১২. যে কোন ধরনের ইনজেকশন বা টিকা লাগানো।[২] তবে রোযার কষ্ট যেন বোধ না হয়—এ উদ্দেশ্যে শক্তির ইনজেকশন বা স্যালাইন লাগানো মাকরূহ।[৩]

১৩. রোযা অবস্থায় দাঁত উঠালে এবং রক্ত পেটে না গেলে।

১৪. পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য রক্ত সব সময় বের হতে থাকে এবং গলার মধ্যে যায় তার কারণে।[৪]

১৫. সাপ ইত্যাদি দংশন করলে।[৫]

১৬. পান খাওয়ার পর ভালভাবে কুলি করা সত্ত্বেও যদি থুতুতে লালভাব থেকে যায়।

১৭. শাহওয়াতের সাথে শুধু নযর করার কারণেই যদি বীর্যপাত ঘটে যায় তাহলে রোযা ফাসেদ হয় না।

১৮. রোযা অবস্থায় শরীর থেকে ইনজেকশনের সাহায্যে রক্ত বের করলে রোযা ভাঙ্গে না এবং এতে রোযা রাখার শক্তি চলে যাওয়ার মত দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকলে মাকরূহও হয় না।[৬]

যে সব কারণে রোযা ভাঙ্গে না তবে মাকরূহ হয়ে যায়

১. বিনা প্রয়োজনে কোন জিনিস চিবানো।

২. তরকারী ইত্যাদির লবণ চেখে ফেলে দেয়া। তবে কোন চাকরের মুনিব বা কোন নারীর স্বামী বদ মেজাযী হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে লবণ চেখে তা ফেলে দিলে এতটুকু অবকাশ আছে।

---

১. جواہر الفتاوی । ২. ایضا । ৩. ایضا । ৪. فتاوی رحیمیہ ج/٣ । ৫. ایضا । ৬. احسن الفتاوی ج/٣ ।

৩. কোন ধরনের মাজন, কয়লা, গুল বা টুথপেস্ট ব্যবহার করা মাকরূহ। আর এর কোন কিছু সামান্য পরিমাণও গলার মধ্যে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।[১]
৪. গোসল ফরয—এ অবস্থায় সারা দিন অতিবাহিত করা।
৫. কোন রোগীর জন্য নিজের রক্ত দেয়া।[২]
৬. গীবত করা, চোগলখুরী করা, অনর্থক কথাবার্তা বলা, মিথ্যা বলা।
৭. ঝগড়া-ফাসাদ করা, গালি-গালাজ করা।
৮. ক্ষুধা বা পিপাসার কারণে অস্থিরতা প্রকাশ করা।
৯. মুখে অধিক পরিমাণ থুতু একত্র করে গিলে ফেলা।
১০. দাঁতে ছোলা বুটের চেয়ে ছোট কোন বস্তু আটকে থাকলে তা বের করে মুখের ভিতর থাকা অবস্থায় গিলে ফেলা।
১১. নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোন বস্তু শিশুর মুখে দেয়া। তবে অনন্যোপায় অবস্থায় এরূপ করলে অসুবিধা নেই।
১২. পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা এত বেশী ধৌত করা যে, ভিতরে পানি পৌঁছে যাওয়ার সন্দেহ হয়—এরূপ করা মাকরূহ। আর প্রকৃতপক্ষে পানি পৌঁছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এ জন্য রোযা অবস্থায় পানি দ্বারা ধৌত করার পর কোন কাপড় দ্বারা বা হাত দ্বারা পানি পরিষ্কার করে ফেলা নিয়ম।
১৩. ঠোঁটে লিপষ্টিক লাগালে যদি মুখের ভিতর চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে তা মাকরূহ।

যে সব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয়:

১. কানে বা নাকে ঔষধ দিলে।
২. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা অল্প বমি আসার পর তা গিলে ফেললে।
৩. কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশতঃ কণ্ঠনালীতে পানি চলে গেলে।
৪. এমন কোন জিনিস খেলে যা সাধারণতঃ খাওয়া হয় না। যেমন: কাঠ, লোহা, কাগজ, পাথর, মাটি, কয়লা ইত্যাদি।
৫. বিড়ি, সিগারেট বা হুক্কা সেবন করলে।
৬. আগরবাতি প্রভৃতির ধোঁয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে বা হলকে পৌঁছালে।

১. [illegible] । ২. [illegible] ।

Scanned by CamScanner

৭. ভুলে পানাহার করার পর রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু পানাহার করলে।
৮. রাত আছে মনে করে সুব্হে সাদেকের পরে সেহ্রী খেলে।
৯. ইফতারীর সময় হয়নি, দিন রয়ে গেছে, অথচ সময় হয়ে গেছে—এই মনে করে ইফতারী করলে।
১০. দুপুরের পরে রোযার নিয়ত করলে।
১১. দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলে তা যদি থুতুর চেয়ে পরিমাণে বেশী হয় এবং কণ্ঠনালীর নীচে চলে যায়।
১২. কেউ জোরপূর্বক রোযাদারের মুখে কোন কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালীতে পৌঁছে গেলে।
১৩. দাঁতে কোন খাদ্য-টুকরা আটকে ছিল এবং সুব্হে সাদেকের পর তা যদি পেটে চলে যায় তবে সে টুকরা ছোলা বুটের চেয়ে ছোট হলে রোযা ভেঙ্গে যায় না, তবে এরূপ করা মাকরূহ। কিন্তু মুখ থেকে বের করার পর গিলে ফেললে তা যতই ছোট হোক না কেন রোযা কাযা করতে হবে।
১৪. পেশাবের রাস্তায় বা স্ত্রীর যোনিতে কোন ঔষধ প্রবেশ করালে।
১৫. পানি বা তেল দ্বারা ভিজা আঙ্গুল যোনিতে বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে।
১৬. শুকনো আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে পুরোটা বা কিছুটা বের করে আবার প্রবেশ করালে। আর যদি শুকনো আঙ্গুল একবার প্রবেশ করিয়ে একবারেই পুরোটা বের করে নেয়, আবার প্রবেশ না করায়, তাহলে রোযার অসুবিধা হয় না।
১৭. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং এ অবস্থায় সুব্হে সাদেক হয়ে গেলে।
১৮. নস্যি গ্রহণ করলে বা কানে তেল ঢাললে।
১৯. কেউ রোযার নিয়তই যদি না করে তাহলেও শুধু কাযা ওয়াজিব হয়।
২০. স্ত্রীর বেঁহুশ থাকা অবস্থায় কিংবা বে-খবর ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হলে ঐ স্ত্রীর উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।
২১. রমযান ব্যতীত অন্য নফল রোযা ভঙ্গ হলে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়।
২২. এক দেশে রোযা শুরু করার পর অন্য দেশে চলে গেলে সেখানে যদি নিজের দেশের তুলনায় আগে ঈদ হয়ে যায়, তাহলে নিজের দেশের হিসেবে যে কয়টা রোযা বাদ গিয়েছে তার কাযা করতে হবে। আর যদি সেখানে গিয়ে রোযা এক দুটো বেড়ে যায় তাহলে তা রাখতে হবে।

যে সব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা, কাফ্‌ফারা উভয়টা ওয়াজিব হয়

১. রোযার নিয়ত (রাতে) করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে।

২. রোযার নিয়ত করার পর দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী-সম্ভোগ করলে। স্ত্রীর উপরও কাযা, কাফ্‌ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে। স্ত্রীর যোনির মধ্যে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করালেই কাযা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক।

৩. রোযার নিয়ত করার পর পাপ হওয়া সত্ত্বেও যদি পুরুষ তার পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করায় এবং অগ্রভাগ ভিতরে প্রবেশ করে (চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক) তাহলেও পুরুষ-স্ত্রী উভয়ের উপর কাযা এবং কাফ্‌ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে।

৪. রোযা অবস্থায় কোন বৈধ কাজ করল, যেমন মাথায় তেল দিল, তা সত্ত্বেও সে মনে করল যে, রোযা নষ্ট হয়ে গিয়েছে; আর তার পরে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ইত্যাদি করল, তাহলেও কাযা, কাফ্‌ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে।

যে সব কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে

১. যদি কেউ শরীয়তসম্মত সফরে থাকে, তাহলে তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে; পরে কাযা করে নিতে হবে। কিন্তু সফরে যদি কষ্ট না হয়, তাহলে রোযা রাখাই উত্তম। আর যদি কোন ব্যক্তি রোযা রাখার নিয়ত করার পর সফর শুরু করে তাহলে সে দিনের রোযা রাখা জরুরী।

২. কোন রোগী ব্যক্তি রোযা রাখলে যদি তার রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয় অথবা অন্য কোন নতুন রোগ দেখা দেয়ার আশঙ্কা হয় অথবা রোগ মুক্তি বিলম্বিত হওয়ার আশংকা হয়, তাহলে রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে। সুস্থ হওয়ার পর কাযা করে নিতে হবে। তবে অসুস্থ অবস্থায় রোযা ছাড়তে হলে কোন দ্বীনদার-পরহেযগার চিকিৎসকের পরামর্শ থাকা শর্ত, কিংবা নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে হতে হবে, শুধু নিজের কাল্পনিক খেয়ালের বশীভূত হয়ে আশঙ্কাবোধ করে রোযা ছাড়া দুরস্ত হবে না। তাহলে কাযা, কাফ্‌ফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে।[১]

১. شامی ।

৩. রোগ মুক্তির পর যে দুর্বলতা থাকে তখন রোযা রাখলে যদি পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয়, তাহলে তখন রোযা না রাখার অনুমতি আছে, পরে কাযা করে নিতে হবে।

৪. গর্ভবতী বা দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীলোক রোযা রাখলে যদি নিজের জীবনের ব্যাপারে বা সন্তানের জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করে বা রোযা রাখলে দুধ শুকিয়ে যাবে আর সন্তানের সমূহ কষ্ট হবে—এরূপ নিশ্চিত হয়, তাহলে তার জন্য তখন রোযা ছাড়া জায়েয, পরে কাযা করে নিতে হবে।

৫. হায়েয-নেফাস অবস্থায় রোযা ছেড়ে দিতে হবে এবং পবিত্র হওয়ার পর কাযা করে নিতে হবে।

যে সব কারণে রোযা শুরু করার পর তা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে

১. যদি এমন পিপাসা বা ক্ষুধা লাগে যাতে প্রাণের আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি আছে।

২. যদি এমন কোন রোগ বা অবস্থা দেখা দেয় যে, ঔষধপত্র গ্রহণ না করলে জীবনের আশা ত্যাগ করতে হয়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি আছে।

৩. গর্ভবতী স্ত্রীলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, নিজের বা সন্তানের প্রাণ নাশের আশঙ্কা হয়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি আছে।

৪. বেহুঁশ বা পাগল হয়ে গেলে রোযা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি আছে।

* উল্লেখ্য যে, এসব অবস্থায় যে রোযা ছেড়ে দেয়া হবে তার কাযা করে নিতে হবে।

* কেউ যদি অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে পারে বা জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোন কাজ করতে পারে তা সত্ত্বেও সে টাকার লোভে রৌদ্রে গিয়ে কাজ করল এবং এ কারণে অনুরূপ পিপাসায় আক্রান্ত হল কিংবা বিনা অপারগতায় আগুনের কাছে যাওয়ার কারণে পিপাসায় আক্রান্ত হল, তাহলে তার জন্যে রোযা ছাড়ার অনুমতি নেই।

রোযার কাফ্‌ফারার মাসায়েল

* রমযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে রমযানের পর যথাশীঘ্র কাযা করে নিতে হবে। বিনা কারণে কাযা রোযা রাখতে দেরী করা গোনাহ।

* কাযা রোযার জন্যে সুব্‌হে সাদেকের পূর্বেই নিয়্যত করতে হবে, অন্যথায় কাযা রোযা সহীহ হবে না। সুব্‌হে সাদেকের পর নিয়্যত করলে সে রোযা নফল হয়ে যাবে।

* ঘটনাক্রমে একাধিক রমযানের কাযা রোযা একত্রিত হয়ে গেলে নির্দিষ্ট করে নিয়্যত করতে হবে যে, আজ অমুক বৎসরের রমযানের রোযা আদায় করছি।

* যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে তা একাধারে রাখা মোস্তাহাব। বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরস্ত আছে।

* কাযা শেষ করার পূর্বেই নতুন রমযান এসে গেলে তখন ঐ রমযানের রোযাই রাখতে হবে। কাযা পরে আদায় করে নিতে হবে।

রোযার কাফ্ফারার মাসায়েল

* একটি রোযার কাফ্ফারা ৬০টি রোযা (একটি কাযা বাদেও)। এই ৬০টি রোযা একাধারে রাখতে হবে। মাঝখানে ছুটে গেলে আবার পুনরায় পূর্ণ ৬০টি একাধারে রাখতে হবে।

* কাফ্ফারার রোযা এমন দিন থেকে শুরু করবে যেন মাঝখানে কোন নিষিদ্ধ দিন এসে না যায়। উল্লেখ্য, যে পাঁচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ বা হারাম তা হল দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন।

* এই ৬০ দিনের মধ্যে নেফাস বা রমযানের মাস এসে যাওয়ার কারণে বিরতি হলেও কাফ্ফারা আদায় হবে না।

* কাফ্ফারার রোযা রাখার মধ্যে হায়েযের দিন (নেফাসের নয়) এসে গেলেও যে কয়দিন সে হায়েযের কারণে বিরতি যাবে তাতে অসুবিধে নেই।

* কাযা রোযার ন্যায় কাফ্ফারার রোযার নিয়্যতও সুব্‌হে সাদেকের পূর্বে হওয়া জরুরী।

* একই রমযানের একাধিক রোযা ছুটে গেলে কাফ্ফারা একটাই ওয়াজিব হবে। দুই রমযানের ছুটে গেলে দুই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

* কাফ্ফারা বাবদ বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন রোযা রাখার সামর্থ্য না থাকলে পূর্ণ খোরাক খেতে পারে এমন ৬০ জন মিসকীনকে (অথবা এক জনকে ৬০ দিন) দুই বেলা পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াতে হবে অথবা সদকায়ে ফিত্‌র-এ যে পরিমাণ গম বা তার মূল্য দেয়া হয় প্রত্যেককে সে পরিমাণ দিতে হবে। এই গম ইত্যাদি বা মূল্য দেয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০ দিনেরটা

এক দিনেই দিয়ে দিলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। তাতে মাত্র এক দিনের কাফ্ফারা ধরা হবে।

* ৬০ দিন খাওয়ানোর বা মূল্য দেয়ার মাঝে ২/১ দিন বিরতি পড়লে ক্ষতি নেই।

রোযার ফেদিয়ার মাসায়েল

* ফেদিয়া অর্থ ক্ষতিপূরণ। রোযা রাখতে না পারলে বা কাযা আদায় করতে না পারলে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাকে ফেদিয়া বলে। সাধারণ ভাবে অনেকে এটাকে রোযার ফেতরাও বলে থাকে। প্রতিটা রোযার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর (ফিত্‌রা) পরিমাণ পণ্য বা তার মূল্য দান করাই হল এক রোযার ফেদিয়া। (ফিত্‌রা-এর পরিমাণ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৪৮৭ নং পৃষ্ঠা)

* যার যিম্মায় কাযা রোযা রয়ে গেছে— জীবদ্দশায় আদায় হয়নি, মৃত্যুর পর তার ওয়ারিছগণ তার রোযার ফেদিয়া আদায় করবে। মৃত ব্যক্তি ওছিয়ত করে গিয়ে থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নিয়ম অনুযায়ী এই ফেদিয়া আদায় করা হবে। আর ওসিয়ত না করে থাকলেও যদি ওয়ারিছগণ নিজেদের মাল থেকে ফেদিয়া আদায় করে দেন, তবুও আশা করা যায় আল্লাহ তা কবূল করবেন এবং মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন।

* অতি বৃদ্ধ রোযা রাখতে না পারলে অথবা কোন ধ্বংসকারী বা দীর্ঘ মেয়াদী রোগ হলে এবং সুস্থ হওয়ার কোন আশা না থাকলে আর রোযা রাখলে ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকলে এমন লোকের জন্য প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ফেদিয়া আদায় করার অনুমতি আছে। তবে এরূপ বৃদ্ধ বা এরূপ রোগী পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি পেলে তাদেরকে কাযা করতে হবে এবং যে ফেদিয়া দান করেছিল তার ছওয়াব পৃথকভাবে পাওয়া যাবে।

নফল রোযার মাসায়েল

* সারা বৎসর পাঁচদিন ব্যতীত যে কোন দিন নফল রোযা রাখা যায়। উক্ত পাঁচ দিন হল দুই ঈদের দুই দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন অর্থাৎ ১১ই, ১২ই ও ১৩ই জিলহজ্ব। এই পাঁচ দিন যে কোন রোযা রাখা হারাম।

* যে ব্যক্তি প্রত্যেক চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে নফল রোযা রাখল, সে যেন সারা বৎসর রোযা রাখল। এটাকে 'আইয়্যামে বীযের রোযা' বলে।

* প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবারও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল রোযা রাখতেন ; এতেও অনেক ছওয়াব আছে।

* বেলা দ্বিপ্রহরের এক ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযার নিয়ত করা দুরস্ত আছে।

* নফল রোযা শুরু করলে সেটা পুরো করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই নফল রোযার নিয়ত করার পর সেটা ভাঙ্গলে তার কাযা করা ওয়াজিব।

* স্বামী বাড়ীতে থাকা অবস্থায় তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর জন্যে নফল রোযা রাখা দুরস্ত নয়। রাখলে স্বামী হুকুম করলে তা ভেঙ্গে পরে কাযা করে নিতে হবে।

* মেহমান যদি একা খেতে মনে কষ্ট পায়, তাহলে তার খাতিরে মেজবান (বাড়ীওয়ালা) নফল রোযা ভেঙ্গে ফেলতে পারে। ভাঙ্গলে পরে কাযা করে নিতে হবে। তাই এই ভাঙ্গার অনুমতি সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত।[1]

আইয়্যামে বীযের রোযা

'আইয়্যামে বীয' অর্থ উজ্জ্বল রাতের দিনগুলো। চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে আইয়্যামে বীয বলা হয়। সাধারণতঃ মূর্খ লোকেরা এটাকে "আইয়াম বেযের রোযা" নামে আখ্যায়িত করে থাকে। তবে শুদ্ধ কথা হল 'আইয়্যামে বীযের রোযা।"

* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনটা নফল রোযা রাখে, সে সারা বৎসর নফল রোযা রাখার ছওয়াব পায়।

* অন্য এক হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যর (রাযি.) কে বলেছিলেন প্রতি মাসে তিন দিন নফল রোযা রাখতে চাইলে আইয়্যামে বীযের তিন দিন রাখবে।[2] অন্য রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় আইয়্যামে বীয ব্যতীত অন্য যে কোন তিন দিন নফল রোযা রাখলেও ঐ ফযীলত হাছেল হয়ে যাবে।

* নফল রোযার নিয়ত ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

শাওয়ালের ছয় রোযা

* শাওয়াল মাসে (১লা শাওয়াল-ঈদুল ফিতরের দিন বাদে) ৬ টা নফল রোযা রাখলে এক বৎসর নফল রোযার ছওয়াব পাওয়া যায়। সাধারণ্যে এটাকে 'ছয় রোযা' বলা হয়।

---

১. رد المحتار । ২. الترغیب ।

* ছয় রোযা একাধারে রাখা যায়, আবার মধ্যে-মধ্যে বিরতি দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গেও রাখা যায়। এটাই উত্তম।[১]

৯ই জিলহজ্জের রোযা

* জিলহজ্জ মাসের নবম তারিখ (আরাফার দিন) রোযা রাখার অনেক ফযীলত রয়েছে। এর দ্বারা পিছনের এক বৎসর এবং সামনের এক বৎসর-এর গোনাহ মাফ হয়ে যায়। ১ম তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত পূর্ণ ৯ দিন রাখা রাখতে পারলে খুবই উত্তম।[২]

* কেউ যদি জিলহজ্জ মাসের শুরু থেকে একাধারে নয়টা রোযা রাখে, তাহলে তা অনেক উত্তম।[৩]

মান্নতের রোযার মাসায়েল

* যদি কেউ আল্লাহর নামে রোযা রাখার মান্নত করে, তাহলে সেই রোযা রাখা ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে কোন শর্তের ভিত্তিতে মান্নত মানলে সেই শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বে ওয়াজিব হয় না—শর্ত পূরণ হলেই ওয়াজিব হয়। কিন্তু কোন গোনাহের কাজের মান্নত মানলে সেই শর্ত পূরণ হলেও রোযা রাখা যাবেনা।

* কোন নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখার মান্নত করলে এবং সেই দিন রোযা রাখলে রাতেই নিয়ত করে নেয়া জরুরী নয়, দুপুরের এক ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করাও দুরস্ত আছে।

* কোন নির্দিষ্ট দিনের রোযা রাখার মান্নত করলে এবং সেই দিন সে রোযা রাখলে মান্নতের রোযা বলে নিয়ত করুক বা শুধু রোযা বলে নিয়ত করুক বা নফল বলে নিয়ত করুক সর্বাবস্থায় মান্নতের রোযাই আদায় হবে। তবে কাযা রোযার নিয়ত করলে কাযাই আদায় হবে—মান্নতের রোযা আদায় হবে না।

* কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে মান্নত না করলে যে কোন দিন সে মান্নতের রোযা রাখা যায়। এরূপ মান্নতের রোযার নিয়ত সুব্হে সাদেকের পূর্বেই হওয়া শর্ত।

* কোন নির্দিষ্ট দিনে বা নির্দিষ্ট তারিখে বা নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখার মান্নত করলে সেই নির্দিষ্ট দিনে বা নির্দিষ্ট তারিখে বা নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখাই জরুরী নয়— অন্য যে কোন সময় রাখলেও চলবে।[৪]

---

১. الدر المختار । ২. بہشتی زیور بحوالہ عالمگیری ج/۱ । ৩. ایضا । ৪. بہشتی زیور من الدر المختار ।

* যদি এক মাস রোযা রাখার মান্নত করে, তাহলে পুরো এক মাস লাগাতার রোযা রাখতে হবে।

* যদি কয়েক দিন রোযা রাখার মান্নত করে, তাহলে একত্রে রাখার নিয়ত না থাকলে ভেঙ্গে ভেঙ্গে রাখলেও চলবে। আর একত্রে রাখার নিয়ত থাকলে একত্রেই রাখতে হবে।

এ'তেকাফ

এ'তেকাফের ফযীলত ও ফায়দা

এতেকাফের অনেক ফযীলত এবং ফায়দা রয়েছে।

এ'তেকাফের একটা ফায়দা হল : এ'তেকাফ করলে গোনাহ্ থেকে মুক্তি পাওয়াটা অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। কারণ এ'তেকাফের অর্থ হল অবস্থান করা। আমি কারও দরবারে অবস্থান করেই থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দাবী আদায় না হবে। এ'তেকাফও ঠিক এরকম যে, আল্লাহ্‌র দরবারে আমি পড়েই থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দাবি আদায় না হয় অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ক্ষমা না হয়। আর শেষ দিনে ক্ষমা হয়েই যাবে। তাই এ'তেকাফ দ্বারা ক্ষমা পাওয়া অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়।

এ'তেকাফের আর একটা ফায়দা হল— হাদীছে এসেছে :

وَيَجْرِىْ لَهٗ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔(مشكوٰة عن ابن ماجة)

অর্থাৎ, একজন মানুষের পক্ষে বাইরে থেকে যত রকম নেক কাজ করা সম্ভব, যদি সে সেই সব নেক কাজ করে, তাহলে তার যে পরিমাণ ছওয়াব হবে, এ'তেকাফ করার দরুণ সে যদি ঐ সব নেক কাজ করতে নাও পারে, তবুও তার ঐ সব নেক কাজের ছওয়াব হয়ে যাবে।

এ'তেকাফের আর একটা ফায়দা হল : এ'তেকাফকারী থেকে জাহান্নাম অনেক দূরে সরে যায়। হাদীছে এসেছে :

وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ اَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ۔(رواه الطبرانى فى الاوسط والبيهقى)

অর্থাৎ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে একদিন এ'তেকাফ করে, তার মাঝে আর জাহান্নামের মাঝে তিন খন্দক দূরত্ব হয়ে যায়।

এক "খন্দক" বলতে বোঝানো হয় অনেক দূরত্ব, যেমন আসমান-যমিনের মাঝে দূরত্ব। আসমান যে কত দূরে তা কেউ বলতে পারে না, কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে, যা মানুষ এখনো হিসাব করে বের করতে পারেনি। এরকম তিন খন্দক দূরে চলে যায় তার থেকে জাহান্নাম। অর্থাৎ, সে জান্নাতের কাছে চলে যায়, জাহান্নাম তার থেকে দূরে চলে যায়।

এ'তেকাফের আর একটা ফায়দা হল : আল্লাহ্‌র সাথে এ'তেকাফকারীর মনের সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র সাথে মনের সম্পর্ক জুড়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় বাধা হল দুনিয়া। দুনিয়ার নানান রকম ফিকির, দুনিয়ার নানান রকম সম্পর্ক মানুষের মনে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জোড়ার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যখন মানুষ ১০ দিন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, দুনিয়ার সব কাজ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে পড়ে থাকে, তখন আল্লাহ্‌র সাথে তার একটা সুসম্পর্ক হয়ে যায়।

এ'তেকাফের পঞ্চম ফায়দা হল : এ'তেকাফ করলে লাইলাতুল কদর পাওয়া অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। যে লাইলাতুল কদরের ফযীলত সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

অর্থাৎ, লাইলাতুল কদর বা শবে কদর হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও বেশী ফযীলত রাখে। হাদীছে শেষ দশকে লাইলাতুল কদর তালাশ করতে বলা হয়েছে। শেষ দশকের যে কোন বেজোড় রাতে হতে পারে। ২১শে রাত, ২৩শে রাত, ২৫শে রাত, ২৭শে রাত, ২৯শে রাত—এর যেকোন রাতে লাইলাতুল কদর হতে পারে। এখন কেউ যদি শেষ দশকে এ'তেকাফ করে, তাহলে সে শেষ দশকের পুরো সময়—জোড়-বেজোড় সব রাতগুলোতেই আল্লাহ্‌র দরবারে পড়ে থাকল, তাই লাইলাতুল কদরের ফযীলত পাওয়াটা তার জন্য প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়।

এই সব ফযীলতের দিকে লক্ষ্য করে সময় সুযোগ করতে পারলেই এতেকাফ করা চাই। বিশেষভাবে এমন অনেক মা-বোন আছেন যারা অবসর, তাদের জন্য এ'তেকাফ করা খুবই সহজ। শুধু ঘরের একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে সেখানেই থাকবেন, প্রয়োজন হলে ঘরের চাকর-চাকরানী বা অন্যদেরকে ঘরের কাজ কর্মের ফাই-ফরমায়েশও দিতে পারবেন।

সুন্নাত এ'তেকাফ (রমযানের শেষ দশকের এ'তেকাফ)-এর মাসায়েল

* এ'তেকাফ অর্থ স্থির থাকা, অবস্থান করা। পরিভাষায় জাগতিক কার্যকলাপ ও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছওয়াবের নিয়তে মসজিদে বা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা ও স্থির থাকাকে এ'তেকাফ বলে।

* রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কেফায়া, অর্থাৎ, বড় গ্রাম বা শহরের প্রত্যেকটা মহল্লা এবং ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে কেউ কেউ এ'তেকাফ করলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে— আর কেউই না করলে সকলেই সুন্নাত তরকের জন্য দায়ী হবে।

* রমযানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত এ'তেকাফের সময়।

এ'তেকাফের জন্য তিনটি শর্ত; যথা :

(১) মহিলাগণ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে এ'তেকাফ করবে। পুরুষের এ'তেকাফের ক্ষেত্রে শর্ত হল--এমন মসজিদে এ'তেকাফ হতে হবে যেখানে নামাযের জামা'আত হয়; জুমুআর জামা'আত হোক বা না হোক।

(২) এ'তেকাফের নিয়ত করতে হবে।

(৩) হায়েয-নেফাস শুরু হলে এ'তেকাফ ছেড়ে দিবে।

নিম্নোক্ত কারণে এ'তেকাফ ফাসেদ তথা নষ্ট হয়ে যায়।

(১) সহবাস করলে; চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক।

(২) এ'তেকাফের স্থান থেকে শরীয়তসম্মত প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হয়ে যাওয়া। শরীয়তসম্মত প্রয়োজন হলে বাইরে যাওয়া যায়; যেমন ফরয বা সুন্নাত গোসলের জন্য বের হওয়া ইত্যাদি। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনেও বের হওয়া যায়; যেমন : পেশাব-পায়খানার জন্য বের হওয়া, খাদ্য-খাবার এনে দেয়ার লোক না থাকলে খাওয়ার জন্য বের হওয়া, পানি দেয়ার কেউ না থাকলে উযূর পানির জন্য বাইরে যাওয়া। যে কাজের জন্য বাইরে যাওয়া হবে, সে কাজ সমাপ্ত করার পর সত্বর ফিরে আসবে, বিনা প্রয়োজনে কারও সাথে কথা বলবে না।

* গোসল ফরয হওয়া ছাড়াও আমরা শরীর ঠাণ্ডা করার নিয়তে বা পরিষ্কার করার নিয়তে সাধারণতঃ যে গোসল করে থাকি, শুধু এরূপ গোসলেরই উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না। তবে কাউকে বলে যদি পথের মধ্যে পানির ব্যবস্থা করে রাখে বা পুকুর ইত্যাদি থাকে আর

পেশাব-পায়খানা থেকে ফেরার পথে অতিরিক্ত সময় না লাগিয়ে জলদি ঐ পানি গায়ে মাথায় ঢেলে বা ডুব দিয়ে গোসল সেরে চলে আসে, তাহলে এ'তেকাফের ক্ষতি হবে না।

এ'তেকাফের অবস্থায় নিম্নোক্ত জিনিসগুলি মাকরূহ :

১. এ'তেকাফ অবস্থায় চুপ থাকলে ছওয়াব হয় এই মনে করে চুপ থাকা মাকরূহ তাহরীমী।[১]

২. বিনা প্রয়োজনে দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত হওয়া মাকরূহ তাহরীমী।[২]

এ'তেকাফের অবস্থায় নিম্নোক্ত জিনিসগুলি মোস্তাহাব ও আদব :

১. নেক কথা ব্যতীত অন্য কথা না বলা।

২. বেকার বসে না থেকে নফল নামায, তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাকা উত্তম।

* এ'তেকাফে খাস কোন ইবাদত করা শর্ত নয়— যে কোন নফল নামায, যিকির-আযকার, তেলাওয়াত, দ্বীনী কিতাব পড়া, পড়ানো বা যে ইবাদত মনে চায় করতে পারে।

* এ'তেকাফ শুরু করার পর নিজের বা অন্যের জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনন্যোপায় অবস্থায় এ'তেকাফের স্থান থেকে বের হলে গোনাহ নেই বরং তা জরুরী, তবে তাতে এ'তেকাফ ভেঙ্গে যাবে।

* পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ'তেকাফে বসা অথবা বসানো উভয়টা না-জায়েয ও গোনাহ।[৩]

* মহিলাদের জন্য মসজিদে এ'তেকাফ করা মাকরূহ তাহরীমী। তারা ঘরে এ'তেকাফ করবে। স্বামী মওজুদ থাকলে এ'তেকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। স্বামীর খেদমতের প্রয়োজন থাকলে এ'তেকাফে বসবে না। শিশুর তত্ত্বাবধান ও যুবতী কন্যার প্রতি খেয়াল রাখার প্রয়োজনীয়তা থাকলে এ'তেকাফে না বসাই সমীচীন। মহিলাগণ নির্দিষ্ট কোন কামরায় বা ঘরের কোন এক স্থানে পর্দা ঘিরে এ'তেকাফে বসবেন।

ওয়াজিব এ'তেকাফ (মান্নতের এ'তেকাফ)-এর মাসায়েল :

* এ'তেকাফের মান্নত করলে এ'তেকাফ ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে কোন শর্তের ভিত্তিতে মান্নত করলে (যেমন আমার অমুক কাজ হয়ে গেলে এ'তেকাফ করব) শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বে ওয়াজিব হয় না।

---

১. [illegible] । ২. [illegible] । ৩. [illegible] ।

* ওয়াজিব এ'তেকাফের জন্য রোযা শর্ত—যখনই এ'তেকাফ করবে রোযাও রাখতে হবে

* ওয়াজিব এ'তেকাফ কমপক্ষে একদিন হতে হবে। বেশী দিনের নিয়ত করলে তা-ই করতে হবে।

* যদি শুধু এক দিনের এ'তেকাফের মান্নত করে, তাহলে তার সঙ্গে রাত শামেল হবে না। তবে যদি রাত দিন উভয়ের নিয়ত করে বা একত্রে কয়েক দিনের মান্নত করে তাহলে রাতও শামেল হবে। দিন বাদে শুধু রাতে এ'তেকাফের মান্নত হয় না।

* উপরোল্লিখিত মাসায়েল ব্যতীত সুন্নাত এ'তেকাফের ক্ষেত্রে যে সব মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে, ওয়াজিব এ'তেকাফের ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য।

যাকাত ও ফিতরা

যাকাতের গুরুত্ব ও ফায়দা

মাল বা ধন-সম্পদের সাথে আল্লাহ পাক যেসব বিধি-বিধান রেখেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল যাকাত। দেহের সাথে সম্পর্কিত ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নামায, আর মালের সাথে সম্পর্কিত ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যাকাত। এই নামায আর যাকাত এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ দুটোকে মুসলমান হওয়ার আলামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাহাবায়ে কেরামকে জেহাদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হত। তাদেরকে বলে দেয়া হত যে, তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে এবং নামায না পড়ে আর যাকাত না দেয়। এতে বোঝানো হত যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে, নামায না পড়বে এবং যাকাত না দিবে। অর্থাৎ, এই তিনোটা কাজ যতক্ষণ না করবে, ততক্ষণ তাদেরকে মুসলমান বলে গণ্য করা হবে না। যদি শুধু মুখে বলে আমি মুসলমান, কিন্তু দেখা গেল নামাযেরও ধারে-কাছে নেই, যাকাতেরও ধারে-কাছে নেই, তাহলে সঠিক মুসলমান হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। মানুষের দৈহিক যত ইবাদত রয়েছে তার ভিতর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল নামায। আর সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট যত বিধান বা ইবাদত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল যাকাত। অতএব কেউ যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দু'টো ইবাদতের ধারে-

কাছে না থাকে, তাহলে তাকে কীভাবে মুসলমান হিসেবে বিবেচনা করা যাবে? সারকথা হল যে নামায পড়বে না, যাকাত দিবে না সে যেন মুসলমানই না।

নামায ও যাকাতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী হওয়ার কারণে কুরআন শরীফে এ দু'টো ইবাদতের কথা সবচেয়ে বেশীসংখ্যক বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় ৮০ জায়গায় নামাযের কথা এবং ৩২ জায়গায় যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এ দু'টো আমল তরক করার শাস্তি অনেক কঠিন বয়ান করা হয়েছে। যাকাত না দেয়ার শাস্তি সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ـ(سورة التوبة : ٣٤)

অর্থাৎ যারা স্বর্ণ-রুপা বা টাকা-পয়সা সঞ্চয় করে রাখে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় তা ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। এই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কী তা বয়ান করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ـ(سورة التوبة : ٣٥)

অর্থাৎ ঐ স্বর্ণ-রুপা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপালে, পাঁজরে পিঠে (অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন স্থানে) দাগ দেয়া হবে এবং বলা হবে যে, নিজেদের জন্য যেটা সঞ্চয় করে রেখেছিলে এটাতো তাই। এখন তার স্বাদ চেখে দেখ, কত মজা!

হাদীছে এসেছে : যারা যাকাত আদায় করে, এই আয়াত তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না। যারা সম্পদের যাকাত আদায় করে তারা এই শাস্তির আওতায় পড়বে না। এ শাস্তি হবে তাদের, যারা যাকাত দিবে না। কাজেই আমি সম্পদ উপার্জন করে যাকাত দিলাম না, শুধু জমাই রেখে গেলাম, তাহলে কিসের জন্য রেখে গেলাম? শাস্তি ভোগ করার জন্যই রেখে গেলাম!

যাকাত আদায় না করার আরও অনেক রকম শাস্তি রয়েছে। এক হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

يَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقٰى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَفِرُّ مِنْهُ .... فَيَقُوْلُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ ... الحديث . (رواه ابن حبان في صحيحه)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মালের যাকাত না দেয়, কেয়ামতের দিন তার মাল বিষাক্ত সাপের রূপ নিয়ে তার গলায় পেঁচিয়ে থাকবে এবং দুই গালে দংশন করতে থাকবে আর বলতে থাকবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চয় করে রাখা সম্পদ!

আমরা সম্পদ রেখে যাই সন্তানদের জন্য। কিন্তু আমরা যা রেখে গেলাম, সেটা সন্তানাদির উপকারে আসবে কি না— তাতো আল্লাহ পাকই জানেন, আমরা জানি না। আমরা যেটা জানি তা হল আমরা যদি যাকাত না দেই, সম্পদের হক আদায় না করি, তাহলে আমাদের শাস্তি হবে। সন্তানের জন্য রেখে যাব, এটা সন্তানের উপকারে আসবে কি না তা নিশ্চিত নয়, কিন্তু সম্পদের হক আদায় না করলে আমার শাস্তি হবে এটা নিশ্চিত। যদি আল্লাহর হুকুম পালন করার পর যা থাকল তা রেখে গেলাম, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ পাকের রহমতে আমাদের সেই রেখে যাওয়া সম্পদ সন্তানের উপকারে আসবে। তাই যাকাত আদায় না করে সন্তানের জন্য রেখে যাওয়ার চিন্তা করলে নিজের সাথে প্রতারণা করা হবে। যাকাত আদায় না করা নিজের প্রতি অবিচার করা। দুনিয়াতে কষ্ট করলাম, কষ্ট করে সম্পদ উপার্জন করলাম, আবার এই সম্পদের জন্য পরকালেও যদি আমাকে কষ্ট ভোগ করতে হয়, তাহলে আমার চেয়ে বোকা আর কে? আমি শুধু কষ্টই করলাম, ভোগ করতে পারলাম না।

আল্লাহ পাক ৪০ ভাগের ১ ভাগ মাল যাকাত হিসেবে দিতে বলেছেন। অর্থাৎ, শতকরা আড়াই টাকা যাকাত হিসেবে দেয়া ফরয। তিনি এমনও বলতে পারতেন যে, যা উপার্জন করবে তা সব আমার রাস্তায় ব্যয় করতে হবে; কিন্তু আল্লাহ পাক সেটা করেন নি। কারণ সেরকম করলে মানুষের জন্য তা খুব কঠিন হয়ে যেত। যেহেতু দুনিয়ার প্রতি মানুষের কিছু আকর্ষণ রয়েছে। টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ, গাড়ী-বাড়ী ইত্যাদির প্রতি মানুষের মহব্বত, এটা স্বাভাবিক বিষয়। এখন যদি আল্লাহ পাক সব ব্যয় করে দিতে বলতেন, তাহলে আমাদের মনের উপরে খুব চাপ পড়ত। মাত্র ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে ফরয করা হয়েছে, তাতেই কত কষ্ট বোধ হয়। শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে দিতেই মনে হয় আমার কত টাকা চলে গেল।

ধন-সম্পদের যাকাত দিতে কষ্ট বোধ করা বোকামী। কারণ ধন-সম্পদের আসল মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। আমরা শুধু এটা নাড়াচাড়া করার মালিক। আসল মালিক যেভাবে বলবেন সেভাবেই এটা নাড়াচাড়া

Scanned by CamScanner

করতে হবে। এখন যদি আমরা আল্লাহ্‌র হুকুম মত ব্যয় না করি, তাহলে বোঝা যাবে আমরা আল্লাহ্‌কে আসল মালিক মনে করছি না। বরং নিজেদেরকেই আসল মালিক মনে করে বসেছি। অতএব নিজেকে অন্যের মালের মালিক মনে করা বোকামী বৈ কি? যখন আমাদের এই বিশ্বাস থাকবে যে, আসল মালিক হলেন আল্লাহ পাক, তখন আল্লাহ্‌র হুকুম মত ব্যয় করতে আর কষ্ট বোধ হবে না। এ জন্যই যেখানে আল্লাহ পাক ব্যয় করার কথা বলেছেন, সেখানে কথাটা এভাবে বলেছেন :

اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর! তোমাদের সম্পদ ব্যয় কর—এভাবে বলেননি, বরং বলেছেন, আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর। এভাবে বলে বোঝানো হয়েছে যে, আমার দেয়া সম্পদ, আমার হুকুমে ব্যয় করবে, তাতে এত কার্পণ্য কেন? তাতে এত দ্বিধা-সংকোচ কেন? যেমন কোন মালিক যদি তার ক্যাশিয়ারকে বলে : তোমাকে এই এত লক্ষ বা এত কোটি টাকা দিলাম, এ থেকে কর্মচারীদের বেতন দিয়ে দাও, তাহলে ঐ ক্যাশিয়ার ঐ লক্ষ টাকা বা কোটি টাকা দিয়ে দিবে, তাতে তার একটুও কার্পণ্য বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আসবে না। কারণ, সে জানে যে, এটাতো আমার মালিকের টাকা, মালিকই হুকুম দিয়েছেন ব্যয় করতে, অতএব আমার ব্যয় করতে কষ্ট বোধ করার কী আছে? ঠিক এরকম মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যই আল্লাহ্ পাক বলেছেন : আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি, ওখান থেকে ব্যয় কর।

আরও মনে রাখতে হবে— সম্পদ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে অর্জিত হয়ে থাকে, মানুষ নিজের বাহুবলে, মানুষ নিজের মেধাবলে, মানুষ নিজের জ্ঞানবলে সম্পদ উপার্জন করতে পারে না। কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, নামায থেকে তোমরা ফারেগ হওয়ার পর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে বের হয়ে যাও। অর্থাৎ, সম্পদ সন্ধানে বের হয়ে যাও। (সূরা জুমুআ : ১০)

এ আয়াতে তোমরা সম্পদ সন্ধানে বের হও— এটা না বলে বলা হয়েছে : আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে বের হও। এতে করে বোঝানো হয়েছে যে, সম্পদ হল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই সম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে। কাজেই

এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, সম্পদ দিয়ে আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এটা আমার শক্তিবলে, এটা আমার বাহুবলে অর্জিত হয়নি। অতএব তাঁরই হুকুম মত ব্যয় করতে হবে। বাহুবলে যদি সম্পদ অর্জিত হত তাহলে যে ব্যক্তি বেশী কুস্তি লড়তে পারে তারই সম্পদ বেশী হত। মেধা এবং বুদ্ধির বলে যদি সম্পদ অর্জিত হত, তাহলে দেশের বুদ্ধিজীবিরা বেশী সম্পদের অধিকারী হত। বিদ্যা বা জ্ঞানের বলে সম্পদ অর্জিত হলে বড় বড় ডিগ্রিধারীরাই বেশী সম্পদের মালিক হত এবং বকলমরা সব ফকীর থাকত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এমন অনেক বড় বড় ধনী আছে, যারা নিজেদের নাম পর্যন্ত সই করতে জানে না। অথচ বড় বড় জ্ঞানীগুণী ডিগ্রিধারীরা পেট ভরে ভাতও পাচ্ছে না।

সম্পদ আল্লাহ্‌র মেহেরবানী, সম্পদ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এ কথাটা ভোলা উচিত নয়। সকাল বেলার বাদশাহকে আল্লাহ বিকেল বেলায় ফকীর করে দিতে পারেন—একথাটাও মনে রাখা দরকার। সম্পদ আল্লাহ দেন, আবার এই সম্পদ আল্লাহ নিয়েও নিতে পারেন। কাজেই আল্লাহ যেভাবে সম্পদ ব্যয় করতে বলেছেন, সেভাবেই ব্যয় করা উচিৎ। তাহলেই আল্লাহ সম্পদে বরকত দিবেন। তাহলেই হয়ত আমার সম্পদ টিকে থাকবে।

আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় করলে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করলে, দ্বীনের কাজে সম্পদ ব্যয় করলে সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। এর বিপরীত অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করলে সে সম্পদে আল্লাহ পাক বরকত দেন না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেছেন :

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ۔(سورة البقرة: ٢٧٦)

অর্থাৎ, সুদকে আল্লাহ মোচন করে দেন আর দান-সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন।

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান-সদকা করা হলে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা হলে, ফরয ব্যয় হোক বা নফল ব্যয় হোক, যে পর্যায়ের ব্যয়ই হোক না কেন এই ব্যয় করলে আল্লাহ পাক সম্পদকে বৃদ্ধি করে দেন। কখনও সম্পদের পরিমাণকে বৃদ্ধি করে দেন, কখনও সম্পদের বরকতকে বৃদ্ধি করে দেন। যখন যেভাবে বৃদ্ধি করা আল্লাহ পাক মোনাছেব মনে করেন, সেভাবেই বৃদ্ধি করে দেন। এর বিপরীত যারা সুদ বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে, তাদের সম্পদকে আল্লাহ বরকতহীন করে দেন, তাদের সম্পদে বরকত হয় না। সম্পদ দ্বারা যে উদ্দেশ্য, একটু সুখ শান্তি

Scanned by CamScanner

অর্জন করা, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। দেখা যায় সব সময় তাদের পেরেশানী লেগে আছে, টেনশনের পর টেনশন লেগে আছে। তাদের সম্পদ কাজের কাজে লাগে না। অতএব দেখা গেল যাকাত দিলে, আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করলে আমার আখেরাতেরও ফায়দা, দুনিয়ারও ফায়দা।

যাকাতের মাসায়েল

* যদি কারও নিকট শুধু স্বর্ণ থাকে, রৌপ্য, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য কিছুই না থাকে, তাহলে সাড়ে সাত তোলা বা তার বেশী (স্বর্ণ) থাকলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হয়। (১ তোলা = ১ ভরি)

* যদি কারও নিকট শুধু রৌপ্য থাকে, স্বর্ণ, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য কিছুই না থাকে, তাহলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা (রৌপ্য) থাকলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হয়।

* যদি কারও নিকট কিছু স্বর্ণ থাকে এবং তার সাথে কিছু রৌপ্য বা কিছু টাকা-পয়সা বা কিছু ব্যবসায়িক পণ্য থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে স্বর্ণের সাড়ে সাত তোলা বা রৌপ্যের সাড়ে বায়ান্ন তোলা দেখা হবে না বরং স্বর্ণ, রৌপ্য এবং টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য যা কিছু আছে সবটা মিলে যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের যে কোন একটার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে (বৎসরান্তে) তার উপর যাকাত ফরয হবে।

* যদি কারও নিকট শুধু টাকা-পয়সা থাকে-স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্যবসায়িক পণ্য কিছু না থাকে, তাহলে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের যে কোন একটার মূল্যের সমপরিমাণ (টাকা-পয়সা) থাকলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

* কারও নিকট স্বর্ণ, রৌপ্য ও টাকা-পয়সা কিছুই নেই, শুধু ব্যবসায়িক পণ্য রয়েছে, তাহলে উপরোক্ত পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোন একটার মূল্যের সমপরিমাণ থাকলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

* কারও নিকট স্বর্ণ, রৌপ্য নেই শুধু টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য রয়েছে, তাহলে টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য মিলিয়ে যদি উক্ত পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোন একটার মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

* আকেল (বুদ্ধিমান) বালেগ, ছাহেবে নেছাব মুসলমানের উপর বৎসরে একবার যাকাত আদায় করা ফরয। যে পরিমাণ অর্থের উপর যাকাত ফরয

হয় তাকে বলে 'নেছাব' আর এ পরিমাণ অর্থের মালিককে বলা হয় 'ছাহেবে নেছাব'। গরীব, পাগল ও না-বালেগের সম্পত্তিতে যাকাত ফরয হয় না।

* নেছাব পরিমাণ অর্থের উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হলে যাকাত ফরয হয়। এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যাকাত ফরয হয় না।

* অর্থ সম্পদের প্রত্যেকটা অংশের উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় বরং শুধু নেছাব পরিমাণের উপর বৎসর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। কাজেই বৎসরের শুরুতে যে পরিমাণ ছিল (নেছাবের চেয়ে কম না হওয়া চাই) বৎসরের শেষে যদি তার চেয়ে পরিমাণ বেশী দেখা দেয়, তাহলে ঐ বেশী পরিমাণের উপরও যাকাত ফরয হবে। এখানে দেখা গেল ঐ বেশী পরিমাণ, যেটা বৎসরের মাঝে যোগ হয়েছে, তার উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত না হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আসছে।

* কেউ যদি বৎসরের শুরুতে মালেকে নেছাব হয় এবং বৎসরের শেষেও মালেকে নেছাব থাকে, মাঝখানে কিছু কম হয়ে যায় (নেছাবের ন্যূনতম পরিমাণের চেয়ে কমে গেলেও) তবে বৎসরের শেষে তার নিকট যে পরিমাণ থাকবে তার উপর যাকাত ফরয হবে। তবে মাঝখানে যদি এমন হয়ে যায় যে, মোটেই অর্থ সম্পদ না থাকে, তাহলে পূর্বের হিসাব বাদ যাবে। পুনরায় যখন নেছাবের মালিক হবে তখন থেকে নতুন হিসাব ধরা হবে, তখন থেকেই বৎসরের শুরু ধরা হবে।

* ব্যবসায়িক পণ্য ছাড়া ঘরে যে সব আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, থালা-বাসন, হাড়ি-পাতিল, আলমারি, শোকেস, পড়ার বই ইত্যাদি থাকে তার উপর যাকাত আসে না।

* থাকা বা ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে যে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করা হয় বা ক্রয় করা হয় কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে যে জমি ক্রয় করা হয় সে ঘর-বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর যাকাত আসে না। তবে ব্যবসা/বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর যাকাত আসে।

* কারও কারখানা থাকলে এবং উক্ত কারখানায় কোন উৎপাদন হলে সে উৎপাদনের কাজে যে মেশিন-যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ব্যবহৃত হয়, মিল-ফ্যাক্টরীতে যে গাড়ী ও যানবাহন ব্যবহৃত হয়, তার মূল্যের উপর যাকাত আসে না বরং যাকাত আসে উৎপাদিত মালামাল ও ক্রয়কৃত কাঁচামালের উপর।

* রিকশা, বেবী, সিএনজি, বাস, ট্রাক, লঞ্চ, স্টীমার ইত্যাদি যা ভাড়ায় খাটানো হয় অথবা যা দিয়ে উপার্জন করা হয়, তার মূল্যের উপর যাকাত

আসে না। অবশ্য এসব যানবাহনই যদি কেউ ব্যবসার (বিক্রয়ের) উদ্দেশ্যে ক্রয় করে থাকে, তাহলে তার মূল্যের উপর যাকাত আসবে।

* পেশাজীবীরা তাদের পেশার কাজ চালানোর জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ব্যবহার করে থাকে, তার মূল্যের উপর যাকাত আসে না। যেমন : কৃষকের ট্রাক্টর, ইলেকট্রিশিয়ানদের ড্রিল-মেশিন, দরজীর সেলাই-মেশিন ইত্যাদি।

* যদি কারও নিকট ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হীরা, মণি, মুক্তা, ডায়মন্ড ইত্যাদির অলংকার থাকে, তাহলে তার মূল্যের উপর যাকাত আসে না। তবে যদি এরূপ নিয়তে রাখা হয় যে, এটা একটা সঞ্চয়, প্রয়োজনের মুহূর্তে বিক্রি করে নগদ অর্থ অর্জন করা যাবে, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। (جواهر الفقه)

* যে অর্থ/সম্পদে যাকাত আসে, সে অর্থ/সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত আদায় করা ফরয। মূল্যের আকারে নগদ টাকা দ্বারাও যাকাত দেয়া যায়, আবার তার দ্বারা কোন আসবাবপত্র ক্রয় করে তা দ্বারাও যাকাত দেয়া যায়।

* যাকাতের ক্ষেত্রে চন্দ্রমাসের হিসেবে বৎসর ধরা হবে। যখনই কেউ নেছাব পরিমাণ অর্থ/সম্পদের মালিক হবে, তখন থেকেই তার যাকাতের বৎসর শুরু ধরতে হবে।

* স্বর্ণ-রৌপ্যের মধ্যে যদি ব্রোঞ্জ, রাং, দস্তা, তামা ইত্যাদি কোন কিছুর মিশ্রণ থাকে আর সে মিশ্রণ স্বর্ণ-রৌপ্যের চেয়ে কম হয়, তাহলে পুরোটাকেই স্বর্ণ-রৌপ্য ধরে যাকাতের হিসেব করা হবে—মিশ্রিত দ্রব্যের কোন ধর্তব্য হবে না। আর যদি মিশ্রিত দ্রব্য স্বর্ণ-রৌপ্যের চেয়ে অধিক হয়, তাহলে সেটাকে আর স্বর্ণ-রৌপ্য ধরা হবে না বরং ঐ মিশ্রিত দ্রব্যই ধরা হবে।

* যাকাত হিসেব করার সময় অর্থাৎ, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্যবসায়িক পণ্য ইত্যাদির মূল্য ধরতে হবে তখনকার (ওয়াজিব হওয়ার সময়কার) বাজার দর হিসেবে এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি যে স্থানে রয়েছে সে স্থানের দাম ধরতে হবে।

* শেয়ারের মূল্যের উপরও যাকাত ফরয হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত মাসআলা জানার জন্য দেখুন "আহকামে যিন্দেগী"।

* যাকাত দাতার যে পরিমাণ ঋণ আছে সে পরিমাণ অর্থ বাদ দিয়ে বাকীটার যাকাত হিসেব করবে। ঋণ পরিমাণ অর্থ বাদ দিয়ে যদি যাকাতের নেছাব পূর্ণ না হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে না।

* কারও নিকট যাকাত দাতার টাকা পাওনা থাকলে সে পাওনা টাকার যাকাত দিতে হবে। পাওনা বিভিন্ন ধরনের আছে। প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য বিশদ বিবরণের কিতাব দেখতে হবে।

* যে ঋণ ফেরত পাওয়ার আশা নেই, এরূপ ঋণের উপর যাকাত ফরয হয় না। তবে পেলে বিগত সমস্ত বৎসরের যাকাত দিতে হবে।

* যৌথ কারবারে অর্থ নিয়োজিত থাকলে যৌথভাবে পূর্ণ অর্থের যাকাত হিসাব করা হবে না বরং প্রত্যেকের অংশের আলাদা আলাদা হিসাব হবে।[১]

* স্ত্রীর সম্পদের যাকাত স্ত্রীর উপর ফরয। স্ত্রীকেই তার যাকাত দিতে হবে। তবে স্বামী যদি অনুগ্রহ করে নিজের সম্পদ থেকে স্ত্রীর যাকাত আদায় করে দেন তা দিতে পারেন।

* যে সব স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার স্ত্রীর মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয় সেটাকে স্বামীর সম্পত্তি ধরে হিসাব করা হবে না বরং সেটা স্ত্রীর সম্পত্তি। আর যে সব অলংকার স্ত্রীকে শুধু ব্যবহার করতে দেয়া হয়, মালিক থাকে স্বামী, সেটা স্বামীর সম্পত্তির মধ্যে হিসাব করা হবে। আর যেগুলোর মালিকানা অস্পষ্ট রয়েছে তা স্পষ্ট করে নেয়া উচিত। যে সব অলংকার স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ থেকে তৈরী বা যেগুলো বাপের বাড়ি থেকে অর্জন করে, সেগুলো স্ত্রীর সম্পদ বলে গণ্য হবে। মেয়েকে যে অলংকার দেয়া হয়, সেটার ক্ষেত্রেও মেয়েকে মালিক বানিয়ে দেয়া হলে সেটার মালিক সে। আর শুধু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দেয়া হলে মেয়ে তার মালিক নয়। নাবালেগা মেয়েদের বিবাহ-শাদী উপলক্ষ্যে তাদের নামে যে অলংকার বানিয়ে রাখা হয় বা নাবালেগ ছেলে কিংবা মেয়ের বিবাহ-শাদীতে ব্যয়ের লক্ষ্যে তাদের নামে ব্যাংকে বা ব্যবসায় যে টাকা লাগানো হয় সেটার মালিক তারা। অতএব এগুলো পিতা/মাতার সম্পত্তি বলে গণ্য হবে না এবং পিতা/মাতার যাকাতের হিসাবে এগুলো ধরা হবে না। আর বালেগ সন্তানের নামে শুধু অলংকার তৈরী করে রাখলে বা টাকা লাগালেই তারা মলিক হয়ে যায় না, যতক্ষণ না সেটা সে সন্তানদের দখলে দেয়া হয়। তাদের দখলে দেয়া হলে তারা মালিক, অন্যথায় সেটার মালিক পিতা/মাতা।[২]

* হিসাবের চেয়ে কিছু বেশী যাকাত দিয়ে দেয়া উত্তম। যাতে কোনরূপ কম হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেটুকু যাকাত না হলেও তাতে দানের ছওয়াবতো হবেই।

১. ইসলামী ফিক্বাহ : ১ম। ২. جواہر الفتاوی ج/۱ وغیرہ।

নিম্নলিখিত লোকদেরকে বা নিম্নলিখিত খাতে যাকাত দেয়া যায় না, দিলে যাকাত আদায় হয় না।

১। যার নিকট নেছাব পরিমাণ অর্থ, সম্পদ আছে তাকে যাকাত দেয়া যায়না।

২। যারা সাইয়্যেদ অর্থাৎ, হাসানী, হুসাইনী, আলাবী, জা'ফরী ইত্যাদি তাদেরকে যাকাত দেয়া যায় না

৩। যাকাত দাতার মা-বাপ, দাদা-দাদী, নানা-নানী, পরদাদা-পরদাদী, পরনানা-পরনানী ইত্যাদি উপরের সিঁড়িকে যাকাত দেয়া যায় না।

৪। যাকাত দাতার ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি-পোত্র, পৌত্রী, ইত্যাদি নীচের সিঁড়িকে যাকাত দেয়া যায় না।

৫। যাকাত দাতার স্বামী বা স্ত্রীকে যাকাত দেয়া যায় না।

৬। অমুসলিমকে যাকাত দেয়া যায় না।

৭। যার উপর যাকাত ফরয হয়—এরূপ মালদার লোকদের নাবালেগ সন্তানকে যাকাত দেয়া যায় না।

৮। মসজিদ, মাদরাসা বা স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণ কাজের জন্য যাকাত দেয়া যায় না।

৯। মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের জন্য বা মৃত ব্যক্তির ঋণ ইত্যাদি আদায়ের জন্য যাকাত দেয়া যায় না।

১০। রাস্তা-ঘাট, পুল ইত্যাদি নির্মাণ ও স্থাপন কার্যে— যেখানে নির্দিষ্ট কাউকে মালিক বানানো হয় না সেখানে যাকাত দেয়া যায় না।

১১। সরকার যদি যাকাতের মাসআলা অনুযায়ী সঠিক খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় না করে, তাহলে সরকারের যাকাত ফান্ডে যাকাত দেয়া যাবে না।

১২। যাকাত দ্বারা মসজিদ মাদরাসার স্টাফকে (গরীব হলেও) বেতন দেয়া যায়না।

নিম্নলিখিত লোকদেরকে বা নিম্নলিখিত খাতে যাকাত দেয়া যায়।

১। ফকীর অর্থাৎ, যাদের নিকট সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন সমাধা করার মত সম্বল নেই অথবা যাদের নিকট যাকাত-ফেতরা ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ অর্থ-সম্পদ নেই, তাদেরকে যাকাত দেয়া যায়।

২। মিসকীন অর্থাৎ, যারা সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত অথবা যাদের জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা নেই, তাদেরকে যাকাত দেয়া যায়।

৩ । ইসলামী রাষ্ট্র হলে তার যাকাত তহবিলের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যায় ।

৪ । যাদের উপর ঋণের বোঝা চেপেছে, তাদেরকে যাকাত দেয়া যায় । ।

৫ । যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত, তাদেরকে যাকাত দেয়া যায় ।

৬ । মুসাফির ব্যক্তি (বাড়িতে সম্পদশালী হলেও) সফরে রিক্তহস্ত হয়ে পড়লে, তাকে যাকাত দেয়া যায় । ।

৭ । যাকাত দাতার ভাই-বোন, ভাতিজা-ভাতিজী, ভগ্নিপতি, ভাগিনা-ভাগিনী, চাচা-চাচী, খালা-খালু, ফুপা-ফুফী, মামা-মামী, শাশুড়ী, জামাই, সৎবাপ ও সৎমা প্রমুখ গরীব হলে তাদেরকে যাকাত দেয়া যায় ।

৮ । নিজের গরীব চাকর-নওকর বা কর্মচারীকে যাকাত দেয়া যায় । তবে এটা বেতন বাবদ কর্তন করা যাবে না ।

নিম্নলিখিত লোকদেরকে যাকাত দেয়া উত্তম ।

১ । দ্বীনী ইল্‌ম পড়নেওয়ালা এবং পড়ানেওয়ালা যদি যাকাতের হকদার হয়, তাহলে এরূপ লোককে যাকাত দেয়া সবচেয়ে উত্তম ।

২ । তারপর যাকাত পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা যাকাত খাওয়ার যোগ্য তারা ।

৩ । তারপর বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর মধ্যে যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য তারা ।

৪ । তারপর যাকাতের অন্যান্য প্রকার হকদারগণ ।

সদকায়ে ফিত্‌র/ফিতরা-এর মাসায়েল

*** ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদেকের সময় যার নিকট যাকাত ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ অর্থ/সম্পদ থাকে, তার উপর সদকয়ে ফিত্‌র বা ফিতরা ওয়াজিব । তবে যাকাতের নেছাবের ক্ষেত্রে ঘরের আসবাবপত্র বা ঘরের মূল্য ইত্যাদি হিসেবে ধরা হয় না কিন্তু ফিতরার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় আসবাবপত্র ব্যতীত অন্যান্য আসবাবপত্র, সৌখিন দ্রব্যাদি, খালিঘর বা ভাড়া ঘর (যার ভাড়ার উপর জীবিকা নির্ভরশীল নয়) এসব কিছুর মূল্য হিসেবে ধরা হবে ।**

*** রোযা না রাখলে বা রাখতে না পারলে তার উপরও ফিতরা দেয়া ওয়াজিব ।**

*** সদকায়ে ফিত্‌র/ফিতরা নিজের পক্ষ থেকে এবং পিতা হলে নিজের না-বালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব । বালেগ সন্তান, স্ত্রী, স্বামী,**

চাকর-চাকরানী, মাতা-পিতা প্রমুখের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে বালেগ সন্তান পাগল হলে তার পক্ষ থেকে দেয়া পিতার উপর ওয়াজিব।[১]

* একান্নভুক্ত পরিবার হলে বালেগ সন্তান, মাতা, পিতার পক্ষ থেকে এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফিতরা দেয়া মোস্তাহাব— ওয়াজিব নয়।[২]

* ফিতরায় ৮০ তোলার সেরের হিসেবে ১ সের সাড়ে বার ছটাক (১ কেজি ৬৬২ গ্রাম) গম বা আটা কিংবা তার মূল্য দিতে হবে। পূর্ণ দুই সের (১ কেজি ৮৬৬ গ্রাম) বা তার মূল্য দেয়া উত্তম।

* ফিতরায় যব দিলে ৮০ তোলার সেরের হিসেবে ৩ সের ৯ ছটাক (প্রায় ৩ কেজি ৫২৩ গ্রাম) দিতে হবে। পূর্ণ ৪ সের (৩ কেজি ৭৩২ গ্রাম) দেয়া উত্তম।

* গম, আটা ও যব ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যশস্য যেমন : ধান, চাউল, বুট, কলাই, মটর ইত্যাদি দ্বারা ফিতরা আদায় করতে চাইলে বাজার দরে উপরোক্ত পরিমাণ গম বা যবের মূল্য যা হয় সেই মূল্যের ধান, চাউল ইত্যাদি দিতে হবে।

* ফিত্‌রায় গম, যব ইত্যাদি শষ্য দেয়ার চেয়ে তার মূল্য নগদ টাকা-পয়সা দেয়া উত্তম।

* ফিতরা ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদের নামাযের পূর্বেই দিয়ে দেয়া উত্তম। নামাযের পূর্বে দিতে না পারলে পরে দিলেও চলবে। ঈদের দিনের পূর্বে রমযানের মধ্যে দিয়ে দেয়াও দোরস্ত আছে।

* যাকে যাকাত দেয়া যায় তাকে ফিতরা দেয়া যায়।

* একজনের ফিতরা একজনকে দেয়া বা একজনের ফিতরা কয়েকজনকে দেয়া উভয়ই দোরস্ত আছে। কয়েকজনের ফিতরাও একজনকে দেয়া দোরস্ত আছে কিন্তু তার দ্বারা যেন সে মালেকে নেছাব না হয়ে যায়। অধিকতর উত্তম হল একজনকে এই পরিমাণ ফিতরা দেয়া, যার দ্বারা সে ছোট-খাট প্রয়োজন পূরণ করতে পারে বা পরিবার-পরিজন নিয়ে দু-তিন বেলা খেতে পারে।

কুরবানী, আকীকা, মান্নত ও কছম

কুরবানীর তাৎপর্য ও ফযীলত

"কুরবানী" অর্থ ত্যাগ। ইসলামে অনেক ধরনের কুরবানী বা ত্যাগের বিধান রয়েছে। এক ধরনের কুরবানী হল জানের কুরবানী। যেমন : নামায, রোযা, হজ্জ, জেহাদ ইত্যাদির বিধান। এগুলো পালন করতে গেলে কিছুটা

---

১. بہشتی زیور ح حاشیہ ।২. بہشتی زیور ।

জানকে কষ্ট দিতে হয়, দেহকে কষ্ট দিতে হয়। এমনকি জেহাদে গে নিজের পূর্ণ জীবনটাও চলে যেতে পারে। আর এক ধরনের কুরবানী হ মালের কুরবানী। যেমন : যাকাত, ফিত্‌রা, কুরবানী, দান-সদ্‌কা ইত্যাদি বিধান। এসব বিধান পালনের মাধ্যমে মালের কুরবানী দেয়া হয়। হজ্জে মধ্যে জানের কুরবানীও হয়, মালের কুরবানীও হয়। আর এক ধরনে কুরবানী হল মনের কুরবানী অর্থাৎ, মনের চাহিদার কুরবানী, মনের খাহে এবং চাহাতের কুরবানী। এই কুরবানীই হল সবচেয়ে বড় কুরবানী। কার মানুষের পক্ষে জান-মাল ব্যয় করা সহজ অর্থাৎ, জান-মালের কুরবানী দে সহজ, কিন্তু মনের কুরবানী দেয়া কঠিন। মানুষ অকাতরে নিজের সম্পদ ব্য করতেও সহজে প্রস্তুত হয়ে যায়, কিন্তু নিজের মনের ধ্যান-ধারণা, নিজে মনের বুঝ, নিজের মনের যুক্তি সহজে ছাড়তে প্রস্তুত হয় না। রাসূল সাল্লাল্লা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কাফেররা তাদের প্রচুর সম্পদ ব্যয় করে এমনকি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিজেদের জীবন পর্যন্ত দি দিয়েছে, তবুও নিজেদের মনে কুফ্‌র-শিরকের যে ধ্যান-ধারণা ছিল সে ত্যাগ করতে রাজী হয়নি। অর্থাৎ, সবকিছু কুরবানী দিতে তারা রাজী হয়ে কিন্তু মনের কুরবানী দিতে তারা রাজী হয়নি। দেখা গেল মনের কুরবানী হল সবচেয়ে কঠিন।

মনের কুরবানী হল সবচেয়ে বড় কুরবানী। ঈদুল আযহার সময় কুরবানী, সেখানে জানোয়ার যবাই করার মাধ্যমে মালেরও কুরবানী হয়, সে সাথে মনেরও কুরবানী হয়। এই কুরবানীর জন্তু যবাই করতে বিপুল পরিমা অর্থ ব্যয় হবে, এই অর্থের প্রতি মনের যে মায়া, সেই মায়াকে ত্যাগ ক কুরবানী করতে হবে। কুরবানী করতে গেলে মনের মধ্যে গোশ্‌ত খাওয়া চেতনাটাই মূল হয়ে দাঁড়াতে চাইবে, মনের এই চেতনাকেও কুরবানী দি হবে এবং সম্পূর্ণ আল্লাহকে রাজী-খুশী করার নিয়্যতেই কুরবানী করতে হবে কুরবানীর জন্তু ক্রয় করার সময় মনের মধ্যে আসবে সবচেয়ে দামী জন্তু ক্রয় করব, কিংবা যেটা ক্রয় করব সেটাকে সাজিয়ে-পরিয়ে মহড়া দিব তাহলে মানুষ জানবে যে অমুকে এই জন্তুটা কুরবানী দিতে যাচ্ছে। এভা মনের মধ্যে নাম প্রচারের চেতনা এসে যেতে চাইবে। মনের এই চেতনাকে কুরবানী দিতে হবে। এভাবে জন্তু কুরবানীর সাথে সাথে মনেরও কুরবানী হবে। বরং মনের কুরবানীটাই হল আসল। কারণ, মনের এই সব গল

খেয়াল ত্যাগ না করলে এই জন্তু কুরবানীর আমলে এখ্লাস থাকবে না। আর কোন আমলে এখ্লাস না থাকলে সেই আমলের কোনই মূল্য নেই। তাই মনের কুরবানী না করে শুধু রক্ত-মাংসের জানোয়ার কুরবানী করলে তাতে কোন ফায়দা হবে না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক তাই ইরশাদ করেছেন :

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ۔

অর্থাৎ, এই কুরবানীর জন্তুর রক্ত-মাংস আদৌ আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না বরং আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া অর্থাৎ, তোমাদের মনের এখ্লাস ও আন্তরিকতা। (সূরা হজ্জ : ৩৭)

এই কুরবানীর বিধান প্রবর্তিত হওয়ার যে মূল ইতিহাস অর্থাৎ, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পুত্রকে কুরবানী করার ঘটনা, সেখানেও মূল ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মনের কুরবানী। তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁর কাছে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস অর্থাৎ পুত্রকে কুরবানী দেয়ার জন্য মন থেকে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর মনের কুরবানী। নিজের সন্তানের চেয়ে প্রিয় জিনিস দুনিয়াতে আর কী হতে পারে? সেই সন্তানকে কুরবানী দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে হুকুম দিয়েছিলেন। তা-ও কেমন পুত্র? প্রায় সারা জীবন হযরত ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন নিঃসন্তান। সন্তানের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তিনি বারবার দুআ করছেন, নিজের বয়স হয়ে গিয়েছে ১২০ বৎসর, স্ত্রীর বয়স হয়েছে ৯৯ বৎসর। এ অবস্থায় আল্লাহ পাক তাঁকে একটা সন্তান দান করলেন, নাম ইসমাঈল। ইসমাঈল-এর বয়স যখন ৭ বৎসর বা এক বর্ণনা মতে ১৩ বৎসর হল, তখন ইব্রাহীম (আ.)-কে স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আদেশ দিলেন তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করে দাও।

নবীদের স্বপ্ন হয় ওহী। তাই নবীগণ যা স্বপ্ন দেখেন তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। নবীদের স্বপ্ন হল দলীল। তাই স্বপ্ন অনুযায়ী তিনি পুত্রকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। আমাদের স্বপ্ন দলীল নয়। তাই আমরা যদি এমন কোন স্বপ্ন দেখি যা শরীয়তে নেই, সেটা করা যাবে না। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে অমুক মাযারে শিরণী দাও বা নজর-নেওয়াজ দাও বা গরু-ছাগল দাও, বা অমুক পূজা মণ্ডপে সাপকে দুধকলা দাও, তাহলে এসব স্বপ্ন অনুযায়ী আমল করা যাবে না। কারণ, মাযারে শিরণী বা নজর-নেওয়াজ দেয়া জায়েয নয়। এমনিভাবে পূজা মণ্ডপে কিছু দেয়াও জায়েয নয়। কাজেই এসব স্বপ্ন

অনুসারে কাজ করা যাবে না। তবে শরীয়তে জায়েয—এমন কোন বিষয় যদি কেউ স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে স্বপ্নের মূল্য আছে।

আমাদের স্বপ্ন দলীল নয়। কারণ, ঘুমের মধ্যে আমাদের চেতনা ঠিক থাকে না। কী দেখেছি তা হয়ত সঠিক ভাবে মনে নেই বা সঠিকভাবে তা বুঝতে পারিনি, কিংবা যা দেখেছি তা কি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেখেছি না শয়তানের পক্ষ থেকে তারও গ্যারান্টি নেই। তাই আমাদের স্বপ্ন দলীল হতে পারে না। পক্ষান্তরে নবীগণ ঘুমালেও তাদের চেতনা সজাগ থাকে। হাদীছে এসেছে : নবীদের চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁদের অন্তর জাগ্রত থাকে। তাই তাঁরা স্বপ্নে কী দেখেছেন তা সঠিকভাবে বুঝতেও পারেন, মনেও রাখতে পারেন। আর শয়তানের ওয়াছওয়াছা থেকেও আল্লাহ পাক তাদেরকে হেফাজতে রাখেন। তাই নবীগণের স্বপ্ন শরীয়তের দলীল হয়ে থাকে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাই স্বপ্নের আদেশ অনুযায়ী পুত্রকে কুরবানী করার জন্য মিনার ময়দানে নিয়ে গেলেন। কুরআন শরীফে এসেছে :

قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔

অর্থাৎ, হযরত ইব্রাহীম (আ.) পুত্রকে বললেন : হে আমার প্রিয় ছেলে! আমি স্বপ্নে তোমাকে যবাই করার বিষয় দেখেছি, তুমি ভেবে দেখ এখন কী করার। পুত্র জবাব দিল :

قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔

অর্থাৎ, হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হচ্ছে তা-ই করুন, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। (সূরা সাফ্ফাত : ১০২)

রেওয়ায়েতে এসেছে—পুত্র আরও বলল : হে আমার পিতা! আমাকে শক্ত করে বাঁধবেন, যাতে আমি নড়াচড়া করতে না পারি। নড়াচড়া করলে আপনার যবাই করতে কষ্ট হবে, আপনার গায়ে রক্ত ছিটে গিয়ে লাগবে। আর ছুরিটাকেও ভালভাবে ধারাল করে নিন, যাতে তাড়াতাড়ি যবাই সেরে ফেলতে পারেন। এভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.) পুত্রকে যবাই করার উদ্যোগ নিলেন। কুরআন শরীফে এসেছে :

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ○ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ○ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ○ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ○

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ, তারা পিতা-পুত্র উভয়ে যখন আল্লাহ্র হুকুমের আনুগত্য করার জন্য নিজেদেরকে সোপর্দ করল, আর ইব্রাহীম পুত্রকে যবাই করার জন্য উপুড় করে শোয়ালো, তখন আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম যে, হে ইব্রাহীম! তোমার স্বপ্নকে তুমি বাস্তবে পরিণত করেছ। এটা ছিল এক মহা পরীক্ষা। (এই পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ।) আল্লাহ বলেন : এভাবেই আমি নেককার লোকদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। আল্লাহ পাক বলেন : আমি তার পুত্রের বদলে একটা মর্যাদাবান দুম্বা পাঠিয়ে দিলাম। (জান্নাত থেকে এই দুম্বাটি আনা হয়েছিল।) [সূরা সাফফাত : ১০৩-১০৭]

হযরত ইব্রাহীম (আ.) পুত্রের গলায় ছুরি চালিয়ে ছিলেন, কিন্তু দেখা গেল পুত্র যবাই হল না, তার স্থলে ঐ দুম্বাটি যবাই হয়ে গেল। এ ঘটনায় দেখা গেল পুত্র যবাই না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক বলেছেন ইব্রাহীম (আ.) পরীক্ষায় পাশ করেছেন। বোঝা গেল— পুত্রের কুরবানী হওয়াটাই পরীক্ষার মূল বিষয় ছিল না। বরং পরীক্ষার মূল বিষয় ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মনের কুরবানী। তিনি যখন মন থেকে পুত্রকে কুরবানী করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হলেন, আল্লাহ্র জন্য নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যোগ নিলেন এবং প্রমাণ করলেন যে, আমি দুনিয়ার বস্তুর প্রতি আমার মনের সব ভালবাসা, মনের সব প্রেম আবেগ সবকিছুকে তোমার জন্য কুরবানী করে দিলাম, তখনই তিনি পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেলেন। পুত্রের কুরবানী হয়ে যাওয়া আল্লাহ্র কাছে কাম্য ছিল না। যদি পুত্রের কুরবানী হয়ে যাওয়াই আল্লাহ্র কাছে কাম্য হত, তাহলে পুত্রই কুরবানী হয়ে যেত। বরং আল্লাহ্র কাছে কাম্য ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মনের কুরবানী।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর এই শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্যই আমাদের উপরও কুরবানীর বিধান রাখা হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযি.) বলেন : সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ ـ (الترغيب والترهيب)

অর্থাৎ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কুরবানী কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াবে বললেন : এটা হল তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ.)-এর আদর্শ।

বোঝা গেল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মত মনের কুরবানী দিতে পারাই হল এই কুরবানীর শিক্ষা।

অতএব আমরা যদি আল্লাহ্র হুকুম পালন করার জন্য আমাদের মনের সব রকম জযবাকে কুরবানী দিতে পারি, যেমন : সম্পদের মায়াকে উপেক্ষা করে আল্লাহ্র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করতে পারি, সম্পদ সঞ্চয় করে রাখার মোহকে কুরবানী দিয়ে যাকাত দিতে পারি, হজ্জ করতে পারি, মানুষের ভালবাসার উপর, ছেলেমেয়ে এবং পরিবারের ভালবাসার উপর আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসাকে প্রাধান্য দিতে পারি; এভাবে সব স্থানে মনের কুরবানী দিতে পারি, তাহলে বোঝা যাবে কুরবানীর শিক্ষা আমাদের মধ্যে এসেছে।

কুরবানীর জন্য উত্তম জন্তু ক্রয় করতে বলা হয়েছে। যাতে বেশী অর্থ ব্যয় হয় এবং মন থেকে অর্থের মায়ার কুরবানী হয়ে যায়। তাই কুরবানীর পশু ভাল এবং হৃষ্টপুষ্ট হওয়া উত্তম। লেংড়া, পা ভাঙ্গা, কান কাটা, লেজ কাটা, শিং ভাঙ্গা ও অন্ধ পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়।

কুরবানী করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র হুকুম পালন ও ছওয়াব অর্জন করার নিয়তে। নাম-শোহরতের ও মানুষকে দেখানোর নিয়তও থাকতে পারবে না। এই নাম-শোহরতের জযবাকেও কুরবানী দিতে হবে। এমনকি গোশ্ত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী করলেও কুরবানী সহীহ হবে না। যদিও কুরবানীর গোশত খাওয়া জায়েয, কিন্তু কুরবানীর উদ্দেশ্য এটা থাকতে পারবে না। এ সমস্ত গলত নিয়ত থাকলে কুরবানী সহীহ হবে না। এমনকি কয়েকজন শরীকে মিলে যদি একটা পশু কুরবানী করে, আর তাদের মধ্যে একজনের নিয়তও গলত থাকে, তাহলে সেই শরীকদের অন্য কারও কুরবানী সহীহ হবে না। তাই শরীক নেয়ার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কারও সম্পর্কে যদি কোনভাবে বোঝা যায় যে, তার নিয়ত সহীহ নয়, তাহলে তার সঙ্গে মিলে কুরবানী না করা চাই। এ বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক। শরীকদের প্রত্যেকের নিয়ত সহীহ থাকতে হবে। অন্যথায় সকল শরীকের কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে, কুরবানীর ছওয়াব পাওয়া যাবে না। সামান্য একটু গলত নিয়তের কারণে কুরবানীর এত বড় ছওয়াব নষ্ট করা হবে চরম বোকামী।

কুরবানীর কত ছওয়াব—এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে। পূর্বে উল্লেখিত হযরত যায়েদ ইব্নে আরকাম (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীছে এসেছে :

Scanned by CamScanner

قَالُوا : فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ : بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ . قَالُوا : فَالصُّوفُ؟
قَالَ : بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ ـ (الترغيب والترهيب)

অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরবানী করলে আমরা কী পাব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : প্রত্যেকটা চুলের বদলে এক-একটা নেকী পাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন পশমের বদলেও কি ছওয়াব পাওয়া যাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : প্রত্যেকটা পশমের বদলে এক-একটা ছওয়াব পাওয়া যাবে। সুবহানাল্লাহ! তাহলে একটা কুরবানীর কত ছওয়াব! একটা পশুর গায়ে কত লক্ষ লক্ষ পশম থাকে তা কে গণনা করে দেখেছে! কুরবানীর এই ছওয়াবের দিকে তাকালে যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, তাদেরও কুরবানী অর্থাৎ, নফল কুরবানী করতে জযবা হওয়ার কথা। আর যাদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব, তাদেরতো অবশ্যই কুরবানী করতে হবে।

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য অনেক টাকা-পয়সা থাকা জরুরী নয়। ঈদুল আযহার দিনগুলোতে যার কাছে যাকাত ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ অর্থ/সম্পদ থাকে, তার উপরই কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। এ হিসেবে কারও কাছে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্য পরিমাণ টাকা-পয়সা থাকলেও তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। আমাদের অনেক মা-বোনের কাছে এ পরিমাণ অর্থ/সম্পদ থাকে। অথচ আমরা মনে করি না যে, আমাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে। আমরা মনে করি শুধু পুরুষদের উপরই কুরবানীর বিধান। তা নয়। নারীদের উপরোক্ত পরিমাণ সম্পদ থাকলে তাদের উপরও কুরবানী ওয়াজিব। কার কাছে কী পরিমাণ টাকা-পয়সা বা সোনা-রুপা আছে, বা কী পরিমাণ ব্যবসার মালামাল আছে, সেগুলো হিসেব করে প্রয়োজন হলে উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিতে হবে আমার উপর কুরবানী ওয়াজিব কিনা। কুরবানী সম্পর্কিত অন্যান্য মাসায়েল কিতাব পড়ে বা উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিতে হবে।

কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকলে টাকা-পয়সার মায়াকে কুরবানী দিয়ে কুরবানী করতে হবে। সম্ভব হলে ওয়াজিবের বাইরেও নফল কুরবানী করার নিয়ম রয়েছে। মৃত মাতা-পিতার নামে, আপনজনের নামে, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে, তাঁর বিবিদের নামে আমরা নফল কুরবানী করতে পারি। দিল খুলে আমাদেরকে কুরবানী করতে হবে। এভাবে প্রচুর সংখ্যক কুরবানী হতে পারে।

ইসলামের জন্য যাদের দরদ নেই বা যারা ইসলামকে মনে-প্রাণে পছন্দ করে না, তারা কুরবানীর দিনে এত সংখ্যক পশু কুরবানী হতে দেখে ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে এবং কুরবানী যেন কম হয়— এজন্য তারা নানান যুক্তি পেশ করতে থাকে। কেউ কেউ বলে : এই এক সময় যদি এত জানোয়ার জবাই না করা হত বরং সারা বৎসর আস্তে আস্তে যবাই হত, তাহলে সারা বৎসর বহু মানুষের পুষ্টির ব্যবস্থা হত। এই এক সময় এত পশু যবাই হওয়ায় সারা বৎসর পশুর ঘাটতি দেখা দিয়ে থাকে ইত্যাদি। তাদের এই যুক্তি ভুল। বেশী ব্যবহার করলেই ঘাটতি দেখা দিবে এটা বাস্তবতা বিরোধী কথা। বরং বাস্তব হল— যে জিনিসের ব্যবহার যত বেশী হয়, তার উৎপাদনও তত বাড়তে থাকে। আর যার ব্যবহার যত কম, তার উৎপাদনও তত কম। এ কারণেই দেখা যায় কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি জানোয়ারের সংখ্যা কম। কারণ এগুলোর ব্যবহার কম। কোন মুসলমান এগুলো খায় না, তাই এদের সংখ্যাও তেমন বাড়ে না। অথচ বিড়াল-কুকুর এক সাথে অনেকগুলো করে বাচ্চা দেয়। তবুও তাতে বরকত নেই। এর বিপরীত গরু-ছাগল প্রতিদিন অনেক সংখ্যায় যবাই হয়, তবুও তার সংখ্যা দিন দিন বাড়তেই থাকে। আল্লাহ পাকই বরকত দিয়ে থাকেন। তাছাড়া যে জিনিসের ব্যবহার যত বেশী হয়, মানুষও সেটা বেশী হারে উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকে। কাজেই এ সমস্ত অপপ্রচারে প্রভাবিত না হওয়া উচিৎ। এগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। এরকম অপপ্রচারে কান না দেয়া উচিৎ। দিল খুলে খুশী মনে কুরবানী করা উচিৎ। কুরবানীর ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

فَطِيْبُوْا بِهَا أَنْفُسًا ۔(ابن ماجة والترمذي)

অর্থাৎ, তোমরা খুশী মনে দিল খুলে কুরবানী করে যাও।

আল্লাহ পাক আমাদের মনের সব রকম ওয়াছওয়াছা দূর করে দেন। দিল খুলে কুরবানী করার তাওফীক দান করুন। নিম্নে কুরবানী সম্পর্কিত জরুরী মাসায়েল বয়ান করা হল—

কুরবানীর মাসায়েল

* ১০ই জিলহজ্জের ফজর থেকে ১২ই জিলহজ্জের সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্থাৎ, কুরবানীর দিনগুলোতে যার নিকট সদকায়ে ফিতর/ফিতরা ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ অর্থ/সম্পদ থাকে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

* মুসাফিরের উপর (মুসাফিরী হালতে) কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।

* কুরবানী ওয়াজিব না হলেও নফল কুরবানী করলে কুরবানীর ছওয়াব পাওয়া যাবে।

* কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয়—সন্তানাদি, মাতা-পিতা ও স্বামীর পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয় না, তবে তাদের পক্ষ থেকে করলে তা নফল কুরবানী হবে।

* যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় সে কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করলে সেই পশু কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়।

* কোন মাকসূদের জন্য কুরবানীর মান্নত করলে সেই মাকসূদ পূর্ণ হলে তার উপর (গরীব হোক বা ধনী) কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

* যার উপর কুরবানী ওয়াজিব, সে কুরবানী না করলে কুরবানীর দিনগুলো চলে যাওয়ার পর একটা বকরীর মূল্য সদকা করা ওয়াজিব।

* বকরী, পাঠা, খাসী, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা, গাভী, ষাঁড়, বলদ, মহিষ, উট এই কয় প্রকার গৃহপালিত জন্তু দ্বারা কুরবানী করা দোরস্ত।

* বকরী, খাসী, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা কমপক্ষে পূর্ণ এক বৎসর বয়সের হতে হবে। বয়স যদি এক বৎসর থেকে কিছু কমও হয়, কিন্তু এরূপ মোটা তাজা যে, এক বৎসর বয়সীদের মধ্যে ছেড়ে দিলেও তাদের চেয়ে ছোট মনে হয় না, তাহলে তার কুরবানী দোরস্ত আছে, তবে অন্ততঃ ছয় মাস বয়স হতে হবে। বকরীর ক্ষেত্রে এরূপ ব্যতিক্রম নেই। বকরী কোন অবস্থায় এক বৎসরের কম বয়সের হতে পারবে না।

* গরু ও মহিষের বয়স কমপক্ষে দুই বৎসর হতে হবে।

* উট-এর বয়স কমপক্ষে পাঁচ বৎসর হতে হবে।

* কুরবানীর পশু ভাল এবং হৃষ্ট-পুষ্ট হওয়া উত্তম।

* যে প্রাণী লেংড়া অর্থাৎ, যা তিন পায়ে চলতে পারে— এক পা মাটিতে রাখতে পারে না বা রাখতে পারলেও তার উপর ভর করতে পারে না— এরূপ পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়।

* যে পশুর একটিও দাঁত নেই তা দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নয়।

* যে পশুর কান জন্ম থেকেই নেই, তা দ্বারা কুরবানী দোরস্ত নয়। তবে কান ছোট হলে অসুবিধা নেই।

* যে পশুর শিং মূল থেকে ভেঙ্গে যায় তা দ্বারা কুরবানী দোরস্ত নয়। তবে শিং ওঠেইনি বা কিছু পরিমাণ ভেঙ্গে গিয়েছে এরূপ পশুর কুরবানী দোরস্ত আছে।

* যে পশুর উভয় চোখ অন্ধ বা একটি চোখ পূর্ণ অন্ধ বা একটি চোখের দৃষ্টি শক্তি এক তৃতীয়াংশ বা তার বেশী নষ্ট, তা দ্বারা কুরবানী দোরস্ত নয়।

* যে পশুর একটি কান বা লেজের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা তার চেয়ে বেশী কেটে গিয়েছে তা দ্বারা কুরবানী দোরস্ত নয়।

* অতিশয় কৃশকায় ও দুর্বল পশু যার এতটুকু শক্তি নেই যে, জবেহের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে, তা দ্বারা কুরবানী দোরস্ত নয়।

* ভাল পশু ক্রয় করার পর এমন দোষ-ত্রুটি দেখা দিয়েছে যার কারণে কুরবানী দোরস্ত হয় না, এরূপ হলে ঐ জন্তুটি রেখে আর একটি ক্রয় করে কুরবানী করতে হবে। তবে ক্রেতা গরীব হলে সেটিই কুরবানী দিতে পারবে।

* গর্ভবতী পশু কুরবানী করা জায়েয। যদি পেটের বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তবে সে বাচ্চাও যবেহ করে দিবে। তবে প্রসবের নিকটবর্তী হলে সেরূপ গর্ভবতী পশু কুরবানী দেয়া মাকরূহ।

* বন্ধ্যা পশু কুরবানী করা জায়েয।

* বকরী, খাসী, পাঠা, ভেড়া-ভেড়ী ও দুম্বায় এক জনের বেশী শরীক হয়ে কুরবানী করা যায় না। এগুলো একটা একজনের পক্ষ থেকেই কুরবানী হতে পারে।

* একটা গরু, মহিষ ও উটে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হতে পারে। সাতজন হওয়া জরুরী নয়; দুইজন বা তিনজন বা চারজন বা পাঁচজন বা ছয়জন কুরবানী দিতে পারে, তবে কারও অংশ সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হতে পারবে না।

* মৃতের নামেও কুরবানী হতে পারে।

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর বিবিগণ ও বুযুর্গদের নামেও কুরবানী হতে পারে।

* যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কুরবানী করে না বরং গোশ্ত খাওয়া বা লোক দেখানো ইত্যাদি নিয়তে কুরবানী করে, তাকে অংশীদার বানিয়ে কোন পশু কুরবানী করলে সকল অংশীদারের কুরবানীই নষ্ট হয়ে যায়। তাই শরীক নির্বাচনের সময় খুবই সতর্ক থাকা দরকার। এক জনের কারণে যেন সকলের কুরবানী নষ্ট হয়ে না যায়।

* কুরবানীর পশু ক্রয় করার সময় শরীক রাখার ইরাদা ছিল না, পরে শরীক গ্রহণ করতে চাইলে ক্রেতা গরীব হলে তা পারবে না, অন্যথায় পারবে।

* যার সমস্ত উপার্জন বা অধিকাংশ উপার্জন হারাম, তাকে শরীক করে কুরবানী করলে অন্যান্য সকল শরীকের কুরবানী অশুদ্ধ হয়ে যাবে।[১]

গোশ্ত বন্টনের তরীকা

* অংশীদারগণ সকলে একান্নভুক্ত হলে গোশত বন্টনের প্রয়োজন নেই। অন্যথায় বন্টন করতে হবে।

* অংশীদারগণ গোশ্ত অনুমান করে বন্টন করবেন না বরং বাটখারা দিয়ে ওজন করে বন্টন করতে হবে। অন্যথায় ভাগের মধ্যে কমবেশ হয়ে গেলে গোনাহগার হতে হবে। অবশ্য কোন অংশীদার মাথা, পায়া ইত্যাদি বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করলে তার ভাগে গোশত কিছু কম হলেও তা দোরস্ত হবে। কিন্তু যে ভাগে গোশ্ত বেশী, সেভাগে মাথা পায়া ইত্যাদি বিশেষ অংশ দেয়া যাবে না।

* অংশীদারগণ সকলে যদি সম্পূর্ণ গোশত দান করে দিতে চায় বা সম্পূর্ণটা রান্না করে বিলাতে বা খাওয়াতে চায়, তাহলে বন্টনের প্রয়োজন নেই।

কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া ও দান করার মাসায়েল

* কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া, পরিবারবর্গকে খাওয়ানো, আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া এবং গরীব-মিসকীনকে দেয়া সবই জায়েয। মোস্তাহাব ও উত্তম তরীকা হল তিন ভাগ করে একভাগ নিজেদের জন্য রাখা, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া এবং একভাগ গরীব মিসকীনকে দান করা।

* মান্নতের কুরবানীর গোশত হলে নিজে খেতে পারবে না এবং মালদারকেও দিতে পারবে না বরং পুরোটাই গরীব-মিসকীনদেরকে দান করে দেয়া ওয়াজিব।

---

১. احسن الفتاوی ج/٧ ۱

* যদি কোন মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে কুরবানীর জন্য ওসিয়ত করে গিয়ে থাকেন, তবে সেই কুরবানীর গোশ্তও মান্নতের কুরবানীর গোশ্তের ন্যায় পুরোটাই খয়রাত করা ওয়াজিব।

* কুরবানীর গোশ্ত বা বিশেষ কোন অংশ (যেমন মাথা) পারিশ্রমিক রূপে দেয়া জায়েয নয়। যেমন অনেক এলাকায় রছম আছে যবেহকারীকে যবেহের পারিশ্রমিক বাবত মাথা দিয়ে দেয়া হয়, এটা জায়েয নয়।

* কুরবানীর গোশ্ত শুকিয়ে (বা ফ্রীজে রেখে) দীর্ঘ দিন খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।[১]

আকীকার মাসায়েল

* আকীকা করা সুন্নাত।

* ছেলে বা মেয়ে জন্মের পর সপ্তম দিবসে আকীকা করা মোস্তাহাব। সপ্তম দিবসে না করতে পারলে যখনই করুক না কেন যে বারে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার আগের দিন করবে। যেমন শনিবার সন্তান হয়ে থাকলে শুক্রবার আকীকা করবে, তাহলেও এক রকমে সপ্তম দিবসে আকীকা করা হবে; এটাই উত্তম। এ ছাড়াও যে কোন দিন ইচ্ছা করা যায়।

* সন্তান বালেগ হওয়ার পরও আকীকা করা দুরস্ত আছে, তবে মৃত্যুর পর আকীকা নেই। (احسن الفتاوی ج ۷)

* আকীকা করা দ্বারা সন্তানের বালা-মুসীবত দূর হয় এবং যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ থাকে।

* ছেলে হলে আকীকায় দুইটি বকরী বা ভেড়া উত্তম, আর মেয়ে হলে একটি বকরী বা ভেড়া। কিংবা কুরবানীর গরু ইত্যাদি বড় পশুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই অংশ নেয়া উত্তম আর মেয়ের জন্য এক অংশ। ছেলের পক্ষ থেকে একটি বকরী বা কুরবানীর এক অংশ দ্বারা আকীকা করলেও চলবে। আর আকীকা না করলেও কোন দোষ নেই। তবে আকীকা করা সুন্নাত।

কেউ মনে করতে পারে, ছেলের জন্য আকীকার পরিমাণ বেশী আর মেয়ের জন্য আকীকার পরিমাণ কম রাখার দ্বারা বোঝা যায় মেয়েদেরকে একটু খাটো করে দেখা হয়েছে। আসলে তা নয়। আকীকা হল সন্তানের আপদ-বালা দূর করার জন্য। আর মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বাইরে ঘোরাফেরা বেশী করবে, তাদের কাজের ক্ষেত্র থাকবে সাধারণতঃ বাইরে।

---

১. فتاوی محمودیہ ج ۴ ।

তাই তাদের বিপদের ঝুঁকিও বেশী। এজন্যেই বালা-মুসীবত দূর করার উপকরণ অর্থাৎ, আকীকার পরিমাণটাও বেশী রাখা হয়েছে।

* যে জন্তু দ্বারা কুরবানী দোরস্ত তার দ্বারাই আকীকা দোরস্ত।

* সন্তানের মথা মুণ্ডানোর জন্য মাথায় খুর/ব্লেড রাখার সাথে সাথে আকীকার পশু যবেহ করতে হবে—এরূপ ধারণা ভুল এবং এটা বেহুদা রছম।

* আকীকার গোশত মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী সহ সকলেই ভক্ষণ করতে পারে।

* আকীকার গোশত কাঁচা ভাগ করে দেয়া বা রান্না করে ভাগ করে দেয়া বা দাওয়াত করে খাওয়ানো সবই দোরস্ত আছে।

* কোন কোন ফকীহ বলেছেন আকীকার পশুর চামড়া বিক্রি করলে তার মূল্য দান করেই দেয়া উচিত। যদিও এ ব্যাপারে কুরবানীর চামড়ার অর্থের ন্যায় অত কড়াকড়ি নেই।[১]

মান্নতের মাসায়েল

* কোন ইবাদত জাতীয় মান্নত মানলে যদি যে উদ্দেশ্যে মান্নত করেছে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, তাহলে ঐ মান্নত পূরা করা ওয়াজিব। উদ্দেশ্য পূর্ণ না হলে মান্নত আদায় করা ওয়াজিব হয় না। আর কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত এমনিতেই আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কোন কিছুর মান্নত করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

* শরীয়তের খেলাফ মান্নত মানলে তা পূর্ণ করা যাবে না, যেমন মাযারে কোন কিছু দেয়ার মান্নত করলে বা নাচ-গানের মান্নত করলে ইত্যাদি। এসব মান্নত পূরা করলে গোনাহ হবে।

* মীলাদের মান্নত মানলে সে মান্নত বাতিল—তা পূরা করার দরকার নেই।[২]

* নির্দিষ্ট গরু, বকরী বা মুরগি মান্নত করলে সেটাই দিতে হবে। আর যদি নির্দিষ্ট করে না বলে, তাহলে গরু ও বকরীর ক্ষেত্রে কুরবানীর উপযুক্ত যে কোন গরু বা খাসী দিতে হবে।

---

১. فتاوی رحیمیہ ج۲। ২. فتاوی رحیمیہ ج۲।

* কোনো স্থান খাস করে মান্নত করলে সেখানেই দেয়া জরুরী নয়, তেমন মক্কা শরীফ বা মদীনার খাস করে মান্নত করলে সেখানেই দেয়া জরুরী নয়— অন্য স্থানেও দেয়া যাবে।

* কোনো দিন বা কোনো মিসকীনকে দেওয়ার মান্নত করলে সেই কোনো দিন বা সেই কোনো মিসকীনকে দেয়া জরুরী নয়— অন্য যে কোন দিন বা অন্য যে কোন মিসকীনকে দিলেও চলবে।

* যদি এই মান্নত করে যে, ১০ জন ফকীরকে বা ১০ জন মিসকীনকে খাওয়াব, তাহলে ফকীরকে বা মিসকীনকেই খাওয়ান জরুরী নয়— যে কোন ধরনের ১০ জন মিসকীনকে খাওয়ালেও চলবে।

* যে কয়জন মিসকীনকে খাওয়ানোর মান্নত করবে সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে তার নিয়ত কী ছিল; যদি এক ওয়াক্ত খাওয়ানোর নিয়ত থাকে, তাহলে এক ওয়াক্ত খাওয়ালেই চলবে। আর যদি দুই ওয়াক্ত খাওয়ানোর নিয়ত থাকে বা কিছু নিয়ত ঠিক করে না থাকে, তাহলে দুই ওয়াক্ত পেট ভরে খাওয়াতে হবে।

* যদি এত বা এতটি মিসকীনকে কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট না করে চাউল-ডাউল ইত্যাদি দেয়ার মান্নত করে থাকে, তাহলে প্রত্যেক মিসকীনকে একটি সদকায়ে ফিতর-এর পরিমাণ দিতে হবে।

* যদি রোযার মান্নত করে থাকে, তাহলে এ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৪৭১ নং পৃষ্ঠা।

* এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে মান্নত মানা দোরস্ত নয়।

কছমের মাসায়েল

* বিনা প্রয়োজনে কথায় কথায় কছম খাওয়া (শপথ করা) অন্যায় কাজ।

* কছমের খেলাফ করলে বা খেলাফ হলে কাফফারা দেয়া ওয়াজিব।

* যদি কেউ বলে আল্লাহ্‌র কছম বা খোদার কছম বা আল্লাহ্‌র বুযুর্গী ও বড়ত্বের কছম আমি অমুক কাজ করব বা করব না, তাহলে কছম হয়ে যাবে— তার খেলাফ করা কিছুতেই জায়েয হবে না।

* যদি কেউ আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম উচ্চারণ করে কছম খায়, তবুও কছম হয়ে যাবে।

* যদি কেউ আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করে শুধু বলে কছম খাচ্ছি, অমুক কাজ করব বা করব না, তবুও কছম হয়ে যাবে।

* যদি কেউ বলে আল্লাহ সাক্ষী বা খোদা সাক্ষী বা রসূলকে হাজির নাযির জেনে বলছি, তবুও কছম হয়ে যাবে

* কুরআন বা আল্লাহর কালামের কছম খেলেও কছম হয়ে যায়। কিন্তু শুধু কুরআন হাতে নিয়ে বা কুরআন ছুঁয়ে যদি কিছু বলে, তাহলে কছম হবে

* যদি কেউ বলে : আমি যদি অমুক কাজ করি বা না করি তাহলে যেন বেঈমান হয়ে যাই বা মৃত্যুর সময় যেন ঈমান নসীব না হয় বা অমুক কাজ করলে আমি মুসলমান নই, তাহলেও কছম হয়ে যাবে। তার খেলাফ করলে কাফফারা দিতে হবে, তবে ঈমান যাবে না।

* যদি কেউ বলে অমুক কাজ করলে আমার উপর যেন আল্লাহর গযব পড়ে বা খোদার অভিশাপ হয়, বা বলে যদি অমুক কাজ করি তাহলে আমি ফকির হয়ে যাই বা তাহলে যেন আমার অঙ্গহানি হয় বা কুষ্ঠরোগ হয়—ইত্যাদি তাহলে কছম হয় না।

* আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কছম খেলে কছম হয় না। যেমন রাসূলের কছম, কাবা শরীফের কছম বা মাতা-পিতার কছম বা সন্তানের কছম বা যে কোন মানুষের কছম। তবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কছম খাওয়া শেরেকী পর্যায়ের শক্ত গোনাহ।

* যদি কেউ বলে তোমার ঘরের ভাত-পানি আমার জন্য হারাম বা অমুক জিনিস আমি আমার জন্য হারাম করে নিয়েছি, তাহলে কছম হয়ে যাবে— সে জিনিস খেলে কাফফারা দিতে হবে।

* যদি কেউ এই বলে অন্যকে কছম দেয় যে, তোমার আল্লাহর কছম তুমি অমুক কাজটা করে দাও বা করো না, তাহলে কছম হয় না— সেই অন্য ব্যক্তির জন্য তার খেলাফ করা দোরস্ত আছে।

* আল্লাহর কছম খেয়ে অতীত বা বর্তমানের কোন বিষয়ে কোন মিথ্যা খবর দিলে বা মিথ্যা বললে কঠিন পাপ হয়; তবে তাতে কোন কাফফারা দিতে হয় না। ভবিষ্যতের কোন বিষয়ে কছম সহকারে কিছু বললে যদি তার খেলাফ করে বা খেলাফ হয়, তাহলে কাফফারা দিতে হবে।

* কোন কাজ করার কছম খেলে তা করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়, না করলে গোনাহ হবে এবং কাফফারা দিতে হবে। পক্ষান্তরে কোন কাজ না করার কছম খেলে সেটা করা তার জন্য হারাম হয়ে যায়, করলে গোনাহ হবে

এবং কাফফারা দিতে হবে। তবে কোন গোনাহর কছম করলে তার জন্য কছম ভঙ্গ করা ওয়াজিব, (অর্থাৎ ঐ গোনাহের কাজ করবে না) কছম ভেঙ্গে কাফফারা দিবে, নতুবা গোনাহগার হবে।

* বিগত কোন ঘটনার বা কথার উপর এই ভেবে কছম দেয় যে, সে ঠিক বলছে অথচ বাস্তবে তার বিপরীত, এরূপ কছমের কোন কাফফারা নেই।

কছমের কাফফারা

* কছম ভঙ্গ করলে তার কাফফারা হল ১০ জন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ানো অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে এক সের সাড়ে বার ছটাক (১ কেজি ৬৬২ গ্রাম) আটা বা তার মূল্য দেয়া। (পূর্ণ দুই সের দেয়া উত্তম। আর ধান-চাউল দিলে গমের মূল্য হিসেবে দিতে হবে)। অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে এই পরিমাণ কাপড় দিবে যার দ্বারা শরীরের অধিকাংশ ঢাকতে পারে, যেমন জামা ও পায়জামা বা লুঙ্গি। মহিলাকে কাপড় দিলে এত পরিমাণ দিবে যার দ্বারা সে সমস্ত শরীর ঢেকে নামায পড়তে পারে।

* যদি কেউ ১০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো বা কাপড় দেয়ার মত সঙ্গতি না রাখে, তাহলে তাকে এক সঙ্গে (বিরতি না দিয়ে) ৩ টি রোযা রাখতে হবে।

* কছম ভঙ্গ করার আগেই কাফফারা দিলে সেটা কাফফারা বলে গণ্য হবে না— পরে কছম ভঙ্গ হলে আবার কাফফারা দিতে হবে।

* একটা বিষয়ে একাধিক বার কছম খেলে তার কাফফারা একটাই।

* কয়েকটা কছমের কাফফারা ওয়াজিব হলে সব কাফফারাই পৃথক পৃথক আদায় করতে হবে।

* যারা যাকাত গ্রহণ করার উপযুক্ত, কাফফারা শুধু তাদেরকেই দেয়া যাবে।[1]

হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত

হজ্জ শরীআতের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফরয। হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا۔

১. বেহেশতী জেওর থেকে গৃহীত।

অর্থাৎ, মানুষের হজ্জ করা দায়িত্ব আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। যাদের সামর্থ্য আছে আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌঁছার তাদের উপর হজ্জ ফরয।

(সূরা আলে ইমরান : ৯৭)

এ আয়াতে কাদের উপর হজ্জ ফরয তা বোঝানো হয়েছে। সাথে সাথে হজ্জের নিয়ত সহীহ হওয়ার গুরুত্বও বোঝানো হয়েছে। হজ্জের নিয়ত হতে হবে সম্পূর্ণ খালেস। কোন রকম মার্কেটিংয়ের নিয়ত, দেশ ঘোরার নিয়ত, বেড়ানোর নিয়ত—এসমস্ত নিয়ত রাখা যাবে না। নিয়ত হবে একমাত্র আল্লাহকে রাজী-খুশী করা। হজ্জ হতে হবে আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে।

যাদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, সব রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছেড়ে দিয়ে, সব রকম মনের ওয়াছওয়াছা ছেড়ে দিয়ে, সব রকম ভ্রান্ত ধারণা ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে হজ্জের পাকা-পোক্ত নিয়ত করে নিতে হবে। হজ্জের ব্যাপারে অনেকের অনেক রকম ওয়াছওয়াছা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে মানুষের সবচেয়ে বড় ওয়াছওয়াছা এই হয় যে, সামনে করব। সামনে করব—এটা হল সবচেয়ে বড় ওয়াছওয়াছা। আমাদের চোখের সামনে বহু লোক সামনে করব, সামনে করব— এই করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন; হজ্জ করা তাদের নছীব হচ্ছে না। অথচ হজ্জ শরীয়তের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফরয। এটা ইসলামের পাঁচ বুনিয়াদের একটা। তাই হজ্জ ফরয হওয়ার পর এই গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায় করতে বিলম্ব করলে যত বিলম্ব হবে, ততই গোনাহ্ হতে থাকবে। আর— খোদা না খাস্তা—এই বিলম্ব করার কারণে যদি কেউ হজ্জ না করে মারা যায়, তাহলে তার জন্য সেটা হবে খুবই আশঙ্কাজনক। কারণ তার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত শক্ত কথা বলেছেন! তিনি বলেছেন :

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَآءَ يَهُوْدِيًّا وَإِنْ شَآءَ نَصْرَانِيًّا.

(مشكوة عن الدارمى)

অর্থাৎ, হজ্জ ফরয হওয়ার পরেও বিনা ওজরে হজ্জ না করে যে মারা যায়, সে ইয়াহুদী হয়ে মারা যাক বা নাসারা হয়ে মারা যাক তাতে আমার কোন পরওয়া নেই। এ থেকে বোঝা যায় হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জ না করা কত বড় মারাত্মক পাপ।

অনেকের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে যে, হজ্জ করতে গেলে এত বিরাট অংকের টাকা খরচ হয়ে যাবে! এরকম ওয়াছওয়াছা হয় যে, হজ্জের জন্য এতগুলো টাকা খরচ করে ফেলব, এটা দিয়ে আরও কিছু দিন একটা ব্যবসা-বাণিজ্য করি, তারপর লাভ হবে, সেই লাভের টাকা দিয়ে হজ্জ করব। দেখা গেল টাকার মায়ায় তিনি হজ্জকে পিছিয়ে দিচ্ছেন। অনেকে তো টাকা কমে যাওয়ার মায়ায় কোন দিনই হজ্জ করতে যাচ্ছেন না। এসব লোকদেরকে মনে রাখতে হবে হজ্জ-উমরা করলে টাকা-পয়সা কমে না বরং বাড়ে। হজ্জ-উমরা করলে অভাব দেখা দেয় না বরং এর বরকতে অভাব দূর হয়। হাদীছে এসেছে—নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ۔ (ترمذی. نسائی وابن ماجة)

অর্থাৎ, তোমরা একের পর এক হজ্জ-ওমরাহ্ করতে থাক। এই হজ্জ-উমরাহ তোমাদের পাপও মোচন করবে, অভাবও মোচন করবে।

এ হাদীছ থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল হজ্জ-ওমরা করলে অর্থ কমবে না বরং বাড়বে, অভাব আসবে না বরং অভাব মোচন হবে। দুনিয়াতে এরকম বহু আল্লাহর বান্দা আছেন যারা প্রতি বছর হজ্জ করেন, উমরা করেন। আলহামদু লিল্লাহ্ প্রতি বছর তাদের অর্থের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাদের অভাব বাড়ে না বরং কমে, তাদের টাকা-পয়সা কমে না বরং বাড়ে। হাদীছের কথাতো মিথ্যা নয়। কারও আকীদা-বিশ্বাসে যদি দুর্বলতা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় বিশ্বাস করে আমল করা শুরু করলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক হজ্জ ওমরা আদায়কারী ব্যক্তির সম্পদে বরকত দান করবেন। সম্পদে বরকত হওয়ার কথা যদি না-ও থাকত, তবুও হজ্জের যে ফায়দার কথা বলা হয়েছে তার জন্য লক্ষ কেন কোটি টাকা ব্যয় করতেও দ্বিধা আসার কথা নয়। হাদীছে বলা হয়েছে :

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ۔ (متفق عليه)

অর্থাৎ, যখন কেউ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে গোনাহমুক্ত হজ্জ করে সেই হজ্জ থেকে ফিরে আসে, সে যেন মায়ের পেট থেকে সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের মত নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ হয়ে ফিরে আসে।

এ হাদীছের দিকে নজর রাখলে যাদেরকে আল্লাহ সামর্থ্য দিয়েছেন তারা ফরয হজ্জ আদায় করে থাকলেও গোনাহমুক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য প্রতি বছরই

তাদের হজ্জে যাওয়ার কথা। প্রতি বছরই হজ্জ করে আসবে আর গোনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে আসবে। গোনাহ্ তো যিন্দেগীতে হতেই থাকে। তাই প্রতি বছরই হজ্জ করে আসবে আর গোনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে আসবে। যে সম্পদ ব্যয় হবে আল্লাহ পাক বরকত দান করবেন। তাই যাদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, সব রকম ওয়াছওয়াছা, সব রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব রকম ভ্রান্ত-ধারণা ছেড়ে দিয়ে তারা হজ্জের নিয়ত করে নেয়া চাই।

হজ্জের ব্যাপারে আমরা অনেকে আরও অনেক ধরনের ভ্রান্ত-ধারণার মধ্যে রয়েছি। অনেকের ধারণা—ছেলে-মেয়ে বিবাহ না দিয়ে হজ্জে যাওয়া যায় না। তারা বলে—ছেলে-মেয়ে উপযুক্ত হয়ে গেছে, ওদেরকে বিবাহ না দিয়ে কীভাবে হজ্জে যাই? এভাবে অনেকে হজ্জে যাওয়াকে পিছিয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দেয়া এক কর্তব্য, হজ্জ আরেক কর্তব্য। এক কর্তব্যের অজুহাতে আরেক কর্তব্যকে পিছিয়ে দেয়া যাবে না। ছেলে-মেয়ের বিবাহ আগে, হজ্জ পরে—এমন কোন কথা নেই। হজ্জ ফরয হলে হজ্জ করে নিব। ছেলে-মেয়ের বিবাহের যখন ব্যবস্থা হবে, তখন তাদেরকে বিবাহ দিব। ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দেয়ার জন্য হজ্জকে ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। ছেলে-মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হয়ে গেলে তাদেরকে বিবাহ না দিয়ে আমরা নামায পড়ছি, রোযা রাখছি, চাকুরী করছি, ব্যবসা-বাণিজ্য করছি। তাদেরকে বিবাহ না দিয়ে এগুলো যখন করতে পারছি, তখন হজ্জ কেন করতে পারব না? শরীয়তে ছেলে-মেয়ের বিবাহের উপর হজ্জকে ঝুলিয়ে রাখার কোন বৈধতা নেই।

কেউ কেউ আছেন মনে করেন যে, একটা জমি কিনতে হবে, জমি না কিনে হজ্জ করি কীভাবে, বাড়ি করা দরকার, বাড়ি না করে হজ্জ করি কিভাবে। এভাবে জমি কিনতে, বাড়ি করতে টাকা-পয়সা শেষ হয়ে যায়, তারপর হজ্জ আর করা হয় না। একবার যদি হজ্জ ফরয হয়ে যায়, এরপর কোন কারণে তার কাছে টাকা-পয়সা না-ও থাকে, অর্থশূন্য হয়ে যায়, তাহলেও ঐ ফরযটা তার যিম্মায় থেকেই যায়। ঐ ফরয আদায় করতে না পারলে পাপ নিয়েই তাকে কবরে যেতে হবে। এই অজুহাত দিয়ে রক্ষা পাওয়া যাবে না যে, আমার টাকা-পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছিল, পরে আর হজ্জ করার মত টাকা-পয়সা হাতে আসেনি, তাই আমার কোন দোষ নেই। হজ্জ ফরয হয়ে গেলে জমি কেনা আগে নয়, হজ্জ করা আগে। হজ্জ ফরয হয়ে

গেলে বাড়ি করা আগে নয়, হজ্জ করা আগে। জমি কেনা হোক বা না হোক, ঘর করা হোক বা না হোক, বাড়ি করা হোক বা না হোক, হজ্জ ফরয হয়ে গেলে হজ্জ আদায় করেই নিতে হবে। জমি না কেনা হলে, বাড়ি না করা হলে আল্লাহর কাছে ঠেকতে হবে না, কিন্তু ফরয হজ্জ আদায় না করলে আল্লাহর কাছে আটকে যেতে হবে।

অনেক ভাই এই ভুল ধারণার শিকার যে, আমার মা-বাবা হজ্জ করেননি আমি কীভাবে হজ্জ করব। এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা হজ্জ করছেন না। মনে করুন, মা-বাপ যদি মালদার না হন, তাদের উপর যদি যাকাত ফরয না হয়, কিংবা যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও তারা যাকাত না দেন, তাহলে কি আমার উপর যাকাত ফরয হলেও আমি যাকাত না দিয়ে থাকব? মাতা-পিতার মাল নেই এ কারণে তাদের উপরে যাকাত হয় না। কিন্তু আমার মাল থাকলে আমার উপর যাকাত ফরয হবে। এখানে মাতা-পিতার উপরে যাকাত ফরয হল না আমার উপর যাকাত ফরয হল কী করে? তদ্রূপ আমার মাল থাকলে আমার উপর হজ্জ ফরয হবে, মাতা-পিতার মাল না থাকলে মাতা-পিতার উপরে হজ্জ ফরয হবে না। অতএব তারা হজ্জ করেনি বলে আমি হজ্জ করতে পারব না এটা বোকামীর যুক্তি। এক জনের ইবাদতকে আরেক জনের ইবাদতের সাথে এরকম ঝুলিয়ে রাখা যাবে না যে, অমুকে না করলে আমি করব না। অমুকে নামায পড়ে না বলে কি আমিও নামায না পড়ে থাকব? আমার ফরয আমাকেই আদায় করতে হবে। এ সমস্ত ভুল ধারণার কারণে হজ্জ না করলে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

হজ্জের নিয়ত করতে গেলে আরও অনেক রকম মনের বাধা আসতে পারে। মনে হতে পারে বর্তমানে আমার নানান রকম অসুবিধা, ফ্যামিলির এই অসুবিধা সেই অসুবিধা, আমার বা অমুকের এই রোগ সেই রোগ, বা আমার ঘর দেখার কেউ নেই, বাচ্চা-কাচ্চা দেখার কেউ নেই। এরকম নানান অসুবিধার সাইড সামনে আসতে পারে। কিন্তু আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি আমাদের কারও যদি বিদেশে যাওয়ার বিরাট একটা সুযোগ এসে যায়, তাহলে কি এই জাতীয় ওযর বাধা হয়ে দাঁড়াবে? তখন কি এই চিন্তা বাধা হয়ে দাঁড়াবে যে, ছেলে-মেয়েকে দেখবে কে, ঘর সামলাবে কে, পরিবারকে দেখবে কে? তখনতো সব কিছু ম্যানেজ করে নিতে পারব। শুধু দ্বীনের কাজে যেতে হলে তখন আর ম্যানেজ করার উপায় থাকে না। তখন সব রকম অসহায়ত্ব সামনে এসে হাজির হয়।

আসলে এগুলো হল মনের দুর্বলতা। মানুষ যখন কোন কাজের পাকা-পোক্ত নিয়ত করে ফেলে, তখন তার সব ব্যবস্থাও সে করতে পারে। এটা আমাকে করতেই হবে' এই মনোভাব যখন এসে যাবে, তখন কী কী অসুবিধা আছে, কীভাবে সেগুলো দূর করা যায় তার চিন্তা-ফিকিরও ভিতরে এসে যাবে। মানুষ যখন কোন কাজের এরকম মনোভাবে চলে আসে যে, আমাকে করতেই হবে, তখন সব ব্যবস্থাও তার হয়েই যায়। আল্লাহ পাকই করে দেন। আল্লাহর কাজের পাকা নিয়ত করলে অবশ্যই আল্লাহ সব কিছু ব্যবস্থা করে দিবেন।

যাহোক, যাদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, তারা সব ওয়াছওয়াছা বাদ দিয়ে হজ্জের নিয়ত করে নেই। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন যাদের প্রতি আমাদের কিছু করণীয় আছে, তারা যদি হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জ না করে দুনিয়া থেকে চলে গিয়ে থাকেন, পারলে তাদের বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করি। বিশেষভাবে মাতা-পিতা যারা আমাদের জন্য সম্পদ রেখে গেছেন, তারা যদি হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জ না করে মৃত্যুবরণ করে থাকেন, তাহলে তাদের বদলী হজ্জ করানোর ব্যবস্থা করি। যদি তারা ওসিয়ত করে গিয়ে থাকেন, আর তারা সম্পদও রেখে গিয়ে থাকেন, তাহলেতো বদলী হজ্জ করানো ওয়ারিছের উপর ওয়াজিব। ওসিয়ত করে গিয়ে থাকলে যারা ওয়ারিছ তাদের উপরে এটা করানো ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি ওসিয়ত না-ও করে থাকেন, তাহলেও তাদের চিন্তা করে দেখা দরকার যে, হজ্জ করা ফরয, এই ফরয আদায় না করার কারণে তাদের কবরে আযাব হতে পারে। যদি তা-ই হয়, তাহলে আমি সন্তান হয়ে কীভাবে এটা সহ্য করতে পারি? আমার সম্পদ আছে, আমি সম্পদ নিয়ে আরামে থাকব, আর তিনি কবরে আযাব ভোগ করতে থাকবেন তা কী করে আমি সহ্য করব? এরকম হলে সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় মাতা-পিতার বদলী হজ্জ করানোর ব্যবস্থা করা। যদি ওসিয়ত না-ও করে থাকেন, তবুও সামর্থ্য থাকলে সন্তান হিসেবে নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় মাতা-পিতার বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করা। আশা করা যায় বদলী হজ্জ করানো হলে তাদের ক্ষমার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

হজ্জ বয়স থাকতেই করা দরকার। শরীরে শক্তি সামর্থ্য থাকতেই করা দরকার। দেখা যায় আমাদের পাক-ভারত-বাংলাদেশ—এই উপমহাদেশের মানুষরাই যখন দুর্বল হয়ে যায়, যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন হজ্জ করতে যায়। তারা মনে করে যে, হজ্জ করার পর আর দুনিয়ার কাজ-কর্ম করা যায় না

হজ্জ করার পর আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করা যায় না। অথচ আমরা নামায পড়ার পর সাধারণ জীবন যাপন করতে পারি, রোযা রাখার পর সাধারণ জীবন যাপন করতে পারি, যাকাত দেয়ার পর সাধারণ জীবন যাপন করতে পারি, এ সব ইবাদত করার পর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারলে হজ্জ করার পর কেন সাধারণ জীবন যাপন করা যাবে না? হজ্জ করার পর আর দুনিয়ার কোন কাজ করতে পারব না এই ধারণাটা কে দিল? এই সমস্ত ভ্রান্ত-ধারণার শিকার হয়ে আমরা হজ্জ না করে শরীরিকভাবে যখন দুর্বলতার পর্যায়ে চলে আসি, তখন হজ্জ করতে যাই। শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে গেলে হজ্জের কাজগুলো ঠিকমত আদায় করা যায় না। তখন আক্ষেপ হয় যে, হায়রে, বয়স থাকতে কেন হজ্জে আসলাম না! তাই সব রকম ওয়াছওয়াছা ঝেড়ে ফেলে হজ্জের নিয়ত করে নেয়া চাই।

কোন্ প্রকার হজ্জ করা উত্তম

* হজ্জ তিন প্রকার (১) হজ্জে ইফ্‌রাদ (২) হজ্জে কেরান (৩) হজ্জে তামাত্তু। এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হল হজ্জে কেরান, তারপর হজ্জে তামাত্তু, তারপর হজ্জে ইফ্‌রাদ। উল্লেখ্য, হজ্জে কেরানে দীর্ঘদিন এহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় থাকতে হয় এবং দীর্ঘদিন এহ্‌রামের বিধি-নিষেধ মেনে চলা বেশ কঠিন, তাই অধিকাংশ হাজীকেই হজ্জে তামাত্তু করতে দেখা যায়। তবে এহ্‌রাম বাঁধা থেকে নিয়ে হজ্জ পর্যন্ত সময়টুকু কম হলে যেমন জিলহজ্জ মাসে মক্কা পৌঁছা হলে তখন হজ্জে কেরান করাই সমীচীন।

বি: দ্র: সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকার হজ্জের মাসায়েল পড়ে মনে রাখা কঠিন বোধ হয়ে থাকে। তাই যেহেতু অধিকাংশ লোক হজ্জে তামাত্তু করে থাকেন, সেমতে এখানে শুধু হজ্জে তামাত্তুর মাসায়েল ও তরীকা এবং যেয়ারত সম্পর্কিত বিষয়াদি বর্ণনা করা হল।[১] কেউ হজ্জে কেরান বা ইফ্‌রাদ করলে তার মাসায়েল জানার জন্য "আহকামে যিন্দেগী" কিতাব খানা পাঠ করা যেতে পারে।

তামাত্তু হজ্জের নিয়মাবলী

হজ্জে তামাত্তুর পরিচয় হল— হজ্জের মাসসমূহে প্রথমে শুধু উমরার এহ্‌রাম বেঁধে উমরা পালন করে এহ্‌রাম খুলে ফেলতে হয়। তারপর হজ্জের

১. হজ্জ ও যিয়ারত সম্পর্কিত অধিকাংশ মাসায়েল ও দুআ معلم الحجاج থেকে গৃহীত।।

সময় পুনরায় হজ্জের এহরাম বেঁধে হজ্জ পালন করতে হয়। একে বলে হজ্জে তামাত্তু বা তামাত্তু হজ্ব।

উমরা বলা হয় তিনটা কাজের সমষ্টিকে। যথা :

১। এহরাম বাঁধা। ২। বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করা। ৩। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা। সায়ী করার পর ৪। কছর (চুল ছোট) করে এহরাম খুলতে হয়। এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হবে।

অতএব আপনি তামাত্তু হজ্জ করতে চাইলে আপনাকে ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত কাজগুলি করতে হবে—

১। প্রথমে শুধু উমরার নিয়তে এহরাম বাঁধতে হবে। এই এহরাম করব।

এখন এহরামের নিয়ম ও মাসায়েলগুলি জেনে নিন। নিম্নে এহরামের বিস্তারিত নিয়ম ও মাসায়েল বয়ান করা হল।

* এহরাম বাঁধতে হলে মীকাত অর্থাৎ শরীয়ত কর্তৃক এহরাম বাঁধার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করার পূর্বেই এহরাম বেঁধে নেয়া জরুরী। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের জন্য এই নির্ধারিত স্থানটি হল ইয়ালামলাম (মক্কা থেকে দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম)। সামুদ্রিক জাহাজযোগে হজ্জ যাত্রীগণ এ স্থান বরাবর অতিক্রম করার পূর্বে অবশ্যই এহরাম বেঁধে নিবেন। প্লেন এ স্থান বরাবর রেখা কখন অতিক্রম করে তা টের পাওয়া কঠিন; তাই প্লেন যোগে হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা গমনকারীর জন্য প্লেনে আরোহণের পূর্বেই এহরাম বেঁধে নেয়া উচিত। বিমানবন্দরে গিয়ে বা হজ্ব-ক্যাম্প থেকে বা বাসা থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বাসায় যে কোন স্থানে এহরাম বাঁধা যায়।

* যারা মদীনা শরীফ আগে যাওয়ার ইচ্ছা করবেন তারা বিনা এহরামেই রওয়ানা হবেন। মদীনা যিয়ারতের পর যখন মক্কা শরীফ-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন, তখন মদীনা থেকে মক্কা শরীফ গমনকারীদের মীকাত যেহেতু যুল-হুলাইফা, তাই যুলহুলাইফা নামক স্থান (বর্তমানে বীরে আলী নামে পরিচিত) থেকে বা মদীনায় থেকেই এহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ রওয়ানা হবেন।

* এহরাম বাঁধার এরাদা হলে প্রথমে ক্ষৌরকার্য করে নিন। নখ কাটুন, বগল ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করুন। এগুলো মোস্তাহাব। মাথার চুল আঁচড়িয়ে নিন।

* তারপর এহরামের নিয়তে গোসল করুন, না পারলে উযূ করে নিন। এটা সুন্নাত। ভালভাবে শরীরের ময়লা দূর করবেন।

* তারপর যে কোন ধরনের পোষাক পরিধান করতে পারেন। এহ্রামের কাপড় নতুন বা পরিষ্কার হওয়া উত্তম। মহিলাদের জন্য হাত মোজা, পা মোজা, অলংকার পরিধান করা জায়েয, তবে না করা উত্তম।

* তারপর সুগন্ধি লাগিয়ে নিন। এটা সুন্নাত।

* তারপর এহ্রামের নিয়তে দুই রাকআত নফল নামায পড়ে নিন। এটা সুন্নাত। এই দুই রাকআতের মধ্যে প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। নামাযের নিষিদ্ধ বা মাকরূহ ওয়াক্তে এহ্রাম বাঁধতে হলে এহ্রামের নামায না পড়েই এহ্রাম বাঁধতে হয়।

* নামাযের পর কেবলামুখী থেকেই এহ্রামের নিয়ত করতে হবে। বসে বসেই নিয়ত করা উত্তম এবং নিয়ত মুখেও উচ্চারণ করা উত্তম।

* উমরার এহ্রামে এভাবে নিয়ত করুন-

আরবীতে : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ

বাংলায় : হে আল্লাহ! আমি উমরা করতে চাই, তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং কবূল কর।

* তারপর তালবিয়া পড়ুন। তালবিয়া পড়া সুন্নাত, তবে নিয়তের সাথে একবার তালবিয়া বা যে কোন যিকির থাকা শর্ত। মহিলাদের জন্য তালবিয়া জোর আওয়াজে পড়া নিষিদ্ধ। তারা এতটুকু শব্দে পড়বে যেন নিজের কানে শোনা যায়। তালবিয়া আরবীতেই পড়া উত্তম।

তালবিয়া এই :

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ

لَا شَرِيْكَ لَكَ۔

অর্থাৎ, আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির! আমি হাজির! কোন শরীক নেই তোমার, আমি হাজির! নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্যও তোমার, কোন শরীক নেই তোমার।

বি: দ্র: নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ করার পর এহ্রাম বাঁধা সম্পন্ন হয়ে গেল।

* তারপর দুরূদ শরীফ পড়ুন এবং যা ইচ্ছা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, তবে এই দুআ করা উত্তম—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত চাই। আর তোমার অসন্তোষ ও জাহান্নাম থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

* হায়েয-নেফাসের অবস্থায় থাকলে নামায না পড়ে শুধু নিয়ত করে এবং তালবিয়া পড়ে নিলেই এহ্রাম হয়ে যাবে।

* এহ্রামের অবস্থায় অধিক পরিমাণে তালবিয়া পড়তে থাকা উত্তম। বিশেষতঃ গাড়ীতে উঠতে, গাড়ী থেকে নামতে, কোন উঁচু স্থানে উঠতে, নীচু স্থানে নামতে, প্রত্যেক নামাযের পর ঘর থেকে বের হওয়ার সময়, প্রবেশের সময়, সাক্ষাতের সময়, বিদায়ের সময়, উঠতে-বসতে, সকাল-সন্ধ্যায়, মোটকথা যে কোনভাবে অবস্থার পরিবর্তন হলে সে সময়ে তালবিয়া পড়া মোস্তাহাব।

* এহ্রামের অবস্থায় নিম্নোক্ত জিনিসগুলো নিষিদ্ধ। সহবাস বা এতদ-সম্পর্কিত কোন আলোচনা ও চুমু দেয়া এবং শাহওয়াত সহকারে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। ঝগড়া-বিবাদ করা বা কোন গোনাহের কাজ করা নিষিদ্ধ। এগুলো এমনিতেও নিষিদ্ধ: এহ্রামের অবস্থায় আরও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত মহিলাদের জন্য চেহারা ঢাকা নিষিদ্ধ। মহিলাদের জন্য মাথা ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, মহিলাদের জন্য চেহারা ঢাকা নিষিদ্ধ-এর অর্থ এই নয় যে, চেহারা সম্পূর্ণ খোলা রাখতে হবে; যাতে পর পুরুষে চেহারা দেখতে পায়, বরং এর অর্থ হল চেহারার সাথে নেকাব বা কোন কাপড় লাগিয়ে রাখা নিষিদ্ধ। তাদের জন্য এহ্রামের অবস্থায় পর্দাও করা জরুরী, আবার চেহারায় কোন কাপড় বা নেকাব লাগানোও নিষিদ্ধ। এর উপর আমল করার উপায় হল তারা চেহারার সাথে লাগতে না পারে এমন কিছু কপালের উপর বেঁধে

তার উপর নেকাব ঝুলিয়ে দিবে। মহিলাগণ এ ব্যাপারে গাফিলতি করে থাকেন, এরূপ করা চাই না।

* এহ্‌রামের অবস্থায় সর্বপ্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা, সুগন্ধিযুক্ত সাবান ব্যবহার, নখ, চুল ও পশম কাটা এবং কাটানো, স্থলভাগের প্রাণী শিকার করা বা সে কাজে কোনরূপ সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ। উকুন মারা নিষিদ্ধ। তবে মশা, মাছি, ছারপোকা, সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি কষ্টদায়ক প্রাণী মারা জায়েয।

* এহ্‌রামের অবস্থায় নিম্নোক্ত জিনিসগুলি মাকরূহ : শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা, চুল বা শরীরে সাবান লাগানো, চুলে চিরুনি করা, এমনভাবে শরীর চুলকানো যাতে চুল, পশম বা উকুন পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এরূপ আশঙ্কা হয় না— এমন আস্তে চুলকানো জায়েয। বালিশের উপর মুখ দিয়ে উপুড় হয়ে শয়ন করা মাকরূহ। সুগন্ধিযুক্ত খাদ্য যদি পাকানো না হয়, তবে তা খাওয়া মাকরূহ। পাকানো হলে মাকরূহ নয়। নাক-গাল কাপড় দিয়ে ঢাকা মাকরূহ, তবে হাত দিয়ে ঢাকা যায়। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়া মাকরূহ।

এ পর্যন্ত এহ্‌রাম ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী বর্ণনা করা হল।

এহ্‌রাম অবস্থায় জেদ্দা বা মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হবেন। মক্কা শরীফে যাওয়ার সময় মক্কা শরীফের প্রায় দশ মাইল দূরে হুদায়বিয়া (বর্তমান নাম শুমাইসিয়া) নামক স্থান অবস্থিত, সম্ভব হলে এখানে দুই রাকআত নামায পড়ে দুআ করুন। এখনই আপনি মক্কার সীমানায় অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দরবারের বিশেষ সীমানায় প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। তাই অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথে তওবা-ইস্তেগফার করতে করতে এবং তালবিয়া পড়তে পড়তে মক্কায় প্রবেশ করুন।

* মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা মোস্তাহাব। তবে আজকাল গাড়ী ড্রাইভারগণ পথিমধ্যে সময় দেন না, তাই জেদ্দা থেকেই বা মদীনা শরীফ থেকেই সম্ভব হলে এ গোসল সেরে নেয়া যেতে পারে।

* প্রবেশ করার সময় তালবিয়া পড়তে পড়তে আল্লাহ্‌র আযমত ও বড়াযী মনে জাগ্রত রেখে অত্যন্ত বিনয় ও খুশু-খুযূর সাথে প্রবেশ করুন। মসজিদে প্রবেশ করার সময় নিম্নোক্ত দুআ বলে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করুন।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ. اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

এবং যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন নফল এ'তেকাফের নিয়তে থাকবেন।

* প্রবেশের পর যখন কা'বা শরীফ সর্বপ্রথমে নযরে আসবে তখন তিনবার পড়ুন اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এরপর দাঁড়িয়ে বুক পর্যন্ত হাত তুলে আপনার আবেগ থেকে যে দু'আ আসে আল্লাহ্‌র কাছে তা প্রার্থনা করুন। এ মুহূর্ত দু'আ কবূল হওয়ার একটি বিশেষ মুহূর্ত। এ মুহূর্তে এ দুআটি পড়াও মোস্তাহাব—

اَعُوْذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ ضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থাৎ, আমি এই গৃহের রবের কাছে পানাহ চাই ঋণী হওয়া, দরিদ্র হওয়া, মন সংকুচিত হওয়া এবং কবরের আযাব থেকে।

* বায়তুল্লাহ (কা'বা শরীফ) প্রথমে নযরে আসার সময় পারলে এ দুআটিও পড়ুন—

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً. وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهٗ وَكَرَّمَهٗ مِمَّنْ حَجَّهٗ وَاعْتَمَرَهٗ تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّتَعْظِيْمًا وَّبِرًّا. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

* মসজিদে হারামে প্রবেশ করে সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়তে হলে পড়ুন নতুবা তাওয়াফ শুরু করুন।

২। মসজিদে হারামে প্রবেশ করে উমরার তাওয়াফ করতে হবে। এই তাওয়াফ উমরার রুকন।

নিম্নে তাওয়াফের মাসায়েল সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করা হল—

* তাওয়াফ শুরু করার মুহূর্তে কা'বা শরীফের দিকে ফিরে হাজরে আসওয়াদকে ডান দিকে রেখে দাঁড়ান অর্থাৎ, হাজরে আসওয়াদ বরাবর তাওয়াফের স্থানে যে লম্বা কালো রেখা টানা আছে সেটাকে ডান পার্শ্বে রেখে এমনভাবে দাঁড়ান, যেন হাজরে আসওয়াদ ডান কাঁধ বরাবর থাকে এবং এ পর্যন্ত যে তালবিয়া পড়ে আসছিলেন তা পড়া বন্ধ করুন। এই এহ্‌রাম শেষ

হওয়া পর্যন্ত আর তালবিয়া পড়বেন না। তবে কেরান ও ইফরাদ হজ্জকারী তাওয়াফে সায়ীর পর থেকে আবার তালবিয়া চালু করবেন।

* তারপর তাওয়াফের নিয়ত করুন। নিয়ত করা শর্ত। শুধু এতটুকু নিয়ত করলেই যথেষ্ট যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার ঘর তাওয়াফ করার নিয়ত করছি। তুমি তা সহজ করে দাও এবং কবূল কর। তবে কোন্ তাওয়াফ—উমরার তাওয়াফ, না তাওয়াফে যিয়ারত, না বিদায়ী তাওয়াফ, না নফল তওয়াফ? ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা উত্তম।

* আরবীতে নিয়ত করতে চাইলে এভাবে করা যায়—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার ঘরের তাওয়াফ করার নিয়ত করছি, তুমি সহজ করে দাও এবং কবূল করে নাও।

* নিয়ত করার পর বায়তুল্লাহর দিকে ফেরা অবস্থায়ই ডান দিকে এতটুকু চলুন যেন হাজরে আসওয়াদ ঠিক আপনার বরাবর হয়ে যায়। অতঃপর নামাযের তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে পড়ুন—

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ۔

* এত বড় দুআ পড়ার সময় না পেলে শুধু এতটুকু বলুন বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার । তারপর হাত নামিয়ে ফেলুন।

* তারপর ধাক্কাধাক্কি করে কাউকে কষ্ট দেয়া ছাড়া সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিন। এই চুমু দেয়া সুন্নাত। তিনবার চুমু দেয়া মোস্তাহাব। চুমুতে যেন শব্দ না হয়। প্রতিবার চুমু দেয়ার পর মাথা হাজরে আসওয়াদের উপর রাখাও মোস্তাহাব। ভিড়ের কারণে চুমু দেয়া সম্ভব না হলে হাত দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে হাতে চুমু দিন। তাও সম্ভব না হলে কোন লাঠি থাকলে তা দ্বারা স্পর্শ করে তাতে চুমু দিন। তাও সম্ভব না হলে দুই হাতের তালু দিয়ে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে দুই হাতেই চুমু খান।

তাওয়াফ হয় তাতে সরাসরি এ সব স্থান স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। তদুপরি মহিলাদের জন্য পুরুষের ভিড় ঠেলে চুমু দিতে যাওয়াও পর্দা ও শালীনতার বিচারে ঠিক নয়। আরও মনে রাখা দরকার যে, হাজরে আসওয়াদের চতুর্পাশে যে রূপার বেষ্টনী রয়েছে তাতে চুমু দেয়া বা মাথা কিংবা হাত রাখা জায়েয নয়।

* চুমু দেয়ার পর কা'বা শরীফ বাম দিকে রেখে তাওয়াফ আরম্ভ করতে হবে। কখনও যেন বুক কা'বা শরীফের দিকে ফিরিয়ে তাওয়াফ না হয়। দুই এক কদমও যেন এমন না হয়। এমন হলে সেই পরিমাণ জায়গা পিছে এসে কা'বা শরীফকে বাম দিকে রেখে পুনরায় সামনে অগ্রসর হবেন। তাওয়াফের সময় কা'বা শরীফের দিকে দৃষ্টিও ফেরাবেন না।

* তাওয়াফ হাতীমের বাইরে দিয়ে করা ওয়াজিব।

* ভিড় না থাকলে এবং কাউকে কষ্ট দেয়া না হলে পুরুষের জন্য যথা সম্ভব বায়তুল্লাহর কাছাকাছি দিয়ে তাওয়াফ করা উত্তম। মহিলাদের জন্য দূর দিয়ে, এমনিভাবে মহিলাদের জন্য রাতের বেলায় তাওয়াফ করা উত্তম।

* প্রথম চক্করে রুকনে ইয়ামানীতে (কা'বা শরীফের দক্ষি-পশ্চিম কোণে) পৌছার পূর্বে বিভিন্ন দু'আ পড়া হয়ে থাকে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সে সব দুআ বর্ণিত নেই, তবে সে সব দু'আ পড়া যায় বা অন্য যে কোন দুআ করা যায়, যে কোন যিকির করা যায়। সাত চক্করে এরকম বিভিন্ন দুআ বর্ণিত আছে, সবগুলো সম্পর্কেই এ কথা। দুআসমূহ কিতাব দেখেও পড়া যায়।

* রুকনে ইয়ামানীতে পৌছে সম্ভব হলে দুই হাতে কিংবা শুধু ডান হাতে রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা মোস্তাহাব। চুমু খাবেন না বা হাতের দ্বারা স্পর্শ করে তাতে চুমু খাবেন না বা স্পর্শ করা সম্ভব না হলে দূর থেকে ইশারাও করবেন না।

* তারপর রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদের কোণে যাওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত দুআ পড়া মোস্তাহাব। প্রত্যেক চক্করেই এই স্থানে এ দুআটি পড়তে হয়—

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

* তারপর হাজরে আসওয়াদ বরাবর পৌছলে এক চক্কর পূর্ণ হয়ে গেল। এখন সম্ভব হলে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে আবার পূর্বের নিয়মে

হাজরে আসওয়াদে চুমু খাবেন বা হাতে স্পর্শ করে বা ইশারা করে হাতে চুমু খাবেন। প্রত্যেক চক্করের শুরুতেই এভাবে চুমু খাবেন তবে প্রথম বারের ন্যায় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবেন না, এটা শুধু তাওয়াফ শুরু করার সময়েই করতে হয়। তবে চুমু খাওয়ার জন্য হাত দ্বারা ইশারা করতে হলে পূর্বের নিয়মে তা করবেন। চুমু খাওয়ার পর দ্বিতীয় চক্কর শুরু করবেন এবং পূর্বের ন্যায় রুক্নে ইয়ামানীতে সম্ভব হলে হাত দ্বারা স্পর্শ করবেন। তারপর রাব্বানা আতিনা ... পড়তে পড়তে হাজরে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছবেন, এভাবে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হয়ে গেল। এভাবে সাত চক্কর শেষ হওয়ার পর আবার হাজরে আসওয়াদে পূর্বের মত চুমু খাবেন। এটা হবে অষ্টম বার চুমু খাওয়া। এখন আপনার তাওয়াফ শেষ হল।

* তাওয়াফ শেষ করার পর বেশী ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি না হয়, তাহলে হাজরে আসওয়াদ ও কা'বা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে (এ স্থানকে 'মুলতাযাম' বলা হয়।) আঁকড়ে ধরবেন, বুক এবং চেহারা দেয়ালের সাথে লাগাবেন এবং উভয় হাত উপরে উঠিয়ে দেয়ালে স্থাপন করে খুব কাকুতি মিনতি সহকারে দুআ করবেন। এটা দুআ কবুলের স্থান। এ স্থানে এরূপ দুআ করা সুন্নাত। তবে বর্তমানে এখানে খুব ভিড় ও ধাক্কাধাক্কি হয় বিধায় পর্দা ও শালীনতা রক্ষার স্বার্থে মহিলাদের পক্ষে এখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকাই উচিত।

* তারপর কা'বা শরীফের দরজা মোবারকের চৌকাঠ ধরে খুব দুআ করুন। সম্ভব হলে গেলাফ আঁকড়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করুন। তবে এহ্‌রাম অবস্থায় থাকলে এসব স্থানে সতর্ক থাকতে হবে যেন কা'বা শরীফের গেলাফ মাথায় না লাগে। এমনিভাবে এসব সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে কাউকে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, কেননা কাউকে কষ্ট দেয়া হারাম। এরূপ কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে এসব ছেড়ে দিতে হবে। তদুপরি এখানেও খুব ভিড় এবং ধাক্কাধাক্কি হয় বিধায় পর্দা ও শালীনতা রক্ষার স্বার্থে মহিলাদের পক্ষে এখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকাই উচিত।

* তারপর দুই রাকআত নামায পড়া ওয়াজিব, এটাকে সালাতুত্তাওয়াফ বা তাওয়াফের নামায বলে। এই নামায 'মাকামে ইবরাহীম'-এর পিছনে পড়া মোস্তাহাব। 'মাকামে ইবরাহীম' একটি বেহেশ্‌তী পাথরের নাম, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা শরীফের উঁচু দেয়াল নির্মাণ

করেছিলেন। তখন প্রয়োজন অনুসারে এ পাথরটি আপনা আপনি উপরে-নীচে উঠানামা করত। এ পাথরের গায়ে ইবরাহীম (আ.)-এর কদম মুবারকের চিহ্ন রয়েছে। পাথরটি কা'বা শরীফের দরজার একটু পূর্ব দিকে একটি পিতলের জালির মধ্যে সংরক্ষিত আছে।

* ভিড়ের কারণে মাকামে ইব্রাহীমে এই দুই রাকআত পড়া সম্ভব না হলে আশে-পাশে পড়ে নিবেন। তাও সম্ভব না হলে দূরবর্তী যেখানে সম্ভব পড়ে নিবেন। তখন নিষিদ্ধ বা মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে তাওয়াফ শেষ হওয়ার সাথে সাথে এ নামায পড়ে নেয়া সুন্নাত। আর তখন নিষিদ্ধ ওয়াক্ত বা মাকরূহ ওয়াক্ত হলে এ নামায তখন পড়বে না। বরং পরে সহীহ ওয়াক্তে পড়ে নিতে হবে।

* মাকামে ইবরাহীমের দিকে যাওয়ার সময় নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে পড়তে যাবেন—

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

* এই নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়ুন।

* এই নামাযের পরও দুআ কবূল হয়ে থাকে।

* তাওয়াফের দুই রাকআত নামায পড়ার পর যমযম কূয়ার নিকট গিয়ে যমযমের পানি পান করা এবং দুআ করা মোস্তাহাব। এটাও দুআ কবূল হওয়ার স্থান। যমযমের পানি কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে পান করা মোস্তাহাব। এ পানি দাঁড়িয়ে-বসে উভয়ভাবে পান করা যায়।[১]

* যমযমের পানি পান করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়তে হয়—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই উপকারী জ্ঞান এবং প্রশস্ত রিযিক, আর সব রোগ-ব্যাধি থেকে শেফা।

এ পর্যন্ত তাওয়াফ ও তার আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পন্ন হল।

৩। তাওয়াফের পর উমরার সায়ী করতে হবে। এই সায়ী ওয়াজিব।

সাফা ও মারওয়া নামক দু'টি পাহাড়ের মাঝে বিশেষ নিয়মে সাতটা চক্কর দেয়াকে সায়ী বলা হয়। নিম্নে সায়ীর মাসায়েল সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করা হল—

---

১. شامی ج/۱ ١

* তাওয়াফ ও তার আনুষঙ্গিক কার্যাবলী শেষ করার পর সায়ী করার উদ্দেশ্যে সাফা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে হাজরে আসওয়াদকে তাওয়াফে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী চুমু দিয়ে যাবেন। এটা মোস্তাহাব। এটা হবে নবম চুমু দেয়া।

* তাওয়াফের পর বিলম্ব না করেই সায়ী করা সুন্নাত।

* সায়ী করার জন্য 'বাবুস সাফা' অর্থাৎ, সাফা দরজা দিয়ে বের হওয়া মোস্তাহাব। অন্য যে কোন দরজা দিয়ে বের হওয়া জায়েয। মনে রাখতে হবে এখান থেকে বের হওয়ার সময় মসজিদ থেকে বের হওয়ার নিয়ম ও দুআগুলোও আমল করতে হবে। অর্থাৎ, এই বলে বাম পা দিয়ে বের হবেন—

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ۔

* তারপর সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হয়ে এই দু'আ পড়া মোস্তাহাব—

اَبْدَاُ بِمَا بَدَاَ اللهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ۔

* সাফা পাহাড়ের এতটুকু উঁচুতে উঠবেন যেন বাবুস সাফা দিয়ে কা'বা শরীফ নযরে আসে। এর চেয়ে বেশী উপরে উঠা নিয়মের খেলাফ বরং এতটুকুই উপরে উঠা সুন্নাত।

* কা'বা শরীফ নযরে আসলে কা'বার দিকে নযর করে দুআ করার সময় যে রকম হাত উঠানো হয় সে রকম করে দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে (কান পর্যন্ত হাত উঠানো ভুল এবং সুন্নাতের খেলাফ) তিন বার নিম্নোক্ত দুআ পড়ুন। এটা মোস্তাহাব।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ۔

তারপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিজের জন্য এবং সকলের জন্য দুআ করুন। এটাও দুআ কবুল হওয়ার স্থান।

* সায়ীর নিয়ত করে নেয়াও উত্তম।

* অতঃপর দুআ-কালাম পাঠ করতে করতে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হোন। যথাসম্ভব মধ্যবর্তী জায়গা দিয়ে সায়ী করার চেষ্টা করবেন। স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকুন। মাঝখানে সবুজ দুই স্তম্ভ নযরে পড়বে, এই স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানটুকু পুরুষের জন্য কিছুটা দ্রুত গতিতে চলা সুন্নাত; একেবারে দৌড়ে নয়। নারীগণ এ স্থানেও স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। এ সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়ুন—

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ -

অর্থ : হে আমার রব! তুমি ক্ষমা কর এবং রহমত দান কর, তুমিতো সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশালী, সবচেয়ে বড় মেহেরবান।

* মারওয়া পাহাড়ের সামান্য উঁচুতে উঠে কা'বামুখী হয়ে পূর্বের ন্যায় হাত উঠিয়ে তিনবার নিম্নোক্ত দুআ পড়ুন এবং অন্যান্য দুআ করুন। এই মারওয়া পাহাড়েও বেশী উপরে উঠা নিষেধ। এখানেও দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে (কান পর্যন্ত হাত উঠানো ভুল এবং সুন্নাতের খেলাফ) তিন বার নিম্নোক্ত দুআ পড়ুন। এটা মোস্তাহাব।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

* সাফা থেকে এই মারওয়া পর্যন্ত আপনার এক চক্কর হয়ে গেল। আবার এখান থেকে সাফা পর্যন্ত পূর্বের নিয়মে যাবেন, তাতে দ্বিতীয় চক্কর হয়ে যাবে। এভাবে সাত চক্কর দিবেন। তাতে মারওয়ার উপর এসে আপনার সপ্তম চক্কর শেষ হবে। সাফা থেকে আবার সাফা পর্যন্ত এক চক্কর হিসেব করবেন না, তাতে চৌদ্দ চক্কর হয়ে যাবে—এটা ভুল।

* মাসিক অবস্থায় সায়ী করা যায়, তবে পবিত্র হওয়ার পরই সায়ী করা সুন্নাত।

* সায়ীর চক্কর কয়টা হল এ নিয়ে সন্দেহ হলে কমটা ধরে নিয়ে বাকীটা পূর্ণ করতে হবে।

* উপরে দ্বিতীয় তলায় এবং ছাদেও সায়ীর জন্য ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানেও সায়ী করা যেতে পারে।

* সায়ীর সপ্তম চক্কর শেষ হওয়ার পর মসজিদে হারামের ভিতর এসে দুই রাকআত নফল নামায পড়া মোস্তাহাব, যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়।

এ পর্যন্ত আপনার সায়ীর কার্যাবলী শেষ হল। এখন আপনি মাথার চুল ছেঁটে এহ্‌রাম খুলতে পারেন।

৪. এহ্‌রাম খোলার জন্য চুল ছাঁটা ওয়াজিব। নিম্নে চুল ছাঁটার মাসায়েল বর্ণনা করা হল।

* এহ্‌রাম খোলার জন্য মাথার চুল ছাঁটা ওয়াজিব। মাথার চুল ছাঁটাকে 'কছর' বলা হয়। মহিলাগণ পুরুষদের ন্যায় 'হলক' বা চুল মুণ্ডন করতে পারবে না। মহিলাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো হারাম। তারা কছর করবে অর্থাৎ, চুল ছাঁটাবে।

* চুল ছাঁটার ক্ষেত্রে চুলের লম্বার দিক থেকে আঙ্গুলের এক কড়া পরিমাণ ছাঁটা জরুরী; সাবধানতার জন্য একটু বেশী ছেঁটে নিতে হবে।

* নিজেই নিজের চুল ছাঁটা যায়। আপনার মত যার এখন চুল ছেঁটে হালাল হওয়ার মুহূর্ত, তার দ্বারাও ছাঁটানো যায়।

* কছর করা হলেই এহ্‌রাম শেষ হয়ে যাবে। এখন এহ্‌রামের অবস্থায় যা নিষিদ্ধ ছিল তা হালাল হয়ে যাবে।

এ পর্যন্ত আপনার ওমরা ও তার আনুষঙ্গিক কার্যাবলী শেষ হল।

৫. ৮ই জিলহজ্জ হজ্জের এহরাম বাঁধতে হবে।

* ৮ই জিলহজ্জ থেকে হজ্জের প্রস্তুতি শুরু হবে। হজ্জের এহরাম বাঁধা না থাকলে এহরাম বাঁধতে হবে। এহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মসজিদে হারামে গিয়ে এই এহরাম বাঁধা মোস্তাহাব।

* হজ্জের এহ্‌রামে এভাবে নিয়ত করুন—

আরবীতে : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ.

বাংলায় : হে আল্লাহ! আমি হজ্জ করতে চাই, তুমি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং আমার থেকে তা কবূল কর।

এহ্‌রাম বেঁধে মিনায় যেতে হবে। আজকাল ৭ই জিলহজ্জ দিবাগত রাতেই মুআল্লিমের গাড়ীতে হাজীদেরকে মিনায় পৌঁছানোর কাজ শুরু হয়, তাই যারা মুআল্লিমের গাড়ীতে মিনায় যাবেন তারা ৭ই তারিখেই এহ্‌রাম বেঁধে নিবেন। এহ্‌রামের পর তালবিয়া শুরু হবে। তাওয়াফে যিয়ারত-এর পর সায়ী করার সময় প্রচণ্ড ভিড় হবে, সেই ভিড়ে সায়ী করতে না চাইলে এখন এহ্‌রামের পর একটি নফল তাওয়াফ করে সেই সায়ী অগ্রিম করে নিতে পারেন। তবে তামাত্তু হজ্জকারীর জন্য তাওয়াফে যিয়ারতের সায়ী অগ্রিম না করে তাওয়াফে যিয়ারতের পরেই করা উত্তম।

* ৮ই জিলহজ্জের যোহর, আসর মাগরিব, ইশা এবং ৯ই জিলহজ্জের ফজর সর্বমোট এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় পড়া মোস্তাহাব এবং এ সময়ে মিনায় অবস্থান করা সুন্নাত। মিনায় যথাসম্ভব মসজিদে খায়েফের কাছাকাছি অবস্থান করা উত্তম।

* ৮ই জিলহজ্জের পূর্বে যদি আপনি মক্কা শরীফে মুকীম হিসেবে অন্ততঃ ১৫ দিন অবস্থান করে থাকেন, তাহলে মিনায় এমনিভাবে আরাফায় এবং

Scanned by CamScanner

মুযদালিফায়ও পুরা নামায পড়বেন, আর তা না হলে এসব স্থানেও কছরের বিধান চলবে।

৬. তারপর **৯ই জিলহজ্জ উকূফে আরাফা বা আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হবে।**

এই উকূফে আরাফা হজ্জের একটি অন্যতম ফরয। নিম্নে আরাফায় গমন ও অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত মাসায়েল এবং নিয়মাবলী বর্ণনা করা হল।

* ৯ই জিলহজ্জ পূর্বের আকাশ বেশ উজ্জ্বলা হওয়ার পর ফজরের নামায পড়ে সূর্যোদয়ের সামান্য কিছু পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। এখানে আরও একটি মাসআলা স্মরণ রাখতে হবে— **৯ই জিলহজ্জ ফজর** থেকে ১৩ই জিলহজ্জের আসর পর্যন্ত সর্বমোট ২৩ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। এ সম্পর্কিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ১৪৭ নং পৃষ্ঠা। নামাযের পর আগে তাকবীরে তাশরীক বলবেন, তারপর তালবিয়া পড়বেন।

* আরাফায় যাওয়ার পথে তালবিয়া পড়তে পড়তে, দুআ ও যিকির করতে করতে, অত্যন্ত খুশু-খুযূর সাথে চলতে থাকুন।

* আরাফার ময়দানে অবস্থিত জাবালে রহমতের উপর দৃষ্টি পড়তেই এই দুআ পড়া মোস্তাহাব। দুআটি বই দেখেও পাঠ করতে পারেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ تَوَجَّهْتُ اِلَيْكَ . وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ . وَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ . وَوَجِّهْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ تَوَجَّهْتُ . سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

* এ সময় দুআ করুন। এটা দুআ কবূলের সময়।

* তারপর তালবিয়া পড়তে পড়তে আরাফার ময়দানে প্রবেশ করুন।

* সূর্য ঢলা থেকে উকূফে আরাফা শুরু এবং সূর্য অস্ত গেলে উকূফে আরাফা শেষ হবে। উকূফে আরাফা হজ্জের অন্যতম ফরয।

* আরাফায় পৌছার পর তালবিয়া, দুআ ও দুরূদ শরীফ পাঠ বেশী বেশী করতে থাকবেন, সূর্য ঢলার পূর্বেই খানা-পিনা থেকে ফারেগ হয়ে যাবেন। সূর্য ঢলার পর গোসল করা উত্তম, না পারলে উযূ করবেন। তাবুর এক কোণে জোহরের ওয়াক্তে জোহর এবং আসরের ওয়াক্তে আসর পড়ে নিন।

* উকূফে আরাফার সময় তালবিয়া, তাসবীহ-তাহলীল, দুরূদ পাঠ ও দুআ করতে থাকা মোস্তাহাব। নিদ্রা এসে গেলেও অসুবিধা নেই, তবে বিনা ওজরে নিদ্রা যাওয়া মাকরূহ।

* মহিলাগণ হায়েয-নেফাস অবস্থায় থাকলেও উকূফে আরাফা করে নিবে, এতে কোন অসুবিধা নেই।

* সূর্যাস্তের পূর্বে কোনক্রমেই আরাফা ময়দানের সীমানা ত্যাগ করা যাবে না। তাহলে দম দিতে হবে।

* সূর্যাস্ত হলে মাগরিবের নামায না পড়ে যথাসম্ভব বিলম্ব না করেই মুযদালিফার উদ্দেশে রওয়ানা হতে হবে। বিনা ওজরে রওনা দিতে বিলম্ব করা মাকরূহ। এই মাগরিবের নামায মুযদালিফায় গিয়ে ইশার ওয়াক্তে পড়তে হবে।

৭. ৯ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত উকূফে মুযদালিফা বা মুযদালিফায় অবস্থান করতে হবে।

নিম্নে মুযদালিফায় গমন ও সেখানে অবস্থান সম্পর্কিত মাসায়েল বর্ণনা করা হল।

* ৯ই জিলহজ্জ সূর্যাস্ত হওয়ার পর আরাফায় বা রাস্তায় কোথাও মাগরিবের নামায না পড়ে সোজা মুযদালিফার দিকে চলুন। তালবিয়া, তাকবীর, দুরূদ ও দুআ পাঠ করতে করতে চলুন।

* মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত হলে প্রথমে মাগরিবের ফরয তারপর ইশার ফরয পড়ুন। তারপর মাগরিবের ও ইশার সুন্নাত এবং বিতর পড়ুন। (প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পড়ার কথাও স্মরণ রাখবেন) এখানে মাগরিবের নামায ইশার ওয়াক্তে পড়া হলেও কাযার নিয়্যত নয় বরং ওয়াক্তিয়ার নিয়্যত করবেন।

* মাগরিব ও ইশার নামায পড়ার পর সুবহে সাদেক পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। এ রাতে জাগরণ করা ও নামায, তেলাওয়াত, দুআ ইত্যাদিতে মশগুল থাকা মোস্তাহাব। কারও কারও মতে এ রাতে শবে কদর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

* সুবহে সাদেক থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত অন্ততঃ কিছু সময় মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। তবে মহিলা, বৃদ্ধ ও মা'যূরদের জন্য ওয়াজিব নয়। তারা মুযদালিফায় অবস্থান না করেও মিনায় চলে যেতে পারেন।

Scanned by CamScanner

* সুবহে সাদেক হওয়ার পর আওয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ে নেয়া উত্তম। নামাযের পর যিকির-এস্তেগফার ও মুনাজাতে মশগুল থাকবেন। সূর্যোদয়ের ২/৪ মিনিট পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশে রওয়ানা হতে হবে।

* মুযদালিফা থেকে ছোলা-বুটের সমান ৭০টি কঙ্কর সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন, এগুলো মিনায় জামরাতে নিক্ষেপ করা হবে। এ কংকর মিনা থেকেও সংগ্রহ করা যায়, তবে কঙ্কর নিক্ষেপের জায়গা থেকে নেয়া নিষেধ। এ কঙ্করগুলো ধুয়ে নেয়া উত্তম।

৮. ১০ই জিলহজ্জ জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। এটা ওয়াজিব।

১০ই জিলহজ্জ মিনায় এসে জামরায়ে আকাবায় (বড় শয়তানে) কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। এটা ওয়াজিব। নিম্নে কঙ্কর নিক্ষেপের বিস্তারিত মাসায়েল বর্ণনা করা হল :

* ১০ই জিলহজ্জ মিনায় এসে সামান-পত্র সাথে থাকলে তা হেফাযতে রেখে বড় জামরায় (যা মসজিদে খায়েফ থেকে দূরবর্তী এবং মক্কা শরীফের দিকে নিকটবর্তী) ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করুন। সম্ভব হলে সূর্য ঢলার পূর্বে, সম্ভব না হলে সূর্য ঢলার পর, তাও সম্ভব না হলে সূর্যাস্তের পর কঙ্কর নিক্ষেপ করুন। এই ১০ তারিখে শুধু বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। সব জামরায় নয়।

* কঙ্কর নিক্ষেপের মোস্তাহাব তরীকা হল : কঙ্কর নিক্ষেপের সময় যে স্তম্ভে কংকর নিক্ষেপ করা হবে তার দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে মিনাকে ডান দিকে এবং কা'বা শরীফকে বাম দিকে রেখে স্তম্ভের অন্ততঃ পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে (এর চেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে কঙ্কর মারা মাকরূহ) ডান হাতের শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা এক একটি কঙ্কর ধরে নিক্ষেপ করবেন। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলবেন। পারলে আরও কয়েকটি বাক্য যোগে নিম্নোক্ত দুআ পড়বেন—

بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا
وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا.

* প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বমুহূর্ত থেকে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর আর তালবিয়া নেই।

* কঙ্কর নিক্ষেপের সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন স্তম্ভের নীচের দিকে চারপাশে কিছুটা উঁচু করে দেয়াল দিয়ে যে ঘেরা আছে কঙ্করটি তার বাইরে না পড়ে বা সজোরে স্তম্ভে লেগে বাইরে ছিটকে না যায়। যে কঙ্করটি এ ঘেরার মধ্যে না পড়বে সেটি বাদ বলে গণ্য হবে।

* উপর থেকে বা যে কোন দিক থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করলেও জায়েয হবে।

* ভিড়ের ভয়ে বা কিছুটা কষ্টের ভয়ে অন্যের মাধ্যমে কঙ্কর নিক্ষেপ করালে ওয়াজিব আদায় হবে না। তাহলে দম দিতে হবে। অন্যের দ্বারা কঙ্কর নিক্ষেপ করানো কেবল তখনই সহীহ হবে, যখন কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানে যাওয়ার মত শক্তি-সামর্থ্য না থাকে অর্থাৎ, এমন অক্ষম হয় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার জন্য বসে নামায পড়া জায়েয হয়। এ পর্যায়ের অপারগ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে অপরের দ্বারা কঙ্কর নিক্ষেপ করানোর অনুমতি নেই। মহিলাগণ যেহেতু কোন রূপ মাকরূহ হওয়া ছাড়াই রাতের বেলায়ও কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারেন, তাই তাদের ভিড়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেননা রাতের বেলায় ভিড় থাকে না বললেই চলে।

* কঙ্কর নিক্ষেপের পর জামরার নিকট বিলম্ব না করেই নিজ স্থানে চলে আসবেন।

৯. তারপর কুরবানী করতে হবে। এটা ওয়াজিব।

নিম্নে কুরবানী সম্পর্কিত মাসায়েল বর্ণনা করা হল।

* কঙ্কর নিক্ষেপের পর দমে শোকর বা হজ্জের শোকর-স্বরূপ কুরবানী করা ওয়াজিব। অন্য কারও মাধ্যমে কুরবানীর কাজটা সেরে নিন। তবে ১০ই জিলহজ্জ বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করা যায় না, করলে দম ওয়াজিব হবে।

উল্লেখ্য যে, ৭ বা ৮ তারিখ মিনায় রওনা হওয়ার পূর্বে কেউ যদি মক্কায় ১৫ দিন বা তার বেশী অবস্থানের কারণে মুকীম হয়ে গিয়ে থাকে এবং সে ছাহেবে নেছাব হয়, তাহলে হজ্জের কুরবানী ব্যতীত ঈদুল আযহার কুরবানীও তার উপর ওয়াজিব হবে।

১০. তারপর মাথার চুল ছোট করতে হবে। এটা ওয়াজিব।

চুল ছাঁটা সম্পর্কিত মাসায়েল পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

* দমে শোকর বা হজ্জের কুরবানী করার পর কছর করা (চুল ছাঁটা) ওয়াজিব। এই কছর বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ ও কুরবানী করার পরে করা ওয়াজিব. পূর্বে করা যাবে না, করলে দম দিতে হবে। কছর করার পর এহরাম থেকে হালাল হবেন অর্থাৎ, এহরামের অবস্থায় যা যা নিষিদ্ধ ছিল তা জায়েয হয়ে যাবে। শুধু তাওয়াফে যিয়ারত করার পূর্বে স্বামীর সাথে (যদি থাকে) সম্ভোগ হালাল হবে না।

১১. তাওয়াফে যিয়ারত করতে হবে। এটা ফরয।

নিম্নে তাওয়াফে যিয়ারতের বিস্তারিত মাসায়েল বর্ণনা করা হল—

* তাওয়াফে যিয়ারত করা ফরয। ১০ই জিলহজ্জ সুবৃহে সাদেক থেকে ১২ই জিলহজ্জ সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এই তাওয়াফ করা যায়। তার পরে করলে মাকরূহ তাহরীমী হবে এবং দম দিতে হবে। তবে মহিলাগণ এই সময়ের মধ্যে হায়েয অবস্থায় থাকার কারণে তাওয়াফ করতে না পারলে পরে করবে, তাতে তাদেরকে দম দিতে হবে না। এই তাওয়াফ ১০ই জিলহজ্জেই করে নেয়া উত্তম। তাওয়াফের তরীকা ও অন্যান্য মাসায়েল পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে এ তাওয়াফের বেলায়ও তা চলবে।

১২. তওয়াফে যিয়ারত-এর সায়ী করতে হয়। এই সায়ী ওয়াজিব।

তাওয়াফে যিয়ারতের সায়ী করা ওয়াজিব। তবে পূর্বে নফল তাওয়াফ করে এই সায়ী অগ্রিম করে থাকলে আর এখন সায়ী করতে হবে না। যদি পূর্বে এই সায়ী করা হয়ে থাকে তাহলে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সায়ী থাকবে না। সায়ীর অন্যান্য মাসায়েল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

* ১০ই জিলহজ্জ দিবাগত রাত মিনায় থাকা সুন্নাত। তাই এই রাতে তাওয়াফে যিয়ারত করলে তাওয়াফ সেরে মিনায় ফিরে যাবেন।

১৩. ১১ ও ১২ই জিলহজ্জ মিনায় প্রত্যেক দিন তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। এটা ওয়াজিব।

* ১১ই জিলহজ্জ পর্যায়ক্রমে ছোট জামরা (সর্ব পূর্বের জামরা) তারপর মধ্যম জামরা, তারপর বড় জামরায় ৭টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। এই কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। ছোট জামরা ও মধ্যম জামরায় কংকর নিক্ষেপের পর ভিড় থেকে একটু দূরে সরে কেবলামুখী হয়ে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ইত্যাদি পড়বেন এবং দুআ করবেন। তবে বড় জামরায় নিক্ষেপের পর এরূপ করবেন না।

* ১১ই জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপের সময় শুরু হবে সূর্য ঢলার পর থেকে, এর পূর্বে করলে আদায় হবে না। সূর্য ঢলার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত হল সুন্নাত সময়, আর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত মাকরূহ সময়। তবে দুর্বল, মা'যূর ও মহিলাদের জন্য মাকরূহ নয়। কংকর নিক্ষেপের তরীকা ও মাসায়েল পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ১১ই জিলহজ্জ দিবাগত রাতও মিনায় থাকবেন।

* ১২ই জিলহজ্জ তারিখেও ১১ই জিলহজ্জের ন্যায় তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। অনেকেই ১২ই জিলহজ্জ তারিখে জলদি জলদি মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য সূর্য ঢলার পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করে ফেলেন, অথচ এটা না-জায়েয। এরূপ করলে পুনরায় সূর্য ঢলার পর তাদেরকে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে, নতুবা দম দিতে হবে।

* ১২ই জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরে যাওয়া জায়েয, তবে ১৩ই জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে তারপর মক্কায় ফিরে যাওয়া উত্তম। ১২ই জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরতে চাইলে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা থেকে বের হয়ে যাবেন। সূর্যাস্তের পর বের হওয়া মাকরূহ। তবে দুর্বল, মা'যূর ও মহিলাগণ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত মাকরূহ হওয়া ছাড়াই ফিরতে পারেন। আর যদি মিনার সীমানাতেই সুবহে সাদেক হয়ে যায়, তাহলে সকলের জন্যেই ১৩ তারিখেও তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব হয়ে যায়— না করলে দম দিতে হবে।

* ১৩ই জিলহজ্জ যদি সূর্য ঢলার পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরতে চান তবে ফিরতে পারেন, কিন্তু তা উত্তম নয় মাকরূহ। সুন্নাত সময় হল সূর্য ঢলার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। এ দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সময় একেবারেই শেষ হয়ে যায়। অতএব এ দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।

এ পর্যন্ত আপনার হজ্জের কার্যাবলী শেষ হল।

১৪. সর্বশেষে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। এই বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

মক্কা থেকে বিদায় নেয়ার সময় এই বিদায়ী তাওয়াফ করার মাধ্যমেই তামাত্তু হজ্জের কার্যাবলী সমাপ্ত হবে। নিম্নে বিদায়ী তাওয়াফের মাসায়েল বর্ণনা পেশ করা হল।

* বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব। হায়েয-নেফাস সম্পন্ন মহিলাদের জন্য ওয়াজিব নয়, তবে মক্কা থেকে বের হওয়ার পূর্বে পবিত্র হয়ে গেলে ওয়াজিব হয়ে যায়। এ তাওয়াফের পর সায়ী নেই। মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে এ তাওয়াফ করতে হয়। তাওয়াফ শেষে যমযমের পানি পান করে সর্বশেষ মুহূর্তে বিরহের বেদনা নিয়ে দুআ করুন, বিশেষভাবে এটাই যেন বায়তুল্লাহর শেষ যিয়ারত না হয়, আবারও যেন আসার তাওফীক হয় এই মর্মে দুআ করে বিদায় নিন।

* তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন নফল তাওয়াফ করে থাকলেও বিদায়ী তাওয়াফের ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়।

বি: দ্র: মসজিদে হারামে এক ওয়াক্ত ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করলে এক লক্ষ নামাযের ছওয়াব পাওয়া যায় বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। অনেক মা-বোন এই ফযীলত পাওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়তে আগ্রহী থাকেন। কিন্তু মহিলাদের জন্য মসজিদে না গিয়ে ঘরেই নামায পড়া উত্তম। ঘরে নামায পড়েই তারা এই ফযীলত পেয়ে যাবেন।

নফল উমরা ও নফল তাওয়াফের মাসায়েল

* বৎসরের পাঁচ দিন ব্যতীত যে কোন দিন উমরার এহরাম বাঁধা যায়। উক্ত পাঁচ দিন হল ৯ই জিলহজ্জ থেকে ১৩ই জিলহজ্জ।

* রমযানে উমরা করা মোস্তাহাব ও উত্তম।

* তামাত্তু হজ্জকারী ব্যক্তি ওয়াজিব উমরা থেকে ফারেগ হওয়ার পর হজ্জের পূর্বে নফল উমরা করতে পারেন।

* এহরাম মুক্ত অবস্থায় যত বেশী সম্ভব নফল তাওয়াফ করা উত্তম বরং নফল উমরার চেয়ে নফল তাওয়াফ করা অধিক উত্তম।

* নফল তাওয়াফের পর সায়ী নেই। তবে তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকআত নামায পড়তে হবে।

* নিজের জন্য বা জীবিত কিংবা মৃত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, উস্তাদ, পীর-বুযুর্গ বা যে কোন ব্যক্তিকে ছওয়াব পৌঁছানোর জন্য উমরা ও তাওয়াফ করা যেতে পারে।

* যারা মক্কা শরীফে থেকে নফল উমরা করতে চান, এহরাম বাঁধার জন্যে তাদেরকে হারামের সীমানার বাইরে গিয়ে এহরাম বেঁধে আসতে হবে।

এরজন্য সবচেয়ে উত্তম স্থান হল তানঈম। বর্তমানে সেখানে মসজিদে আয়েশা নামক একটি মসজিদ আছে। তাই মসজিদে আয়েশায় গিয়ে এহরাম বেঁধে এসে নফল উমরা করবেন।

যেসব কারণে দম বা সদকা দিতে হয়

হজ্জ বা উমরার মধ্যে কিছু এমন ভুল-ত্রুটিও হতে পারে, যার কারণে দম দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। আবার এমন কিছু ভুল-ত্রুটিও হয়, যার কারণে দম ওয়াজিব হয় না তবে সদকা ওয়াজিব হয়। "দম" বলতে সাধারণভাবে একটা পূর্ণ বকরী বা ভেড়া বা দুম্বা, কিংবা গরু, মহিষ ও উটের এক সপ্তমাংশ বোঝায়। আর "সদকা" বলতে সাধারণভাবে একটা ফিতরা পরিমাণ দান করাকে বোঝায় এবং একজন ফকীরকে এই পরিমাণের চেয়ে কম দেয়া যাবে না। এই দম-এর প্রাণী হারামের সীমানার মধ্যে যবাই হওয়া জরুরী এবং কুরবানীর যোগ্য হওয়া জরুরী।

দম ও সদকা ওয়াজিব হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে এবং সব ধরনের ভুলেই দম বা সদকা ওয়াজিব হয় না, তার মধ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। তাই হজ্জ বা উমরার মধ্যে কোন প্রকার ভুল হলে তখন কী করণীয়, সে সম্বন্ধে উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিতে হবে। এ সম্পর্কে জানার জন্য "আহকামে যিন্দেগী" কিতাবখানারও সহযোগিতা নেয়া যাবে।

মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারত

* মদীনা যিয়ারত করা হজ্জের অংশ নয় তবে একটা শ্রেষ্ঠতম ছওয়াবের কাজ এবং বরকত, মর্যাদা ও উন্নতি লাভের একটা শ্রেষ্ঠ ও বড় মাধ্যম। বড়ই সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে এই মোবারক যিয়ারতে মদীনার তাওফীক লাভ করে। তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদের মতে সঙ্গতি-সম্পন্ন লোকদের জন্য এই যিয়ারত ওয়াজিব।

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার মৃত্যুর পর যে আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার যিয়ারত করল।[১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য শাফাআত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে গেল।[২]

---

১. [illegible] । ২. [illegible] ।

* মদীনা সফরের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত ও মসজিদে নববীর যিয়ারত উভয়টার নিয়ত করবে।

* মদীনার পানে রওয়ানা হওয়ার পর থেকেই বেশী বেশী দুরূদ শরীফ ও ইস্তেগফার পড়তে থাকা আদব এবং খুব বেশী আগ্রহ, ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে অগ্রসর হতে থাকবে।

* মদীনার নিকট পৌঁছে গেলে যওক শওক ও দুরূদ শরীফ পাঠ আরও বৃদ্ধি করবে।

* মদীনার শহর দৃষ্টিগোচর হলে দুরূদ সালাম পাঠ এবং দুআ করতে থাকবে।

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযার উপরে অবস্থিত সবুজ গম্বুজ দৃষ্টিগোচর হলে ভক্তি ভালবাসা মনে জাগরুক করবে।

* মদীনায় প্রবেশের পর থাকার জায়গা ঠিক করে মাল-সামান রেখে ও বিশেষ জরুরত থাকলে তা সেরে যথাসম্ভব দ্রুত মসজিদে নববীতে গমন করবে। মহিলাদের জন্য রাত্রে যিয়ারত করা উত্তম।

* মসজিদে নববীর যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায় তবে 'বাবে জিবরীল' দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম।

* মসজিদে প্রবেশ করার পর রিয়াযুল জান্নাত (বেহেশতের বাগান) নামক স্থানে পৌঁছে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে এবং জামা'আত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা না হলে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করবে। সম্ভব হলে মেহরাবে নবীর কাছে এই দুই রাকআত নামায পড়া সবচেয়ে উত্তম। অতঃপর শোকর আদায় করবে এবং যিয়ারত কবূল হওয়ার জন্য পূর্বেই দুআ করে নিবে।

* অতঃপর অত্যন্ত আদব ও তা'যীমে রওযার সামনে পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের বরাবর দাঁড়াবে। রওযার সামনের দেয়ালে জালির মাঝে এ সোজা একটি বড় ছিদ্র আছে। এই সোজা গিয়ে সালাম পেশ করবে। সালাম পেশ করার সময় এই খেয়াল রাখবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলামুখী হয়ে শুয়ে আরাম করছেন এবং সালাম কালাম শ্রবণ করছেন। নিম্নোক্ত বাক্যে সালাম পেশ করা যায়—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلْدِ اٰدَمَ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاۤ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ

* এতখানি বলার সময় না পেলে যতটুকু সম্ভব বলবে; অন্ততঃ প্রথম বাক্যটা বলবে অর্থাৎ বলবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ । অন্য কেউ সালাম পাঠিয়ে থাকলে তার পক্ষ থেকেও সালাম পেশ করবে।

* অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওছীলা দিয়ে দুআ করবে এবং শাফাআতের দরখাস্ত করবে।

* অতঃপর কিছুটা ডান দিকে সরে আর একটি ছিদ্রের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ান। এবার আপনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর চেহারা মোবারক বরাবর দাঁড়িয়েছেন। তাঁর উদ্দেশে এভাবে সালাম পেশ করুন—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَبَا بَكْرِ ِالصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

* অতঃপর আর কিছুটা ডান দিকে সরে হযরত ওমর (রাযি.)-এর চেহারা মোবারকের বরাবর দাঁড়িয়ে এভাবে সালাম পেশ করুন। এ সোজাও জালিতে একটি ছিদ্র আছে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজ্‌রা (যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারক অবস্থিত) এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি রিয়াযুল জান্নাত বা বেহেশতের বাগান নামে পরিচিত। এ স্থানটির বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এখানে নফল পড়ুন ও তেলাওয়াত করুন।

* রিয়াযুল জান্নাত অংশের মধ্যে সাতটি উস্তুওয়ানা বা স্তম্ভ রয়েছে, এগুলোকে রহমতের স্তম্ভ বলা হয়। মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে এবং কাউকে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হলে এগুলোর পার্শ্বে নফল নামায পড়ুন। স্তম্ভ সাতটি এই :

Scanned by CamScanner

১। **উস্তুওয়ানা হান্নানাহ :** মিম্বরে নববীর ডান পার্শ্বে অবস্থিত খেজুর বৃক্ষের গুঁড়ির স্থানে নির্মিত স্তম্ভটি। যে গুড়িটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বর স্থানান্তরের সময় উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছিল।

২। **উস্তুওয়ানা ছারীর :** এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ'তেকাফ করতেন এবং রাতে আরামের জন্য তাঁর বিছানা এখানে স্থাপন করা হতো। এ স্তম্ভটি হুজরা শরীফের পশ্চিম পার্শ্বে জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৩। **উস্তুওয়ানা উফূদ :** বাহির থেকে আগত প্রতিনিধি দল এখানে বসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে এখানেই বসে কথা বলতেন। এ স্তম্ভটিও জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৪। **উস্তুওয়ানা হারছ :** হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুজরা শরীফে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন কোন না-কোন সাহাবী পাহারার জন্য এখানে বসতেন। এ স্তম্ভটিও জালি মোবারক ঘেঁষে রয়েছে।

৫। **উস্তুওয়ানা আয়েশা (রাযি.) :** হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার মসজিদে এমন একটি জায়গা রয়েছে, লোকজন যদি সেখানে নামায পড়ার ফযীলত জানতো, তবে সেখানে স্থান পাওয়ার জন্য লটারির প্রয়োজন দেখা দিতো। স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম চেষ্টা করতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রাযি.) তাঁর ভাগ্নে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)কে সেই জায়গাটি চিনিয়ে দেন। এটিই সেই স্তম্ভ। এটি উস্তুওয়ানা উফূদের পশ্চিম পার্শ্বে রওযায়ে জান্নাতের ভিতর অবস্থিত।

৬। **উস্তুওয়ানা আবূ লুবাবা (রাযি.) :** হযরত আবূ লুবাবা (রাযি.) থেকে একটি ভুল সংঘটিত হওয়ার পর তিনি নিজেকে এই স্তম্ভের সাথে বেঁধে বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে না খুলে দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সাথে বাঁধা থাকব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ তা'আলা আদেশ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত খুলবো না। এভাবে দীর্ঘ ৫০ দিন পর হযরত আবূ লুবাবা (রাযি.)-এর তওবা কবূল হলো। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন। এটি উস্তুওয়ানা উফূদের পশ্চিম পার্শ্বে রওযায়ে জান্নাতের ভিতর অবস্থিত।

৭। উম্মুওয়ানা জিবরীল (আ.) : হযরত জিবরীল (আ.) যখনই হযরত দেহইয়া কাল্‌বী (রাযি.)-এর আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানেই উপবিষ্ট দেখা যেতো।

* মসজিদে নববীতে একাধারে কেউ ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি এবং আযাব ও মুনাফেকী থেকে মুক্তির ছাড়পত্র লিখে দেয়া হবে বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনার ভিত্তিতে অনেক মা-বোন নিয়মিত মসজিদে নববীতে নামায পড়ার জন্য যাতায়াত করে থাকেন। কিন্তু মহিলাদের জন্য ঘরেই নামায পড়া উত্তম।

পর্দার বিধান

নারীদের উপর পর্দা করা ফরয। পর্দার গুরুত্ব ও ফায়দা সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ের নসীহত নং ৩-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অবশিষ্ট কিছু হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হল।

* নারীদের চেহারাও পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। চেহারারও পর্দা করতে হবে। ইদানিং দেখা যায় কিছু মা-বোন বোরকা পরিধান করেন অথচ চেহারা খোলা রাখেন, এতে পর্দার ফরয পালন হয় না।

* অন্ধের সাথেও পর্দা করা ফরয।

* পীরের সাথেও পর্দা করা ফরয।

* দুলাভাইয়ের সাথেও পর্দা করা ফরয।

* কোন নারী অপর কোন নারীর গোপন অঙ্গ দেখতে পারবে না। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হলে ভিন্ন কথা। সে ক্ষেত্রেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ দেখা জায়েয হবে না। নারীর গোপন অঙ্গ (সতর) বলতে বুঝায় তার মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত সমস্ত শরীর।

* চলা ফেরা ও কাজ কর্মের সময় বা লেন-দেনের সময় প্রয়োজন হলে নারীর জন্য মুখমণ্ডল, হাতের তালু, আঙ্গুল ও পদযুগল খোলারও অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পুরুষের জন্য বিনা প্রয়োজনে নারীর এগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়।[১]

* নারীদের আওয়াজেরও পর্দা রয়েছে। তাই যেখানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেখানে পর্দার অন্তরালে থেকেও

---

১. معارف القرآن، بیان القرآن ।

বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শুনানো এবং পর্দার সাথে কথা-বার্তা বলা নিষেধ। যেখানে এরূপ আশঙ্কা নেই, সেখানে পর্দার আড়ালে থেকে কথা বলা জায়েয কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরালে থেকেও বেগানা পুরুষদের সঙ্গে কথা-বার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত। প্রয়োজনের মুহূর্তে বলতে হলেও নারীকে মিহি সুরে কথা না বলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ফিতনার সম্ভাবনা থেকে বাঁচার জন্য এটাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। মনে রাখতে হবে, নারীদের মিহি সুরে কথা বলা থেকে ফিতনার সূচনা হতে পারে।

* নারীদের জন্য বেগানা পুরুষকে অলংকারের আওয়াজ শোনানোও জায়েয নয়। তাই যে অলংকারে বাজনা হয়, এমন অলংকার পরিধান করে বাইরে যাবে না।

* নারীদের চুলেরও পর্দা রয়েছে। এমনকি যে চুল কেটে ফেলা হয় বা চিরুনি ইত্যাদি করতে গিয়ে যে চুল ঝরে পড়ে, তাও কোন স্থানে গেড়ে রাখতে বলা হয়েছে, বা এমন স্থানে তা ফেলতে হবে যাতে তা গায়ের মাহরাম পুরুষের নজরে না পড়ে।

* সুশোভিত রঙ্গিন কারুকার্য খচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নিষিদ্ধ।[১]

* যে স্বীয় পরিবারের (অধীনস্থ) কোন মহিলাকে বেগানা পুরুষের সাথে মেলামেশা করতে দেয়, পরের বিছানায় যেতে দেয়, (বর্বর পশ্চিমা সভ্যতায় যা চালু হয়েছে।) শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাতে কোন প্রকার বাঁধা না দেয় অর্থাৎ, শরীয়তের পর্দার বিধান লঙ্ঘন করতে দেয়, তাকে দাইয়ূস বলা হয়। আর দাইয়ূস ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না।[২]

যাদের সঙ্গে নারীকে পর্দা করতে হয় না অর্থাৎ, যাদের সামনে নারীগণ যেতে পারেন তাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল—

নারীর মাহরাম

১। নিজ স্বামী (যার নিকট স্ত্রীর কোন অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম)

২। পিতা (আপন হোক বা সৎ। দুধ পিতাও এর অন্তর্ভুক্ত)

৩। দাদা (দাদার পিতা বা আরও যত উপরে যাক এর অন্তর্ভুক্ত)

---

১. معارف القرآن نقلا عن الجصاص ۔ ২. بحوالہ فروع الایمان ۔

৪। নানা (নানার পিতা বা আরও যত উপরে যাক এর অন্তর্ভুক্ত)
৫। চাচা (আপন হোক বা সৎ)
৬। ভাই (আপন হোক বা বৈমাত্রেয় [বাপ শরীক] বা বৈপিত্রেয় [মা শরীক]) তবে চাচাত-মামাত-খালাত-ফুফাতো ভাইয়ের সঙ্গে পর্দা করতে হবে। দুধ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা দেয়া যায়।
৭। ভ্রাতুষ্পুত্র (আপন ভাইয়ের পুত্র হোক বা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বা বৈপিত্রেয় ভাইয়ের)
৮। ভাগিনা (আপন বোনের ছেলে হোক বা সৎ বোনের)
৯। ছেলে (আপন হোক বা সৎ)
১০। আপন শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও আপন নানা শ্বশুর ব্যতীত অন্য সকল প্রকার শ্বশুরের সঙ্গে পর্দা করতে হবে)
১১। মামা (আপন হোক বা সৎ)
১২। নাতি ([আপন ছেলের ঘরের হোক বা মেয়ের ঘরের হোক])
১৩। জামাই (আপন মেয়ের জামাই)

* নির্বোধ, ইন্দ্রিয় বিকল ধরনের লোক বা ঐসব বালক যারা বিশেষ কাজ-কারবারের দিক দিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বোঝে না, তাদের সাথে পর্দা করা জরুরী নয়— তারাও পর্দার হুকুম থেকে ব্যতিক্রম।

উল্লেখ্য, নারীদের মাহরাম পুরুষ যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে তারা মাহরাম মহিলার শুধু মাথা, চেহারা, গর্দান দুই বাহু ও পায়ের নলা দেখতে পারে, তাও যদি শাহওয়াত না থাকে। পেট পিঠ দেখা জায়েয নয়।

গোঁপ, দাড়ির মাসায়েল

* পুরুষের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং অন্ততঃ এক মুষ্ঠি লম্বা রাখা ওয়াজিব। দাড়ি মুণ্ডানো বা এক মুঠের চেয়ে কম রেখে ছাঁটা বা উপড়ানো হারাম। তবে মহিলাদের গোঁপ দাড়ি হলে মুণ্ডানো জায়েয বরং দাড়ি হলে মুণ্ডিয়ে ফেলা মোস্তাহাব। কোনভাবে মূল থেকে তুলে ফেলতে পারলে আরও উত্তম।[১]

চুল ও শরীরের অন্যান্য পশমের মাসায়েল

* মাথায় টিকি রাখা বা কোন দরগায় মান্নত মেনে জন্মচুল রাখা এসব নাজায়েয।[২]

---

১. داڑھی اور انبیاء کی سنتیں ۔ فتاوی رحیمیہ ج/۲ ۔ ২. صفائی معاملات ۔

* মহিলাদের মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা হারাম, হাদীছ শরীফে এরূপ মহিলাদের প্রতি লা'নত এসেছে। তবে চুলের অগ্রভাগ থেকে এলোমেলো অংশ ছেটে সোজা করা যায়। ববকাটিং করাতে কাফের ও বিজাতীর অনুসরণ হয় বলেও তা নিষিদ্ধ।

* নাকের মধ্যের পশম না উপড়ে কাঁচির দ্বারা কাটা উত্তম।

* বগলের পশম উপড়ে ফেলাই উত্তম, কিন্তু কামানোও জায়েয। উপড়ে ফেলার জন্য কোন লোমনাশক বা লোশন জাতীয় কিছু ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই।

* নাভির নীচের পশম মেয়েদের জন্য উপড়ে ফেলাই সুন্নাতের মোয়াফেক। বেশী কষ্টের হলে কামানোতে কোন অসুবিধা নেই। উপড়ে ফেলার জন্য কোন লোমনাশক বা লোশন জাতীয় কিছু ব্যবহার করাতেও কোন অসুবিধা নেই।

* নাভির নীচের পশম কামানোর সময় নাভির দিক থেকে শুরু করা নিয়ম। মলদ্বারে পশম থাকলে তাও কামিয়ে ফেলবে।

* কানের মধ্যে পশম থাকলে তাও কেটে ফেলবে।

* বুক-পিঠের পশম কামানো জায়েয আছে, তবে ভাল নয়।

* উপরে উল্লেখিত স্থানসমূহ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানের পশম যেমন : পায়ের নলা, রান, হাত ইত্যাদির পশম রাখা এবং কাটা উভয়ই দোরস্ত আছে।

* বগলের পশম, নাভির নীচের পশম ইত্যাদি প্রত্যেক সপ্তাহে একবার সাফ করা মোস্তাহাব। দুই সপ্তাহে একবার করলেও জায়েয। একেবারে শেষ সীমা ৪০ দিন। এ সব থেকে পাক সাফ না হওয়া অবস্থায় ৪০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে গোনাহ হবে।

* জানাবাতের অবস্থায় অর্থাৎ, যখন গোসল ফরয হয় তখন চুল বা এসব পশম কাটা-ছাঁটা মাকরূহ।

* বিনা অপারগতায় অন্যের দ্বারা বগলের পশম সাফ করানো ভাল নয়।

* ভ্রু যদি বিশৃঙ্খল থাকে, তাও কিছু কিছু কেটে-ছেঁটে সমান করে দেয়া দোরস্ত আছে। তবে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম উপায়ে ভ্রুকে চিকন করার উদ্দেশ্যে উভয় পাশের পশম মুণ্ডিয়ে বা উপড়ে ফেলার যে বর্তমান ফ্যাশন তা জায়েয নয়।[১]

---

১. جدید فقہی مسائل প্রভৃতি।

* কাটা চুল মাটির নীচে দাফন করে দেয়া উত্তম। কোন ভাল জায়গায় ফেলে দেয়াও দোরস্ত আছে, কিন্তু নাপাক ও খারাপ স্থানে ফেলা চাই না। এমনিভাবে এমন স্থানেও ফেলা চাইনা যেখানে তা কোন গায়ের মাহরামের নজরে পড়তে পারে।

* মহিলাগণ চুলের আলগা খোপা বা আলগা চুল ব্যবহার করতে পারেন, যদি সেটা কৃত্রিম চুলের হয়। আর যদি সেটা মানুষের চুল হয় তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয নয়।

তেল, প্রসাধনী ও সাজ-গোছের বিধি-বিধান

* হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় তেল ব্যবহার করতেন, তাই তেল ব্যবহার করা সুন্নাত।

* তেল ব্যবহার করার ইচ্ছা করলে বাম হাতের তালুতে তেল নিয়ে প্রথমে ভ্রুর উপর, তারপর চোখে, তারপর মাথায় লাগানো সুন্নাত।[১]

* মাথায় তেল লাগাতে মুখমণ্ডলের দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত।[২]

* ক্রিম, স্নো, পাউডার ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই, যদি এগুলোতে কোন নাপাক বস্তু মিশ্রিত না থাকে।[৩]

* নেল পলিশ (নখ পলিশ) প্রভৃতি যা ব্যবহার করলে একটা শক্ত আবরণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যার নীচে পানি পৌঁছে না এরূপ বস্তু সহকারে উযূ গোসল-সহীহ হয় না। আর উযূ-গোসল সহীহ না হলে নামাযও সহীহ হয় না এবং প্রত্যেক উযূর সময় নেল পলিশ দূর করাও মুশকিল, তাই নেল পলিশ থেকে বিরত থাকাই জরুরী।[৪]

* নেল পলিশ ব্যবহার করলে উযূ-গোসলের পূর্বে অবশ্যই তা ভালভাবে তুলে নিতে হবে। লিপস্টিক দ্বারা কোন আবরণ পড়লে তাও উযূ-গোসলের পূর্বে ভালভাবে তুলে নিতে হবে।[৫]

* নেল পলিশ ব্যতীত অন্যান্য যেসব মেকআপে আল্লাহর সৃষ্টি করা গঠনে কোন বিকৃতি ঘটে না, তা ব্যবহার করা জায়েয।[৬]

* কপালে টিপ দেয়া হিন্দুয়ানী প্রথা বিধায় তা নিষিদ্ধ।

* শরীরে গুদানী দিয়ে কিছু অংকন করা (উল্কি আঁকা) হারাম।[৭]

---

১. رسول اللہ ﷺ کی سنتیں ।২. ایضا ।৩. آپ کے مسائل اور انکا حل ج ۲ ।৪. ایضا ।৫. آپ کے مسائل اور ان کا حل ج ۲ ।৬. ایضا ।৭. تعلیم الدین ।

আয়না-চিরুনির বিধি-বিধান

* আয়না দেখা জায়েয।

* আয়না দিনে-রাতে যে কোন সময় দেখা যায়। রাতে আয়না দেখা ঠিক নয়—এরূপ একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে, যার কোন ভিত্তি নেই।[১]

* চুল পরিপাটি করার জন্য চিরুনি করা সুন্নাত, তবে খুব বেশী এর ধান্ধায় না পড়া উচিত।

* চুল আঁচড়ানোর সময় প্রথমে ডান দিক তারপর বাম দিক আঁচড়ানো সুন্নাত।

* চিরুনি করার জন্য অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে আয়না দেখার সময় দুআ পড়তে হয়। দুআটির জন্য দেখুন—সপ্তম অধ্যায়।

* একই চিরুনি দিয়ে একাধিক ব্যক্তির চুল আঁচড়ানোতে কোন অসুবিধা নেই।

সুরমা, আতর ও সেন্ট ব্যবহারের বিধি-বিধান

* পুরুষ-মহিলা সবার জন্য সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত।

* সুরমা বিশেষভাবে রাতের বেলায় শোয়ার পূর্বে লাগানো উত্তম।

* প্রত্যেক চোখে তিনবার করে সুরমা লাগানো সুন্নাত।

* আতর ব্যবহার করা সুন্নাত। তবে যে আতরের খুশবু বাইরে ছড়ায়-এরূপ আতর ব্যবহার করে মহিলাগণ বাইরে যাবেন না।

* সেন্ট এর মধ্যে স্পিরিট ব্যবহার করা হয়, এই স্পিরিট খেজুর, কিশমিশ বা আঙ্গুর থেকে তৈরি করা হলে সেরূপ স্পিরিট নাপাক, অতএব সেরূপ স্পিরিটযুক্ত সেন্টও নাপাক হবে এবং তা ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। তবে 'আহছানুল ফতওয়া' ২য় খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদন্ত করে জানা গেছে বর্তমান যুগের স্পিরিটে এবং এ্যালকোহলে (শরাবে) খেজুর, আঙ্গুর ব্যবহার করা হয় না। অতএব বর্তমানে স্পিরিট নাপাক নয়, ফলে সেন্ট ব্যবহারেও কোন দোষ থাকছে না।[২] তবে সন্দেহের ক্ষেত্রে বিরত থাকাই শ্রেয়।

* মাঝে মাঝে আতর লাগানো ভাল। বিশেষভাবে জুমুআর দিন, ঈদের দিন প্রভৃতি সময়।

---

১. امداد الفتاوی ج/۴ ॥ ২. احسن الفتاوی ॥

অলংকারের বিধি-বিধান

* মহিলাদের জন্য কাচ বা কোন ধাতুর চুড়ি পরিধান করা জায়েয।[১]

* মহিলাদের কান ফুটানো জায়েয। নাক ফুটানো অধিকাংশের মতে জায়েয, কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।[২]

* মহিলাদের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, তামা ইত্যাদি সব রকম ধাতুর সব রকম অলংকার ব্যবহার করা জায়েয। তবে বিধর্মীদের অনুকরণ যেন না হয়।[৩]

* স্বর্ণ-রূপা ব্যতীত অন্যান্য ধাতুর আংটি মহিলাদের জন্য জায়েয, তবে মাকরূহ।[৪]

* যেসব অলংকারে বাজনা হয়, সেগুলো গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে পরা জায়েয নয়।[৫]

নখ সম্পর্কিত মাসায়েল

* হাত পায়ের নখ কেটে ফেলা সুন্নাত। প্রতি সপ্তাহে একবার কাটা মোস্তাহাব। অন্ততঃ দুই সপ্তাহে একবার কাটলেও চলবে। ৪০ দিনের বেশী না কাটা অবস্থায় অতিবাহিত হলে গোনাহ হবে। কোন কোন মেয়েলোক নখ না কেটে লম্বা করে রাখে, এতে গোনাহ হবে।

* দাঁত দিয়ে নখ কাটা মাকরূহ। এতে শ্বেত রোগ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

* জানাবাতের অবস্থায় অর্থাৎ, গোসল ফরয হওয়ার অবস্থায় নখ কাটা মাকরূহ।

* নখ কাটার সময় প্রথমে ডান হাতের তারপর বাম হাতের নখ কাটা সুন্নাত। পায়ের ক্ষেত্রেও প্রথমে ডান পায়ের তারপর বাম পায়ের নখ কাটা সুন্নাত। এ ক্ষেত্রে খাস কোন তারতীব জরুরী নয়।

* কাটা নখ মাটির নীচে দাফন করে দেয়া উত্তম। অন্ততঃ কোন ভাল স্থানে ফেলে দেয়াও দোরস্ত আছে। নাপাক ও খারাপ জায়গায় ফেলা চাই না।

মেহেদী ও খেযাব (কলপ) সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* নারীদের জন্য হাতে এবং পায়ে মেহেদী লাগানো মোস্তাহাব। কেউ কেউ পায়ে মেহেদী লাগানোকে খারাপ মনে করেন এই যুক্তিতে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িতে মেহেদী লাগাতেন, অতএব তা

---

১. فتاوی رشیدیہ । ২. ایضا । ৩. ایضا । ৪. فتاوی رحیمیہ ج/۲ । ৫. ایضا ।

পায়ে লাগানো বে-আদবী, এ যুক্তি ঠিক নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়িতে তেল লাগাতেন তাই বলে কি পায়ে তেল লাগানো বে-আদবী হবে?

* অন্ততঃ হাত-পায়ের নখে মেহেদী লাগালেও চলবে।[১]

পোশাক-পরিচ্ছদের মাসায়েল

* মহিলাদের জন্য পুরুষের কাট-ছাটের পোশাক পরিধান করা এবং তাদের বেশ ধারণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ।[২]

* মহিলাদের জন্য শাড়ি পরিধান করা জায়েয।[৩]

* প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় ব্যবহার করা নাজায়েয, ছবি যে কোনভাবেই তৈরী হোক না কেন।[৪]

* এত টাইট-ফিট পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ, যাতে শরীরের গোপন অঙ্গ ফুটে ওঠে।[৫]

* বিজাতীয় লেবাস-পোশাক বর্জনীয়।

* মহিলাদের জন্য সব ধরনের সূতা ও রেশমের কাপড় বৈধ।[৬]

* যে কাপড়ে শরীর দেখা যায় এমন পাতলা কাপড় পরিধান করা না করারই হুকুম রাখে। অতএব তদ্রূপ পাতলা কাপড় পরিধান করে নামায পড়লে নামায হবে না।

* হারাম উপায়ে অর্জিত পোশাক বা হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ দ্বারা ক্রয় করা পোশাক পরিধান করা হারাম।[৭]

* অহংকার প্রদর্শন বা বিলাসিতার নিয়তে উচ্চমানের পোশাক পরিধান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন সেই সম্পদের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে এবং শোকর আদায়ের নিয়তে উত্তম পোশাক পরিধান করা প্রশংসনীয়।

* কামিজ, জামা, পায়জামা পরিধান করতে প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ঢুকানো সুন্নাত এবং খোলার সময় এর বিপরীত বাম দিক থেকে খোলা সুন্নাত। মোজা, জুতা, স্যান্ডেল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এরূপ তরীকা সুন্নাত।

* একই সময়ে জামা ও পায়জামা উভয়টি পরিধান করতে হলে আগে জামা পরে পায়জামা পরিধান করা উত্তম।

---

১. فتاوى دار العلوم ।২. امداد الفتاوى ج۴ ।৩. رد المحتار ج۶، فقه الحديث، جواهر الفقه ج۲، تعليم الدين ।৪.
الفقه على المذاهب الاربعة ।৫. هدايه ج۴ ।৬. احسن الفتاوى ।৭. فتاوى محموديه ج۵

* পায়জামা বসে পরিধান করা ভাল, অন্যথায় স্বাস্থ্যগত অসুবিধা হতে পারে।

* মহিলাদের জন্য পুরো পা ঢেকে মাটি পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে পরা উত্তম।

* কাপড় পরিধান করা ও খোলার দুআর জন্য সপ্তম অধ্যায় দেখুন।

* নতুন কাপড় সংগ্রহ করলে পুরাতন কাপড় গরীব-মিসকীনকে দিয়ে দেয়া উত্তম।

জুতা/স্যান্ডেল সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* মহিলাদের জন্য পুরুষের স্টাইলের জুতা/স্যান্ডেল পরিধান করা হারাম ও নিষিদ্ধ।

* জুতা/স্যান্ডেল পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পায়ে পরে বাম পায়ে পরিধান করা এবং খোলার সময় প্রথমে বাম পায়েরটা পরে ডান পায়েরটা খোলা সুন্নাত। জুতা পরিধান করার সময় হাত লাগানোর দরকার হলে বসে পায়ে দিবে।

* নতুন জুতা/স্যান্ডেল পরিধান করা এবং খোলার সময় যে দুআ পড়তে হয়, তার জন্য দেখুন সপ্তম অধ্যায়।

* মাঝেমধ্যে খালি পায়ে চলতে অসুবিধা নেই, তবে হযরত রাসূল (সাঃ) অধিকাংশ সময় জুতা/স্যান্ডেল বা মোজা পরিধান করে চলতেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-ব্যয়

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও ফায়দা

ইসলামে হালাল মাল উপার্জন করার গুরুত্ব অনেক। উপার্জন হালাল হওয়া ইবাদত কবূল হওয়ার জন্য শর্ত। যার উপার্জন হালাল নয়, তার ইবাদত কবূল হয় না। এজন্যেই কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ ! كُلُوا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ (المؤمنون : ٥١)

অর্থাৎ, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র (হালাল) রিজিক আহার কর এবং নেক আমল কর। এখানে নেক আমলের কথা বলার পূর্বে হালাল রিজিক গ্রহণ করতে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমল তথা ইবাদত কবূল হওয়ার জন্য রিজিক হালাল হওয়া শর্ত। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ۔ (رواه احمد)

অর্থাৎ, শরীরের যে মাংসটুকু হারামের দ্বারা উৎপন্ন, তা জান্নাতে যাবে না, তা জাহান্নামের উপযুক্ত। (আহমদ)

উপার্জন ও আহার হালাল না হলে তার মধ্যে নেক কাজের চেতনা সৃষ্টি হয় না বরং হারাম মাল আহার করলে তার দ্বারা অন্তরে পাপের চেতনা সৃষ্টি হয়। হারাম মাল থেকেই সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতার জন্ম। কারণ, খাদ্যরস থেকে রক্ত সৃষ্টি হয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং খাদ্য যে রকম হবে, সেই প্রভাব সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সৃষ্টি হবে এবং সেই ধরনের কাজই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত হবে। হারাম মাল গ্রহণ করলে অন্তরে হারাম প্রভাবই সৃষ্টি হবে। কাজেই হালাল হারাম বেছে চলা অত্যন্ত জরুরী।

অনেক মা-বোন আছেন যারা, স্বামী বা পিতা বা ভাই বা গার্জিয়ানদের কাছে নানা রকম দাবী দাওয়া ও নানা রকম আবেদন করে থাকে, যা দেয়ার সাধ্য তাদের নেই, ফলে তারা তাদের দাবী পূরণ করার জন্য হারাম পথে পা বাড়ায়। মা-বোনেরা ইচ্ছা করলে অনেক স্বামী বা গার্জিয়ানকে হারাম উপার্জন থেকে বিরত রাখতে পারেন।

নিম্নে মা-বোনদের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ কয়েক ধরনের ব্যবসা ও টাকা খাটানোর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল। সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত মাসায়েল জানতে হলে "আহকামে যিন্দেগী" কিতাবখানা পাঠ করা যেতে পারে।

ব্যবসা-বাণিজ্য করতে টাকা খাটানোর মাসায়েল

যদি কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য অন্যকে টাকা দেয় এবং যাকে টাকা দেয়া হল তার কোন অর্থ উক্ত ব্যবসায় না লাগে বরং সে শুধু শ্রম দেয়, তাহলে এরূপ কারবারকে ইসলামী ফেকাহ্র পরিভাষায় 'মুযারাবা' বলা হয়। আর উক্ত ব্যবসায় তার টাকা/অর্থও যদি লাগে তাহলে তাকে 'শেরকাত' (কোম্পানি ব্যবসা) বলা হয়। নিম্নে মুযারাবা-এর মাসায়েল বর্ণনা করা হল :

* অর্থদাতা/মহাজন ও বেপারীর মুনাফার হার নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। অর্থাৎ, লাভের কত অংশ কে পাবে তা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ মহাজনের অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ, বাকীটা বেপারীর ইত্যাদি। যদি

এরূপ কথা হয় যে, মোটের উপর মহাজনকে এত টাকা দিতে হবে বা মাসিক এত টাকা দিতে হবে তাহলে নাজায়েয ও সুদ হয়ে যাবে।

* যদি এরূপ শর্ত করা হয় যে, মুনাফা থেকে একটা নির্দিষ্ট অংক যে কোন এক জনের, বাকীটা অন্যের বা একটা নির্দিষ্ট অংক প্রথমে এক জনের জন্যে পৃথক করে নিয়ে বাকীটা উভয়ের মধ্যে বণ্টন হবে, তাহলে মুযারাবা ফাসেদ হয়ে যায়।[১]

গরু, ছাগল, হাস, মুরগি রাখালী দেয়ার মাসায়েল

গরু, ছাগল, হাস, মুরগি, ইত্যাদি জীবজন্তু রাখালী দেয়া এই শর্তে যে, এর যে বাচ্চা হবে তা আমরা আধা-আধি (বা চারআনা বা তিনআনা বা এরূপ কোন হারে) ভাগ করে নিব বা মুরগীর ডিম এভাবে ভাগ করে নিব, এরূপ রাখালী বা ভাড়া দেয়া জায়েয নয়। গ্রামাঞ্চলে এরূপ প্রচলিত থাকলেও তা জায়েয নয়। তবে নির্দিষ্ট সময় লালন-পালন করলে তার বিনিময়ে এত টাকা দেয়া হবে, বা এত পারিশ্রমিক দেয়া হবে—এরূপ চুক্তি করা জায়েয।

বন্ধকের মাসায়েল

* কর্জ পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকী জিনিস ফেরত নেয়ার বা দখল নেয়ার অধিকার থাকে না।

* কোন জিনিস বন্ধক রাখলে বন্ধক গ্রহীতা কোনরূপে তা ব্যবহার করলে নাজায়েয হবে। মালিক অনুমতি দিলেও বন্ধকী জিনিস দ্বারা কোনরূপেই লাভবান হওয়া জায়েয নয়। যেমন : বাগান বন্ধক রেখে তার ফল খাওয়া, জমি বন্ধক রেখে তার ফসল খাওয়া, ঘর বন্ধক রেখে তাতে বসবাস করা, অলংকার থালা-বাটি বন্ধক রেখে তা ব্যবহার করা ইত্যাদি।

* গরু, ছাগল, বকরী, ঘোড়া ইত্যাদি বন্ধক রাখলে তার খোরাক ইত্যাদির খরচ মালিককে দিতে হবে। গাভী, বকরীর দুধ ও বাছুর সবই মালিক পাবে। দুধ খেয়ে থাকলে ঋণ পরিশোধ হওয়ার সময় দুধের মূল্য ফেরত দিতে হবে; অবশ্য কিছু খরচ হয়ে থাকলে সে খরচের টাকা কেটে রাখতে পারবে।

---

১. বেহেশতী জেওর, ইসলামী ফেকাহ : ৩য়. ছাফাইয়ে মু'আমালাত এবং ٨ / ﺝ ﺑﺪﺍﺋﻊ থেকে গৃহিত।

* বন্ধকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও মালিক অর্থ পরিশোধ করে বন্ধকী জিনিস ফেরত না নিলে তা বিক্রি করে নিজের অর্থ আদায় করার অধিকার এসে যায়। ইসলামী জজ (কাযী) থাকলে তার নিকট মামলা দায়ের করে বিক্রির অনুমোদন নিয়ে নিবে।[1]

আমানতের মাসায়েল

* টাকা-পয়সা বা মাল-সামান আমানত রাখলে আমানতদারের উপর তার পূর্ণ হেফাজত করা ওয়াজিব।

* কেউ টাকা-পয়সা আমানত রাখলে অবিকল সেই টাকা-পয়সাই পৃথকভাবে হেফাযত করে রাখা ওয়াজিব— নিজের টাকার সঙ্গে মিশানো এবং ঐ টাকা থেকে খরচ করা জায়েয নয়। এরূপ করতে হলে মালিক থেকে অনুমতি নিতে হবে।

* আমানতের মাল পূর্ণ হেফাজত সত্ত্বেও নষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। আর হেফাজতে ত্রুটি করার কারণে নষ্ট হলে বা চুরি হলে, খোয়া গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

* কেউ কাপড়-চোপড়, হাড়ি-পাতিল, থালা-বাসন, বই-পত্র অলংকার ইত্যাদি আমানত রাখলে মালিকের বিনা অনুমতিতে আমানতদারের পক্ষে তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। গাভী আমানত রাখলে তার দুধ খাওয়া বা বলদ আমানত রাখলে তার দ্বারা জমি চাষ করানো মালিকের অনুমতি ব্যতীত জায়েয নয়।

* আমানতকারী যখনই তার মাল ফেরত চাইবে তখনই তার মাল তার নিকট ফেরত দেয়া ওয়াজিব। বিনা ওযরে ফেরত দিতে বিলম্ব করা জায়েয নয়।

* যে অভাবী, তার কাছে কারও আমানত না রাখা উচিত। কেননা অভাব আমানতে খেয়ানতের বা অনিয়মের কারণ ঘটতে পারে।

বি: দ্র: হেফাজতের সঙ্গে আমানত রেখে অন্যের উপকার করা অনেক ছওয়াবের কাজ। কিন্তু আমানতে খেয়ানত করলে কবীরা গোনাহ হবে।[2]

ওয়াক্ফ/সদকায়ে জারিয়ার মাসায়েল

* জায়গা-জমি, বাড়ি বাগান ইত্যাদি আল্লাহর নামে এই মর্মে ওয়াক্ফ করা যে, এতে মসজিদ/মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হবে কিংবা এতে গরীব

১. বেহেশতী জেওর, ইসলামী ফিকাহ : ৩য় এবং হাক্কাইতে মোআমালাত থেকে গৃহীত। ২. বেহেশতী জেওর, ইসলামী ফিকাহ : ৩য়, হাক্কাইতে মুআমালাত ও আদাবুল মুআশারাত থেকে গৃহীত।

দুঃখীরা, ইসলামের সেবকরা থাকবে কিংবা এর আয় থেকে তারা ভোগ করবে—এরূপ করাকে 'সদকায়ে জারিয়া' বলে। অন্যান্য সব ইবাদত বন্দেগীর ছওয়াব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব যতদিন ঐ সম্পত্তি থাকবে এবং যতদিন গরীব-দুঃখীর উপকার ও ইসলামের খেদমত হতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত দাতার আমলনামায় ছওয়াব লেখা হতে থাকবে।

* ওয়াক্ফকারী যদি শর্ত করে যে, এই ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় থেকে এত অংশ বা এত টাকা আগে আমার আওলাদ পাবে, (বাকী যা কিছু থাকবে তা অমুক অমুক দ্বীনী কাজে ব্যয় হবে) তবে তাও দোরস্ত আছে। আওলাদকে উক্ত পরিমাণই দেয়া হবে।

* মাদ্রাসা-মসজিদে টাকা-পয়সা বা মাল-আসবাব দান করা এবং তালিবে ইলমদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করাও সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

ওসিয়ত

* নিজের মাল বা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসিয়ত করা যাবে না। এক-তৃতীয়াংশের অধিকের জন্য ওসিয়ত করলেও তার ওসিয়ত এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে, ওছিয়ত সম্পূর্ণ হোক বা না হোক।

* নিজের ওয়ারিছ (যে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে অংশ পাবে)-এর জন্য ওসিয়ত করা যায় না। অবশ্য যদি অন্যান্য ওয়ারিছরা এতে সম্মত থাকে তাহলে উক্ত ওয়ারিছ ওসিয়ত দ্বারা অংশ পেতে পারে অথবা যদি উক্ত ওয়ারিছ হকদার হওয়ার সত্ত্বেও অন্য কোন কারণে মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও সে ওসিয়ত অনুযায়ী অংশ পাবে, যেমন দাদা জীবিত থাকাকালীন পিতা ইন্তেকাল করলে নাতি দাদার সম্পত্তি থেকে অংশ পায় না কিন্তু দাদা ওসিয়ত করে গেলে তখন উক্ত নাতি ওসিয়ত অনুযায়ী অংশ পাবে।

* কোন মাকরূহ বা হারাম কাজের জন্য ওসিয়ত করে গেলে তা পূরণ করা হবে না।

* ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর কাফন-দাফনের ব্যয় ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট অর্থ থেকে ওসিয়ত পূর্ণ করা হবে। দাফন-কাফনের ব্যয় ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট না থাকলে ওসিয়ত পূরা করা হবে না।

* কেউ কোন দ্রব্য বা শস্য সদকা করার ওসিয়ত করলে সে দ্রব্যের দামও সদকা করা যায়।

* যতদিন কোন লোক জীবিত থাকবে, তার নিজের ওসিয়ত ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারও বাকী থাকবে।

* যদি কেউ ওসিয়ত করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার জানাযা পড়াবে বা আমাকে অমুক স্থানে দাফন করবে, তাহলে এসব ওসিয়ত পূরণ করা ওয়াজিব নয়, তবে অন্য কোন শরীয়তসম্মত বাধা না থাকলে পূরণ করাতে কোন অসুবিধা নেই।

* কারও অনাদায়ী যাকাত, অনাদায়ী হজ্জ থাকলে তা আদায় করার বা নামায-রোযা বাকী থাকলে তার ফেদিয়া আদায় করার ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। এরূপ ওসিয়ত করে গেলে তার দাফন-কাফন ও ঋণ পরিশোধের পর যে পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকবে তার এক-তৃতীয়াংশের মধ্য হতে তা আদায় করা হবে। যদি এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে তা আদায় না হয়, তাহলে তা আদায় করা না- করা ওয়ারিছদের ইচ্ছাধীন থাকবে। 'নামাযের ফেদিয়া', 'রোযার ফেদিয়া', 'বদলী হজ্জ' ইত্যাদি পরিচ্ছেদে এসব সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বিবাহ-শাদি

যাদের সাথে বিবাহ হারাম

১. নিজের সন্তানের সাথে। যেমন : ছেলে, ছেলের ছেলে, তার ছেলে, নাতি, নাতির ছেলে ইত্যাদি যতই নীচের দিকে যাক।

২. বাপ, দাদা, পরদাদা, নানা, পরনানা, ইত্যাদি যতই উর্ধ্বে যাক না কেন।

৩. ভাই। (আপন বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়)। মাতা ও পিতা উভয়ে ভিন্ন হলে সেরূপ ভাইয়ের সাথে বিবাহ জায়েয।

৪. ভাতিজার সাথে।

৫. ভাগিনার সাথে।

৬. মামা, অর্থাৎ মায়ের আপন বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সাথে।

৭. চাচা, অর্থাৎ পিতার উপরোক্ত তিন প্রকার ভাইয়ের সাথে।

৮. জামাই, অর্থাৎ মেয়ের সাথে যার বিবাহের আক্দ হয়েছে, তার সাথে। (চাই সহবাস তার সাথে হোক বা না হোক)

৯. মায়ের স্বামী, অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর মা যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং তার সাথে সহবাস হয়, তার সাথে।

১০.সতীনের পুত্রের সাথে।

১১.শ্বশুর, তার পিতা, দাদা, পরদাদা প্রমুখের সাথে।

১২.ভগ্নির স্বামীর সাথে, যে পর্যন্ত ভগ্নি তার বিবাহে থাকে।

১৩.ফুফা এবং খালুর সাথে, যে পর্যন্ত ফুফু ফুফার এবং খালা খালুর বিবাহে থাকে।

১৪.নসবের দিক দিয়ে অর্থাৎ জন্ম ও জাতিগত দিক দিয়ে যে সব আত্মীয় ও আপনজনের সাথে বিবাহ হারাম (যেমন : বাপ, দাদা, ছেলে, চাচা, মামা ইত্যাদি)। তদ্রূপ দুধের দিক দিয়েও সেসব আত্মীয়দের সাথে বিবাহ হারাম। যেমন : দুধবাপ, দুধ ভাই, দুধ পোতা প্রমুখের সাথে।

১৫.অন্য কোন ধর্মাবলম্বী পুরুষের সাথে।

১৬.কারও স্ত্রী থাকা অবস্থায় বা তালাকের পর ইদ্দতের সময় অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ হারাম।

১৭.আপন শ্বশুরের সাথে।

১৮.কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে যেনা করলে ঐ নারীর মা ও মেয়ে (বা মেয়ের অর্থাৎ নিম্নদিকের যে কোন মেয়ে) এর সাথে ঐ পুরুষের বিবাহ দোরস্ত নয়।

১৯.কোন নারী কামভাবের সাথে বদ নিয়তে অপর কোন পুরুষের শরীর স্পর্শ করলেও উপরোক্ত হুকুম। তদ্রূপ কোন পুরুষ কামভাবসহ বদ নিয়তে কোন নারীকে স্পর্শ করলেও ঐ পুরুষের সন্তানগণ ঐ নারীর জন্য হারাম হয়ে যায়।

২০.ভুলবশতঃ কামভাবের সাথে কন্যা বা শাশুড়ীর গায়ে হাত দিলে স্ত্রী (অর্থাৎ ঐ কন্যার মা বা ঐ শাশুড়ীর মেয়ে) চিরতরে হারাম হয়ে যায়। তাকে তালাক দিয়েই দিতে হবে।

২১.কোন ছেলে কুমতলবে বিমাতার শরীরে হাত লাগালে বা বিমাতা কুমতলবে বিপুত্রের শরীরে হাত লাগালে ঐ নারী তার স্বামীর জন্য একেবারে হারাম হয়ে যায়।[১]

যাদের সাথে বিবাহ জায়েয

যাদের সাথে বিবাহ হারাম, তারা ব্যতীত অন্য সব পুরুষের সাথে বিবাহ জায়েয, অতএব যে সব পুরুষের সাথে বিবাহ জায়েয, তাদের তালিকা বলে

১. বেহেশতী জেওর থেকে গৃহীত।

শেষ করার নয়। কিন্তু যাদের সাথে বিবাহ জায়েয তা সত্ত্বেও সমাজে অনেকে সেটাকে জায়েয মনে করে না বা খারাব মনে করে, এরূপ কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা হল।

১. এরূপ ভাইয়ের সাথে বিবাহ জায়েয, যার মা ও বাপ উভয়ে ভিন্ন।
২. মার চাচাত, মামাত, ফুফাত, খালাত ভাইয়ের সাথে বিবাহ জায়েয।
৩. বাপের চাচাত, মামাত ভাইয়ের সাথে বিবাহ জায়েয।
৪. চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, খালু শ্বশুরের সাথে বিবাহ জায়েয।
৫. ননদের স্বামী, ভগ্নিপতি (যখন ভগ্নি তার বিবাহে না থাকে) বিয়াই অর্থাৎ, ভাইয়ের শ্যালক, বোনের দেবর ভাসুর, ছেলের শ্বশুর, মেয়ের শ্বশুর প্রভৃতির সাথে বিবাহ জায়েয।
৬. ফুফার সাথে (যখন ফুফু তার বিবাহে না থাকে) খালুর সাথে (যখন খালা তার বিবাহে না থাকে)
৭. পালকপুত্র, ধর্মছেলে, ধর্মবাপ, ধর্ম ভাইয়ের সাথে বিবাহ জায়েয।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের তরীকা

* সৎ ও খোদাভীরু পাত্র-পাত্রীর সন্ধান করতে হবে।

* পাত্র/পাত্রীর জন্য বংশ, মুসলমান হওয়া, ধর্মপরায়ণতা, সম্পদশালীতা ও পেশায় সমমানের পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের বিষয়টি শরীয়তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদশালীতায় সমপর্যায়ের হওয়ার দ্বারা বুঝানো হয়েছে ধনবতী মহিলার জন্য একেবারে নিঃস্ব কাঙ্গাল-পুরুষ সমমানের নয়; তবে মহরের নগদ অংশ প্রদানে এবং ভরণ-পোষণ প্রদানে সক্ষম হলে তাকে সমমানের ধরা হবে, উভয় পক্ষের সম্পদ একই পরিমাণে বা কাছাকাছি হতে হবে, তা বোঝানো হয়নি।

* পাত্র/পাত্রীর ধর্মপরায়ণতার দিকটাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। আজকাল ধর্মের দিকটা দেখা হয় না বরং শুধু সম্পদ এবং রূপ সৌন্দর্যের দিকটাই দেখা হয়। এর ফলে পরিবারের ধর্মীয় দিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

* পাত্র/পাত্রীর বয়সের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা সঙ্গত, পাত্রীর চেয়ে পাত্রের বয়স কিছু বেশী হওয়া উত্তম; তবে বহুত বেশী বেশ কম হওয়া সঙ্গত নয়।[১]

---

১. اصلاح الرسوم ।

বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার তরীকা

* বিবাহের পয়গাম বা প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত বাক্যটি বলে নিবে[১]—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

(كتاب الاذكار)

অতঃপর বলবে আমি অমুকের ব্যাপারে এই আগ্রহ নিয়ে এসেছি।

* অপর কেউ প্রস্তাব দিয়ে থাকলে এবং উভয় পক্ষের সে প্রস্তাবে রাজী হওয়ার ভাব দেখা গেলে সেটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অন্য প্রস্তাব দেয়া নিষেধ।

পাত্রী দেখা প্রসঙ্গে

* বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখে নেয়া সুন্নাত। নিজে না দেখলে বা সম্ভব না হলে কোন মাহিলাকে পাঠিয়েও দেখার ব্যবস্থা করা যায়।

* পাত্রীর চেহারা এবং হাত দেখার অনুমতি রয়েছে।

* যে উক্ত নারীকে বিবাহ করতে চায় একমাত্র সে ব্যতীত অন্য কোন গায়রে মাহরামের পক্ষে তা দেখা বৈধ নয়। অথচ আজকাল ছেলের সাথে ছেলের বন্ধু-বান্ধব, ভগ্নিপতি, মামা, খালু ইত্যাদি অনেকে মেয়ে দেখার জন্য এসে থাকে। তাদেরকে মেয়ে দেখানো এবং তাদের জন্য দেখা জায়েয নেই। আর মনে রাখতে হবে নাজায়েয কাজের মধ্যে কোন বরকতও নেই। এইসব নাজায়েয তরীকার মধ্য দিয়ে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাতে সেই দম্পতির জীবনের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

মহর সম্পর্কিত মাসায়েল

* মহর পরিশোধ করা ওয়াজিব। তাই নাম শোহরতের জন্য সাধ্যের অতিরিক্ত মহর ধার্য করা অপছন্দনীয়।

* রাসূল (সাঃ) তাঁর কন্যা ফাতেমার জন্য যে মহর ধার্য করেছিলেন, তাকে 'মহরে ফাতিমী' বলা হয়। বর্তমানের হিসাবে তার পরিমাণ কী এ ব্যাপারে তিনটি উক্তি পাওয়া যায়—(১) ১৩১.২৫ তোলা রূপার সমপরিমাণ। (২) ১৪৫.৭৫ তোলা ৮ রত্তি রূপার সমপরিমাণ। (৩) ১৫০ তোলা রূপার সমপরিমাণ। সতর্কতাস্বরূপ ১৫০ তোলার মতটি গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে

১. كتاب الاذكار ।

প্রচলিত গ্রাম-এর ওজন হিসেবে ১৫০ তোলা = ১৭৪৯.৬০০ গ্রাম। খুচরা বাকীটুকু পূর্ণ করে দিয়ে ১৭৫০ গ্রাম ধরা চলে।[১]

* কমের পক্ষে মহরের পরিমাণ দশ দেরহাম (অর্থাৎ, প্রায় পৌণে তিন তোলা রূপার সমপরিমাণ) বেশীর কোন সীমা নেই। তবে খুব বেশী মহর ধার্য করা ভাল নয়।

* বিবাহের সময় মহর ধার্য হলে এবং বাসর ঘর অতিবাহিত হলে ধার্যকৃত পূর্ণ মহর দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর বাসর ঘর হওয়ার পূর্বে তালাক হলে ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক দেয়া ওয়াজিব হয়।

* বিবাহের সময় মহরের উল্লেখ না হলে 'মহ্‌রে মেছ্‌ল' বা খান্দানী মহর ওয়াজিব হয় আর এরূপ সূরতে বাসর ঘর হওয়ার পূর্বেই তালাক হয়ে গেলে সে মেয়েলোকটি মহর পাবে না— শুধু একজোড়া কাপড় পাবে। একজোড়া কাপড়ের অর্থ লম্বা হাতাওয়ালা একটা জামা, একটা উড়না বা ছোট চাদর ও একটা পায়জামা। অথবা একটা শাড়ী ও একটা বড় চাদর যার দ্বারা আপাদ মস্তক ঢাকা যায়।

* 'মহ্‌রে মেছ্‌ল' বা খান্দানী মহর বিবেচনার ক্ষেত্রে বাপ-দাদার বংশের মেয়েদের যেমন বোন, ফুফু, ভাতিজী, চাচাত বোন প্রমুখের মহর দেখতে হবে এবং এই খান্দানী মহর নিরূপণের ক্ষেত্রে যুগের পরিবর্তনে, স্থানের পরিবর্তনে, রূপ-গুণ, বয়স, পাত্র, দ্বিতীয় এবং প্রথম বিবাহের তারতম্যে মহরের যে তারতম্য হয়ে থাকে তাও বিবেচনায় আনতে হবে।

* স্বামী যদি স্ত্রীকে মহরের নিয়তে (খোরাক, পোশাক ও বাসস্থান ব্যতিরেকে) কিছু টাকা বা অন্য কোন জিনিস দেয়, তাহলে তা মহর থেকেই কাটা যাবে।

* স্বামী যদি স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে বা লজ্জায় ফেলে বা অন্য কোন কৌশলে ও অসদুপায়ে স্ত্রীর আন্তরিক ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তার দ্বারা মহর মাফ করিয়ে নেয়, তবে তাতে মহর মাফ হয়ে যায় না।

এযেন নেয়ার তরীকা ও মাসায়েল

* মেয়ে যদি ছেলেকে পূর্বে থেকে না চিনে তাহলে এযেন (অনুমতি/সম্মতি) নেয়ার সময় মেয়ের সামনে ছেলের নাম-ধাম, পরিচয় ও মহরের কথা

১. فتاوی رحیمیہ ج/۲ ।

তুলে ধরে বলতে হবে 'আমি অমুকের সাথে তোমাকে বিবাহ দিচ্ছি বা বিবাহ দিলাম বা বিবাহ দিয়েছি। তুমি রাজী আছ কি না?

* সাবালেগা অবিবাহিতা মেয়ের নিকট এযেন চাওয়ার পর সে (অসম্মতিসূচক কোন ভাব প্রকাশ না করে সম্মতিসূচক ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করে) চুপ থাকলে বা মুচকি হেসে দিলে বা (মা-বাপের বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার মনবেদনায়) চোখের পানি ছেড়ে দিলে তার এযেন আছে ধরা হবে। জবরদস্তী তার মুখ থেকে 'রাজী আছি' কথা বের করার চেষ্টা নিস্প্রয়োজন ও অন্যায়।

* মেয়ে পূর্বে থেকে ছেলেকে না চিনলে এবং তার সামনে ছেলের নাম/ধাম, পরিচয় সুস্পষ্টভাবে তুলে না ধরলে তার চুপ থাকাকে এযেন বা সম্মতি ধরা যাবে না।

* শরীয়ত অনুসারে যে ওলীর হক অগ্রগণ্য, তিনি বা তার প্রেরিত লোক ব্যতীত অন্য কেউ এযেন আনতে গেলেও সে ক্ষেত্রে মেয়ের চুপ থাকাটা এযেন বলে গণ্য হবে না। বরং সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট অনুমতির শব্দ উল্লেখ করলেই এযেন ধরা যাবে।

* যদি মেয়ে বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হয়, তাহলে তার চুপ থাকাটা এযেন বলে গণ্য হবে না বরং মুখ দিয়ে স্পষ্ট কথা (যেমন 'রাজী আছি') বলতে হবে।

* না বালেগা ছেলে/মেয়ের বিবাহ যদি বাপ দাদা করায়, তাহলে সে বিবাহ দোরস্ত আছে এবং বালেগা হওয়ার পর তাদের সে বিবাহ ভঙ্গ করার কোন ক্ষমতা থাকবে না। বাপ, দাদা ব্যতীত অন্য কেউ করালে যদি সমান ঘরে করায় এবং মহরও ঠিকমত হয়, তাহলে বর্তমানে তাদের বিবাহ দোরস্ত হয়ে যাবে, তবে বালেগ হওয়ার সময় মুসলমান হাকিমের আশ্রয় গ্রহণ করে তারা সে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারবে। আর বাপ, দাদা ব্যতীত অন্যরা নীচ ঘরে বা অনেক কম মহরে বিবাহ দিলে সে বিবাহ দোরস্ত হবে না।

বিবাহের দিন, সময় ও স্থান প্রসঙ্গ

* বিবাহ শাওয়াল মাসে এবং জুমুআর দিনে এবং মসজিদে সম্পন্ন করা উত্তম। এছাড়াও যে কোন মাসে, যে কোন দিনে, যে কোন সময়ে বিবাহ হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। অমুক অমুক দিন বিবাহ করা ঠিক

নয়—এ জাতীয় কথা কুসংস্কার এবং এগুলো হিন্দুয়ানী ধ্যান-ধারণা থেকে বিস্তার লাভ করেছে।

বিবাহে বরকত কীভাবে আসবে?

কীভাবে বিবাহে বরকত আসবে তা একটা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً - (البيهقي في شعب الايمان)

অর্থাৎ, ঐ বিবাহে বেশী বরকত হয় যে বিবাহে ব্যয় করা হয় কম।

উল্লেখ্য, এই কম ব্যয়ের মধ্যে মহর কম করাও অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সমাজ এখন যেভাবে চলছে তা হল লাখ লাখ টাকা মহর বাঁধা হয়, কিন্তু সেই মহর পরিশোধ করা হয় না। মহর ধার্য করার সময় সেটা পরিশোধ করার নিয়তও থাকে না। অথচ মহর পরিশোধ করা ওয়াজিব। অন্যান্য মানুষের ঋণ পরিশোধ করা যেমন জরুরী, স্ত্রীর মহর পরিশোধ করাও তেমন জরুরী। অথচ সমাজ এটাকে জরুরী মনে করছে না। শুধু নামের জন্য মোটা অংকের মহর ধার্য করা হচ্ছে, তারপর কোন দিন চিন্তাও করে দেখা হচ্ছে না কত টাকা মহর ধার্য ছিল, কত দেয়া হয়েছে আর বাকীটা দিতে হবে কি-না। কেউ যদি মহর না দিয়ে মারা যায়, তাহলে আরেক জন মানুষের ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেলে যে ক্ষতি হবে, এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ ক্ষতি হবে। অন্যান্য ঋণের মত মহরও একটা ঋণ। এটাও পরিশোধ করা জরুরী। যদি মানুষ এটাকে জরুরী মনে করত, তাহলে এত বড় অংকের মহর ধার্য করত না। আজকাল প্রায়ই এরকমও দেখা যায় যে, বড় অংকের মহর ধার্য করে মিথ্যা লিখে দেয়া হয় যে, এত টাকা উশুল বা অর্ধেক উশুল ইত্যাদি। এখানে এক দিকে বড় অংকের মহর ধার্য করে অপরাধ করল, আবার মিথ্যা লেখার অপরাধও করল। বিবাহতো একটা শরীয়তের অনুষ্ঠান, এটা শুধু মানুষের যৌন-ফূর্তি পূরণ করার ব্যবস্থা নয়। অতএব এখানে শুরুতেই যদি শরীয়ত লঙ্ঘন করা হয়, তাহলে ঐ বিবাহে বরকত আসবে কী করে?

শুধু মহরের ক্ষেত্রে মিথ্যা লেখার কারণে নয়। এছাড়াও বৈবাহিক জীবনে বরকত নষ্ট হওয়ার আরও অনেক কারণ রয়েছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে বহু রকম রছম ও গোনাহ করা হচ্ছে। মানুষ যেগুলোকে গোনাহই মনে করছে না। গান-বাদ্যের মত পাপতো রয়েছেই, তদুপরি বর্তমান যুগে বিবাহের অনুষ্ঠানে

আরও বহু রকম গোনাহ্ চালু হয়েছে, ফলে মানুষের জীবনের বরকত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ একটা নতুন জীবনের শুরু যেখান থেকে হচ্ছে, সেখান থেকেই পাপ ও গলত ঢুকে যাচ্ছে। হাজার রকম গলত ঢুকে যাচ্ছে। যেমন ধরুন, আজকাল বিবাহ অনুষ্ঠান হলেই সেটা ভিডিও করে রাখতে হবে— এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটাকে কোন গোনাহ্ই মনে করা হচ্ছে না। মনে রাখতে হবে একটা গোনাহ্ করা যতটুকু অপরাধ, সেই গোনাহকে গোনাহ্ মনে না করা তার চেয়ে বড় অপরাধ। কেউ যদি গোনাহ মনে করে গোনাহ করে, তাহলে একদিন না- একদিন সেই গোনাহ থেকে তওবা নছীব হতে পারে। কারণ তার ভিতর এই উপলব্ধি থেকে যাচ্ছে যে, আমি অপরাধ করেছি, আর এই অনুভূতি থেকেই তওবার মনোভাব আসে। কিন্তু গোনাহকে গোনাহই মনে করা না হলে কোন দিন তওবা নছীব হবে না। বিবাহের অনুষ্ঠানে মানুষকে খাওয়ানোর সময়ও ছবি তুলে রাখা হচ্ছে। সবাইকে গোনাহের ভিতরে শামিল করে দেয়া হচ্ছে। এভাবে বিবাহের অনুষ্ঠানে বহু রকম পাপ করা দ্বারা বিবাহের বরকত নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। নিম্নে বিবাহ অনুষ্ঠানের বিশেষ কয়েকটি রছম ও কুপ্রথার কথা উল্লেখ করা হল।

বিবাহ মজলিসের কয়েকটি রছম ও কুপ্রথা

* বিবাহের গেটে টাকা ধরা নাজায়েয।[১]

* বিবাহের আক্দ সম্পন্ন হওয়ার পর বর দাঁড়িয়ে হাযিরীনে মজলিসকে যে সালাম দিয়ে থাকে এবং বিবাহের পর বর গুরুজনদের সাথে যে মুসাফাহা করে থাকে এটা ভিত্তিহীন রছম ও বেদআত। এটা রছম ও কুসংস্কার —এটা পরিত্যাজ্য।[২]

* বিবাহের পর বধূর মুখ দেখানো রছম ও (পর পুরুষকে দেখানো) না জায়েয।[৩]

বাসর রাতের কতিপয় বিধান

* নববধূ মেহেদি ব্যবহার করবে, অলংকার এবং উত্তম পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হবে।

* পুরুষ বাসর ঘরে প্রবেশ করতঃ নববধূকে সহ দুই রাকআত শুকরানা নামায পড়বে।[৪]

১. فتاوی محمودیہ ج/۳ । ২. ایضا । ৩. ایضا । ৪. شرعۃ الاسلام ।

অতঃপর স্ত্রীর কপালের উপরিস্থিত চুল ধরে বিসমিল্লাহ বলে এই দুআ পাঠ করা সুন্নাত—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ۔(امداد الفتاوى ج-٢/)

উল্লেখ্য স্বামীর এসব সুন্নাত জানা না থাকলে স্ত্রী তাকে মোলায়েমভাবে বলে আমল করাবে।

ওলীমা বিষয়ক সুন্নাত ও নিয়মসমূহ

* বাসর ঘর হওয়ার পর (তিন দিনের মধ্যে) বা আক্দের সময় আপন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং গরীব মিসকীনদেরকে ওলীমা অর্থাৎ, বৌ-ভাত খাওয়ানো সুন্নাত। কেউ কেউ বাসর হওয়ার পর এবং আক্দের সময় উভয় সময়েই এরূপ আপ্যায়ন উত্তম বলেছেন।[১]

* ওলীমায় অতিরিক্ত ব্যয় করা কিংবা খুব উঁচু মানের খানার ব্যবস্থা করা জরুরী নয় বরং প্রত্যেকের সামর্থানুযায়ী খরচ করাই সুন্নাত আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

* যে ওলীমায় শুধু ধনী ও দুনিয়াদার লোকদের দাওয়াত করা হয় এবং দ্বীনদার ও গরীব-মিসকীনদের দাওয়াত করা হয় না, হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওলীমা। অতএব সব ওলীমায় দ্বীনদার ও গরীব মিসকীনদেরকেও দাওয়াত করা উচিত।

* আমাদের দেশে যে বরযাত্রী যাওয়ার নিয়ম চালু হয়েছে এবং কনের পরিবারের পক্ষ থেকে ভোজের ব্যবস্থা করার নিয়ম চালু হয়েছে, এটা শরীয়তসম্মত অনুষ্ঠান নয়—এটা রছম, অতএব তা পরিত্যাজ্য।

শোয়া এবং ঘুমের মাসায়েল

১. ইশার নামাযের পর গল্প-গুজব বা দুনিয়াবী কাজ-কর্ম কিংবা দুনিয়াবী কথা-বার্তায় লিপ্ত না হয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব ঘুমানোর প্রস্তুতি নেয়া সুন্নাত। এ সুন্নাত পালন করলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠা সহজ হয় কিংবা অন্ততঃ ফজরের নামাযের জন্য সহজেই ঘুম ভাঙ্গে। ইশার পর ঘুমানোর পূর্বে অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা মাকরূহ।

২. ঘুমানোর পূর্বে পেশাব-পায়খানার জরুরত থেকে ফারেগ হয়ে নেয়া উত্তম।

---

১. شرح مسلم ١١ /

৩. ঘুমানোর পূর্বে চেরাগ/বাতি ও আগুন নিভিয়ে দেয়া সুন্নাত। বিশেষ প্রয়োজন না হলে ডিম লাইটও জ্বালিয়ে ঘুমানো ঠিক নয়।[১]

৪. ঘুমানোর পূর্বে খাদ্য-খাবার ও পানির পাত্র ঢেকে দেয়া সুন্নাত। ঢাকার জন্য কোন কিছু না পেলে অন্ততঃ একটা লাঠি দিয়ে হলেও ঢেকে রাখবে।

৫. মেসওয়াক করে ঘুমানো সুন্নাত।

৬. উযূ অবস্থায় ঘুমানো সুন্নাত।

৭. উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগানো সুন্নাত।

৮. সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা (২১ পারা) তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

৯. সূরা মূলক তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

১০. আয়াতুল কুরছী পাঠ করা সুন্নাত।

১১. সূরা-বাকারার শেষ তিন আয়াত (اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত) পাঠ করা সুন্নাত।

১২. তাসবীহে ফাতেমী অর্থাৎ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বা ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া সুন্নাত।

১৩. কালিমায়ে তাইয়্যেবা পড়া সুন্নাত।

১৪. দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত।

১৫. তিনকুল (সূরা এখলাস, ফালাক ও নাছ) পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে বুলানো। এভাবে তিনবার করা সুন্নাত।

১৬. তিনবার এস্তেগফার পড়া এবং গোনাহ থেকে তওবা করা।

১৭. মুর্দারের মাথা কবরে যে দিকে রাখা হয় সে দিকে মাথা রেখে শোয়া (যেমন আমাদের দেশের জন্য উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শোয়া) সুন্নাত।

১৮. প্রথমে অন্ততঃ কিছুক্ষণ ডান হাত ডান গালের নীচে রেখে ডান কাতে শোয়া সুন্নাত। ডান হাত গালের নীচে রেখে এই দুআ পড়বে—

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى ـ(بخاری کتاب الدعوات)

১৯. এই দুআটিও পড়বে—

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ(شرعة الاسلام)

২০. সর্বশেষে এই দুআ পড়বে। তাহলে ঐ ঘুমে মৃত্যু হলে ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে—

---

১. گزرست ؛

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ۔ (بخارى كتاب الدعوات)

২১. উপুড় হয়ে শোয়া নিষেধ।[১]

২২. ঘুম থেকে উঠে হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় হালকাভাবে মর্দন করবে, যাতে ঘুমের প্রভাব কেটে যায়।

২৩. ঘুম থেকে উঠে তিনবার আল-হামদু লিল্লাহ এবং তিনবার কালিমায়ে তাইয়্যেবা পড়া সুন্নাত।

২৪. ঘুম থেকে উঠে এই দুআ পড়া সুন্নাত—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ۔

২৫. ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করা সুন্নাত। এবং উযূ করা উত্তম।

২৬. সুযোগ হলে দুপুরে খাওয়ার পর কায়লূলাহ করা অর্থাৎ, কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা সুন্নাত, ঘুম আসুক বা না আসুক।

স্বপ্ন বিষয়ক বিধি-নিষেধসমূহ

* কোন দুঃস্বপ্ন অর্থাৎ, অপছন্দনীয় বা ভয়-ভীতির খাব দেখলে ৫টি আমল করবে, তাহলে কোন ক্ষতি হবে না ইন্‌শাআল্লাহ।

১. স্বপ্ন দেখে চক্ষু খোলার সাথে সাথে তিনবার বাম দিকে থুতু ফেলবে।

২. তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا (আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম ওয়া শাররি হাযিহির রুইয়া) পড়বে।

৩. পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোবে।

৪. এই স্বপ্নের অপকারিতা থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দুআ পড়বে। তাহলে ইনশাআল্লাহ আর ক্ষতি হবে না।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الرُّؤْيَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا۔

৫. এই দুঃস্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করবে না।

---

১. تعليم الدين ‖

* কেউ স্বপ্ন বর্ণনা করলে ব্যাখ্যা ভাল মনে হলে তা-ই বলবে, নতুবা শ্রবণকারী ও ব্যাখ্যাদাতা উভয়েই বলবে خَيْرًا رَأَيْتَ وَخَيْرًا يَكُوْنُ অর্থাৎ, ভাল দেখেছেন, ভালই হবে।[১]

জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে মাসায়েল

জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচলিত ৩ টি ব্যবস্থা রয়েছে। যথাঃ

১. **স্থায়ী ব্যবস্থা** : যেমন পুরুষের জন্য ভ্যাসেকটমি ও মহিলাদের জন্য লাইগেশন। এ ব্যবস্থায় অপারেশনের মাধ্যমে পুরুষ বা নারীর সন্তান দেয়ার ও নেয়ার ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়।

২. **মেয়াদী ব্যবস্থা** : যেমন নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ইনজেকশন, নিরাপদকাল মেনে চলা এবং আই, ইউ, ডি (এক ধরনের প্লাষ্টিক কয়েল) ব্যবহার করা ইত্যাদি।

৩. **সাময়িক ব্যবস্থা** : যেমন কনডম ব্যবহার করা, জন্মনিরোধক পিল/বড়ি ব্যবহার করা ইত্যাদি।

* জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয় বরং হারাম, উদ্দেশ্য বা কারণ যা-ই হোক না কেন। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া একটা ক্ষমতা (প্রজনন ক্ষমতা)কে নষ্ট করে দেয়া হয় এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয়া হয়, যা সম্পূর্ণ হারাম।

* জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পদ্ধতি (মেয়াদী ব্যবস্থা) গ্রহণ করা মাকরূহ তাহরীমী। আর মাকরূহ তাহরীমী হারামের কাছাকাছি।

* জন্মনিয়ন্ত্রণের তৃতীয় পদ্ধতি (সাময়িক ব্যবস্থা) গ্রহণের পেছনে যদি উদ্দেশ্য এই থাকে যে, এতে করে পৃথিবীর লোক সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকবে, খাদ্যের সংকট হবে না, বাসস্থানের সংকট হবে না ইত্যাদি, তাহলে এটা ঈমান বিরোধী চেতনা থেকে হওয়ার কারণে জায়েয নয়। মনে রাখতে হবে—আল্লাহর পরিকল্পনা সকলের পরিকল্পনার চেয়ে উত্তম, তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ এমনভাবে জানেন যা কেউ জানে না, তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি জীবের রিযিকের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন। এমন নয় যে, এত লোক জন্ম নিচ্ছে যে ব্যাপারে আল্লাহর কোন পরিকল্পনা নেই, বা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করতে তিনি অক্ষম।

---

১ كتاب الاذكار ।

* আর জন্মনিয়ন্ত্রণের তৃতীয় পদ্ধতি যদি স্ত্রী বা সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে অভিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তারের পরামর্শক্রমে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা জায়েয।

* আর তৃতীয় পদ্ধতি যদি বিলাসিতার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় এই ভেবে যে, সন্তান কম হলে ঝামেলা কম হবে, ছিমছাম থাকা যাবে ইত্যাদি, তাহলে স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে তা গ্রহণ করা জায়েয, তবে এটা খেলাফে আওলা বা অনুত্তম, কেননা এটা ধর্মীয় চাহিদা বিরোধী। ধর্ম চায় রাসূলের উম্মত বৃদ্ধি পাক। রাসূলের উম্মত বৃদ্ধি পেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন এ নিয়ে গর্ব করবেন বলে হাদীছে উল্লেখ এসেছে।[1]

সহবাসের সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধসমূহ

১. সংগম শুরু করার পূর্বে নিয়ত সহীহ করে নেয়া; অর্থাৎ, এই নিয়ত করা যে, এই হালাল পন্থায় যৌন চাহিদা পূর্ণ করা দ্বারা হারামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, তৃপ্তি লাভ হবে এবং তার দ্বারা কষ্টসহিষ্ণু হওয়া যাবে, ছওয়াব হাছেল হবে এবং সন্তান লাভ হবে।
২. কোন শিশু বা পশুর সামনে সংগমে রত না হওয়া।
৩. পর্দাঘেরা স্থানে সংগম করা।
৪. সংগম শুরু করার পূর্বে শৃঙ্গার (চুম্বন, স্তন মর্দন ইত্যাদি) করবে।
৫. বীর্য, যৌনাঙ্গের রস ইত্যাদি মোছার জন্য এক টুকরা কাপড় রাখবে।
৬. বিসমিল্লাহ বলে কার্য শুরু করবে।
৭. সহবাস শুরু এবং শেষের দুআর জন্য দেখুন সপ্তম অধ্যায়।
৮. সংগম অবস্থায় বেশী কথা না বলা।[2]
৯. বীর্যপাতের পরই স্বামীর নেমে না যাওয়া বরং স্ত্রীর উপর অপেক্ষা করা, যেন স্ত্রীও তার খাহেশ পূর্ণ মাত্রায় মিটিয়ে নিতে পারে।[3]
১০. সংগম শেষে পেশাব করে নেয়া জরুরী।[4]
১১. সংগমের পর তখনই গোসল করে নেয়া উত্তম। অন্ততঃ উযূ করে নিবে।
১২. এক সংগমের পর পুনর্বার সংগমে লিপ্ত হতে চাইলে যৌনাঙ্গ এবং হাত ধুয়ে নিতে হবে।
১৩. সংগমের পর অন্ততঃ কিছুক্ষণ ঘুমানো উত্তম।

---

১. জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত উপরোক্ত মাসায়েল মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের ফতওয়া এবং দারুল উলূম দেওবন্দ-এর স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দামাত বারাকাতুহুম)-এর বয়ান থেকে গৃহীত। ॥ ২. شامی ॥ ৩. ترمذی شریف ॥ ৪. ترمذی شریف ॥

১৪.জুমুআর দিন সংগম করা মোস্তাহাব।
১৫.সংগমের বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করা নিষেধ।

গোসল ফরয থাকা অবস্থার বিশেষ বিধি-নিষেধসমূহ

* জানাবাত অবস্থায় নখ, কাটা বা নাভির নীচের ক্ষৌরকার্য করা মাকরূহ।[১]

* জানাবাত অবস্থায় মসজিদে গমন করা, কাবা শরীফ তাওয়াফ করা, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা বা তেলাওয়াত করা এবং নামায পড়া নিষেধ। তবে দুআ হিসেবে কোন আয়াত পড়তে পারে।

* জানাবাত অবস্থায় কালিমা, দুরূদ শরীফ, যিকির, এস্তেগফার বা কোন ওযীফা পাঠ করতে নিষেধ নেই।

* জানাবাত অবস্থায় কুলি করা ব্যতীত পানি পান করা মাকরূহ তানযীহী।

* জানাবাত অবস্থায় হাত ধোয়ার পূর্বে কিছু পানাহার করা মাকরূহ তানযীহী।[২]

তালাক দেয়ার মাসায়েল

* নিতান্ত অপারগতা ছাড়া তালাক দেয়া জুলুম ও অন্যায়।

* নিতান্ত ঠেকা ব্যতীত স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া মহাপাপ।

* কোন কল্যাণ ও প্রয়োজনে তালাক দেয়া মোবাহ বা জায়েয।

* স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য কষ্টদায়ক হয় বা স্ত্রী নামায সম্পূর্ণ পরিত্যাগ-কারিণী হয় বা স্বামীর অবাধ্য হয়, তাহলে সে স্ত্রীকে তালাক দেয়া মোস্তাহাব বা উত্তম। বোঝানো সত্ত্বেও যে স্ত্রী অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তাকেও তালাক দেয়া মোস্তাহাব।[৩]

* স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর হক আদায় করতে অক্ষমতা দেখা দিলে তালাক দেয়া ওয়াজিব। তবে স্ত্রী তার হক মাফ করে দিলে ওয়াজিব থাকে না।

* নিজের কানে শোনা যায় এতটুকু শব্দে তালাক দিলেই তালাক হয়ে যায়, স্ত্রীর বা অন্য কারোর শোনা যাওয়া জরুরী নয়।

* হাসি ঠাট্টা করে বা রাগের মুহূর্তে বা নেশা পান করে মাতাল অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়।

* তালাক দেয়ার ক্ষমতা স্বামী ব্যতীত অন্য কারও নেই। অবশ্য স্বামী কাউকে (স্ত্রীকে বা অন্য কাউকে) তালাক দেয়ার ক্ষমতা দিলে সে তালাক দিতে পারে।

---

১. عالمگیری ॥ ২. احسن الفتاوی ج/٢ ॥ ৩. احسن الفتاوی ج/٥ ॥

* হায়েয-নেফাসের অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয়ে যায়। তবে হায়েয-নেফাসের অবস্থায় তালাক দেয়া গোনাহ।

* এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়া হারাম ও গোনাহে কবীরা। তবে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলেও তিন তালাক হয়ে যাবে এবং স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় নিয়ম মাফিক অন্য স্বামীর ঘর হয়ে ঘুরে না আসলে আর তাকে বিবাহ করার কোন উপায় থাকবে না।

* কারও চাপ, জোর-জবরদস্তী বা হুমকির মুখে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে।

বি: দ্র: তালাকের বিভিন্ন শব্দ এবং তালাকের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। তালাকের শব্দ ও প্রকারের পার্থক্যের ভিত্তিতে হুকুমেরও পার্থক্য হয়ে থাকে। তাই তালাক সম্পর্কিত কোন ঘটনা ঘটলে মুফতী সাহেবদের থেকে সমাধান জেনে নিতে হবে।

ইদ্দতের মাসায়েল

স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে বা তার স্বামীর মৃত্যু হলে যে সময়ের জন্য উক্ত স্ত্রীকে এক বাড়ীতে থাকতে হয়, অন্যত্র যেতে পারে না বা অন্য কোথাও বিবাহ বসতে পারে না তাকে ইদ্দত বলে। ইদ্দতের মাসায়েল নিম্নরূপ :

* স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে তালাকের তারিখের পর পূর্ণ তিন হায়েয অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্ত্রীর পক্ষে অন্যত্র বিবাহ বসা হারাম।

* উক্ত স্ত্রীর বয়স কম হওয়ার কারণে বা বৃদ্ধা হওয়ার কারণে হায়েয না আসলে তিন হায়েযের পরিবর্তে পূর্ণ তিন মাস উপরোক্ত নিয়মে ইদ্দত পালন করতে হবে।

* উক্ত ইদ্দতের সময়ে তাকে স্বামীর বাড়ীতেই নির্জন বাসস্থানে থাকতে হবে।

* গর্ভাবস্থায় তালাক হলে সন্তান প্রসব হওয়া মাত্রই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে, চাই যত তাড়াতাড়িই প্রসব হোক না কেন।

* হায়েযের অবস্থায় তালাক হলে সে হায়েযকে ইদ্দতের মধ্যে ধরা যাবে না। সে হায়েয বাদ দিয়ে পরবর্তী পূর্ণ তিন হায়েয ইদ্দত পালন করতে হবে।

* যদি কোন স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস বা নির্জনবাস হওয়ার পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাকে ইদ্দত পালন করতে হয় না।

* তালাকে বায়েন হলে ইদ্দত পালন করার সময় (পূর্ব) স্বামী থেকে সতর্কতার সাথে পূর্ণ মাত্রায় পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। তবে স্বামী কর্তৃক

অবৈধভাবে আক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকলে সেখান থেকে সরে অন্যত্র গিয়ে ইদ্দত পালন করাই সমীচীন হবে।[১]

* কোন বিবাহ যদি অবৈধ হয় এবং সহবাসও হয়, তাহলে ঐ পুরুষ যখন তাকে পরিত্যাগ করবে তখন থেকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

* যে স্ত্রীর স্বামী মারা যায়, তার ইদ্দত হল চার মাস দশ দিন। আর গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত।

* স্বামীর মৃত্যু হলে মৃত্যুকালে স্ত্রী যে বাড়ীতে ছিল ,ইদ্দত পালন করার সময় দিবারাত্রি সে বাড়ীতেই থাকতে হবে, অবশ্য গরীব হলে এবং বাইরে গিয়ে কাজকর্ম ব্যতিরেকে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা না থাকলে দিনের বেলায় কাজের জন্য বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু রাতের বেলায় সে বাড়ীতেই থাকতে হবে। বাড়ীতে নিজেদের একাধিক ঘর বা একাধিক কামরা থাকলে যে কোন ঘর বা যে কোন কামরায় থাকতে পারবে। নির্দিষ্ট একটি স্থানেই আবদ্ধ থাকা জরুরী নয়। বাড়ির বারান্দা বা উঠানেও বের হতে পারবে।

* স্বামীর মৃত্যু চাঁদের প্রথম তারিখে হলে চাঁদের হিসেবে চার মাস দশ দিন ধরা হবে। আর চাঁদের প্রথম তারিখ ছাড়া অন্য যে কোন তারিখে মৃত্যু হলে ৩০ দিনের চার মাস এবং তারপর ১০ দিন অর্থাৎ, ১৩০ দিন ইদ্দত পালন করবে। স্ত্রী গর্ভবতী না হলে বা এমন হলে যার ঋতু আসা বন্ধ হয়েছে যদি তাকে তালাক দেয়া হয়, তাহলে চাঁদের ১ম তারিখে তালাক হলে চাঁদের হিসেবে তিন মাস আর অন্য তারিখে তালাক হলে ৩০ দিনের তিন মাস অর্থাৎ, ৯০ দিন ইদ্দত ধরা হবে।

মনে রাখতে হবে ইদ্দতের ক্ষেত্রে হিসাব হবে চান্দ্র মাসের। অনেকে ইংরেজী মাস বা বাংলা মাস হিসেবে ইদ্দতের হিসাব করে থাকেন এটা ভুল।

* স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেতে দেরী হলে সংবাদ পাওয়ার পূর্বে যে সময় অতিবাহিত হয়েছে সেটাও ইদ্দতের ভিতর অতিবাহিত হয়েছে ধরা হবে, আর ইদ্দতের পূর্ণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সংবাদ পেলে আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না—তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে ধরা হবে।

* স্বামীর মৃত্যু হলে বা তালাকে বায়েন হলে স্ত্রীকে শোক পালন করতে হয়। নিম্নে শোক পালন করার মাসআলা বর্ণনা করা হল :

১. احسن الفتاوی ج/٥ ॥

স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালনের মাসায়েল

* স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী "ইদ্দত" পালন করবে। তার গর্ভ থাকলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত, অন্যথায় চার মাস দশ দিন পর্যন্ত এই ইদ্দত পালন করবে।

* ইদ্দত পালনকালে সাজ-সজ্জা এবং রূপচর্চা থেকে বিরত থেকে শোক পালন করতে হবে।

* স্বামীর মৃত্যুর সময় সে যে ঘরে বসবাস করত সেখানেই থাকবে, সেখান থেকে বের হবে না। ভাড়ার বাসা হলে ভাড়া দেয়ার ক্ষমতা থাকলে সেখানেই থাকবে। তবে নিরাপত্তার অভাব হলে নিকটতম স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে ইদ্দত পালন করবে।

* ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে সে কারও সঙ্গে বিবাহ বসতে পারবে না। ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ বসতে পারবে।

পরিবারে সুখ-শান্তি ও মিলেমিশে থাকার নীতি

পরিবারে বিভিন্ন কারণে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এসব কারণগুলো শুরু থেকেই যদি এড়িয়ে চলা যায়, তাহলে একটা সুখী ও আনন্দময় পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব এবং সেই সুখ ও আনন্দকে ধরে রাখা সম্ভব। সাধারণতঃ যে সব কারণে পরিবারে অশান্তি দেখা দিয়ে থাকে নিম্নে সেগুলো প্রতিকার ব্যবস্থাসহ উল্লেখ করা হল।

(১) শ্বশুর-শাশুড়ী ও পুত্র-বধূর মাঝে সুসম্পর্ক না থাকা

সাধারণতঃ শ্বশুর-শাশুড়ী পুত্রের উপর অধিকার থাকার সুবাদে পুত্রবধূর উপরও কর্তৃত্ব করতে চায় এবং পুত্রের ন্যায় পুত্রবধূকেও বাধ্যগত পেতে এবং রাখতে চায়। তারা পুত্র থেকে যে রকম আনুগত্য ও খেদমত হকদার পুত্রবধূ থেকেও সে রকম পেতে চায়। এর ফলে পুত্রবধূর সাথে কর্তৃত্ব সুলভ আচরণ ও ক্ষেত্রবিশেষে বাদীসুলভ ব্যবহারও করে থাকে। অনেক সময় পুত্রবধূ প্রফুল্ল চিত্তে না চাইলেও জবরদস্তী তার থেকে শ্বশুর-শাশুড়ী কাজ ও খেদমত নিয়ে থাকেন এবং জবরদস্তী পুত্রবধূকে একান্নভুক্ত রাখা হয়। এসব কারণে পুত্রবধূর স্বাধীন চেতনা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কখনও কখনও সে আত্মমর্যাদায় আঘাতবোধ করে এবং এ সংসারকে সে আপন বলে মেনে নিতে পারে না, ফলে শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে শুরু হয় তার সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং তখনই পুত্রবধূ তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়। পুত্রবধূর আপনজন ও আত্মীয়-

স্বজনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের আতিথেয়তা ও আপ্যায়নকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণেও অনেক সময় শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি পুত্রবধূ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

এর প্রতিকারের জন্য মনে রাখা দরকার যে, শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা মৌলিকভাবে পুত্রবধূর দায়িত্ব নয়, যদি সে করে, তাহলে সেটা তার অনুগ্রহ। এটা তার দায়িত্ব নয়। বরং এ খেদমতের দায়িত্ব তাদের পুত্রের উপর বর্তায়। পুত্রের পক্ষ থেকে তার বধূ যদি সে খেদমতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়, তাহলে সেটা তার অনুগ্রহ। শ্বশুর-শাশুড়ী যদি পুত্রবধূর খেদমতকে এ দৃষ্টিভঙ্গীতে মূল্যায়ন করেন, তাহলে পুত্রবধূর প্রতি তারা প্রীত হবেন এবং তার প্রতি তাদের বাদীসুলভ মনোভাব সৃষ্টি হবে না এবং সংসারে অশান্তি দেখা দেয়া থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

তবে পুত্রবধূকেও মনে রাখতে হবে সে শুধু আইন দেখাতে চাইবে না। আইন দেখিয়ে পরিবারে শান্তি আনা যায় না। বরং আখলাক-চরিত্রের মাধ্যমে এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমতের মাধ্যমে পরিবারে শান্তি আনার চেষ্টা করবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা আইনতঃ দায়িত্ব না হলেও নৈতিক দায়িত্ব।

(২) যৌথ পরিবার থাকা

অনেক সময় একান্নভুক্ত পরিবার থাকার কারণেও সংসারের শান্তি বিনষ্ট হয়। বিশেষভাবে যদি স্ত্রীর জন্য থাকার ঘরও পৃথক করে দেয়া না হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক নারীই এ কামনা করবে যে, স্বামীকে নিয়ে সে স্বাধীনভাবে নিজের মত করে একটা সংসার গড়ে তুলবে, তার থাকার জন্য একটা ভিন্ন ঘর থাকবে, যেখানে সে তার মাল-সামান সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে পারবে, যেখানে সে স্বাধীনভাবে স্বামীর সাথে বিনোদন করতে পারবে। যৌথ পরিবার ও একান্নভুক্ত সংসার অনেক ক্ষেত্রেই এ কামনায় বাধা সৃষ্টি করে। ফলে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ, দেবর প্রমুখদের সাথে পুত্রবধূর বনিবনা হয়ে ওঠে না। এর থেকেই পরিবারে অশান্তি দেখা দিতে থাকে।

অনেক পিতা-মাতাই মনে করে থাকেন তাদের পুত্রের ভিন্ন সংসার গড়ে উঠলে তারা অবহেলিত হবেন, তারা বঞ্চিত হবেন। কিন্তু পুত্রকে যদি তারা যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে পুত্রের সংসার ভিন্ন হলেও পুত্র তাদের অধিকার ও খেদমতে ত্রুটি করবে না— এটাও বাস্তব সত্য। তদুপরি জোর-জবরদস্তী কিছুদিন একান্নভুক্ত রাখা হলেও চরম মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ার পর এক সময়তো পৃথক হতেই হবে, সেই পৃথক হওয়াটা আগে ভাগে

করে ফেললেইতো ভাল। মনে রাখা দরকার—যৌথ পরিবার সাময়িক বিচারে ভাল হলেও স্থায়ী সুসম্পর্কটা বড় কথা। তদুপরি স্ত্রীর অধিকার আছে পৃথক হয়ে যেতে চাওয়ার, অন্ততঃ একটা থাকার ভিন্ন ঘর পাওয়া স্ত্রীর অধিকার। এ সম্পর্কে "স্ত্রীর হক" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (দেখুন ৩২৪ পৃষ্ঠা) হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলতেন : এই চুলার আগুন থেকেই সংসারের শান্তিতে আগুন লাগে। অতএব এই যুগে শুরু থেকেই চুলা পৃথক করে দেয়া সমীচীন। তবে স্ত্রীরও মনে রাখা দরকার বিনা প্রয়োজনে স্বামীকে তার মাতা-পিতা ও ভাই-বোন থেকে পৃথক করে নিয়ে তাদের মনে কষ্ট দেয়া উচিত নয়।

(৩) আয়-ব্যয়ের মাঝে ভারসাম্য থাকা

প্রত্যেক মানুষেরই উচিত তার আয় অনুযায়ী ব্যয় করা। অনেকেই সংসার জীবনের প্রথম দিকে আবেগের বশবর্তী হয়ে সাধ্যের বাইরেও অনেক বেশী ব্যয় করে থাকে। সব ক্ষেত্রেই সে তার স্ট্যান্ডার্ড ছাড়িয়ে চলে যায়। এভাবে চলতে চলতে এক সময় গৃহকর্তা ঋণী হয়ে পড়ে কিংবা এভাবে চলা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন পূর্বের স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার জন্য তাকে অবৈধ আয়ের পথে পা বাড়াতে হয় কিংবা স্ত্রী-পুত্র পরিজনের কাছে হেয় হতে হয়, তাদের মন রক্ষা করা সম্ভব হয় না, ফলে মানসিক শান্তি বিনষ্ট হয়। কুরআনে একদিকে যেমন কার্পণ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে, অপর দিকে এত বেশী হাত খোলা হতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে হয় এবং হেয় হতে হয়। সুতরাং আয় ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলা উচিত।[১]

(৪) স্ত্রীর সংসার চালাতে না জানা

কোন গাড়ীর আরোহীগণ যদি গাড়ীর চালককে সহযোগিতা না করে, তাহলে চালক সে গাড়ী নির্বিঘ্নে চালাতে সক্ষম হয় না। তদ্রূপ সংসার জীবনে পুরুষ হল গাড়ী চালকের ন্যায় আর স্ত্রী হল সে গাড়ীর আরোহী এবং কিছুটা সে চালকও বটে। তাই স্ত্রীকেও সংসার চালানো শিখতে হবে, যাতে পুরুষের আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে সংসার পরিচালনায় সে সহযোগিতা করতে পারে এবং যাতে স্বামীর আয়ের সাথে সঙ্গতিহীনভাবে সংসার চালিয়ে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় না ফেলে।

---

১. ماخوذ از معارف القرآن و اسلام کا اقتصادی نظام ؛

(৫) স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সন্দেহ

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের চরিত্রের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়লে এ থেকে সংসারে চরম অশান্তি দেখা দিতে পারে। এর থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রথমতঃ উভয়কেই মনে রাখতে হবে যে, দলীল-প্রমাণ ছাড়া কারও ব্যাপারে কু-ধারণা করা অন্যায় এবং পাপ। অতএব দলীল-প্রমাণ ছাড়া নিছক সন্দেহ হয়ে থাকলে মন থেকে সে সন্দেহ ঝেড়ে ফেলতে হবে। যদি মন থেকে সন্দেহ না যায় তাহলে, যে কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় সে কারণ উল্লেখ করে তাকে স্পষ্ট বলতে হবে যে, এ কারণে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে— তুমি এ থেকে বিরত হও। আর বিরত হতে না পারলে আমার জন্য দুআ কর, যেন আমার মন থেকে এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং নিজেও মন থেকে কু-ধারণা দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করতে থাকবে। এভাবে ইনশাআল্লাহ মন পরিষ্কার হয়ে যাবে। অন্যথায় মনে মনে সন্দেহ, ক্ষোভ চাপা রাখলে সেটা খারাপ পরিণতি ডেকে আনতে থাকবে।

আর বাস্তবিকই যদি দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় যে, স্বামীর চরিত্র নষ্ট হচ্ছে, তাহলে স্ত্রী যেহেতু জোরপূর্বক স্বামীকে কোন কিছু মানাতে বাধ্য করতে পারবে না এবং এজন্য বকাঝকা করলে স্বামীর জিদ বেড়ে গিয়ে আরও হিতে বিপরীত হতে পারে, তাই স্ত্রীর তখন করণীয় হল :

(এক) স্বামীর মতি ভাল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবে।

(দুই) যখন স্বামী নির্জনে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠমুহূর্তে থাকবে এবং ঠাণ্ডা মাথায় থাকবে তখন খুব নরম ভাষায় তাকে বুঝাতে থাকবে। এবং স্বামীকে শরীয়ত মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকবে। বিশেষতঃ পর্দাহীনভাবে গায়ের মাহরাম মহিলাদের সাথে উঠা-বসার কারণেই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই স্বামীকে শরীয়ত মোতাবেক চলতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং নিজেও সে অনুযায়ী চলবে। তাহলে কোন পক্ষেরই অন্য পক্ষের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারবে না।

(তিন) স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য আগের চেয়ে বেশী নিজেকে নিবেদিত করবে। এভাবে হয়ত স্বামীর সংশোধন হয়ে যেতে পারে। এ না করে স্ত্রী যদি এরূপ মুহূর্তে স্বামীকে জব্দ করতে চায়, প্রকাশ্যে হেয় করতে চায় এবং স্বামীর মনোরঞ্জনে পূর্বের চেয়ে পিছিয়ে থাকে, তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।

(৬) একাধিক বিবাহ

ইসলাম বিভিন্ন প্রয়োজনের ভিত্তিতে একাধিক বিবাহ (এক সঙ্গে সর্বোচ্চ চারজন) পুরুষের জন্য জায়েয রেখেছে। তবে শর্ত হল পুরুষ তার সকল স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখবে। স্বামী আরও স্ত্রী ঘরে আনুক, আরও একটা বিবাহ করুক সাধারণভাবে স্ত্রী তা মেনে নিতে চায় না এবং এ জন্য মনোমালিন্য ও সংসারে অশান্তি লেগে যায়। এ অশান্তির প্রতিকারের জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই কিছু করণীয় রয়েছে। স্বামীর করণীয় হল—যদি একান্তই তাকে আবার বিবাহ করতে হয়, তাহলে যে কারণে আগের স্ত্রী পরবর্তী বিবাহকে মেনে নিতে পারছে না অর্থাৎ, সে আশঙ্কা করছে যে, অন্য স্ত্রীকেই বেশী আদর-সোহাগ করা হবে এবং তার আদর-সোহাগ কমে যাবে, তার সন্তানাদি অবহেলিত হবে ইত্যাদি— স্বামীর কর্তব্য কার্যতভাবে এ আশঙ্কাকে দূর করা অর্থাৎ, সে সকল স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণভাবে সমতা রক্ষা করবে, সকলকেই এক দৃষ্টিতে দেখবে, সকলের সাথে এক রকম আদর সোহাগের আচরণ করবে, তাহলে আস্তে-আস্তে পূর্বের স্ত্রী স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আর স্ত্রীর কর্তব্য হল প্রথমতঃ সে মনকে বুঝাবে যে, পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ করা যখন জায়েয, তখন আমার সেটা মেনে নিতে বাধা কোথায়। দ্বিতীয়তঃ সে জিদ ধরে স্বামীর খেদমত ও মনোরঞ্জনে ত্রুটি করবে না; তাহলে এই অবসরে পরবর্তী স্ত্রীর দিকে স্বামী বেশী ঝুঁকে পড়বে বরং তার জন্য উচিত হল স্বামীকে আরও বেশী আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা, যাতে স্বামীকে ভারসাম্যের পর্যায়ে রাখা যায়। তৃতীয়তঃ সতীনকে প্রকাশ্যে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া। যদি সতীনের সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতার আচরণ করা হয়, তাহলে সেও তাকে শত্রু ভাববে। এভাবে শুরু থেকেই অমিল লেগে গেলে ভবিষ্যতে তাকে আপন করে নেয়া কঠিন হবে। মনে রাখতে হবে— নতুন সতীনকে আপন করে নিতে না পারলে সংসারে যে অশান্তি আসবে, সে অশান্তি শুধু নতুন সতীনই ভোগ করবে না, পুরাতনকেও ভোগ করতে হবে। তাই জিদ ধরা নয় বরং বুদ্ধিমত্তা হল শুরু থেকেই সতীনকে আপন করে নিয়ে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করা। আর নতুন স্ত্রীকেও মনে রাখতে হবে যে, তার স্বামীর পুরাতন স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে, যেমন তার অধিকার রয়েছে। অতএব পুরাতন স্ত্রী থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের কুক্ষিগত রাখার প্রচেষ্টা অত্যন্ত অন্যায়। নতুন স্ত্রী যদি স্বামীকে সব স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে,

তাহলে এক দিকে স্বামী অন্যায় থেকে রক্ষা পাবে অপর দিকে আগের স্ত্রীও তাহলে নতুনের প্রতি মুগ্ধ হবে এবং সর্বোপরি সংসারের শান্তি রক্ষা হবে।

(৭) তালাক সম্পর্কিত কুসংস্কার

তালাক দেয়া বা না দেয়া উভয় ক্ষেত্রেই সমাজে বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা রয়েছে। কিন্তু লোকেরা কথায় কথায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, নিতান্ত ঠেকা ছাড়াই সামান্য সামান্য কারণে রাগের মাথায় তালাক দিয়ে দেয় এবং তিন তালাক দিয়ে বসে, যাতে করে পরে হুঁশ ফিরে এলেও আর স্ত্রীকে রাখা তার জন্য জায়েয থাকে না। তখন সে নানানভাবে পারিবারিক অশান্তিতে পড়ে যায়। স্বামীকে মনে রাখতে হবে অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া বা নিতান্ত ঠেকা ব্যতীত তালাক দেয়া স্ত্রীর প্রতি যুলুম এবং অন্যায়। আর কখনও তালাক দিতে হলেও এক তালাক দেয়া সমীচীন, যাতে পরে সম্বিত ও হুঁশ ফিরে এলে প্রয়োজনবোধে আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়। সারকথা— রাগের মাথায় তালাক দেয়া পরিবারে অশান্তি ডেকে আনতে পারে। তাই সর্বদা স্ত্রীর খেয়াল রাখা উচিত যেন স্বামীর মধ্যে এ রকম রাগ সৃষ্টি হতে না পারে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রীর করণীয়

কোন কারণে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হয়ে যায় তখন স্বামীর রাগকে প্রশমিত করার জন্য এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্ত্রীর চারটা কাজ করণীয়। যথা :

১. স্ত্রীকে মনে করতে হবে যে, সে স্বামীর অধীনস্থ ও স্বামীর কর্তৃত্বাধীন এবং এই অধীনস্থ ও কর্তৃত্বাধীন থাকার মধ্যেই সাংসারিক ও পারিবারিক কল্যাণ ও শৃঙ্খলা নিহিত। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ীও এরকমই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব স্বামীর রাগ সাময়িকভাবে তাকে সহ্য করে নিতে হবে, তার পক্ষেও উল্টা স্বামীর প্রতি রাগান্বিত হওয়াটা সমীচীন হবে না।

২. স্বামী যদি রাগান্বিত হয় আর প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর কোন অন্যায় নাও থাকে, তবুও সেই মুহূর্তে স্ত্রীর চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়—স্বামীর সাথে তর্ক জুড়ে দেয়া ঠিক নয়। কেননা তর্ক শুরু করলে স্বামীর রাগ আরও বেড়ে যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে; যেমন মারধরের দিকে যেতে পারে বা খোদা নাখাস্তা তালাকের দিকেও যেতে পারে। রাগের মুহূর্তেই এসব ঘটে থাকে। অতএব স্বামীর রাগ বৃদ্ধি না করে তা প্রশমিত করা উচিত। স্ত্রীর যদি কোন অন্যায় না থাকে আর সে স্বামীর রাগের

মুহূর্তেও চুপ থাকে—কথা কাটাকাটি না করে, তাহলে পরে যখন স্বামীর রাগ ঠাণ্ডা হবে, তখন সে নিজের অন্যায় রাগের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং অন্যায় রাগ সত্ত্বেও স্ত্রীর ধৈর্য এবং মোলায়েম ব্যবহারের কারণে স্ত্রীর প্রতি মুগ্ধ হবে, তার অনুগত হয়ে পড়বে; আর ভবিষ্যতে রাগ করতে গেলেও ভেবে-চিন্তে রাগ করবে।

৩. স্বামীর রাগের পেছনে স্ত্রীর অন্যায় থাকুক বা না থাকুক স্ত্রীর উচিত খোশামোদ-তোশামোদ করে হলেও স্বামীর রাগ ভাঙ্গানো। স্ত্রীর যদি অন্যায় থাকে তাহলে তো তার জিদ ধরা চরম অন্যায় হবে বরং সে মুহূর্তে তার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত। যদি তার অন্যায় নাও থাকে, তবুও সে জিদ ধরলে হয়তোবা স্বামীকে নত করা সম্ভব হবে না। তাহলে তার সামান্য জিদের কারণে পরিণতি খারাপ হয়ে পড়তে পারে। স্ত্রীর একথা মনে করা উচিত নয় যে, আমার অন্যায় নেই, অতএব খোশামোদ করতে যাওয়া আমার জন্য অপমানজনক। বরং এই খোশামোদের ফলে স্বামীকে স্বাভাবিক করতে পারলে পরে স্বামীর হুঁশ ফিরে আসার পর সে উক্ত স্ত্রীর প্রতি মুগ্ধ এবং তার অনুগত হয়ে যাবে। এভাবেই স্ত্রীর মান বেড়ে যাবে।

৪. চুপ থেকে, তর্ক না করে, খোশামোদ-তোশামোদ করেও যদি স্বামীর রাগ ভাঙ্গানো না যায়, তাহলে নির্জনে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে তার কাছে সত্যিকার অবস্থা তুলে ধরবে এবং নিজের অন্যায় থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিবে। ইনশাআল্লাহ স্বামীর রাগ প্রশমিত হবে।

স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে স্ত্রী কী করবে?

স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে মন থেকে সে অপছন্দ লাগাকে দূর করার জন্য স্ত্রীকে নিম্নের বিষয়গুলো চিন্তা করতে হবে।

১. তার অন্যান্য গুণাবলীর কথা চিন্তা করতে হবে এবং এভাবে তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

২. এই চিন্তা করতে হবে যে, এ সব দোষ দেখেও যদি সবর করা হয়, তাহলে ছওয়াব হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। অতএব আল্লাহ আমাকে এ স্বামী দান করে আমার প্রতি অনুগ্রহই করেছেন—আমার ছওয়াব লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছেন।

৩. নিজের কিছু দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করে ভাববে যে, আমার এসব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তো স্বামী আমাকে ভালবেসে যাচ্ছে, সে সবর করে যাচ্ছে,

তাহলে আমি কেন তার দোষ-ত্রুটি দেখে সবর করতে পারব না, আমি কেন এসব সত্ত্বেও তাকে ভালবাসতে পারব না? এরূপ চিন্তা করলে স্বামীর দোষ-ত্রুটিকে মেনে নেয়া সহজ বোধ হবে।

স্বামীকে বশীভূত করার পদ্ধতি ও মাসায়েল

* স্বামীকে বশীভূত করার অর্থ যদি এই হয় যে, স্বামী স্ত্রীর বাধ্যগত হয়ে থাকবে, তার কথায় স্বামী উঠা-বসা করবে এবং স্ত্রী স্বামীর নাকে রশি লাগিয়ে ঘুরাতে পারবে, এরকম বশীভূত করতে চাওয়া ঠিক নয়। এরকম বশীভূত করার জন্য কোন তাবীজ-তুমার করাও হারাম। কেননা, এটা শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। শরীয়ত চায় স্ত্রী স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত থাকবে। তবে হ্যাঁ, স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাকে যথাযথ ভাল না বাসে, তার হক আদায়ে ত্রুটি করে, তাহলে তাকে বশীভূত করতে চাওয়া এই অর্থে যে, সে যেন স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়, স্ত্রীকে যেন যথার্থ ভালবাসে, তার হকসমূহ যেন আদায় করে, এরূপ বশীভূত করতে চাওয়া অন্যায় নয়।

স্বামীকে এরূপ বশীভূত করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল স্ত্রী স্বামীর সাথে খোশামোদ-তোশামোদ করে চলবে, স্বামীর কল্যাণ ও স্বামীর খেদমতের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদিত করে দিবে।

একথা মনে রাখা দরকার যে, জোরপূর্বক স্বামীকে বশীভূত করা যায় না। কোন স্ত্রী জোর-জবরদস্তী করে, রাগারাগি করে, জিদ ধরে, তর্কাতর্কি করে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে স্বামীকে স্থায়ীভাবে বশীভূত করতে পারে না। একমাত্র খোশামোদ-তোশামোদ করেই স্বামীকে অনুগত করা যায়। অনেক মহিলা স্বামীর সাথে রাগারাগি করে, জিদ ধরে, তর্কাতর্কি করে, ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে স্বামীকে নিজের কথা মানতে বাধ্য করে, এমতাবস্থায় স্বামী মনে করে যে, তার কথা না মানলে ফ্যাসাদ হবে, মানুষে জানাজানি হয়ে সমাজে অসম্মান হবে, বা রাগারাগি হয়ে শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়িও হয়ে যেতে পারে, এই মনে করে স্বামী স্ত্রীকে সহ্য করে যায়, তার কথামত কাজ করতে থাকে, আর স্ত্রী মনে করে যে, সে বিজয়ী হয়ে গেছে, তার কথাই উপরে থেকেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এভাবে স্ত্রী স্বামীর ভালবাসা লাভ করতে পারবে না। বরং স্বামী মনে মনে ঐ স্ত্রীকে ঘৃণা করতে থাকে, কিন্তু সামাজিক লজ্জার ভয়ে কিছু বলতে পারে না। মনের ভালবাসা এক জিনিস আর সামাজিক লজ্জার ভয়ে কিংবা ঘর ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে স্বামী তার কথা মেনে নিল এটা আর এক জিনিস।

তবে হ্যাঁ, উপরোক্ত পন্থায়ও যদি স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, তখন স্বামীর মতি-গতি ভাল করার ও স্ত্রীর প্রতি তাকে মেহেরবান করার উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীছের যে কোন ঝাড়-ফুঁক বা তাবীজ ব্যবহার করলে করতে পারে। যেমন নিম্নোক্ত আয়াত পাঠপূর্বক কোন মিষ্টান্ন দ্রব্যে দম করে স্বামীকে খাওয়ানো হলে ইনশাআল্লাহ স্বামী স্ত্রীর প্রতি মেহেরবান হয়ে যাবে। তবে মনে রাখা দরকার আল্লাহর ইচ্ছা না হলে এরূপ তদবীরে কাজ নাও হতে পারে। তাই তদবীরে কাজ না হলে কুরআন-হাদীছের প্রতি ভক্তি নষ্ট করা যাবে না।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۭ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ۝ (সূরা বাকারা : ১৬৫)

উল্লেখ্য যে, অবৈধ স্থানে এই তদবীর প্রয়োগ করলে কোন আছর হবে না। এবং সেরূপ তদবীর করা জায়েযও নয়।[১]

শ্বশুর বাড়ীতে বসবাস ও সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার নীতি

শ্বশুর বাড়ীতে বসবাসের কতিপয় আদব ও নীতি রয়েছে, যা মেনে চললে শ্বশুর বাড়ীতে সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা যায় এবং সকলের কাছে প্রিয় হওয়া যায়। এ নীতিগুলো অমান্য করলেই বিবাদ ও ঝগড়া কলহের সূত্রপাত ঘটে এবং অশান্তি সৃষ্টি হয়। নীতিগুলো নিম্নরূপ :

১. স্বামীর হক যথাযথভাবে আদায় করা। স্বামীর হক সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. যত দিন শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকবেন তাদের খেদমত ও আনুগত্যকে জরুরী বলে জানবে এবং সেমতে তাদের খেদমত ও আনুগত্য করবে। তাদের সাথে কথা-বার্তা ও উঠা-বসায় আদব-সম্মানের প্রতি খুব লক্ষ রাখবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা আইনত কর্তব্য না হলেও নৈতিক দায়িত্ব। আর মনে রাখতে হবে আইনের অধিকার দেখাতে গেলে সংসারে শান্তি আসে না। সংসারে শান্তি আসে নৈতিক ব্যবহার এবং উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে।

---

১. تعویذات থেকে গৃহীত।

৩. শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ প্রমুখের থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভিন্ন সংসার গড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে না। অনেক মেয়ে বিবাহের শুরু থেকেই ছুতানাতা অজুহাত বের করে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ প্রমুখের থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভিন্ন সংসার গড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। যদিও স্ত্রীর অধিকার রয়েছে ভিন্ন হতে চাওয়ার, কিন্তু সে এরূপ দাবি করলে, এর জন্য পীড়াপীড়ি করলে শ্বশুর-শাশুড়ী যখন জানবে, তখন তারা এই ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে যে, পুত্রবধূ আমাদের পুত্রকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এখান থেকেই ফ্যাসাদের সূত্রপাত ঘটবে। ফ্যাসাদ ঘটানো কোন কৃতিত্বের কাজ নয়। বরং পরস্পরে মিলেমিশে থাকতে পারার মধ্যেই কৃতিত্ব।

৪. শ্বশুর বাড়ীর কোন দোষ-ত্রুটি মা-বাপের কাছে বলবে না বা শ্বশুরালয়ের কারও সম্পর্কে কোন গীবত-শেকায়েত বাপের বাড়ীতে করবে না। এ থেকেই ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষের মন খারাপ হয়ে নানান জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অনেক মহিলা স্বামীর কাছে শ্বশুর-শাশুড়ীর দোষ বলে তার কান-ভারী করতে থাকে, এভাবে মাতা-পিতা থেকে তার স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল গ্রহণ করে থাকে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা অপরাধ এবং গোনাহের কাজ।

৫. শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকা অবস্থায় যদি একান্নভুক্ত সংসার হয়, তাহলে স্বামী সংসার চালানোর টাকা-পয়সা স্ত্রীর হাতে দিতে চাইলে সে স্বামীকে বলবে শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে দেয়ার জন্য; যাতে শ্বশুর-শাশুড়ীর মন পরিষ্কার থাকে এবং তারা এই ভাবতে না পারে যে, পুত্রবধূ আমাদের পুত্রকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে।

৬. শ্বশুর বাড়ীর বড়দেরকে আদব এবং ছোটদেরকে স্নেহ করবে।

৭. শাশুড়ী, ননদ প্রমুখ যে কাজ করবে তা করতে লজ্জাবোধ করবে না। তাদের কাজে সহযোগিতা করবে বরং তারা করার পূর্বেই সম্ভব হলে তাদের কাজ করে দিবে, তাহলে তাদের ভালবাসা লাভ করা যাবে।

৮. নিজের কাজ কারও জন্য ফেলে রাখবে না এই ভেবে যে, অমুকে করে দিবে। নিজের সব কিছুকে নিজেই সাজিয়ে গুছিয়ে ও পরিপাটি করে রাখবে।

৯. দুই-চারজনে কোন গোপন কথা বলতে থাকলে সেখান থেকে সরে যাবে, তারা কী বলছিল সেটা জানার জন্য খোঁজ লাগাবে না। অহেতুক এই সন্দেহ করবে না যে, তারা হয়ত আমার কোন দোষ বলাবলি করছিল।

Scanned by CamScanner

১০. শ্বশুর বাড়ীতে প্রথম প্রথম মন না বসলেও মনকে বোঝানোর চেষ্টা করবে, কান্না জুড়ে দিবে না। বাপের বাড়ি থেকে এসে পারলে না, এরই মধ্যে আবার যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করবে না। এভাবে কিছুদিন পর মন ঠিক হয়ে যাবে।[১]

পুত্রবধূর প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ীর কর্তব্য

১. পুত্রবধূ এলেই শাশুড়ী মনে করবে না যে, এখন থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, ঘরের কোন কাজ আর আমাকে করতে হবে না, এখন কাজের মানুষ এসে গেছে। পুত্রবধূ ঘরের বাঁদী বা চাকরানী নয়, পুত্রবধূ কাজের মেয়ে নয় বরং পুত্রবধূ ঘরের শোভা, পুত্রবধূকে চাকরানী মনে করবে না এবং চাকরানীসুলভ আচরণ তার সাথে করবে না।

২. শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা পুত্রবধূর আইনতঃ দায়িত্ব নয়, করলে সেটা তার অনুগ্রহ। অতএব শ্বশুর-শাশুড়ীর যতটুকু খেদমত-সেবা সে করবে তার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ী প্রীত হবেন এবং সেটাকে তার অনুগ্রহ মনে করবেন। আর যতটুকু সে করবে না তার জন্য তাকে জবরদস্তী করতে পারবেন না। কিংবা তার কারণে তার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারবেন না।

৩. পুত্রবধূর অধিকার রয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে একান্নভুক্ত না থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার। অতএব পুত্রবধূ যদি পৃথক হতে চায়, তাহলে তাতে বাধা দিতে পারবে না। বরং হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেছেন : এই যমানায় একান্নভুক্ত থাকার কারণেই পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাজেই শুরুতেই অর্থাৎ, ফ্যাসাদ লাগার আগেই পুত্র ও বধূকে পৃথক করে দেয়া সমীচীন। তাতে মহব্বত ভাল থাকবে। অন্যথায় যখন ফ্যাসাদ লাগবে তখন পৃথকও করে দিতে হবে আবার মহব্বত ও সুসম্পর্কও নষ্ট হয়ে যাবে।[২]

৪. পুত্রের সাথে পুত্রবধূর অত্যাধিক ভালবাসা হতে দেখলে ঈর্ষাবোধ করবে না এবং অহেতুক এই সন্দেহ করবে না যে, বধূ আমাদের পুত্রের মাথা খেয়ে ফেলবে কিংবা আমাদের থেকে বুঝি তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা হয়ে যাওয়াইতো শরীয়তের কাম্য। তাদের মধ্যে মহব্বত হতে দেখলে ঈর্ষাবোধ করবে, আবার অমিল হয়ে গেলে মিল করানোর জন্য তাবীজের সন্ধানে ছুটাছুটি করবে—এই বিপরীত মুর্খিতার কোন অর্থ হয় না।

---

১. تحفۂ زوجین থেকে গৃহীত। ॥ ২. تحفۂ زوجین থেকে গৃহীত। ॥

৫. পুত্রবধূকে স্নেহ করবে, আদর সোহাগ করবে এবং তার আরাম ও সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখবে, যেন পুত্রবধূ শ্বশুর-শাশুড়ীকে স্নেহময়ী পিতা-মাতার মত পেয়ে তাদেরকে আপন মনে করে নিতে পারে এবং তাদের জন্য সব রকম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করাকে নিজের গৌরব মনে করে নিতে পারে।

৬. পুত্রবধূর কাছে নিজেদেরকে তার কল্যাণকামী হিসেবে প্রমাণিত করতে হবে, যাতে তাদের প্রতি পুত্রবধূর ভক্তি আযমত বৃদ্ধি পায়।

৭. যৌতুকের জন্য পুত্রবধূকে কোন রকম চাপতো দূরের কথা ইশারা ইঙ্গিতেও কিছু বলবে না। এমনকি পুত্রবধূ তার বাপের বাড়ী থেকে কী কী মাল-সামান এনেছে, কী কী আনেনি বা কেন আনেনি এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনাই তুলবে না। মনে রাখতে হবে যৌতুক চাওয়া হারাম এবং এই যৌতুকের কারণে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এখন কোন পিতা-মাতা যৌতুকের কথা তুলে পুত্রের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে কি না, সেটা পিতা-মাতার উচিত হবে কি না, তা তাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। অনেক সময় পুত্র স্ত্রীকে এসব কথা কিছুই বলে না, পিতা-মাতাই নিজেদের থেকে এসব আলোচনা তুলে থাকেন, কিন্তু পুত্রবধূ মনে করে স্বামীর ইশারাতেই এগুলো বলা হচ্ছে। এভাবে পিতা-মাতার এসব আলোচনা দ্বারা পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে মন কষাকষি এবং ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয়ে যেতে পারে।

৮. পুত্রবধূকে সংসার চালানো শিখিয়ে দিবে।

৯. পুত্রবধূকে এই নতুন সংসারে এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দান করবে।

১০.পুত্রবধূ এক হিসেবে শ্বশুর-শাশুড়ীর অধীনস্থ। অতএব পুত্রবধূর দ্বীনদারী, ইবাদত-বন্দেগী ও তার ইজ্জত-আব্রুর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। বোখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীছে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন প্রত্যেককেই তার অধীনস্থ সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে যে, সে তার অধীনস্থদেরকে দ্বীনের উপর চালানোর চেষ্টা করেছে কি-না।

ঘর সাজানো-গোছানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাসায়েল

* ঘর এবং ঘরের আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সুন্নাত।[১] পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।

---

১. ترمذی

* বিনা প্রয়োজনে মাকড়সা মারা অনুচিত, তবে তার জাল ভেঙ্গে ঘর পরিষ্কার করা যাবে।[১]

* পিপড়া, ছারপোকা ইত্যাদি কোন প্রাণী আগুন দ্বারা পুড়িয়ে মারা নিষেধ। একান্ত ঠেকা অবস্থায় গরম পানি দিয়ে ছারপোকা তাড়ানো যায়।

* টিকটিকি ও গিরগিটি মারা ছওয়াবের কাজ।[২]

* ঘরের জিনিসপত্রগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা সাংসারিক সুব্যবস্থার অন্যতম কাজ।

* প্রাণীর ফটো বা মূর্তি রাখা হারাম। কোন বুযুর্গ বা গুরুজনের ফটোর বেলায়ও একই হুকুম। যে ঘরে ফটো বা মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

* রাতের বেলায় ঘর ঝাড়ু দেয়ায় কোন দোষ নেই।[৩]

* আয়না বা কোন প্লেটে লিখিত আল্লাহর নাম, রাসূলের নাম, কালিমা, আয়াত সৌন্দর্যের নিয়তে রাখা বে-আদবী। তবে বরকতের নিয়তে রাখাতে অসুবিধা নেই।[৪]

* ঘরের দরজা-জানালায় পর্দা দিবে শরীয়তের পর্দার হুকুম পালন করার নিয়তে, সৌন্দর্যের নিয়তে নয়।

সন্তান লালন-পালন

শিশুর শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত পরিচর্যা

* সন্তান জন্মলাভ করার পরপরই তাকে গোসল দিবে। প্রথমে লবণ পানি দিয়ে, তারপর খালেস পানি দিয়ে গোসল করাবে, তাহলে ফোড়া, গোটা ইত্যাদি অনেক ব্যাধি থেকে শিশু মুক্ত থাকবে। এরপর শরীরে বেশী ময়লা থাকলে কয়েক দিন পর্যন্ত এরূপ লবণ পানি দিয়ে গোসল করাবে, অন্যথায় শুধু খালেস পানি দিয়ে গোসল করাবে।

* গোসলের পর অন্ততঃ চার/পাঁচ মাস পর্যন্ত তেল মালিশ করা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

* ভেজা কাপড় দিয়ে শিশুর নাক, কান, গলা, মাথা ভালভাবে পরিষ্কার করবে। অপরিচ্ছন্নতা থেকে শিশুর বহু রোগ জন্ম নেয়।

১. فتاوی رحیمیہ ج/٦ । ২. فتاوی محمودیہ ج/٥ । ৩. امداد الفتاوی ج/٣ । ৪. بہشتی امداد الفتاوی ج/٣ ।

* মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য খুবই উপকারী। কুরআন শরীফে সন্তানকে বুকের দুধ পান করানোর জন্য মাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

* দুধমায়ের দুধ খাওয়াতে হলে সুস্থ, সবল ও জওয়ান দুধমাতা নির্বাচন করতে হবে। যে মায়ের বাচ্চার বয়স ছয় সাত মাসের বেশী হয়নি— এরূপ মহিলার দুধ তাজা হয়ে থাকে, এরূপ মহিলাকে দুধমাতা নির্বাচন করা ভাল।

* শিশুকে খারাপ দুধ খাওয়াবে না। যে দুধ এক ফোটা নখের উপর রাখলে সাথে সাথে প্রবাহিত হয় বা মোটেই প্রবাহিত হয় না বা যে দুধের উপর মাছি বসে না সেটাই খারাপ দুধ। আর যে দুধ সামান্য প্রবাহিত হয়ে থেমে যায়, সেটা ভাল দুধ।

* দুধ পান করানোর পূর্বে মধু বা চিবানো খেজুর প্রভৃতি মিষ্টিদ্রব্য আঙ্গুলে লাগিয়ে শিশুর গালে লাগিয়ে দিয়ে তারপর দুধপান করানো ভাল।

* শিশুদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ালে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে।

* শিশুদেরকে নিজে বা কোন সমঝদার ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা খাওয়াবে, যাতে বে আন্দাজ খেয়ে তাদের রোগ-ব্যাধি দেখা না দেয়, কিংবা পাকস্থলী দুর্বল হয়ে না যায়।

* ছোট শিশুদেরকে বার বার এ পাশ-ওপাশ করে শোওয়াবে, যাতে এক দিকে বেশীক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে ট্যারা হয়ে না যায়, কিংবা এক পাশে বেশীক্ষণ শুয়ে মাথা বাঁকা হয়ে না যায়।

* শিশুদেরকে সকলের কোলে যাওয়ার অভ্যাস করাবে, যাতে শিশু একজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে। অন্যথায় তার অবর্তমানে শিশুর অসুবিধা হতে পারে।

* পেশাব-পায়খানার পর শিশুকে শুধু মুছে দেয়া যথেষ্ট নয় বরং পেশাব পায়খানার পর তৎক্ষণাৎ পানি দিয়ে ধুয়ে-মুছে দিতে হবে। প্রয়োজনে হালকা গরম পানি ব্যবহার করতে হবে।

* বাচ্চাকে বেশী কোলে রাখবে না, তাতে বাচ্চা দুর্বল হয়ে যেতে পারে বরং সম্ভব হলে কিছু কিছু দোলনায় ঝুলানো ভাল।

* শোয়ানো বা কোলে নেয়ার সময় শিশুর মাথা কিছুটা উঁচুতে রাখবে।

* শিশুদেরকে নির্দিষ্ট সময় খাওয়ানোর অভ্যাস করানো ভাল, তাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

* শিশুদেরকে বিশেষ কোন এক ধরনের খাদ্যের প্রতি অভ্যস্ত করে তুলবে না বরং মৌসুমী সব ধরনের খাদ্য খাওয়াবে, তাহলে অভ্যাস ভাল হবে। অন্যথায় এক ধরনের খাদ্য-খাবারে অভ্যস্ত হলে বহু সময়ই পেরেশানী হয়ে থাকে।

* টক দ্রব্য বেশী খাওয়াবে না।

* একবার খাওয়ানোর পর হজম হওয়ার পূর্বে আবার খাবার দিবে না। কিংবা এত বেশী খাওয়াবে না যা হজম হতে পারবে না।

* সক্ষম হওয়ার পর শিশুদেরকে নিজের হাতে নিজের খাবার খেতে অভ্যস্ত করে তুলবে।

* খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে হাত পরিষ্কার করে দিবে।

* শিশুদেরকে তাকিদ করবে যেন কেউ কোন খাবার দিলে মাতা-পিতাকে না দেখিয়ে তারা না খায়।

* শিশুদেরকে ঢিলে-ঢালা পোশাক পরিধান করাবে।

* দুধ ছাড়ানোর সময় হলে এবং দুধের বাইরে বাড়তি খাবার শুরু করলে খেয়াল রাখতে হবে যেন শক্ত কিছু না চিবায়, অন্যথায় দাঁত উঠতে মুশকিল হবে এবং দাঁত চিরতরে দুর্বল হয়ে যাবে।

* বাচ্চাদের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যেন নিজের কাজ নিজে করে।

* বাচ্চাদেরকে কিছুটা হালকা ব্যায়াম যেমন হাঁটা-চলা করা, দৌড়া-দৌড়ি করা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত করাবে, তাহলে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং অলসতা আসবে না।

* কিছুটা খেলাধুলা ও ফূর্তির সুযোগ দিবে, তাহলে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং অলসতা আসবে না। এতে তাদের মন ও স্বাস্থ্য উভয়টার উপকার হবে।

* বাচ্চাদেরকে মাজন-মেসওয়াক ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তুলবে।

* বাচ্চাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।

* ভাল খাবার ও মস্তিষ্কের জন্য উপকারী খাদ্য খাবার দিবে, তবে বিলাসিতায় যেন অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে।

* শিশুদেরকে দু'বছরের বেশী দুধ পান করানো যাবে না। শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার মতে আড়াই বৎসর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করানো যেতে পারে, তারপর অবশ্যই দুধ ছাড়াতে হবে। এরপরও দুধ পান করানো সকলের ঐকমত্যে হারাম।

* বাচ্চার দুধ ছাড়ানো মুশকিল হলে সূরা বুরূজ লিখে বেঁধে দিলে সহজেই দুধ ছেড়ে দিবে।[১]

শিশুর মানসিক পরিচর্যা

* শিশু-কিশোরদের সামনে বা তাদের সাথে কথাবার্তা ও আচার-আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া না হয় বরং ভাল প্রতিক্রিয়া হয়। মনে রাখতে হবে শিশু অবুঝ হলেও, তারা কোন কথা ও আচরণ পূর্ণ উপলব্ধি করতে না পারলেও তার ভাল বা মন্দ প্রতিক্রিয়া তাদের মনে পড়বে এবং তার মন-মানসিকতা গঠনে সেটা ভূমিকা রাখবে। শিশুর মন ভিডিও-এর ন্যায়, যা কিছুই তার সামনে বলা হবে বা করা হবে তার একটা চিত্র শিশুর মনে অংকিত হয়ে যাবে। যদিও সে এখন তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন সে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে তখন দেখা যাবে শিশুকালে যে সব চিত্র তার মনে অংকিত হয়ে ছিল এখন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। তাই শিশুর সামনে অবলিলায় সব কিছু বলা বা করা যাবে না; বরং শুধু এমন সব কিছুই তার সামনে বলতে বা করতে হবে, যাতে তার মন-মানসিকতা ভাল এবং উন্নত হয়ে উঠে। এ পর্যায়ে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হল।

* জন্মের সময় শিশুর (ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের) কানে আযান ও ইকামতের শব্দগুলো বলবে (ডান কানে আযানের শব্দাবলী এবং বাম কানে ইকামতের শব্দাবলী), তাহলে একটা ফায়দা এ-ও হবে যে, তার মনে ঈমানের শক্তি সৃষ্টি হবে।

* অবুঝ শিশুর জাগ্রত থাকা অবস্থায় তার সামনেও মাতা-পিতা অশ্লীল কথা-বার্তা ও যৌন আচরণে লিপ্ত হবে না, অন্যথায় শিশুর মধ্যে নির্লজ্জতা সৃষ্টি হতে পারে।

* শিশুর সাথে অনাদর ও অবহেলার আচরণ করবে না, তাহলে তাদের মন নিষ্ঠুর ও বিকারগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে।

* আবার শিশুকে মাত্রাহীন আদর-সোহাগ করলে তারা লাগামহীন হয়ে যেতে পারে।

---

১. শিশুর শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত যাবতীয় তথ্য تربیت اولاد ও معارف القرآن প্রভৃতি থেকে গৃহীত। ॥

* শিশুদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করালে তাদের পরিচ্ছন্ন মানসিকতা গঠিত হবে। অন্যথায় তাদের মধ্যে নোংরা থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

* শিশু-কিশোরদেরকে যতদূর সম্ভব নিজের কাজ নিজের হাতে করতে অভ্যস্ত করাবে, তাহলে তারা আত্মনির্ভরশীল মনোভাবাপন্ন হয়ে গড়ে উঠবে।

* শিশু-কিশোরদেরকে অতি বেশী জাঁকজমক ও বিলাসিতায় লালন-পালন করলে তাদের মধ্যে বিলাসী মনোভাব সৃষ্টি হয়।

* শিশুদের সব জিদ ও সব দাবি পূরণ করতে নেই, তাহলে তাদের মধ্যে একগুঁয়েমি ও হটকারিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। তাই তাদের সব জিদ ও সব দাবি পূরণ করতে নেই। বিশেষভাবে অন্যায় জিদ ও অন্যায় দাবি পূরণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আবার তাদের কোন দাবিই যদি পূরণ করা না হয়, তাহলে তাদের মন ছোট হয়ে যাবে এবং তারা সংকীর্ণ মানসিকতার অধিকারী হবে।

* অবাধ্য ও দুশ্চরিত্র শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে দিবে না। অন্যথায় তাদের চরিত্রের কুপ্রভাব ওদের মনে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই শিশুদের খেলার সাথী নির্বাচনের বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

* ছেলেদেরকে মেয়েদের সঙ্গে একত্রে খেলাধুলা করতে দিলে ছেলেদের মধ্যে মেয়েলীপনা বা পর্দাহীনতার মনোভাব দেখা দিতে পারে।

* শিশুদেরকে বাঘের ভয়, শিয়ালের ভয়, ভূতের ভয় ইত্যাদি দেখাবে না, তাহলে তারা ভীরু প্রকৃতির হয়ে যেতে পারে।

* শিশুরা অন্যায় করলে আল্লাহ্র ভয় দেখাবে, জাহান্নামের আযাবের ভয় দেখাবে, তাহলে তাদের মনে খোদাভীরুতা সৃষ্টি হবে। আর তাদের অন্যায় কাজে বাধা না দিলে অন্যায়কে তারা ন্যায় বলে ভাবতে শিখবে।

* ভাল কাজের জন্য আল্লাহর খুশী হওয়ার কথা এবং জান্নাতের নেয়ামত লাভের কথা শোনালে তাদের মনে পরকালের চিন্তা গড়ে উঠতে সহায়ক হবে।

* প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ সব কিছুই দেখেন ও জানেন—এ বিষয়টা তাদের সামনে তুলে ধরলে তাদের মধ্যে খোদামুখী চেতনা গড়ে উঠবে।

* শিশুদেরকে নেককার লোকদের কাহিনী শোনালে তাদের মধ্যে নেককার হওয়ার চেতনা সৃষ্টি হবে এবং বীর বাহাদুরের কাহিনী শোনালে তাদের মধ্যে বীরত্বের মনোভাব জাগ্রত হবে।

* শিশুদেরকে তাগিদ সহকারে অভ্যস্ত করাবে তারা যেন মুরব্বী ছাড়া কারও নিকট কিছু না চায় কিংবা কেউ কিছু দিলে মুরব্বীর অনুমতি ব্যতীত যেন গ্রহণ না করে। এরূপ না করলে তাদের মনে লোভ-লালসা জন্ম নিবে।

* গরীব-মিসকীনকে দান-সদকা করতে হলে শিশুদের হাত দ্বারা সেটা দেওয়াবে, তাহলে শিশুদের মধ্যে দানশীলতা সৃষ্টি হবে।

* শিশুরা ভাল কাজ করলে বা ভাল লেখা-পড়া করলে তাদেরকে সামান্য পুরষ্কার প্রদান করবে এবং শাবাশী প্রদান করবে, তাহলে ভাল কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ সৃষ্টি হবে। এর বিপরীত মন্দ কাজ করলে অবস্থা অনুযায়ী সামান্য তিরস্কার ও সামান্য শাস্তি প্রদান করবে, তাহলে তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, এটা মন্দ। তবে মনে রাখতে হবে খুব বেশী শাবাশী দেয়া বা খুব বেশী পুরষ্কৃত করা ঠিক নয়, তাহলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। পক্ষান্তরে খুব বেশী শাস্তি দিলে তারা খিটখিটে বা জেদী হয়ে যেতে পারে বা বেশী তিরস্কার করলে নিজের ব্যাপারে তার অনাস্থা জাগতে পারে।

* শিশুদেরকে কোন খাদ্য-খাবার দিলে তারা যেন সকলের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে সকলে মিলে খায়, এরূপ অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। তাহলে তাদের মধ্যে স্বার্থপরতার মনোভাব সৃষ্টি হবে না।

* শিশুদের জন্য আদর্শ শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে, তাহলে তারা আদর্শবান হওয়ার চেতনা লাভ করবে।

শিশুদের আদর-সোহাগ প্রসঙ্গ

* বাচ্চাদের আদর-সোহাগ করা সুন্নাত। পরিমিত আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত হলে বাচ্চাদের মানসিকতা বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

* বাচ্চাদেরকে আদর-সোহাগ খুব বেশী করা তাদের জন্য ক্ষতিকর। এতে তারা লাগামহীন হয়ে যেতে পারে।

* আদর করে ছেলেকে আব্বু ডাকা এবং মেয়েকে আম্মু ডাকা জায়েয, এতে কোন ক্ষতি নেই।[১]

* আদর-সোহাগ করতে গিয়ে শিশুদেরকে খোঁচা দেয়া, আঁচড় দেয়া বা কোনরূপ উত্যক্ত করা হলে প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা যদি শিশুর মানসিক কষ্ট হয় বলে বোঝা যায়, তাহলে এরূপ করা জায়েয নয়।[২]

* আদর-সোহাগ করে নাম বিকৃত করে ডাকা ঠিক নয়।

---

১. امداد الفتاوى । ২. حسن العزيز ।

সন্তানের নাম রাখা

* ভাল অর্থপূর্ণ নাম রাখা উচিত, কারণ নামের অর্থের আছর হয়ে থাকে।

* সবচেয়ে উত্তম নাম আব্দুল্লাহ, তারপর আব্দুর রহমান। যে সকল নামের শুরুতে আব্দ এবং শেষে আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের যে কোন একটি থাকে এই প্রকারের নাম রাখাও উত্তম। আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের জন্য দেখুন পঞ্চম অধ্যায়।

* আম্বিয়া, সাহাবা ও ওলী-আউলিয়াদের নামের অনুরূপ নাম রাখাও উত্তম।

* মেয়েদের নাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা এবং অন্যান্য নেককার বিবিদের নামের অনুরূপ রাখবে।

* কারও নাম অপছন্দনীয় রাখা হলে তার নাম বদলে ভাল নাম রাখবে। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও নাম অপছন্দনীয় হলে তার নাম বদলে ভাল নাম রেখে দিতেন।

* একাধিক নাম রাখা জায়েয। তবে ভাল নামটি কাগজে-কলমে রেখে বাজে অর্থহীন আর একটি ডাক নাম রেখে সেই নামে ডাকার যে প্রচলন আজকাল দেখা যায় তা কাম্য নয়। একাধিক নাম রাখলে প্রত্যেকটি নামই ভাল নাম হওয়া উচিত।

* সপ্তম দিবসে সন্তানের নাম রাখা মোস্তাহাব।

সন্তানকে কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা ইত্যাদি প্রদানের মাসায়েল

* সন্তানকে কাপড়-চোপড় দিবে তাদেরকে মালিক বানানোর নিয়তে নয় বরং তারা শুধু ব্যবহার করবে এই নিয়তে। মালিক নিজে থাকবে। কেননা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান যারা মালিক হয়ে যায় সেটা আর কাউকে দেয়া যায় না, নিজে মালিক থাকলে পুরাতন হওয়ার পর অন্য কাউকে দিয়ে দেয়া যাবে। ছোট ছেলে-মেয়েরা যার মালিক হয়ে যায় তা অন্য কাউকে দেয়া বা করয দেয়াও জায়েয নয়।

* ছোট ছেলে-মেয়েকে দেখে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবরা যে টাকা দিয়ে থাকে মাতা-পিতাই তার মালিক। অবশ্য যদি কেউ স্পষ্টতই বাচ্চাকে দেয়া উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করে বা বাচ্চার ব্যবহারের জিনিস দেয়, তাহলে বাচ্চাই তার মালিক।[১]

১. বেহেশতী জেওর, (বাংলা) শামসুল হক ফরীদপুরী। ॥

* খতনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ছোট ছেলে-মেয়েকে যা দেয়া হয়, সেটা মূলতঃ মাতা-পিতাকে দেয়াই উদ্দেশ্য থাকে, তাই মাতা-পিতাই তার মালিক। মাতা-পিতা নিজেদের ইচ্ছা মত তা ব্যয় করতে পারেন। অবশ্য যদি কেউ খাস করে বাচ্চাকেই কিছু দেয়, তাহলে বাচ্চা সমঝদার হলে সে সেটা গ্রহণ করবে, নতুবা পিতা সেটা গ্রহণ (কব্জা) করবে। পিতা না থাকলে দাদা সেটা গ্রহণ করবে। পিতা ও দাদার অনুপস্থিতিতে বাচ্চাকে যে লালন-পালন করছে সে গ্রহণ করবে। তাহলে বাচ্চা সেটার মালিক বলে গণ্য হবে।[১]

* প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য যে পোশাক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকেও সেরূপ পোশাক পরিধান করানো নিষিদ্ধ।

* ছেলেদেরকে সাদা পোশাক পরিধান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে এবং রং-চংয়ের পোশাকের প্রতি অনুৎসাহিত করবে এই বলে যে, এরূপ পোশাক মেয়েলী পোশাক, তুমি মাশাআল্লাহ পুরুষ ছেলে ইত্যাদি।

* সন্তানকে অতিরিক্ত বিলাসী খাদ্য খাবার ও বিলাসী পোশাক প্রদান করবে না, এতে তাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।

* সন্তানদেরকে অবৈধ বস্তু ক্রয়ের জন্য টাকা-পয়সা প্রদান করা জায়েয নয়; যেমন পটকা ও আতসবাজী ক্রয়ের জন্য।

* সব সন্তানকেই একই মানের জিনিস ও কাপড়-চোপড় দেয়া কর্তব্য, বিনা কারণে বৈষম্য করা মাকরূহ।

* জীবদ্দশায় সন্তানদেরকে টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি ইত্যাদি হাদিয়া দিলে সকলকে সমান দেয়া কর্তব্য (উত্তম)। তবে কোন সন্তান যদি তালেবে ইল্‌ম হয়, দ্বীনের খাদেম হয় বা উপার্জনে অক্ষম হয় তাহলে তাকে কিছু বেশী দেয়া হলে তাতে কোন দোষ নেই। ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মীরাছ বন্টনের যে পার্থক্য সেটা মৃত্যুর পরের বিধান। জীবদ্দশায় দেয়ার ক্ষেত্রে সে নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

* সন্তানদের যদি নিজস্ব সম্পদ থাকে, তাহলে তার ভরণ-পোষণ ও ব্যয়ভার তার সম্পদ থেকে হতে পারে। এমতাবস্থায় মাতা-পিতার উপর উক্ত সন্তানের ভরণ-পোষণ ও ব্যয়ভার ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে সন্তান বালেগ এবং উপার্জন করতে সক্ষম হলে তার ভরণ-পোষণও আইনতঃ মাতা-পিতার উপর ওয়াজিব নয়। আর সন্তান যদি নাবালেগ হয় এবং তার নিজস্ব কোন সম্পদ না থাকে কিংবা বালেগ হলেও সে আয় উপার্জন করতে সক্ষম না হয়

---

১. ماخوذ از تربیت اولاد و بہشتی زیور ۔

এবং তার নিজস্ব সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় পিতা জীবিত থাকলে উক্ত সন্তানের ভরণ-পোষণ শুধু পিতার উপর ওয়াজিব, মাতার উপর ওয়াজিব নয়। আর পিতা জীবিত না থাকলে মাতার উপর ওয়াজিব এবং রক্ত সম্পর্কের নিকট আত্মীয় থাকলে সকলের উপর এ দায়িত্ব বণ্টিত হবে।[১]

সন্তান ও শিশুদের শিক্ষা বিষয়ক নীতি ও মাসায়েল

* শিশুকে সর্বপ্রথম কালিমায়ে তাইয়্যেবা শিক্ষা দিবে।

* নিয়মিত লেখা-পড়া শুরু করানোর পূর্বেও সময় সুযোগে তার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ঈমানের কথা এবং ভাল-মন্দ সম্পর্কে শিক্ষা দিবে এবং মৌখিকভাবে দু'আ-দুরূদ ইত্যাদি শিখাবে।

* শিশুদেরকে মাতা-পিতা ও দাদার নাম এবং বাড়ির ঠিকানা অবশ্যই শিক্ষা দিবে। যাতে খোদা না-খাস্তা হারিয়ে গেলে অন্যরা তাকে সেই পরিচয় অনুযায়ী পৌঁছিয়ে দিতে পারে।

* সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় দ্বীনী শিক্ষা দেয়া এবং কুরআন পাঠ শিক্ষা দেয়া কর্তব্য।

* কত বৎসর বয়স থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখাপড়া শুরু করাতে হবে— এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে সাত বৎসর বয়স থেকেই সন্তানকে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য অর্থাৎ, নামাযের জন্য যখন সাত বৎসর বয়সকে নির্ধারণ করা হয়েছে এর থেকে আমার মনে হয় এ বয়সটাই নিয়মতান্ত্রিক লেখা-পড়া করানোর উপযুক্ত সময়।

* শিশুদের শিক্ষা দানের জন্যও আদর্শ ও নেক্কার শিক্ষক নির্বাচন করা উত্তম।

* যতদূর সম্ভব বিজ্ঞ, দক্ষ ও পারদর্শী শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষা দান করানো প্রয়োজন, তাহলে সন্তানও তদ্রূপ বিজ্ঞ হয়ে গড়ে উঠবে। শুধু সস্তা শিক্ষক খোঁজা হলে শুরু থেকেই শিশুর শিক্ষার মান বিগড়ে যাবে, তারপর সংশোধন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

* নিয়মতান্ত্রিক লেখা-পড়া শুরু হওয়ার পর মামুলী ছুটি ব্যতীত বারবার ছুটি দেয়া চলবে না। তবে নিতান্ত জরুরত হলে ভিন্ন কথা।

---

১. ايضا ۱

* কঠিন পাঠগুলো সকালের দিকে এবং সহজ পাঠগুলো বিকালের দিকে পড়াবে ; কেননা বিকালে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন কঠিন পাঠ দেয়া হলে তার মধ্যে জটিলতা দেখা দিতে পারে ।

* শিশুদের পড়ার সময় ও পাঠের পরিমাণ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করবে। যেমন প্রথম দিকে এক ঘণ্টা করে তারপর দুই ঘণ্টা করে । এমনিভাবে তার স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুসারে সময় ও পাঠের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকবে, এক সঙ্গেই সারা দিন লেখা-পড়ার চাপ দিলে একদিকে ক্লান্তিবশতঃ সে পড়া চুরি করতে শুরু করবে, অপরদিকে ধারণ ক্ষমতার উপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে তার স্মৃতিশক্তি ও মেধায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে ।

* সন্তানদেরকে আয়-উপার্জন করার মত একটা জ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা অবশ্যই শিক্ষা দিবে । এটা সন্তানের হক ।[১]

* শিশুদেরকে কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, পান-আহার, সালাম-কালাম ইত্যাদির আদব-কায়দা ও চরিত্র শিক্ষা দেয়া মাতা-পিতার দায়িত্ব ।

সন্তানের দাবি-দাওয়া ও জিদ পূরণ করার বিষয়ে কতিপয় নীতি ও মাসায়েল

* সন্তানের বৈধ দাবি-দাওয়া কিছু-কিছু পূরণ করতে হয়, অন্যথায় তাদের মন ছোট হয়ে যায় ।

* সন্তানের সব জিদ পূরণ করতে নেই, তাহলে তাদের মধ্যে একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার মনোভাব সৃষ্টি হয় । বিশেষতঃ সন্তান যদি কোন অবৈধ বিষয়ের জন্য দাবি করে বা জিদ ধরে, তাহলেও তা করা জায়েয নয়— হারাম । এরূপ জিদ থেকে বিরত না হলে প্রয়োজনে তাকে শাসন করতে হবে ।

* যেটা দেয়ার ইচ্ছা নেই, সন্তানকে ভুলানোর জন্য বা থামানোর জন্য এরূপ কোন বিষয়ের ওয়াদা করা নিষেধ । এটাও মিথ্যার শামিল । এরূপ কোন ওয়াদা করে ফেললে তা পূরণ করা জরুরী হয়ে পড়ে, তবে শর্ত হল কোন অবৈধ বিষয়ের ওয়াদা না হতে হবে ।

শিশুদের শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল

* অনেক সময় নম্র কথায় এবং নম্র আচরণে শিশুর সংশোধন নাও হতে পারে । এরূপ মুহূর্তে কঠোরতা অবলম্বন ও শাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । প্রয়োজনের মুহূর্তে কঠোরতা অবলম্বনপূর্বক শাসন না করা খেয়ানত ।

---

১. تربیت اولاد ۱

* শাসন ও শাস্তি প্রদানের কয়েকটা পদ্ধতি হতে পারে যথা :

(১) তিরস্কার করা (২) ধমক দেয়া (৩) কড়া কথা বলা। (৪) হাত বা লাঠি দ্বারা মারা (৫) আটক করে রাখা (৬) কান ধরে উঠা-বসা করানো (৭) ছুটি বন্ধ করে দেয়া। এই শেষোক্ত শাস্তিই সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। শিশুদের মনে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে।[১]

* মারধর অতিরিক্ত করা হলে, উঠতে বসতে লাথি-জুতা করতে থাকলে শিশুরা নির্লজ্জ হয়ে যায় এবং মারের ভয় তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। তারপর তাকে শাসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই মারধর-এর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা অন্যায়। ফোকাহায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে বলেছেন : যে মারপিট দ্বারা হাত ভেঙ্গে যায়, চামড়া ফেটে যায় বা চামড়ায় দাগ পড়ে যায় সেরূপ মারপিট করা নিষিদ্ধ। এরূপ মারধর যে পিতা বা যে উস্তাদ করবে সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।[২] মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করা যুলুম। অধীনস্থ বা ছোটদেরকে অতিরিক্ত শাস্তি দিলেও তা জুলুম বলে গণ্য হবে।

* মারধর-এর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা থেকে বাঁচার উপায় হল রাগের মুহূর্তে মারধর না করা। কেননা রাগের মুহূর্তে ব্যালেন্স ঠিক থাকে না। রাগ ঠাণ্ডা হওয়ার পর কতটুকু অন্যায় এবং তার জন্য কতটুকু কীভাবে শাস্তি দেয়াটা উপযোগী তা চিন্তা-ভাবনা করে শাস্তি দিতে হবে। হাদীছেও রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করতে নিষেধ করা হয়েছে। খুব বেশী রাগ এসে গেলে রাগ দমন করার পদ্ধতিসমূহের উপর আমল করবে।

* কখনও অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া হয়ে গেলে শাস্তি দেয়ার পর তাকে আদর-সোহাগ করে, অনুগ্রহ করে খুশি করে দিবে।

* বকাবকি ও ভর্ৎসনা করার ক্ষেত্রেও সীমা অতিক্রম করবে না, লাগামহীনভাবে মুখে যা আসে বলবে না, বরং পূর্বে চিন্তা করে নিবে কী কী শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন।

সন্তানকে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর তরীকা

* একটা সু-সন্তান লাভ করার জন্য এবং সন্তানকে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর জন্য মাতা-পিতার কিছু করণীয় রয়েছে। সন্তানের জন্মের পূর্ব থেকেই শুরু করতে হবে সন্তানকে ভাল বানানোর ফিকির ও প্রচেষ্টা, আর সেই ফিকির ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত। এই ফিকির ও প্রচেষ্টার একটা মোটামুটি রূপরেখা নিম্নে প্রদান করা হল :

---

১. تربیت اولاد । ২. تربیت اولاد مع ردالمحتار ج/۳ ।

* একটা সু-সন্তান পেতে হলে মাতাকে সৎ ও ভাল নারী হতে হবে। ভাল নারীর গর্ভেই ভাল সন্তানের আশা বেশী করা যায়। যে মায়ের চিন্তা-চেতনা ভাল এবং যে মায়ের মধ্যে দ্বীনদারী থাকে, সে মায়ের গর্ভে ভাল সন্তান জন্ম লাভ করে।

* মাতা-পিতা উভয়কেই হালাল খাবার গ্রহণ করতে হবে। কেননা হারাম খাদ্য থেকে সৃষ্ট বীর্যের মধ্যে খারাপ আছর হতে পারে, আর তার থেকে সৃষ্ট সন্তানের মধ্যেও তার প্রভাব থেকে যেতে পারে।

* সহবাসের সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই সহবাসের সুন্নাত ও আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

* সু-সন্তানের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে নিম্নোক্ত দু'আ করবে—

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ.

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে নিজ অনুগ্রহে পবিত্র বংশধর দান কর। অবশ্যই তুমি দু'আ শ্রবণকারী। (সূরা আল্ ইমরান : ৩৮)

* সন্তান গর্ভে আসার পর মায়ের চিন্তা-ভাবনা, মায়ের মন-মানসিকতা ও মায়ের আচার-আচরণ সবকিছুর প্রভাব পড়ে থাকে গর্ভস্থ সন্তানের উপর। তাই সন্তান গর্ভে আসার পর মাকে সব কু-চিন্তা ও পাপের চিন্তা পরিহার করতে হবে এবং নেক চিন্তা ও ভাল চিন্তা-ভাবনা রাখতে হবে, তাহলে সন্তানের উপর তার সু-প্রভাব পড়বে।

* অতঃপর কোন দ্বীনদার বুযুর্গ দ্বারা খেজুর বা কোন মিষ্টান্ন দ্রব্য চিবিয়ে তার কিছুটা নবজাতকের মুখের তালুতে লাগিয়ে দিবে। এটা করা সুন্নাত। এতে করে বুযুর্গের মুখের লালার মাধ্যমে বুযুর্গীর সু-প্রভাব নবজাতকের মধ্যে প্রবেশ করবে। তবে কোন বিদআত-কুসংস্কারপন্থী লোকদের মাধ্যমে এটা না করানো চাই।

* শিশুর একটা সুন্দর নাম রাখবে। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

* শিশুকে মা ব্যতীত অন্য কোন দুধমাতার দুধ পান করালে দ্বীনদার পরহেযগার ও সু-স্বভাবের অধিকারী মহিলার দুধ পান করাবে। কেননা, দুধের মাধ্যমে দুধদাত্রীর স্বভাব, চরিত্র ও মন-মানসিকতার প্রভাব ছড়িয়ে থাকে।

* কিছুটা বুঝ হওয়ার পর থেকেই প্রত্যেকটা পদে পদে ধীরে ধীরে শিশুকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে থাকতে হবে এবং অন্যায় ত্রুটি হলে

Scanned by CamScanner

সংশোধন করে দিতে হবে। প্রয়োজনে তাম্বীহ্ করবে এবং মুনাছেব শাস্তিও দিতে হবে।

* সাত বৎসর বয়স থেকেই শিশুকে নামাযের হুকুম দিবে এবং পুরুষ ছেলে হলে জামাআতের সাথে নামায পড়তে অভ্যস্ত করাবে। দশ বৎসর বয়স হলে প্রয়োজনে মারপিট করে হলেও নামায পড়াতে হবে।

* শিশুদেরকে রোযা রাখানোর ক্ষেত্রে সাত বৎসরের কোন সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি, সে যখন যে কয়টা রোযা রাখতে সক্ষম হবে তখন তার দ্বারা তা রাখাতে হবে। শিশুর নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত ও আখলাক-চরিত্র গঠনের ব্যাপারে জননীকেই বেশী খেয়াল রাখতে হবে, কেননা তার কাছেই সন্তানরা বেশী সময় কাটায়।

* প্রতিদিন ঘরে একটা নির্ধারিত সময়ে দ্বীনী কথা-বার্তা আলোচনার বা দ্বীনী কিতাব তালীমের সিলসিলা জারী রাখতে হবে। এতে সন্তানদের সাথে সাথে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও উপকার হতে থাকবে। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে এর জন্য সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে, তখন সকলের সময় অবসর থাকে। প্রথম দিকে সকলে তালীম শুনতে না চাইলেও তালীম করে যেতে হবে, আস্তে আস্তে সকলে শুনতে অভ্যস্তও হবে এবং আছরও হতে থাকবে।

* শুরু থেকেই সতর্ক থাকতে হবে, যেন খারাপ সাথীদের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক গড়ে উঠতে না পারে। অধিকাংশতঃ কুসংসর্গ থেকেই সন্তানরা কুপথে ধাবিত হয়।

* সন্তানদেরকে মুসলমানদের সাথে, বিশেষতঃ গরীব সৎ মুসলমানদের সাথে উঠা-বসা করতে অভ্যস্ত করাবে।

* সন্তানকে অভ্যস্ত করাবে তারা যেন কোন কাজ গোপনে না করে। কেননা গোপনে সে এমন কাজই করবে, যেটাকে সে অন্যায় বলে মনে করে, এভাবে গোপনে কাজ করতে অভ্যস্ত হওয়ার অর্থ অন্যায় কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া।

* হালাল সম্পদ দ্বারা সন্তানের ভরণ-পোষণ করবে। হারাম সম্পদের দ্বারা কুস্বভাব, শরীয়তবিরুদ্ধ চেতনা জন্ম নেয়।

* সন্তানকে যৌন বিষয়ক ও প্রেম-প্রীতি বিষয়ক বই-পত্র ও নভেল-নাটক পড়তে বা দেখতে দিবে না।

* মনে রাখতে হবে— সন্তানের প্রথম বয়সই তার এসলাহের উপযুক্ত সময়। প্রথমে নষ্ট হয়ে গেলে পরে তার এসলাহ অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে।

প্রথম দিকে অবুঝ সন্তান বলে অবহেলা করে ছেড়ে দিলে পরবর্তীতে অনুতপ্ত হতে হয়।

* সন্তানদের সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রথম সন্তানকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কেননা পরবর্তী সন্তানরা প্রায়শঃই প্রথম জনের অনুকরণ করে থাকে।

* সন্তানের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় আদায় করবে। সন্তানদের বিস্তারিত অধিকার পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

* সন্তান যেন নেককার হয়, অসৎ না হয়, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা ও দু'আ করতে থাকবে। এরূপ কয়েকটি দুআ নিম্নে পেশ করা হল :

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ (১)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার বংশধরকে নামায কায়েম করনে ওয়ালা বানাও। হে আমার রব! আমার দু'আ কবূল কর। (সূরা ইবরাহীম : ৪০)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّیّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا (২)

অর্থঃ হে আমাদের রব, আমাদের বিবি (বা স্বামী) ও সন্তানদেরকে আমাদের জন্য সুখের বানাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের অগ্রণী বানাও। (ফুরকান : ৭৪)

যাদের সন্তান সুপথে আসেনা তাদের সান্ত্বনা

* সন্তানকে সুপথে আনার চেষ্টা করা মানুষের আয়ত্ত্বের মধ্যে, কিন্তু সে চেষ্টার ফলাফল মানুষের আয়ত্বাধীন নয়। অনেক সময় হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সন্তান সুপথে না আসতে পারে এবং তার কারণে মাতা-পিতার পেরেশানীর অন্ত না থাকতে পারে। এরূপ মুহূর্তে পিতা-মাতার করণীয় হল :

১. চেষ্টা অব্যাহত রাখবে, কিন্তু ফলাফল লাভের অপেক্ষায় থাকবে না; অর্থাৎ, তারা যেমন চায় সন্তান তেমনই হয়ে যাবে— এই অপেক্ষায় থাকবে না, তাহলে পেরেশানী কমে যাবে।

২. সন্তান সুপথে আসছে না এ জন্য স্বভাবতঃ যে কষ্ট ও দুঃখ হবে তার কারণে ছওয়াব হবে—এই বিশ্বাস রাখবে, তাহলেও মনে একটু তৃপ্তি পাওয়া যাবে। মনে করতে হবে যে, এভাবেও হয়ত আল্লাহ আমার গোনাহ মোচন ও ছওয়াব লাভের পথ করে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করছেন।

৩. সন্তানের সুমতি ও হেদায়েত হোক এ জন্য সর্বদা দু'আ করতে থাকবে।[১] সন্তানের জন্য মাতা-পিতার দুআ বিশেষভাবে কবূল হয়।

যাদের সন্তান মারা যায় তাদের সান্ত্বনা

যার সন্তান মারা যায় তার সান্ত্বনা লাভের জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় চিন্তা করতে হবে।

১. যে সন্তান মারা গিয়েছে তার মরে যাওয়াই ভাল ছিল, সে বেঁচে থাকাটা তার জন্য খারাপ ছিল। এটা তার বুঝে না আসলেও আল্লাহ তা'আলা সব কিছু জানেন ও বুঝেন, তিনি অত্যন্ত হেকমতওয়ালা।

২. এই সন্তানের কারণে মানুষ কত রকম পেরেশানী ও মুসীবতের সম্মুখীন হয় সেগুলো চিন্তা করে মনে করবে যে, আল্লাহ আমাকে সে সব পেরেশানী থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যই হয়ত আমার সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়েছেন, কাজেই এটা আমার প্রতি আল্লাহ্‌র এক অনুগ্রহ।

৩. সন্তানের মৃত্যুর কারণে যে কষ্ট হয় ,তার বিনিময়ে ছওয়াব অর্জিত হয়। বিশেষ করে নাবালেগ সন্তানের মৃত্যু হলে সে সন্তান পরকালে তার নাজাতের ওছীলা হয়ে দাঁড়াবে, সে সন্তান জাহান্নাম ও তার মাঝে আড় হয়ে দাঁড়াবে। এক হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী বালেগ সন্তানের মৃত্যু হলেও সে কারণে যে কষ্ট হবে তার বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাত দান করবেন।[২]

যাদের কোন সন্তান হয় না বা পুত্র হয়না তাদের সান্ত্বনা

যার ছেলে-মেয়ে কোন সন্তানই হয় না বা পুত্র সন্তান হয় না, তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিন্তা করতে হবে:

১. মোটেই সন্তান না হওয়া বা পুত্র না হওয়াই তার জন্য ভাল। আল্লাহ পাক প্রত্যেকেরই কল্যাণ চান এবং সব কিছুর রহস্য তার জানা আছে। সে মতে তার সন্তান না হওয়ার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, যা আল্লাহ অবগত আছেন।

২. সন্তান থাকলে বিশেষতঃ পুত্র সন্তান থাকলে যে সব পেরেশানী হয় সেগুলো চিন্তা করে মনে করবে যে, আল্লাহ আমাকে সে সব পেরেশানী থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ সন্তান দেয়া যে রকম আল্লাহ্‌র নেয়ামত, সন্তান না দেয়াও এক একম নেয়ামত। সুতরাং সন্তান না হওয়ার জন্য শোকরের মনোভাব রাখতে হবে—না-শোকরের মনোভাব নয়।

---

১. অত্র পরিচ্ছেদের যাবতীয় তথ্য تربیت اولاد থেকে গৃহীত। ॥ ২. تربیت اولاد ॥

৩. সন্তান না হওয়ার কারণে বা পুত্র না হওয়ার কারণে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে স্বামীকে নরমে বুঝাতে হবে যে, এটা স্ত্রীর এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়, এটা স্ত্রীর কোন অন্যায় নয়। এজন্য আল্লাহ্র প্রতিও নারাজ হওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ হয়ত এরই মধ্যে তাদের কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

৪. স্বামীকে আরও বুঝাতে হবে যে, একথা মনে করা ঠিক নয় যে, সন্তান ও বংশধর না থাকলে নাম টিকে থাকবে না। মূলতঃ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হতে পারলেই নাম টিকে থাকে, সন্তান দ্বারা নয়। বরং সন্তান হয়ে যদি খারাপ হয় তাহলে উল্টা বদনামী হয়ে থাকে।

সতীনের সন্তানের জন্য যা করণীয়

সতীনের সন্তান বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আত্মীয়দের যা হক ও অধিকার রয়েছে তাদের বেলায়ও তা পালন করতে হবে। বরং অনেক আলেমের মতে বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয় আর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের হক একই রকম। এমতে নিজের সন্তানের জন্য যা যা করণীয়, সতীনের সন্তানের জন্যও তা-ই করণীয়। সতীনের সন্তানের সাথে দুর্ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায়।

বিশেষতঃ সতীন যদি মারা যায় তাহলে সৎ-মাকে এ কথা চিন্তা করে দেখতে হবে যে, আমি সতীনের সন্তানের সাথে দুর্ব্যবহার করলে খোদা না-খাস্তা আমার সন্তান ছোট থাকা অবস্থায় আমার মৃত্যু হলে অন্য সতীন ঘরে এসে আমার সন্তানের প্রতিও দুর্ব্যবহার করতে পারে। এরূপ ভাবনা মনে উপস্থিত রাখলে সতীনের সন্তানকে নিজের সন্তানের মত বরণ করে নেয়া সহজ হবে এবং দুর্ব্যবহারের মনোভাব জাগ্রত হবে না বরং করুণার মনোভাব জাগ্রত হবে।

রান্না-বান্না ও পানাহারের মাসায়েল

* মহিলাদের জন্য ঘরের কাজ করা, রান্না-বান্না করা বা চাকর-নওকর থাকলে এসব কাজে তাদের সহযোগিতা করা বা তত্ত্বাবধান করাও ইবাদতের শামিল এবং এতে তাদের ছওয়াব হয়ে থাকে। মহিলাদের এসব কাজ ছওয়াব মনে করে করা উচিত। স্বামীর চাকর-নওকরের ব্যবস্থা করার সঙ্গতি না থাকলে এবং স্ত্রী রান্না-বান্না করতে সক্ষম হলে রান্না-বান্না করা তার উপর নৈতিক ওয়াজিব।

* রান্না-বান্না করার জন্য চাউল, আটা ইত্যাদি মেপে নিবে, তবে মূল পাত্রে কী পরিমাণ অবশিষ্ট থাকল সেটা মেপে দেখবে না, তাহলে বরকত কমে যাবে।

* যখন গোসল ফরয অবস্থায়ও রান্না-বান্না করাতে কোন দোষ নেই।[১]

* বিসমিল্লাহ বলে রান্না-বান্না শুরু করবে।

* গোবরের জ্বালানী দিয়ে রান্না-বান্না করা জায়েয।[২]

* গোবর বা মনুষ্য মল থেকে তৈরী গ্যাস দ্বারা রান্না করা জায়েয।[৩]

* রান্না শেষ হওয়ার পর চুলার আগুন নিভিয়ে রাখবে, যাতে করে অন্য কিছুতে আগুন লাগতে না পারে। গ্যাসের চুলা হলেও নিভিয়ে রাখবে। একটা ম্যাচের শলাকা বাঁচানোর জন্য গ্যাস জ্বালিয়ে রাখলে অপচয়ের গোনাহ হবে। অপচয় করা কবীরা গোনাহ।

* রান্না শেষ হওয়ার পর খাদ্য-খাবার ঢেকে রাখবে।

যে সব পশু-পাখী খাওয়া জায়েয ও হালাল

যে সব পশু-পক্ষী পাঞ্জা দ্বারা শিকার ধরে খায়না তা (যবাই করে) খাওয়া জায়েয ও হালাল। যেমন : পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, উভয় প্রকার পা বিশিষ্ট খরগোস, বন্য গরু এবং পক্ষীর মধ্যে হাঁস, মুরগি, বন্যহাঁস, বন্যমুরগি, ময়না, টিয়াপাখী, বক, সারস, চড়ুই, পানকৌড়ি, কবুতর ইত্যাদি। ঘোড়া খাওয়া জায়েয তবে মাকরূহ। যে সব মুরগি খোলা থাকে এবং নাপাক খেয়ে বেড়ায় তাদেরকে তিনদিন না বেঁধে রেখে খাওয়া মাকরূহ।[৪]

যেসব পশু-পাখী খাওয়া জায়েয নয়

যে সব পশু-পাখী পাঞ্জা দ্বারা শিকার ধরে খায় বা যাদের খাদ্য শুধু নাপাক বস্তু, সে সব পশু-পাখী খাওয়া জায়েয নয়। যেমন : বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, বানর, বেজী, গাধা, খচ্চর, সজারু, কচ্ছপ, গোসাপ, বাজ, চিল, শিকড়া, শকুন, ঈগল, কাল কাক ইত্যাদি।[৫]

হালাল পশু-পাখীর যা যা খাওয়া নাজায়েয

হালাল পশু-পাখীর নিম্নোক্ত জিনিসগুলো খাওয়া জায়েয নয় : পেশাব, পায়খানা, প্রবাহিত রক্ত, পিত্ত, মূত্রথলি, অণ্ডকোষ, পুরুষাঙ্গ, স্ত্রী-লিঙ্গ,

---

১. احسن الفتاوی ج/۲ । ২. فتاوی محمودیہ ج/۵ । ৩. فتاوی رحیمیہ ج/۲ । ৪. بہشتی زیور، فتاوی رشیدیہ । ৫. বেহেশতী জেওর ।

পায়খানার রাস্তা, শরীরের অতিরিক্ত মাংসগ্রন্থি যেমন : টিউমার ইত্যাদি ও মেরুদণ্ডের হাড়ের মগজ।

কোন কোন আলেমের মতে মেরুদণ্ডের হাড়ের মগজ মাকরূহ তানযীহী, অনেকের মতে এটা মাকরূহ হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে সতর্কতা হল তা না খাওয়া। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী গুর্দা খাওয়া মাকরূহ তানযীহী। হালাল জানোয়ারের নাড়ীভুঁড়ি, চামড়া, পা খাওয়া জায়েয।[১]

মাছ ও পানির অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কিত মাসায়েল

* পানির প্রাণীর মধ্যে মাছ (সব ধরনের মাছ) খাওয়া জায়েয।

* মাছ খাওয়া হালাল হওয়ার জন্য যবেহ করা শর্ত নয়।

* যে মাছ আপনা আপনি মরে চিৎ হয়ে ভেসে ওঠে, তা খাওয়া জায়েয নয়। তবে গরমের কারণে, আঘাতের কারণে, চাপাচাপির কারণে, ঔষধ দেয়ার কারণে বা কিছু খাওয়ার কারণে যদি মরে ভেসেও ওঠে, তবুও তা খাওয়া জায়েয। কিংবা স্বাভাবিকভাবে মরে ভেসে উঠেছে কিন্তু চিৎ হয়নি বরং পিঠ এখনও উপরের দিকে রয়েছে, তাহলেও খাওয়া জায়েয।[২]

* ছোট মাছ হলেও তার পেটের মল-আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার করা ব্যতীত খাওয়া জায়েয নয়।[৩]

* কচ্ছপ, কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক, ব্যাঙ ইত্যাদি খাওয়া জায়েয নয়।

* পানির কোন পোকা-মাকড় খাওয়া জায়েয নয়।

যবাই করার মাসায়েল

* যবাইকারীর মুসলমান হওয়া শর্ত— কাফেরের যবাই করা জন্তু খাওয়া হারাম।

* মুসলমান পুরুষ হোক বা মহিলা, উভয়ের যবাই করা পশু-পাখী খাওয়া হালাল।

* নাবালেগ ছেলে মেয়ে যবাই করতে জানলে এবং বিসমিল্লাহ (আল্লাহ্‌র নাম) বললে তার যবাই খাওয়া হালাল।

* যবাই করার সময় জন্তু ও যবাইকারী উভয়ের মুখ কেবলার দিকে থাকা সুন্নাতে মুআক্কাদা।

* যবাই করার সময় যবাইকারী আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা শর্ত। 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে সাধারণতঃ এ শর্ত পূরণ করা হয়। ইচ্ছাকৃত

১. فتاوی رشیدیہ وغیرہ। ২. احسن الفتاوی ج/۷ وشامی। ৩. احسن الفتاوی ج/۷।

বিসমিল্লাহ না বললে বা অন্য কোন বাক্যে আল্লাহ্র নাম না নিলে সে জন্তু খাওয়া হারাম হয়ে যায়। তবে ভুলে ছুটে গেলে খাওয়া দোরস্ত আছে।

* যবাইর মধ্যে জানোয়ারের চারটা রগ কাটতে হবে। তিনটা রগ কাটলেও দোরস্ত আছে। তিনটার কম কাটলে সে জন্তু মৃত বলে গণ্য এবং হারাম হয়ে যাবে। রগ চারটি এই : শ্বাসনালী, খাদ্যনালী ও দুইটা শাহরগ।

* ধারাল ছুরি দ্বারা যবাই করা উত্তম। ভোঁতা বা কম ধারাল ছুরি দ্বারা যবাই করা মাকরূহ।

* ছুরির অভাবে ধারাল পাথর, বাঁশ বা আখের ধারাল বাক্লা দ্বারা যবাই করা দোরস্ত আছে।

* পাথরের আঘাতে, বন্দুকের গুলিতে মারা গেলে খাওয়া দোরস্ত নয়। তবে বন্দুকের গুলি বা পাথরের আঘাত লাগার পর মরে যাওয়ার পূর্বে যবাই করতে পারলে তা খাওয়া জায়েয।

* দাঁত বা নখ দ্বারা যবাই করা দোরস্ত নয়।

* যবাই করার সময় জানোয়ারের মাথা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলেও তা খাওয়া দোরস্ত আছে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ কেটে আলাদা করে দেয়া মাকরূহ। তবে এরূপ জানোয়ার খাওয়া মাকরূহ নয়।

* যবাই করার পর জানোয়ার ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে চামড়া খসানো, হাত-পা কাটা, ভাঙ্গা বা সমস্ত গলা কেটে দেয়া মাকরূহ।

* গোসল ওয়াজিব বা উযূ নেই—এমন অবস্থায়ও যবাই করা যায়, তাতে যবাইয়ের কোন প্রকার ক্ষতি হবে না।[১]

* হাঁস, মুরগি ইত্যাদির পালক ছাড়ানোর জন্য ফুটন্ত পানিতে হাঁস মুরগিকে যদি এতক্ষণ রাখা হয়, যাতে তার পেটের নাপাকী গোশতের মধ্যে ভেদ করার প্রবল ধারণা হয়, তাহলে তার গোশত নাপাক হয়ে যায়— পাক করার আর কোন উপায় থাকে না। অবশ্য যদি পানি ফুটতে না থাকে শুধু গরম হয়, তাহলে তাতে দীর্ঘক্ষণ চুবিয়ে রাখলেও অসুবিধা নেই কিংবা ফুটন্ত পানিতে চুবিয়ে সাথে সাথে উঠিয়ে ফেললেও অসুবিধা নেই।[২]

* যবাই করার পূর্বে প্রাণীকে ক্ষুধার্ত রাখা যুলুম। যবাই করার আগ পর্যন্ত প্রাণীকে স্বাভাবিক খাদ্য-খাবার দিতে থাকবে।

---

১. احسن الفتاوی ج/۷ ॥ ২. ایضا ॥

পান করার মাসায়েল

১. বসে পান করা সুন্নাত।
২. ডান হাতে পান করা সুন্নাত।
৩. পাত্রের ভাঙ্গা স্থানে মুখ লাগিয়ে পান না করা আদব।
৪. তিন শ্বাসে পান করা সুন্নাত।
৫. পানির পাত্রের মধ্যে শ্বাস না ছাড়া এবং ফুঁক না দেয়া।[১]
৬. শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদু লিল্লাহ বলা সুন্নাত।
৭. অন্য মুসলমান বোনের বিশেষভাবে পরহেযগার ও বুযুর্গ মহিলাদের পান করার পর রেখে যাওয়া অবশিষ্ট পানি বরকত মনে করে পান করা। অনেকে অন্যের পান করার পর অবশিষ্ট পানি পান করতে খারাপ বোধ করে—এটা ঠিক নয়।
৮. পান করার পর অন্যকে দিতে হলে আদব হল ডান পাশের জনকে অগ্রাধিকার দেয়া। তার অনুমতিসাপেক্ষে বাম পাশের জনকেও দেয়া যায়।
৯. যে পাত্রের ভিতর দেখা যায় না বা যে পাত্র থেকে এক সঙ্গে অনেক পানি পড়ার সম্ভাবনা, এরূপ পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা আদব। কেননা পাত্রের মধ্যে ক্ষতিকারক কোন কিছু থাকতে পারে বা এক সঙ্গে অনেক পানি মুখের মধ্যে গিয়ে বিপদের কারণ হতে পারে।
১০. যিনি পান করাবেন তিনি সর্বশেষে পান করবেন।

খাওয়ার মাসায়েল

১. খাওয়ার পূর্বে জুতা খুলে নেয়া আদব। আজকাল চেয়ার-টেবিলে খেতে গিয়ে অনেকেই এই আদবটি রক্ষা করেন না। খেয়াল রাখা চাই।
২. খাওয়া শুরু করার পূর্বে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করে নেয়া সুন্নাত।
৩. কুলি করা সুন্নাত, যদি প্রয়োজন হয়।[২]
৪. বিনয়ের সাথে, বিনয়ের ভঙ্গিতে বসা আদব। আসন গেড়ে বসা বেশী খাওয়ার নিয়তে বা তাকাব্বুরের জন্যে হলে মাকরূহ, অন্যথায় জায়েয।
৫. দস্তর খানা বিছানো সুন্নাত।

---

১. ترمذی ॥ ২. ইসলামী তাহযীব ॥

৬. যমীনের উপর বসবে এবং বসার বরাবর খাদ্যের বরতন রাখবে। চেয়ার-টেবিলে খাওয়া নিষিদ্ধ না হলেও যেহেতু চেয়ার-টেবিলে খাওয়াতে অনেকগুলো সুন্নাত ও আদব বর্জিত হয়, অতএব তা পরিত্যাজ্য।

৭. হেলান দিয়ে না খাওয়া (এমনকি হাতে ভর করেও না)।

৮. খাওয়ার শুরুতে দুআ পড়া সুন্নাত। দুআর জন্য দেখুন সপ্তম অধ্যায়।

৯. ডান হাতে খাওয়া সুন্নাত। প্রয়োজনে বাম হাতের সহযোগিতা নেয়া যায়।

১০. নিজের শরীরের এসলাহ এবং আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের নিয়তে খেতে হবে।

১১. তিন আঙ্গুলের (বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমা) দ্বারা খাওয়া সুন্নাত। প্রয়োজনে তিনের অধিকও ব্যবহার করা যেতে পারে।

১২. এক পদের খানা হলে নিজের সম্মুখ থেকে খাওয়া— অন্যের সম্মুখ থেকে না নেয়া।

১৩. প্রথমেই খানা দিয়েই আরম্ভ করবে। কেউ কেউ নেমক (লবণ) দ্বারা খানা শুরু এবং শেষ করাকে সুন্নাত বলেছেন, এটা ঠিক নয়।

১৪. প্রথমে পাত্রের মাঝখান থেকে খানা নিবে না বরং পাশ থেকে নিতে থাকবে, কেননা মাঝখানে বরকত নাযিল হয়।

১৫. খেজুর বা এ জাতীয় খাদ্য যেমন বিস্কুট মিষ্টান্ন একটা একটা করে খাওয়া, একসঙ্গে একাধিক সংখ্যক করে না খাওয়া।

১৬. গরম খাদ্য/পানীয় ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা না করা।[১]

১৭. খাদ্যদ্রব্য পড়ে গেলে তা উঠিয়ে (প্রয়োজনে পরিষ্কার করে) খাওয়া সুন্নাত।

১৮. খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন দোষত্রুটি না লাগানো উচিত। রান্নার দোষ বলা খাদ্যদ্রব্যের দোষ বলার অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৯. খাওয়ার সময় এমন সব কথা বা আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিৎ, যাতে অন্যের মনে ভয় বা ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে।[২]

২০. পেটে কিছু ক্ষুধা থাকা অবস্থায়ই খানা শেষ করা উত্তম।

২১. খাবারের বর্তন, পেয়ালা ইত্যাদি সাফ করে খাওয়া এবং আঙ্গুলসমূহ ভাল করে চেটে খাওয়া সুন্নাত। আঙ্গুল চাটার সুন্নাত তারতীব হল— প্রথমে মধ্যমা, তারপর তর্জনী, তারপর বৃদ্ধা। আর খাওয়ার মধ্যে পাঁচ আঙ্গুল ব্যবহৃত হলে তারপর অনামিকা, তারপর কনিষ্ঠা।[৩]

---

١. مفاتيح الجنان نقلا عن العوارف ا ٢. شرح شرعة الاسلام ا ٣. الذخيرة ا

২২. দস্তরখানা উঠানোর পূর্বে সকলে উঠে যাবে না। এটাই আদব। বরং দুই-একজন থাকা অবস্থাতেই দস্তরখান উঠানো সেরে ফেলা চাই। দস্তরখানা উঠানোর দুআ পড়বে। দেখুন সপ্তম অধ্যায়।

২৩. খাওয়ার শেষে উভয় হাত কব্জিসহ ধৌত করা সুন্নাত। সাবান, বেশন ইত্যাদি ব্যবহার করে হাত পরিষ্কার করাতেও ক্ষতি নেই।[১]

২৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার শেষে হাত এবং মাথায় ভিজা হাত বুলিয়ে নিতেন। রুমাল ইত্যাদি দ্বারা হাত মুছে নেয়াতেও দোষ নেই।[৫] বর্তমানে প্রচলিত হাত পরিষ্কার করার জন্য টিস্যু পেপার ব্যবহার করাতেও কোন ক্ষতি নেই।

মজলিসে খানার সুন্নাত ও আদবসমূহ

* প্রথমে ছোটদেরকে হাত ধোয়ানো তারপর গুরুজনদেরকে হাত ধোয়ানো আদব, যাতে গুরুজনদেরকে ছোটদের অপেক্ষা করতে না হয়।[২]

* খানা পরিবেশনকারী তার ডান দিক থেকে বাম দিকে পর্যায়ক্রমে খানা পরিবেশন করবে।

* ইল্ম, আমল, পরহেযগারী ও বয়সে যারা বড়, তাদের দ্বারা প্রথমে খাওয়া আরম্ভ হওয়া আদব।

* কারও লোকমার দিকে নযর না করা আদব।

* যেখান থেকে খানা বণ্টন করা হয় সেখানে নযর না করা আদব। এতে লোভ প্রকাশ পায়।

* নিজের খাওয়া শেষ হলেও উঠে না যাওয়া এবং হাত নাড়া-চাড়া করতে থাকা, যেন অন্যরা লজ্জায় তৃপ্ত হওয়ার পূর্বেই খানা শেষ করে না বসে।

অমুসলিমদের সাথে পানাহার এবং তাদের তৈরী করা খাদ্য-খাবারের মাসায়েল

* অমুসলিমদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয নয়। অমুসলিমদের তৈরী ও রান্না করা খাদ্য খাবার, মিষ্টি ইত্যাদি ক্রয় করা এবং খাওয়া জায়েয, যদি বাহ্যিকভাবে তাতে কোন নাপাক বস্তুর মিশ্রণ বোঝা না যায়। তবে মুসলমান ভাইয়ের উপকারের উদ্দেশ্যে মুসলমানের দোকান থেকে ক্রয় করলে উত্তম হবে।[৩]

---

১. خزانة المفتين ॥ ২. مفاتيح الجنان نقلا عن الظهيرية ॥ ৩. امداد الفتاوى ج/٤ ॥

* অমুসলিমদের সাথে একত্রে বসে বা তাদের বরতনে খাওয়া মাকরূহ, তবে ঠেকাবশতঃ হলে জায়েয। আর যদি জানা থাকে যে, তাদের বরতন নাপাক তাহলে জায়েয নয়।[১]

মেহমানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ

মেহমান বলা হয় অতিথিকে। আর যার কাছে মেহমান যায়, তাকে বলা হয় মেজবান।

* কেউ নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াত দিলে তা কবূল করবে (এটা সুন্নাত) তবে দাওয়াত দাতার সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ সম্পদ হারাম উপায়ে অর্জিত হলে তার দাওয়াত কবূল করা উচিত নয়।

* সুন্নাতের অনুসরণ ও মুসলমানদের মন খুশী করার নিয়তে দাওয়াত কবূল করতে হবে। একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি দাওয়াত দিলে তাদের মধ্যে যার ঘর অধিক নিকটে তার দাওয়াত কবূল করা সুন্নাত।[২]

* দাওয়াত ছাড়া বা আগে জানানো ছাড়াই খাওয়ার সময় কারও নিকট মেহমান হিসেবে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। একান্তই এরূপ সময় যেতে হলে বাইরে থেকে খেয়ে যাবে, যাতে অসময়ে মেজবানকে খানা পাকানোর বা খানার ব্যবস্থা করার বিড়ম্বনা পোহাতে না হয়। কিংবা তাদের খাবার মেহমানকে দিয়ে তাদেরকে অভুক্ত থাকতে না হয়। আর বাইরে থেকে খেয়ে গেলে গিয়েই মেজবানকে তা অবহিত করা আদব। অন্যথায় মেহমানের খানার প্রয়োজন ভেবে মেজবান খাবারের ব্যবস্থা করবে, তারপরে দেখা যাবে মেহমানের প্রয়োজন নেই। এতে করে খাবার নষ্ট হবে কিংবা অন্ততঃ মেজবান বিব্রতবোধ করবেই।[৩] তবে বিশেষ কারও ব্যাপারে যদি জানা থাকে যে, পূর্ব এত্তেলা ছাড়া মেহমান হলেও তিনি কোনরূপ বিব্রতবোধ করবেন না, তাহলে তার ব্যাপারটা ভিন্ন।

* দাওয়াত দেয়া হয়নি এমন কাউকে মেহমান সাথে আনবে না। আনলে মেজবানের অনুমতি গ্রহণ করবে। তবে মেজবানের কোনই আপত্তি থাকবে না এমন বুঝতে পারলে অনুমতির প্রয়োজন নেই।

* মেহমান মেজবান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বসবে এবং থাকবে।

* মেহমান মেজবানের অনুমতি বা সম্মতি ব্যতীত কাউকে ডেকে খানায় শরীক করবে না বা কাউকে খানা থেকে কিছু প্রদান করবে না।

---

১. فتاوی محمودیہ ج/৫ । ২. گلزار سنت । ৩. آداب المعاشرت ।

* মেহমান খাওয়ার মজলিসে এমন কিছু আবদার করবে না, যা যোগাড় করা মেজবানের জন্য মুশকিল হতে পারে।

* খাওয়ার ব্যাপারে মেহমানের কোন বাছ-বিচার থাকলে কিংবা বিশেষ কোন অভ্যাস বা রুটিন থাকলে পূর্বেই তা মেজবানকে অবহিত করা উচিত। দস্তরখানে এসে এরূপ কিছু উত্থাপন করে মেজবানকে বিব্রত করা উচিৎ নয়।[১]

* কোন বিশেষ অসুবিধা না থাকলে মেজবান কর্তৃক উপস্থিত সব রকম খাবার থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করে তাকে খুশী করা উচিত।

* মেহমান মেজবানের নিকট এত বেশী সময় বা এত বেশী দিন অবস্থান করবে না, যাতে মেজবানের কষ্ট, ক্ষতি বা বিরক্তি হতে পারে। এরূপ করা নিষিদ্ধ।

* মেজবান থেকে অনুমতি নিয়ে বিদায় গ্রহণ করা আদব।

মেজবানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ

* মেহমানকে সাদর অভ্যর্থনার সাথে, সম্মানের সাথে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবে।

* খাওয়ার সময় হয়ে গেলে যথাশীঘ্র মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করা আদব।[২]

* মেজবান অতিরিক্ত খাওয়ার জন্য মেহমানকে পীড়াপীড়ি করবে না। অনেকে মেহমানকে বেশী খাওয়াতে পারলে আনন্দ বোধ করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার—খাওয়ার পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে মেহমানের কষ্ট হতে পারে, আর মেহমানকে কষ্ট দেয়া ভাল কাজ হতে পারে না।

* সম্ভব হলে মেহমানের রুচির প্রতি লক্ষ রেখে খাদ্য প্রস্তুত করবে।[৩]

* সাধ্য এবং প্রচলন অনুযায়ী মেহমানের জন্য অন্ততঃ একদিন আড়ম্বরের সাথে খাবারের আয়োজন করা সুন্নাত।

* বিদায়ের সময় মেহমানকে ঘর থেকে দরজা পর্যন্ত পৌছানো সুন্নাত।[৪]

ঘরে প্রবেশের মাসায়েল

* ঘরে প্রবেশের পূর্বে ঘরবাসীর অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব। এমনকি পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও পুত্র-কন্যার ঘর হলেও অনুমতি গ্রহণ করা জরুরী। একমাত্র যে ঘরে শুধু প্রবেশকারীর স্ত্রী বা স্বামী থাকে সেখানে উক্ত প্রবেশকারীর জন্য অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়, তবে সেখানেও কাশি দিয়ে, জুতার শব্দ করে বা যে কোনভাবে সাড়া দিয়ে প্রবেশ করা মোস্তাহাব ও উত্তম।

---

১. اسلامی تہذیب । ২. شرح شرعۃ الاسلام । ৩. اسلامی تہذیب । ৪. তা'লীমুদ্দীন ।

* অনুমতি গ্রহণের সুন্নাত-তরীকা হল : দরজার বাইরে থেকে সালাম দিবে কিংবা সালাম দিয়ে বলবে আসতে পারি? ভিতর থেকে সাড়া না পেলে আবার সালাম দিবে। এভাবে তিনবার করবে। তারপরও যদি ভিতর থেকে কোন সাড়া না আসে, তাহলে সেখান থেকে চলে আসবে। উল্লেখ্য যে, এই সালামকে বলা হয় 'সালামে ইস্তি'যান' বা অনুমতি গ্রহণের সালাম। এই সালামের উত্তর ওয়ালাইকুমুস সালাম... নয় বরং এর উত্তর হল প্রবেশের অনুমতি দেয়া বা না দেয়া। প্রবেশের অনুমতি দিলে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সময় স্বাভাবিক সালাম জওয়াব আদান-প্রদান করতে হবে।

* অনুমতি চাওয়ার জন্য দরজায় করাঘাত করা, কড়া নাড়ানো কিংবা বর্তমানে প্রচলিত কলিং বেল বাজানো দ্বারাও অনুমতি চাওয়ার হুকুম আদায় হয়ে যাবে।

* অনুমতি চেয়ে এমন স্থানে দাঁড়াবে, যাতে গায়রে মাহরাম কেউ দরজা/জানালা খুললে বা পর্দা সরালে নযরে না পড়ে কিংবা কোনভাবে গোপন কিছু নযরে না আসে।

* ভিতর থেকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কে? তাহলে এরূপ বলবে না যে, "আমি" বরং পরিষ্কার নিজের নাম বলবে যে, আমি অমুক বরং প্রয়োজনে নিজের পরিচয়ও বলবে।

* 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান পা দিয়ে প্রবেশ ঘরে প্রবেশ করা সুন্নাত।

* ঘরে প্রবেশের দুআর জন্য দেখুন সপ্তম অধ্যায়।

* ঘরে প্রবেশ করে ঘরবাসীকে সালাম দিবে। ঘরে কোন লোক না থাকলে এই বলে সালাম দিবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ অর্থ : হে গৃহবাসী, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কেউ ঘুমন্ত এবং কেউ জাগ্রত থাকলে জাগ্রতদেরকে এমনভাবে সালাম দিবে যেন ঘুমন্তদের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়।[১]

ঘর থেকে বের হওয়ার মাসায়েল

* বিসমিল্লাহ বলে দরজা খুলবে। এবং বের হওয়ার দুআ পড়ে বের হবে। দুআর জন্য দেখুন সপ্তম অধ্যায়।

* ডান পা দিয়ে বের হবে। (যদি নেক কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়)

* বের হয়ে আয়াতুল কুরসী পড়বে।

---

১. মা'আরেফুল কুরআন معارف القرآن ও مسائل وآداب ملاقات شرح الاسلام প্রভৃতি থেকে গৃহীত।

রাস্তা-ঘাটে চলার মাসায়েল

* বড় রাস্তা হলে ডান দিক দিয়ে চলবে।

* স্বামীর সাথে বা মুরব্বীদের সাথে চললে পিছে পিছে চলবে।

* দৃষ্টি নত করে চলবে।

* হাত পা ছুড়ে ছুড়ে অহংকারের সাথে চলবে না।

* রাস্তা অতিক্রম করার সময় যথাসম্ভব দ্রুত চলবে।

* উপর দিকে উঠার সময় ডান পা আগে বাড়ানো এবং 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নাত। নীচের দিকে নামার সময় বাম পা আগে বাড়ানো এবং 'সুবহানাল্লাহ' বলা সুন্নাত। আর সমতল স্থান দিয়ে চলার সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সুন্নাত।

যানবাহনে চলার মাসায়েল

* বিসমিল্লাহ বলে যানবাহনে আরোহণ করা সুন্নাত।

* যানবাহনে প্রথমে ডান পা রাখা সুন্নাত। বিসমিল্লাহ বলতে বলতে ডান পা রাখবে।

* ভালভাবে আসন গ্রহণের পর আলহামদু লিল্লাহ বলবে।

* তারপর (যানবাহন চলতে শুরু করলে) নিম্নোক্ত দুআ পড়া সুন্নাত—

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّ لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

* তারপর তিনবার "আলহামদু লিল্লাহ" বলবে।

* তারপর তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলবে।

* তারপর নিম্নোক্ত দুআ পড়বে—

سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

* নৌকা, জাহাজ, পুল ইত্যাদিতে চড়লে তার দুআর জন্য দেখুন সপ্তম অধ্যায়।

সফরে যাওয়ার মাসায়েল

* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার সফরে যাওয়াকে অধিক পছন্দ করতেন। সোমবার সফর করাও সুন্নাত। এ ছাড়া যে কোন দিন সফর করা যায়। ইসলামে অমুক অমুক দিন বা অমুক অমুক সময় যাত্রা খারাপ—এরূপ কোন ধারণা নেই।

বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবত কেন আসে এবং তখন কী করণীয়?

মানুষের উপর বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত কখনও তার পাপের কারণে এসে থাকে। এটা এ জন্যে এসে থাকে যেন সে ভবিষ্যতে পাপের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায়। অতএব এ বিপদ-আপদ তার প্রতি এক প্রকার রহমত।

আবার কখনও বিপদ-মুসীবত তার পরীক্ষাস্বরূপ এবং তার দরজা বুলন্দ করার জন্যও এসে থাকে। এটাও তার প্রতি আল্লাহ্র রহমত। তবে বিপদ-আপদ আসলে এটা নিজের পাপের কারণেই এসেছে তাই মনে করতে হবে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে বিনয়ী হতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আর বিপদ থেকে পরিত্রাণ চাইতে হবে। এ কথা বলা যাবে না কিংবা মনে করা যাবে না যে, আমার পরীক্ষা চলছে, কেননা এরূপ বলা বা মনে করার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হতে পারে যে, আমার পাপ নেই। অতএব পাপের কারণে আমার এ বিপদ ঘটেনি বরং আমি পরীক্ষা দিয়ে মর্যাদা বুলন্দ হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এটা এক ধরনের বড়াঈ বা অহংকারের শামিল হয়ে যেতে পারে।

সারকথা, বিপদ-আপদের সময় করণীয় হল :

(ক) বিপদ-আপদকে আল্লাহ্র রহমত মনে করতে হবে।

(খ) তা নিজের পাপের কারণে ঘটেছে ভেবে আল্লাহ্র কাছে বিনয়ী হতে হবে।

(গ) পরিত্রাণের জন্য দুআ করতে হবে। আল্লাহর নিকট বিপদ চেয়ে নেয়া ঠিক নয়।

(ঘ) সবর করতে হবে—বে-সবরী ও হা হুতাশ করা যাবে না।

* যে কোন সমস্যা ও বিপদ-মুছীবত দেখা দিলে দুই রাকআত 'সালাতুল হাজত' নামায পড়ে আল্লাহ্র নিকট তা থেকে পরিত্রাণের জন্য দুআ করা সুন্নাত। বিপদ-আপদ বা সমস্যা দেখা দিলে সেই পেরেশানীতে পড়ে আল্লাহ থেকে বিমুখ হওয়া এবং ইবাদত ও আল্লাহ্র স্মরণ থেকে পিছিয়ে পড়া অন্যায়।

* ছোট-বড় যে কোন ধরনের বিপদ দেখা দিলে এমনকি শরীরে কাঁটা বিদ্ধ হলেও নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে—

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا. (مسلم)

* কোন কিছু হারিয়ে গেলে ৪১ বার 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়া অত্যন্ত ফলদায়ক এবং এটা পরীক্ষিত আমল।

চিকিৎসার মাসায়েল

* রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা করানো এবং ঔষধ সেবন করা মোস্তাহাব।[১] কেউ কেউ বলেন চিকিৎসা করানো সুন্নাত। চিকিৎসা করাতে থাকবে, কিন্তু রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখতে হবে।

* শরীয়তের বরখেলাপ তাবীজ-তুমার, ঝাড়-ফুঁক ব্যবহার করা জায়েয নয়। শরীয়তসম্মত তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা হলে তা করা যায়, তবে উত্তম নয়।[২]

* শরীরে যদি অস্বাভাবিকতা থাকে (যেমন আঙ্গুল বেশী আছে) তাহলে প্লাস্টিক সার্জারি করা জায়েয। নিছক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য জায়েয নয়।

* চিকিৎসা অবস্থায় রোগের জন্য ক্ষতির বস্তু থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।[৩]

রোগ অবস্থায় রোগীর যা যা করণীয়

* রোগকে আল্লাহ্র নেয়ামত মনে করবে; কেননা, আল্লাহ পাক যাকে ভালবাসেন তাকেই কোন বিপদ দিয়ে থাকেন। তবে রোগ মুক্তির জন্য চিকিৎসা করা বা দুআ করা এ ধারণার পরিপন্থী নয়। কারণ, রোগমুক্তি এবং নিরাপদ থাকাও আল্লাহ্র নিকট নেয়ামত। দুর্বল বান্দার পক্ষে এই প্রকারের নেয়ামতই আহ্বান।

* রোগকে গোনাহ মোচনের ওছীলা মনে করবে।

* মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করবে। তবে মৃত্যু কামনা করা নিষেধ। একান্ত কষ্ট-যন্ত্রণায় অপারগ হয়ে গেলে নিম্নোক্ত দুআ করা যায়—

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِنْ كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! যতক্ষণ আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর, ততক্ষণ তুমি আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি মৃত্যুই আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে (ঈমানের সাথে) আমার মৃত্যু ঘটাও।[৪]

* অসুস্থ অবস্থায় সমস্ত গোনাহ থেকে তাওবা করবে।

* ধৈর্য-ধারণ করবে।

* চিকিৎসা করাবে। চিকিৎসা করানো সুন্নাত।

---

১. امداد ج/۸ । ২. تعلیم الدین । ৩. رسول اللہ ﷺ کی سنتیں । ৪. বোখারী ও মুসলিম।

* যিকির, দুআ, নামায ও তিলাওয়াত পূর্বক শেফা কামনা করবে।

* রোগের মাত্রা অধিক করে প্রকাশ করবে না, যেমন : কেউ এলে বসা থেকে শুয়ে যাওয়া কিংবা কাতরাতে থাকা ইত্যাদি। এর দ্বারা নিজেকে বেশী অসুস্থ করে দেখানোর দ্বারা আল্লাহ্‌র না-শোকরী প্রকাশ পায় তদুপরি এতে অন্যদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়।

* যত্ন-সেবাকারীদের প্রতি রাগান্বিত হবে না।

* খাদ্য-খাবারের প্রতি রাগ প্রকাশ করবে না।

* মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলে মনে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের আশা প্রবল করা সুন্নাত।

* মুমূর্ষু ব্যক্তি জীবনের ভাল-মন্দ কার্যাবলী সম্পর্কে মনে মনে হিসাব নিকাশ ও পর্যালোচনা করবে না। কেননা, এতে মন্দের পরিমাণের আধিক্য দেখে আল্লাহ্‌র রহমত পাওয়ার আশা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

* ঋণ থাকলে তা পরিশোধ এবং নামায-রোযার ফেদিয়া প্রদান বা যে কোন মালী ইবাদত অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করার ওসিয়ত করবে। সে যদি এতটুকু সম্পদ রেখে যায় যা দ্বারা এসব আদায় করা সম্ভব, তাহলে মৃত্যুর পূর্বে এ ওসিয়ত করা ওয়াজিব।

* মৃত্যুর পর জানাযা, কবর নির্মাণ, দাফন-কাফন, ঈছালে ছওয়াব ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে সব অনিয়ম, বিদআত ও রছম পালন করা হয়, তা থেকে ওয়ারিছ ও আপনজনকে বিরত থাকার ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব।

* মৃত্যুকে খারাপ মনে করবে না বরং ভাল মনে করবে। কেননা, মৃত্যু দ্বারা পাপ থেকে রক্ষা ও পৃথিবীর এই কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং মৃত্যু আল্লাহর কাছে তার পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যম।

* মুমূর্ষু অবস্থায় বেশী বেশী আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল থাকা সুন্নাত।

* খাঁটি অন্তরে এখলাসের সাথে মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করতে থাকবে।

মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যারা উপস্থিত থাকে তাদের যা যা করণীয়

* মুমূর্ষু রোগীর পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা মোস্তাহাব। এতে মৃত্যু-যন্ত্রণা হ্রাস পায়। রোগী ছোট হোক বা বড় উভয়ের ক্ষেত্রে এটা করা মোস্তাহাব।

* মুমূর্ষু রোগীকে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের সুসংবাদ প্রদান করতে হবে, যাতে তার মনে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের আশা প্রবল হয়।

* তার পাশে অনুচ্চস্বরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়তে থাকবে, যেন সে এটা শুনে নিজেও মুখে বা মনে মনে তা পড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। তাকে এই কালেমা পড়ার নির্দেশ দিবে না, কেননা যন্ত্রণা এবং কষ্টবশতঃ পড়তে অস্বীকার করে বসলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

* মুমূর্ষু রোগীর নিকট থেকে হায়েয-নেফাসওয়ালী মহিলা এবং যার উপর গোসল ফরয— এরূপ ব্যক্তিদেরকে সরিয়ে দিবে।

* মুমূর্ষু রোগীকে কেবলামুখী করে শুইয়ে দেয়া সুন্নাত। এই কেবলামুখী দুভাবে করা যায় (১) চিত শোয়া অবস্থায় পা কেবলার দিকে করে এবং মাথা উঁচুতে রেখে। (২) উত্তর দিকে মাথা রেখে ডান কাতে শুইয়ে। তবে কেবলামুখী করতে গিয়ে রোগীর খুব বেশী কষ্ট হলে তাকে নিজের অবস্থায়ই থাকতে দিবে।

* তার নিকট সুগন্ধি উপস্থিত করবে এবং আশপাশ সুগন্ধিযুক্ত করবে। কেননা, মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়।

* নেককার লোকদেরকে পাশে সমবেত করবে।

* রূহ কব্‌জ হওয়া পর্যন্ত তার নিকট কুরআন পাঠ করতে থাকবে।

মৃত্যুর পর করণীয়

* নিজের সামনে কারও মৃত্যু হলে বা কারও মৃত্যু সংবাদ শুনলে নিম্নোক্ত দুআ পড়তে হয়—

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

* মৃত্যু হয়ে গেলে একটা চওড়া পট্টি দ্বারা মৃতের থুতনীর নীচ দিক থেকে নিয়ে মাথার উপর গিরা দিয়ে বেঁধে দিবে।

* মৃতের চক্ষু বন্ধ করে দিবে।

* মৃতের দুই পায়ের দুই বৃদ্ধ আঙ্গুল একত্রে মিলিয়ে বেঁধে দিবে।[১]

* মৃতের উভয় হাত ডানে বামে সোজা করে রাখবে, সিনার উপর তুলে রাখবে না।

---

১. بہشتی زیور ।

* একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখবে।[১] কোন চৌকি বা খাটের উপর মাইয়েতকে রাখবে; মাটির উপর রাখবে না।[২] মৃতের পেটের উপর কোন লম্বা লোহা বা ভারি বস্তু দ্বারা চাপা দিয়ে রাখবে, যাতে পেট ফুলে যেতে না পারে।[৩]

* হায়েয-নেফাসওয়ালী মহিলাকে মাইয়েতের কাছে আসতে দিবে না।[৪]

* সম্ভব হলে খুশবূ (আগরবাতি প্রভৃতি) জ্বালিয়ে মৃতের কাছে রাখবে।[৫]

* যথাসম্ভব লোকদেরকে মৃত্যুর সংবাদ অবগত করাবে।[৬]

* মাইয়েতের জন্য এস্তেগফার করতে থাকবে।[৭]

* দ্রুত দাফন-কাফন সম্পন্ন করবে। এটাই উত্তম। জানাযার নামাযে অধিক লোক হওয়ার আশায় জানাযায় বিলম্ব করবে না। এরূপ করা মাকরূহ ও অনুচিত।[৮]

* মৃতকে গোসল দেয়ার পূর্বে তার নিকট কুরআন শরীফ পাঠ করা নিষেধ।[৯]

* আপনজনের মৃত্যুতে যে কষ্ট হয় তার জন্য ছওয়াব হবে— এই আশা রাখতে হবে। কারও মৃত্যুতে মাতম করা, জামা কাপড় ফাড়া-ছেঁড়া করা, বুক চাপড়ানো, ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা, চিৎকার করে কাঁদা জায়েয নেই। মনের দুঃখে স্বাভাবিকভাবে যে চোখের পানি বা রোদন এসে যায় তা নিষিদ্ধ নয়।

কাফন-দাফন

কাফনের কাপড়ের মাসায়েল

* মাইয়েতকে কাফনের কাপড় দেয়া ফরযে কেফায়া।

* মাইয়েত জীবনে সাধারণতঃ যে মানের কাপড় পরিধান করত, তার কাফনও উক্ত মানের হওয়া উচিত।

* কাফন সাদা রংয়ের হওয়া উত্তম। নতুন বা পুরাতন উভয়টিই সমান। কাফনের কাপড় পবিত্র হতে হবে।

* পুরুষের কাফনে তিনটা কাপড় হওয়া সুন্নাত। যথা :

১। ইজার : এটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হয়।

---

১. احکام میت । ২. ایضا । ৩. ایضا । ৪. ایضا । ৫. ایضا । ৬. بہشتی زیور । ৭. احکام میت ।
৮. احسان الفتاوی । ৯. বেহেশতী জেওর ।

২। লেফাফা/চাদর : এটা ইজার থেকে ৪ গিরা (৯ ইঞ্চি) লম্বা হয়।

৩। কুর্তা/জামা : (হাতা ও কল্লীবিহীন) এটা গর্দান থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হয়।

* মহিলাদের কাফনে পাঁচটা কাপড় হওয়া সুন্নাত। উপরোক্ত তিনটা এবং নিম্নের দুইটা।

৪। সীনা বন্দ : এটা বগল থেকে রান পর্যন্ত হওয়া উত্তম। নাভি পর্যন্ত হলেও চলে।

৫। সারবন্দ/উড়না : এটা তিনহাত লম্বা হয়।

বি: দ্র: উপরোক্ত পরিমাণটা সাধারণতঃ বড় মানুষের জন্য, ছোটদের জন্য তার সাইজ অনুসারে কেটে নিতে হবে।

* সর্বমোট কাফনের কাপড় পুরুষের জন্য পৌনে আট গজ থেকে আট গজ এবং মহিলাদের জন্য সোয়া এগার গজ থেকে সাড়ে এগার গজ। মহিলাদের গোসল ও দাফনের সময় পর্দা রক্ষার জন্য যে কাপড়ের প্রয়োজন সেটা এ হিসাবের বাইরে।

মাইয়েতকে গোসল প্রদানের নিয়ম

* পুরুষ মাইয়েতকে পুরুষ এবং নারী মাইয়েতকে নারী গোসল করাবে। আপনজন আপনজনকে গোসল করানো উত্তম।

* গোসলের স্থান পর্দাঘেরা হতে হবে।

* যে খাটিয়ায় গোসল দেয়া হবে প্রথমে তিন-পাঁচ বা সাতবার সেটায় আগরবাতি ইত্যাদির ধোঁয়া দিবে।[১]

* মাইয়েতকে এমনভাবে খাটিয়ায় শোয়াবে, যেন কেবলা তার ডান দিকে থাকে, সম্ভব না হলে যে কোনভাবে শোয়ানো যায়।

* একটা লম্বা মোটা কাপড় দিয়ে মাইয়েতের সতর ঢেকে তার ভিতর থেকে তার শরীরের কাপড় (প্রয়োজনে কেটে) খুলে নিবে।

* মাইয়েতের সতর দেখবে না, সরাসরি হাত লাগাবে না।

* বাম হাতে দস্তানা পরিধান করে বা কোন কাপড় পেঁচিয়ে তা দ্বারা মাইয়েতকে তিন বা পাঁচটা ঢিলা দ্বারা ইস্তেন্জা করাবে, তারপর পানি দ্বারা ইস্তেন্জার স্থান ধৌত করবে।

---

১. بہشتی زیور عن البحر الرائق ॥

* অতঃপর তুলা ভিজিয়ে তা দ্বারা ঠোঁট, দাঁত ও দাঁতের মাঢ়ি মুছে দিবে এবং উক্ত তুলা ফেলে দিবে। এভাবে তিনবার করবে।

* অতঃপর অনুরূপভাবে তিনবার নাকের দুই ছিদ্র পরিষ্কার করবে। তবে গোসলের প্রয়োজন (ফরয) অবস্থায় মৃত্যু হলে বা মহিলার হায়েয-নেফাস অবস্থায় মৃত্যু হলে মুখে এবং নাকে পানি দেয়া জরুরী। পানি দিলে কাপড় বা তুলা দ্বারা উক্ত পানি তুলে নিবে। (আহকামে মাইয়েত)

* অতঃপর মুখ এবং নাক ও কানের ছিদ্রে তুলা দিয়ে দিবে, যেন পানি ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে।

* অতঃপর উযূর ন্যায় মুখ ও উভয় হাত ধৌত করাবে, মাথায় মাসেহ করাবে এবং উভয় পা ধৌত করাবে।

* অতঃপর সাবান বা এজাতীয় কিছু দ্বারা মাথা (পুরুষ হলে দাড়িও) পরিষ্কার করাবে।

* অতঃপর মাইয়েতকে বাম কাতে শুইয়ে বরই এর পাতাসহ সিদ্ধ করা (অপারগতায় সাধারণ) কুসুম গরম পানি দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডান পাশে তিনবার এতটুকু পানি ঢালবে যেন নীচের দিকে বাম পার্শ্ব পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

* অতঃপর অনুরূপভাবে ডান কাতে শুইয়ে বাম পাশে তিনবার পানি ঢালবে।

* অতঃপর গোসলদাত্রী মাইয়েতকে তার শরীরের সাথে টেক লাগিয়ে বসাবে এবং পেটকে উপর দিক থেকে নীচের দিকে আস্তে আস্তে মর্দন করবে এবং চাপ দিবে। এতে কিছু মল-মূত্র বের হলে তা মুছে ফেলে ধুয়ে দিবে।

* অতঃপর মাইয়েতকে বাম কাতে শুইয়ে কর্পূর মিলানো পানি ডান পাশে মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনভাবে ঢালবে, যেন নীচে বাম পাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

* অতঃপর আর একটি দস্তানা পরিধান করে বা কাপড় হাতে পেঁচিয়ে সমস্ত শরীর কোন কাপড় দ্বারা মুছে শুকিয়ে দিবে। এরপর মাইয়েতকে কাফনের কাপড় পরিধান করাবে।

এ হল মাইয়েতকে গোসল দেয়ার সুন্নাত তরীকা।

* মাইয়েতকে গোসল দেয়ার পর গোসলদাত্রীর নিজেরও গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব।[1]

---

১. ردالمحتار ؛

* গোসলদাত্রী মাইয়েতের কোন দোষ (যেমন চেহারা বিকৃত হওয়া, কাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি) দেখলে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করবে না। পক্ষান্তরে তার কোন ভাল কিছু দেখতে পেলে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করা মোস্তাহাব।

কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (মহিলার)

* কাফনের কাপড়ে সর্বপ্রথম তিন, পাঁচ বা সাতবার আগরবাতি প্রভৃতির ধোঁয়া দিবে।[১]

* প্রথমে লেফাফা বিছাবে, তারপর ইজার, তারপর সারবন্দ, তারপর সীনাবন্দ, তারপর কুর্তা/জামার নীচের অর্ধাংশ। তারপর মাইয়েতকে কাফনের উপর চিত করে শোয়াবে। অতঃপর পূর্ববর্ণিত নিয়মানুযায়ী প্রথমে কোর্তা/জামা পরিধান করাবে, অতঃপর মাইয়েতের শরীরের থেকে গোসলের কাপড় বের করে নিবে এবং নাক, কান ও মুখ থেকে তুলা বের করে নিবে। অতঃপর পূর্বোক্ত নিয়মে খুশবু এবং কর্পূর লাগাবে (মহিলাকে খুশবুর স্থলে জাফরানও লাগানো যায়) অতঃপর মাথার চুল দুই ভাগ করে জামার উপর সীনার পরে রেখে দিবে— একভাগ ডান দিকে আরেক ভাগ বাম দিকে। অতঃপর সারবন্দ বা উড়না মাথা এবং চুলের উপর রেখে দিবে (বাঁধবে না বা পেঁচাবে না) অতঃপর সীনাবন্দ বগলের নীচে দিয়ে প্রথমে বাম দিকে অতঃপর ডান দিক জড়াবে। অতঃপর ইজারের বাম দিক তারপর ডান দিক এমনভাবে উঠাবে যেন সারবন্দ তার ভিতর এসে যায়। তারপর লেফাফা অনুরূপভাবে প্রথমে বাম পাশে তারপর ডান পাশে উঠাবে এবং সবশেষে পূর্বোক্ত নিয়মে তিন স্থানে বেঁধে দিবে। উল্লেখ্য, সীনাবন্দ ইজার ও লেফাফার মধ্যে বা সব কাপড়ের উপর বাইরেও বাঁধা যায়।

কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (পুরুষের)

* কাফনের কাপড়ে সর্বপ্রথম তিন, পাঁচ বা সাতবার আগরবাতি প্রভৃতির ধোঁয়া দিবে।[২]

* তারপর প্রথমে লেফাফা বিছাবে, তার উপর ইজার তার উপর কোর্তা/জামার নীচের অর্ধাংশ বিছাবে এবং অপর অর্ধাংশ মাথার দিকে গুটিয়ে রাখবে। তারপর মাইয়েতকে এই বিছানো কাফনের উপর চিত করে শোয়াবে

---

১. بہشتی زیور نقلا عن مجمع الانہر । ২. ایضا ।

এবং কোর্তা/জামার গুটানো অর্ধাংশ মাথার উপর দিয়ে পায়ের দিকে এমনভাবে টেনে আনবে যেন কোর্তার/জামার ছিদ্র (গলা) মাইয়েতের গলায় এসে যায়। এরপর গোসলের সময় মাইয়েতকে যে কাপড় পরানো হয়েছিল সেটা বের করে নিবে এবং নাক, কান ও মুখ থেকে তুলা বের করে নিবে। তারপর মাথা ও দাড়িতে আতর প্রভৃতি খুশবু লাগাবে। অতঃপর কপাল, নাক, উভয় হাতের তালু, উভয় হাঁটু ও উভয় পায়ে (সাজদার অঙ্গসমূহে) কর্পূর লাগাবে। তারপর ইজারের বামপাশ উঠাবে অতঃপর ডান পাশ (ডান পাশ উপরে থাকবে) তারপর লেফাফার বাম পাশ অতঃপর ডানপাশ উঠাবে। অতঃপর কাপড়ের লম্বা টুকরা বা সুতা দিয়ে মাথা এবং পায়ের দিকে এবং মধ্যখানে (কোমরের নীচে) বেঁধে দিবে, যেন বাতাসে বা নড়াচড়ায় কাফন খুলে না যায়।

মাইয়েতের পরিবারের সাথে অন্যদের যা যা করণীয়

* প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদের জন্য মোস্তাহাব হল মৃতের পরিবারের জন্য এক দিনের খাবার তৈরি করে পাঠাবে এবং দুঃখের কারণে তারা খেতে না চাইলে অনুরোধ করে খাওয়াবে।[১]

* মৃতের পরিবারকে তিন দিনের মধ্যে (এক বার) সান্ত্বনা জানানো মোস্তাহাব। দূরের লোকেরা শোকবার্তা প্রেরণের মাধ্যমে অর্থাৎ, পত্র বা ফোনের মাধ্যমেও এ মোস্তাহাব আদায় করতে পারেন। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে তাযিয়াত বলা হয়।

* স্বতন্ত্রভাবে একাকী তাযিয়াত করা সুন্নাত। তবে ঘটনাক্রমে যদি একাধিক লোক একত্রিত হয়ে যায়, তাতে কোন অসুবিধা নেই।[২]

* তাযিয়াতের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(ক) সান্ত্বনাবাণী।

(খ) সবর ও ধৈর্যের ফযীলত বর্ণনা এবং ধৈর্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

(গ) আপনজনের মৃত্যুজনিত কষ্টের জন্য তাদের ছওয়াব লাভের উল্লেখ।

(ঘ) তাযিয়াতের সময় হাত উঠানো ব্যতীত নিম্নোক্ত দুআ পড়া—

أَعْظَمَ اللّٰهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ . (احسن الفتاوى)

---

১. احکام میت از شامی ورد محتار ॥ ২. احسان الفتاوی ॥

* তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে তাযিয়াত করা মাকরূহ, তবে সফরে থাকার কারণে এ সময়ের মধ্যে তাযিয়াত করতে না পারলে এরপরও করতে পারেন।

* তাযিয়াতকারীগণ মৃতের পরিবারের উপর তাদেরকে আপ্যায়ন করানোর বোঝা চাপাবে না। দেখা যায় মৃতের পরিবার শোকের মধ্যে থাকে, আর আমরা তাদের সেখানে খাওয়ার সময়ও ভিড় করে থাকি। এটা অমানবিকতা এবং সুন্নাতের পরিপন্থী।[১]

ঈছালে ছওয়াব ও তার তরীকা

নফল ইবাদত (যেমন : নফল নামায, নফল রোযা, নফল হজ্ব ইত্যাদি) তেলাওয়াত, যিকির-আযকার ও দান-সদকা করে তার ছওয়াব (মৃত বা জীবিতকে) পৌছে দেয়া এবং মাইয়েতের জন্য দুআ করাকে ঈছালে ছওয়াব বলে। ঈছাল শব্দের অর্থ পৌছানো। অতএব ঈছালে ছওয়াব অর্থ ছওয়াব পৌছানো।

* ঈছালে ছওয়াব দ্বারা আমলকারীর ছওয়াব কমে না বরং আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমলকারী ও মাইয়েত উভয়কেই পূর্ণ পরিমাণ ছওয়াব দিয়ে থাকেন। কোন আমলের ছওয়াব একাধিক মাইয়েতকে পৌছানো হলে আল্লাহ্‌র রহমতের ব্যাপকতার ভিত্তিতে আশা করা যায় যে, সে ছওয়াব ভাগাভাগি করে নয় বরং প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ পরিমাণ দান করবেন, যদিও যুক্তি অনুযায়ী তা ভাগাভাগি হওয়ারই কথা।

* ইবাদতে মালিয়া অর্থাৎ দান-সদকা দ্বারা ঈছালে ছওয়াব করা উত্তম। এর মধ্যে কয়েকটি স্তর রয়েছে। যথা :

(ক) নগদ অর্থ প্রদান করা সবচেয়ে ভাল। এরূপ অর্থ সদকায়ে জারিয়ার কাজে অর্থাৎ, মসজিদ-মাদ্রাসা প্রভৃতির কাজে ব্যয় করলে আরও উত্তম হবে।

(খ) তারপর কাঁচা খাবার (পাকানো ছাড়া) প্রদান করা।

(গ) আর সর্বনিম্ন স্তর হল খাদ্য-খাবার রান্না করে তা খাওয়ানো।

* ঈছালে ছওয়াবের একটি আদব এই যে, অন্ততঃ কিছু পাঠ করে হলেও (যেমন— তিনবার সূরা এখলাস পাঠ করে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারকে তার ছওয়াব স্বতন্ত্রভাবে পৌছে দিবে।

---

১. احکام میت ۱

* মাইয়েতের আপনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ স্থানে থেকে তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার সম্পাদনপূর্বক কিংবা দুআর মাধ্যমে ঈছালে ছওয়াব করতে পারে। এর জন্য সকলে একত্রিত হয়ে সম্মিলিত ভাবে খতম পড়ার অবশ্যকতা নেই। তদুপরি আজকাল সম্মিলিতভাবে খতম পড়াটা রেওয়াজে পরিণত হযেছে। তাই এই রেওয়াজ পরিত্যাগ করা উচিত।

* টাকা-পয়সার বিনিময়ে কুরআন-খানী বা কোন খতম করালে তাতে কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না। অতএব সেরূপ কুরআন-খানী ও খতমের দ্বারা ঈছালে ছওয়াবও হবে না বরং এরূপ বিনিময় গ্রহণপূর্বক খতম ও কুরআন-খানী করা এবং করানো উভয়টা হারাম। নাজায়েয তরীকায় কিছু করে তার দ্বারা ছওয়াবের আশা করা যায় না।

* ঈছালে ছওয়াবের জন্য কোন দিন তারিখ (যেমন- কুলখানি অর্থাৎ, ৪র্থা, চল্লিশা, বার্ষিকী ইত্যাদি) নির্ধারণ করা রছম ও বিদআত। অতএব তা পরিত্যাজ্য। এসব নির্দিষ্ট দিনের অনুসরণ ছাড়াই ঈছালে ছওয়াব করা উচিত। আজকাল আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে এ বিদআত ছড়িয়ে পড়েছে। তাই এ থেকে খুব বেঁচে থাকা চাই। মাইয়েতের জন্য করতে হবে, তবে সেটা সহীহ্ তরীকায় হওয়া চাই। কোন আমল সহীহ তরীকায় না হলে তা যত টাকা-পয়সা ব্যয় করেই করা হোক না কেন তাতে কোন ছওয়াব পাওয়া যায় না।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত মৃত্যুর পূর্বে আপনজনকে ওসিয়ত করে যাওয়া যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার জন্য যা কিছু করবে, তা যেন সহীহ তরীকায় হয়, কোন বেদআত-রছম অনুসরণ করে না হয়। এরূপ ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। বিশেষতঃ যখন সমাজে মাইয়্যেতকে কেন্দ্র করে যেসব রছম পালন করার রেওয়াজ গড়ে ওঠে, তখন সেসব থেকে যেন ওয়ারিশগণ বেঁচে থাকে তার জন্য ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। যেমন : বর্তমানে প্রচলিত আছে কেউ মারা গেলেই মাইয়েতের পরিবার বা ওয়ারিছগণ ৪র্থ দিনে মীলাদ করে থাকে, ৪০ দিনে চল্লিশা পালন করে থাকে, বৎসরান্তে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে থাকে। এগুলো রছম ও বিদআত। তাই মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেকের কর্তব্য তার ব্যাপারে যেন এগুলো করা না হয়, তার ওসিয়ত করে যাওয়া।

অনেকে মনে করেন কুলখানী, চল্লিশা ইত্যাদি না করলে মানুষে মনে করবে, আমরা মাইয়্যেতের জন্য কিছুই করলাম না, এরূপ মনে করা ঠিক নয়। এরূপ মনে করা দ্বারাই বোঝা যায় আমরা মানুষকে খুশী করার জন্য এগুলো করে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের উচিত মাইয়্যেতের কীভাবে উপকার হয় এবং আল্লাহ কিসে খুশী হন তা দেখা। সহীহ্ তরীকায় আমল করলেই আল্লাহ খুশী হবেন এবং তাতেই মাইয়্যেতের উপকার হবে।[১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সবকিছু সঠিকভাবে বোঝার ও সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

১.ঈছালে ছওয়াব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য احسن الفتاوى ج/١، جواہر الفقہ واحکام میت প্রভৃতি থেকে গৃহীত।

بسم الله الرحمن الرحيم

সপ্তম অধ্যায়

মাছনূন দুআ-দুরূদ

দুআ-দুরূদের গুরুত্ব ও ফায়দা

আমাদের উচিত জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ করা। জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে যেন মনের মধ্যে আল্লাহ্‌র স্মরণ এসে যায়, এজন্য ইসলাম আমাদেরকে একটি বিশেষ শিক্ষা দিয়েছে। আমরা যদি সেই শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করি, তাহলে সারাক্ষণ আমাদের মনে আল্লাহ্‌র স্মরণ উপস্থিত থাকবে এবং খুব সহজে আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক জুড়ে যাবে। সে শিক্ষাটা হল প্রত্যেকটা পদে পদে যে সব দু'আ রাখা হয়েছে, সেই দু'আগুলো পাঠ করা।

জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের দু'আ রাখা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সে সব দু'আ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। খাওয়া-পান করা, উযূ, গোসল, নামায, রোযা, হজ্জ, উমরা, হাঁটা, চলা, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা এমনকি জুতা পরিধান করা পর্যন্ত সব কিছুর জন্য শরীয়ত বিভিন্ন দু'আ রেখেছে। এই দু'আগুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য, রহমত, বরকত ইত্যাদি আনুকূল্য কামনা করা হয়। প্রত্যেকটা কাজ যেন সুন্দরভাবে হয়, প্রত্যেকটা কাজে যেন আল্লাহ্‌র রহমত হয়, তার মধ্যে যেন বরকত হয়, আমাদের জন্য যেন সেটা উপকারী হয়, সুন্দরভাবে যেন আমার সব কাজ সম্পাদন হয়—এসব বিষয় কামনা করা হয়। প্রত্যেকটা পদে পদে এভাবে দু'আ করতে থাকার অর্থ হল তার মনের ভিতর এই চিন্তা আসছে যে, আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া, আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া, আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমার কোন কাজ সু-সম্পন্ন হবে না। এভাবে প্রত্যেকটা পদে

পদে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা প্রকাশ পাবে, প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক জুড়তে থাকবে। অতএব সব কিছুই আল্লাহ্র কাছে চেয়ে নিতে হবে। যেমন একটা উদাহরণ : আমি ভাত খেতে বসব, তখনও আল্লাহ্র কাছে বলে নিব যে, হে আল্লাহ! এই খাবারটা যেন আমার স্বাস্থ্যের উপযোগী হয়, এটা যেন আমার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। দু'আ না করলেও খানার স্বাভাবিক যে ফায়দা এবং আল্লাহ্র যেটা ফয়সালা সেটাতো হবেই, তারপরও আল্লাহ্র কাছে যে চেয়ে নিলাম, এতে আল্লাহ্র সাথে আমার সম্পর্ক জুড়ল। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিতে হবে।

জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে দু'আ আছে। যেমন আমরা ঘর থেকে বের হব, এই বের হওয়ার সময় দু'আ আছে। যখন জামা-কাপড় পরিধান করব, সে সময়ও দু'আ আছে। পেশাব-পায়খানায় যাওয়া, পেশাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর্যন্ত দু'আ রয়েছে। উযূ শুরু করার দু'আ আছে, উযূর মাঝখানে দু'আ আছে, উযূর শেষে দু'আ আছে, গোসলের জন্য দু'আ আছে, শোয়ার সময় দু'আ আছে, যখন ঘুম থেকে উঠব, তখনও দু'আ আছে, খাদ্য-খাবার সামনে আসলে দু'আ আছে, খাওয়া শুরু করব দু'আ আছে, শেষ করব দু'আ আছে। এমনকি দস্তরখানা উঠানোরও দু'আ আছে। কোন কিছু দু'আ থেকে খালি নেই। মানুষ যদি প্রত্যেকটা পদে পদে এই সমস্ত দু'আগুলো পাঠ করে, বিশেষভাবে দু'আগুলোর অর্থ বুঝে পাঠ করে, তাহলে আল্লাহর দিকে মনোযোগ এসেই যাবে। কারণ এই সব দু'আর মধ্যে সুন্দর সুন্দর অর্থ রয়েছে। এসব দুআর ভিতরে আল্লাহ্র কথাই বলা হয়েছে— আল্লাহ্র নামে শুরু করার কথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ্র সাহায্য চাওয়া হয়েছে, এই সব কাজে যেন বরকত হয়, এই সব কাজ যেন সুন্দর মত হয়, এই সব কাজ যেন খুব পরিপাটি হয়, কোন অসুবিধার সম্মুখীন যেন হতে না হয়, এ সমস্ত কথাই বলা হয়েছে। তাই যখন এই সব দু'আ পাঠ করা হবে এবং অর্থ বুঝে বুঝে পাঠ করা হবে, তখন দেখা যাবে প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হচ্ছে, সাথে সাথে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠছে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে যাচ্ছে। তদুপরি এসব দুআর প্রত্যেকটার ভিন্ন ভিন্ন অনেক ফযীলতও রয়েছে।

বাচ্চাদেরকে আমরা এই সব দু'আ শিখিয়ে দেই। ওরা সহজে শিখতে পারে। ওদের সহজে মুখস্থ হয়ে যায়। যাদের বয়স বেশী হয়েছে, তাদের

Scanned by CamScanner

জন্য এ সব দু'আ মুখস্থ করা একটু কঠিন লাগতে পারে। তবে মনোযোগ দিলে কঠিন থাকে না। কিছু কিছু দু'আতো আমাদের মুখস্থ আছেই। যেগুলো মুখস্থ নেই, বই দেখে দেখে কিছুদিন আমল করতে থাকলে এক মাস দুই মাস লাগুক, তবুও এক সময় মুখস্থ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ। একান্তই যদি মুখস্থ না হয়, তবুও অন্ততঃ এতটুকু করা যায় যে, প্রত্যেকটা কাজ করার সময় নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে সেই কাজে রহমত, বরকত এবং আছানীর জন্য দু'আ করে নিতে হবে।

সব কিছুই আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিতে বলা হয়েছে। এমনকি হাদীছে এসেছে তোমার জুতা/স্যান্ডেলের ফিতা ছিড়ে গেলে তাও আল্লাহর কাছে চেয়ে নাও। তাই ছোট-বড় সবকিছুই আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে হবে। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেসব দুআ রাখা হয়েছে, সেগুলো পাঠ করে নিলে সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য এবং কল্যাণ চেয়ে নেয়া হবে। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শরীয়তের শিখানো নির্দিষ্ট যে দুআ রয়েছে, তা পাঠ করে নিব। কোন নির্দিষ্ট দুআ না থাকলে নিজের ভাষায় আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করে নেই, নিজের ভাষায় চেয়ে নেই। এভাবে যখন করতে থাকব, তখন পদে পদে আল্লাহকে স্মরণ করা হবে। এভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জুড়ে যাবে। এভাবে করতে থাকলে এক সময় দেখা যাবে প্রতিদিন শত শত বার, হাজার হাজার বার আল্লাহকে স্মরণ করা হচ্ছে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করা হচ্ছে। এরকম হলে আমাদের অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, আমরা দুনিয়ার সব কাজ করে যাব, কিন্তু দিলের ভিতরে দুনিয়া থাকবে না, বরং দিলের ভিতরে থাকবে আল্লাহ। এটাই হল আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক জুড়ে যাওয়া, আল্লাহর সাথে প্রেম হয়ে যাওয়া। যার প্রতি অন্তরে প্রেম এসে যায় সে যা কিছুই করুক সারাক্ষণ তার ধ্যান থাকে প্রেমিকার দিকে। সারাক্ষণ যার মনে আল্লাহ্‌র ধ্যান থাকবে, সেই হল আল্লাহ্‌র আসল প্রেমিক। সারাক্ষণ যার মাথার ভিতরে আল্লাহ্‌র ফিকির, সেইতো আল্লাহ্‌র প্রেমিক। অতএব জীবনের সব কাজে সফলতা অর্জন করার জন্য, ফযীলত অর্জন করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র সাথে মহব্বতের সম্পর্ক জোড়ার জন্য জীবনের সব ক্ষেত্রে শরীয়ত যে সব দুআ শিক্ষা দিয়েছে, সেগুলো জেনে নেই এবং আমল করা আরম্ভ করি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

সকাল-সন্ধ্যার দুআ ও আমল

* যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিনবার

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

পড়ে (বিসমিল্লাহ পড়বে না) সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের দু'আ করতে থাকবে এবং ঐ দিন তার মৃত্যু হলে সে শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করবে। আর সন্ধ্যায় অনুরূপ পাঠ করলে পরবর্তী সকাল পর্যন্ত ঐ মর্তবা হাছেল হবে।[১]

* যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ তিনবার পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন (পুরস্কার ও ছওয়াব দিয়ে) তাকে অবশ্যই রাজী খুশী করে দিবেন। দুআটি এই—

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا. (كتاب الاذكار)

অর্থ : আমি সন্তুষ্ট রব হিসেবে আল্লাহ্র প্রতি, দ্বীন হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নবী ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

* যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা (ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর কথা বলার পূর্বে) সাতবার পাঠ করবে

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ[২]

তাহলে ঐ দিন বা রাত্রে তার মৃত্যু হলে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে।[৩]

* যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় ৩ বার নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে, ঐ দিন ঐ রাত তার কোন আকস্মিক বিপদ-মুসীবত বা নোকছান ঘটবে না। দুআটি এই—

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. (ترمذى. ابو داؤد)

অর্থ : আল্লাহ্র নাম নিয়ে (আমি সকালে/সন্ধ্যা বেলায় পৌঁছলাম) যার নামের উপর থাকলে আসমান ও যমীনের কেউ ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।

---

১. ترمذى ॥ ২. অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। ॥
৩. مشكوة نقلا عن ابى داؤد

* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বেলায় পাঠ করতেন—

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ . (ترمذى)

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার কুদরতেই আমি সকাল বেলায় প্রবেশ করলাম, তোমার কুদরতেই আমি সন্ধ্যা বেলায় প্রবেশ করি। তোমার কুদরতেই আমি বেঁচে থাকি এবং মৃত্যুবরণ করি। আর তোমার দিকেই পুনরুত্থান করতে হবে।

* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যা বেলায় পাঠ করতেন—

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ . (مشكوة ج)

অর্থ : পূর্বের দুআর মতই।

* যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে তার একটা গোলাম আযাদ করার ছওয়াব হবে। দশটা নেকী লেখা হবে, দশটা পাপ মোচন হবে এবং দশটা দরজা বুলন্দ হবে—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

(مشكوة عن ابى داؤد)

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক—তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

* সকাল সন্ধ্যায় কেউ সায়্যিদুল এস্তেগফার পাঠ করলে ঐ দিন বা রাত্রে যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে সে জান্নাতে যাবে। সাইয়্যেদুল এস্তেগফারটি এই—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ. (بخارى كتاب الدعوات)

* যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে-স্বস্তিতে থাকবে, আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত সুখে-স্বস্তিতে থাকবে।[১] সূরা ইয়াসীন পাঠের আরও বহু ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল একবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে দশ খতম কুরআনের ছওয়াব পাওয়া যায়।[২]

* যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে, সে অনাহারে থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা তার রিযিকের অভাব দূর করে দিবেন।

---

১. رواه الترمذى وقال حديث غريب ।

২. معارف القرآن نقلا عن المظهرى

সূর্যোদয়ের সময়ের দুআ

সূর্য উদিত হলে পড়বে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لَنَا هٰذَا الْيَوْمَ وَاَقَالَنَا فِيْهِ عَثَرَاتِنَا . (كتاب الاذكار)

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে এই দিবস দান করেছেন এবং আজ আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন।

চাঁদ দেখার দুআ

* আরবী মাসের ২৯ তারিখ হলে সন্ধ্যায় পরবর্তী মাসের চাঁদ তালাশ করা কর্তব্য। কেননা আরবী মাসের হিসাব রাখা মুসলমানদের দায়িত্ব। নতুন চাঁদ দেখলে পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ . (ترمذى)

ফরয নামাযের পরের দুআ ও আমলসমূহ

* প্রত্যেক ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, (এভাবে তিনবার) পড়া সুন্নাত।

* প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়লে তার বহু ফযীলত রয়েছে। যে নামাযের পর সুন্নাত আছে সে নামাযে সুন্নাত শেষ করে এগুলো পড়লেও চলবে। ১০০ বার উপরোক্ত তাসবীহ পড়ার পর নিম্নোক্ত দুআটি পড়ে নিলে তার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। (মুসলিম)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক—তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। হাদীছে এসেছে :

عَنْ كَعْبِ بْنِ عجرة ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ اَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ ثَلٰثٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ تَسْبِيْحَةً وَّ ثَلٰثٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَّ اَرْبَعٌ وَّ ثَلٰثُوْنَ تَكْبِيْرَةً . (رواه مسلم)

অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : এরকম কয়েকটি কালেমা রয়েছে, যা নামাযের পরে পাঠ করা হয়, যার পাঠক অথবা আদায়কারী কখনও নিরাশ হয় না। তা হল প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া।

উপরোক্ত তাসবীহকে তাসবীহে ফাতেমী বলা হয়। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা হল :

হযরত ফাতেমা (রাযি.)-এর একটি ঘটনা

হযরত আলী (রাযি.) একবার তাঁর এক শাগরেদকে বললেন, আমি কি আমার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমার বর্ণনা তোমাকে শুনাব না? শাগরেদ বললেন নিশ্চয় শুনাবেন। তখন তিনি বললেন : ফাতেমা ছিলেন পরিবারের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে আদরের। হযরত ফাতেমা নিজ হাতে যাতা পিষতেন, ফলে তাঁর হাতে দাগ পড়ে যায়। নিজ হাতে মশক ভরে পানি উঠাতেন, ফলে তাঁর বুকে দাগ পড়ে যায়। নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন, ফলে কাপড়-চোপড় প্রায়শঃই ময়লা থাকত। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অনেকগুলি গোলাম-বাঁদী আসে। আমি ফাতেমাকে বললাম তোমার আব্বাজানের খেদমতে গিয়ে যদি একজন খাদেম চেয়ে আনতে, তাহলে কাজ-কর্মে অনেক সাহায্য হত। ফাতেমা গিয়ে দেখে যে, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লোকজনের অনেক ভিড়। ফলে সে ফিরে আসল। পরের দিন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এখানে তাশরীফ এনে জিজ্ঞাসা করেন ফাতেমা! গতকাল তুমি কী জন্য গিয়েছিলে? সে লজ্জায় কিছুই বলল না। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাতা চালাতে চালাতে তার হাতে দাগ পড়ে গেছে। মশক বহন করার দরুন তার বুকে দাগ পড়ে গেছে। ঘরে ঝাড়ু দেয়ার দরুণ প্রায়শঃই তার কাপড়-চোপড় ময়লা থাকে। গতকাল আপনার খেদমতে কিছু গোলাম-বাঁদী আসায় আমি তাকে বলেছিলাম, একটা খাদেম চেয়ে আনলে কাজ-কর্মে সাহায্য হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ফাতেমা! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর ফরয আদায় করতে থাক। তুমি ঘরের কাজ-কর্ম নিজ হাতেই সম্পাদন করতে থাক এবং যখন শয়ন করবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার

আল্লাহু আকবার পড়ে নিও। এ আমল খাদেম থেকেও উত্তম। ফাতেমা বললঃ আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ব্যবস্থার উপর সন্তুষ্ট আছি। অন্য হাদীছে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই ফুফাত বোন এবং ফাতেমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়ে নিজেদের কষ্টের কথা প্রকাশ করে খাদেম চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে খাদেম থেকে উত্তম জিনিস সম্পর্কে বলে দিচ্ছি। তা হল প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ আর ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে এবং একবার পড়বে—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

* নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যে সব দুআ (মুনাজাত) পড়তেন বা অন্যকে পড়তে বলেছেন, তার কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হল। ফরয নামাযের পর এগুলো পাঠ করা যায়—

১. اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. (مسلم)

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমার পক্ষ থেকে শান্তি প্রদত্ত হয়। তুমি মহান হে মহিমাময়, মহানুভব!

২. اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য কর তোমার যিকির করা, তোমার শোকর আদায় করা ও উত্তমভাবে তোমার ইবাদত করার জন্য।
(আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

৩. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (بخارى)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই কাপুরুষতা হতে, তোমার কাছে পানাহ চাই হীন বয়সে উপনীত হওয়া থেকে, তোমার কাছে পানাহ চাই দুনিয়ার ফেতনা থেকে এবং তোমার কাছে পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে।

৪. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ : হে আল্লাহ। আমি তোমার কাছে পানাহ চাই কুফর থেকে, অভাব-অনটন থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। (كتاب الاذكار)

৫. اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ (كتاب الاذكار)

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের কেউ নেই। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, করুণাময়। হে আল্লাহ! তুমি আমার দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূরীভূত করে দাও।

* নাছায়ী শরীফের হাদীছে আছে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরছী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোন অন্তরায় থাকে না অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের শান্তি ও আরাম আয়েশ ভোগ করতে শুরু করবে।[১] আয়াতুল কুরছী হল তৃতীয় পারার শুরুতে اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ থেকে শুরু করে وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ পর্যন্ত।

জুমুআর দিনের দুআ ও আমল

১. সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা। (জুমুআর নামাযের আগে হোক বা পরে) এরূপ করলে কিয়ামতের দিন তার জন্য আকাশতুল্য একটি নূর প্রকাশ পাবে।[২]
২. সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ পূর্ব হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গুরুত্বের সাথে যিকির, তাসবীহ ও দু'আয় লিপ্ত থাকা মোস্তাহাব।[৩]
৩. জুমুআর দিন চুল কাটা, নখ কাটা, বগল ও নাভির নীচের পশম সাফ করা। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।
৪. যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ফজর নামযের পূর্বে তিনবার নিম্নোক্ত এস্তেগফারটি পাঠ করবে তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে—

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ . (كتاب الاذكار)

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত দুআ

নতুন কাপড় পরিধান করার দুআ

নতুন কাপড় পরিধান করার সময় এই দুআ পড়তে হয়[৪]—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ .

১. نسائی ২. ابن كثير ৩. كتاب الاذكار ৪. زاد سنت

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করালেন এবং এটা আমার চেষ্টা ও শক্তি ছাড়া নছীবে রাখলেন।

কাপড় খোলার দুআ

কাপড় খোলার সময় পড়বে[১]—

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ .

উল্লেখ্য যে, কাপড় খোলার সময় বিস্‌মিল্লাহ বলার দরুন শয়তান লজ্জাস্থানের দিকে নযর দিতে পারে না। (حصن حصين)

জুতা/স্যান্ডেল পরিধান করা ও খোলার দুআ

* কাপড় ও নতুন জুতা/স্যান্ডেল পরিধান করে এই দুআ পড়তে হয়—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهٗ وَاَعُوْذُ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهٗ . (كتاب الاذكار)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কামনা করি এটার কল্যাণ এবং এর সদুদ্দেশ্য। আর তোমার নিকট পানাহ চাই এটার অনিষ্ঠ ও অসদুদ্দেশ্য থেকে।

* জুতা/স্যান্ডেল (ও কাপড়) খোলার সময় পড়বে—

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ . (كتاب الاذكار عن ابن السنى)

আয়না-চিরুনির দুআ

* চিরুনি করার জন্য অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে আয়না দেখার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়তে হয়—

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ . (كتاب الاذكار عن ابن السنى)

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি যেমন আমার চেহারাকে সুন্দর করেছ, তেমন আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।

ঘুম ও স্বপ্ন বিষয়ক দুআ

শোয়ার সময়ের দুআ

শোয়ার সময় পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى . (بخارى كتاب الدعوات)

---

১. كتاب الاذكار

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমি মৃত্যুবরণ করি এবং জীবন লাভ করি। অথবা পড়বে—

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا

فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ . (متفق عليه)

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি আমার পার্শ্ব রাখছি। তোমার নামেই তা উঠাব। যদি আমার প্রাণ রেখে দাও, তাহলে ক্ষমা করে দিও আর যদি আবার ছেড়ে দাও তাহলে তুমি তাকে রক্ষা কর যেভাবে তোমার নেক বান্দাদের বেলায় রক্ষা করে থাক।

ঘুম না আসলে পড়ার দুআ

শোয়ার পর ঘুম না আসলে নিম্নোক্ত দুআটি পড়বে। এ দুআটি পড়লে ঘুমের মধ্যে ভীতিজনক স্বপ্ন দেখা বন্ধ হবে।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَ عِقَابِهٖ وَ شَرِّ عِبَادِهٖ وَ مِنْ هَمَزَاتِ

الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ . (كتاب الاذكار)

ঘুম থেকে উঠে পড়ার দুআ

ঘুম থেকে উঠে এই দুআ পড়া সুন্নাত—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ . (مسلم)

সহবাসের দুআ

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا . (متفق عليه)

অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে এই কাজ আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।

সন্তানাদি সম্পর্কিত দুআ

বদ নজর থেকে হেফাজতের দুআ

* বাচ্চার প্রতি কারও বদ নযর লাগলে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বাচ্চাকে ফুঁক দিবে কিংবা লিখে বেঁধে দিবে : (اعمال قرآنی)

وَاِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ـ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

সন্তান লাভের দুআ ও আমল

* সন্তান লাভের জন্য নিম্নোক্ত আমলগুলো করা যেতে পারে—

(ক) এই দু'আ করবে— رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে বংশধরহীন রেখ না, তুমিই উত্তম উত্তরাধিকারী।

(খ) প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার পড়বে[১]—

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ـ

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি নিজ অনুগ্রহে আমাকে উত্তম আওলাদ দান কর। অবশ্যই তুমি দু'আ শ্রবণকারী।

পানাহার বিষয়ক দুআ

পানি পান করার দুআ

* পানি পান করার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে এবং পানি পান শেষে এই দুআ পড়বে[২]—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَهٗ عَذْبًا فُرَاتًا وَّلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا ـ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি এটাকে বানিয়েছেন সুমিষ্ট ও সুপেয় এবং এটাকে বানাননি লবণাক্ত ও বিস্বাদ।

যমযমের পানি পান করার দুআ

* যমযমের পানি পান করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে :[৩]

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই উপকারী ইল্‌ম, প্রচুর রিযিক এবং সব রোগ-ব্যাধি থেকে শেফা।

১. الل قرآنی। ২. شرعة الاسلام। ৩. معلم الحجاج।

দুধ, চা, কফি, মাঠা পান করার দুআ

* দুধ, চা, কফি, মাঠা পান করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে :[১]

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ . (ابو داؤد ، ترمذی)

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য এতে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এটা আরও বেশী করে দাও।

খানার দুআ

* খানা সামনে আসলে এই দুআ পড়বে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (كتاب الاذكار)

অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে আমাদের বরকত দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

* খাওয়ার শুরুতে [২] بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা বারাকাতিল্লাহ্) পড়া সুন্নাত এবং এটি জোরে পড়া মোস্তাহাব, যাতে অন্যরাও শুনতে পারে।[৩]

* শুরুতে পড়তে ভুলে গেলে এবং খাওয়ার মাঝে স্মরণ হলে পড়বে [৪] بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ (বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু)[৫]

* অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে এক সাথে খেলে এই দুআ পড়া সুন্নাত। যেমন কুষ্ঠ রোগীর সাথে বা খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি আছে এমন ব্যক্তির সাথে—

بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ . (ترمذی و ابو داؤد)

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রেখে এবং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে আরম্ভ করলাম।

* খানা শেষ হলে এই দুআ পড়বে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . (سنن اربعة)

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

---

১. ابو داؤد ترمذی। ২. এ দুআটির অর্থ হল— আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র বরকতের উপর খাওয়া শুরু করছি। ৩. تكملة جه/ ٣। ৪. এ দুআটির অর্থ হল— আমি এর প্রথমে ও শেষে আল্লাহ্‌র নাম নিলাম। ৫. ترمذی।

দস্তরখানা উঠানোর দুআ

* দস্তরখানা উঠানোর দুআ এই—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا . (بخاری)

অর্থ : আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা; এমন প্রশংসা যা অশেষ, পবিত্র ও বরকতময়। হে আমার প্রভু! এই খাবারকে অপ্রচুর মনে করে বা চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে বা এর প্রতি বিমুখ হয়ে উঠলাম না।

উল্লেখ্য, খানা শেষে সকলে উঠে যাওয়ার পূর্বেই দস্তরখানা তুলে নেয়া চাই। এরকম যেন না হয় যে, সকলেই উঠে গেল অথচ দস্তরখানা সেখানেই পড়ে রইল, তোলা হল না।

দাওয়াত খাওয়ার দুআ

* কারও নিকট দাওয়াত খেলে খানা শেষে এই দুআ পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ . (مسلم)

অর্থ : হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও এবং যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও।

* অথবা পড়বে—

اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَاَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ . (ابو داؤد)

অর্থাৎ, তোমাদের খানা গ্রহণ করল নেককার লোকেরা, ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি রহমতের দুআ করল এবং রোযাদারগণ তোমাদের নিকট ইফতার গ্রহণ করল।

* মেজবানের ঘর থেকে বিদায় নেয়ার সময় মেহমান পড়বে—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ . (مسلم)

অর্থ : হে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের উপর রহম কর।

ঘর সংক্রান্ত দুআ

ঘরে প্রবেশের দুআ

* ঘরে প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا . (ابو داؤد)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি গৃহে প্রবেশ করতে এবং বের হতে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে গৃহে প্রবেশ করি এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে গৃহ থেকে বের হই। আর আল্লাহ্র উপরই আমি ভরসা রাখি।

ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ

* ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়বে—

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ . (ابو داؤد)

অর্থ : আমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে বের হলাম। আল্লাহ্রই উপর ভরসা করলাম। শক্তি সামর্থ্য কেবল আল্লাহ্র কাছ থেকেই আসে।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সব রকম ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে মুক্তি চাওয়া বিষয়ক নিম্নোক্ত দুআও পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ . (ابو داؤد)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি নিজে বা অন্য কর্তৃক বিভ্রান্ত হওয়া, নিজে বা অন্য কর্তৃক বিচ্যুত হওয়া, যালেম হওয়া বা মাযলূম হওয়া, নাদানী করা বা নাদানীর স্বীকার হওয়া (এই সবকিছু) থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

সফর সংক্রান্ত দুআ

* সফরে রওনা দেয়ার প্রাক্কালে পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَ التَّقْوٰى وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَ اَطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَ الْخَلِيْفَةُ فِىْ

الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ . (مسلم)

অর্থ : হে আল্লাহ! এই সফরে আমরা তোমার নিকট নেকী ও তাকওয়া কামনা করি। এ সফরকে আমার জন্য সহজ করে দিন এবং দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করে দিন। হে আল্লাহ! এ সফরে আপনিই আমার সঙ্গী এবং আপনিই আমার স্থলাভিষিক্ত আমার পরিবারের জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সফরের দুঃখ-কষ্ট এবং ভয়ানক দৃশ্যের সম্মুখীন হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যাবর্তনের পর স্বীয় মাল-আসবাব এবং পরিবার-পরিজনের মধ্যে অশুভ অবস্থা অবলোকন করা থেকে।

* সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পড়বে :

آيِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ . (مسلم)

অর্থ : আমরা সফর থেকে ফিরে এসেছি, তওবা করছি এবং ইবাদত ও গুণকীর্তন করছি স্বীয় প্রতিপালকের।

* কাউকে সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে বিদায় জানানোর সময় পড়বে—

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ . (ترمذى)

অর্থ : আমি তোমার দ্বীন, আমানত এবং তোমার আমলের শেষ পরিণাম আল্লাহ তা'আলার সোপর্দ করছি।

* সফরে যাওয়ার সময় আপনজন থেকে এই বলে বিদায় নিবে—

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا يُضِيْعُ وَدَائِعُهُ . (كتاب الاذكار عن ابن السنى)

অর্থ : আমি তোমাদেরকে এমন সত্তার কাছে আমানত রেখে যাচ্ছি, যার আমানত কখনও নষ্ট হয় না।

যানবাহন বিষয়ক দু'আ

*** প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে যানবাহনে ডান পা রাখবে। তারপর পুরোপুরি উঠে বা আসনে বসে আলহামদু লিল্লাহ বলবে। তারপর নিম্নোক্ত দু'আ পড়া সুন্নাত—**

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ .

(ابو داؤد ، ترمذى ، نسائى)

অর্থ : পবিত্র ঐ আল্লাহ, যিনি একে আমাদের আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন, অথচ একে আমরা নিজেদের আয়ত্বাধীন করতে পারতাম না। আর নিশ্চয় আমরা আপন প্রভুর কাছে ফিরে যাব।

* নৌকা, জাহাজ, পুল ইত্যাদিতে চড়লে পড়বে—

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . (كتاب الاذكار عن ابن السنى)

অর্থ : আল্লাহর নামেই এর চলা ও থামা। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

বিপদ-আপদ সংক্রান্ত দুআ

* কোন বিষয়ে মনে দুশ্চিন্তা বা পেরেশানী থাকলে কিংবা অশান্তির মধ্যে পড়লে পাঠ করবে—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ . (ترمذى)

অর্থ : আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক।

অথবা পড়বে—

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ .

অর্থ : হে চিরঞ্জীব! হে সবকিছু ধারণকারী! আমি তোমার রহমতের ওছীলা দিয়ে তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি।

অথবা পড়বে—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ . (ترمذى وكتاب الاذكار)

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আর আমি অবশ্যই গোনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত।

* শত্রু বা যে কোন দুষ্ট লোকের দ্বারা ক্ষতির ভয় হলে এই দুআ পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ . (ابو داؤد نسائى)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমাকে তাদের মোকাবিলায় দাঁড় করাচ্ছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি।

* প্রচণ্ড মেঘ দেখলে পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُنْزِلَ بِهٖ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا . (حصن حصين)

অর্থ : হে আল্লাহ! এই মেঘের সাথে যে অনিষ্টকারিতা রয়েছে তা থেকে আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর।

* বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলে বা বজ্রপাতের শব্দ শুনলে পড়বে—

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَ لَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ . (ترمذى)

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার গযব দিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেল না, তোমার আযাব দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিও না। তার আগে আমাদেরকে শান্তি দাও।

* অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকলে পড়বে—

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لَا عَلَيْنَا . اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْاٰجَامِ وَ الظِّرَابِ وَ بُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَ مَنَابِتِ الشَّجَرِ . (متفق عليه)

অর্থ : হে আল্লাহ! এই বৃষ্টি আমাদের আশে-পাশে বর্ষণ কর, আমাদের উপর বর্ষণ করো না। হে আল্লাহ! উচ্চস্থান, বনজঙ্গল, পাহাড় প্রণালী ও বৃক্ষ উৎপাদনের স্থানসমূহের উপর বর্ষণ কর।

* কোন জায়গায় অগ্নিকাণ্ড হতে দেখলে পড়বে "আল্লাহু আকবার" (بخارى) অথবা পড়বে—

يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ . (الانبياء :)

অর্থাৎ, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাও।

* কাউকে কোন মুসীবত, পেরেশানী বা খারাপ অবস্থায় দেখলে পড়বে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَ فَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا . (مشكوة)

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে ঐ অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন, যে অবস্থায় তোমাকে ফেলেছেন।

তবে দুআটি এমনভাবে পড়বে না যে, উক্ত মুসীবতগ্রস্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে। তাহলে সে মনে কষ্ট অনুভব করবে। কোন মানুষকে কোনভাবে কষ্ট দেয়া অনুচিত।

সুখ-দুঃখ বিষয়ক দুআ

* কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখলে পড়বে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ . (ابن ماجه)

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যার দানে যাবতীয় সৎকর্ম পূর্ণতা লাভ করে।

* কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখলে বা ঘটলে পড়বে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ . (ابن ماجه)

অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা।

* কোন মুসলমানকে নতুন পোশাক পরিহিত দেখলে পড়বে-

تُبْلِىْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ . (حصن حصين)

অর্থ : তুমি যেন এই কাপড় পুরাতন করতে পার। (আল্লাহ তোমাকে এতটুকু হায়াত দারাজ করুন) এবং তারপর যেন আল্লাহ তোমাকে এ স্থলে নতুন কাপড় দান করেন।

* কোন মুসলমানকে হাসতে দেখলে পড়বে—

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ . (مسلم و بخارى)

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন।

অসুস্থতা সংক্রান্ত দুআ

* অসুস্থ অবস্থায় চারশত বার দুআয়ে ইউনুস পড়বে। তাহলে ঐ রোগে মৃত্যু হলে শহীদের সমান ছওয়াব পাওয়া যাবে, আর সুস্থ হলে সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। (احكام ميت)

* অসুস্থ অবস্থায় নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করলে এবং উক্ত রোগে তার মৃত্যু হলে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ . لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ . (احكام ميت از ترمذى، نسائى وابن ماجه)

* মৃত্যুর সময় আসন্ন বুঝলে পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى . (متفق عليه)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার প্রতি রহম কর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত কর।

এবং আরও পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ . (ترمذى و ابن ماجة)

অর্থ : হে আল্লাহ! মৃত্যুর বিভীষিকা এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় এই পর্যায়ে তুমি আমাকে সাহায্য কর।

মৃত্যু সংক্রান্ত দুআ

* নিজের সামনে কারও মৃত্যু হলে বা কারও মৃত্যু-সংবাদ শুনলে নিম্নোক্ত দুআ পড়তে হয়—

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ . (ابو داؤد)

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব।

* আপনজনের মৃত্যু হলে এরূপ পড়বে—

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا . (مسلم)

অর্থ : নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্রই জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার এই মুসীবতে তুমি আমাকে প্রতিদান নসীব কর এবং তার স্থলে তার চেয়ে উত্তম বদলা আমাকে দান কর।

* কোন ইসলামের শত্রুর মৃত্যু সংবাদে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَاَعَزَّ دِيْنَهٗ . (كتاب الاذكار)

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করলেন এবং তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করলেন।

ইস্তেনজা সংক্রান্ত দুআ

পায়খানায় যাওয়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে—

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ . (بخارى)

অর্থ : আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! নর-নারী উভয় প্রকার দুষ্ট জিন থেকে আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি।

পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ الْاَذٰى وَ عَافَانِىْ . (ابن ماجة)

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি অপবিত্র মল-মূত্রকে আমার থেকে বের করে আমাকে শান্তি ও আরাম দান করেছেন।

দুরূদ শরীফ প্রসঙ্গ

দুরূদ শরীফের ফযীলত

এক হাদীছে এসেছে—হযরত আনাস (রাযি.) বয়ান করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটা রহমত নাযেল করেন, তার দশটা গোনাহ মাফ করেন এবং তার দশটা দরজা বুলন্দ করেন।[১]

অন্য এক হাদীছে এসেছে—হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাযি.) বয়ান করেন যে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হবে ঐ লোক যে আমার উপর সব চেয়ে বেশী দুরূদ পাঠ করত।[২]

অন্য এক হাদীছে এসেছে—হযরত রুওয়াইফে' ইব্‌নে ছাবেত (রাযি.) বয়ান করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ

পাঠ করবে এবং তার সাথে নিম্নোক্ত দুআও বলবে সে অবশ্যই আমার সুপারিশ লাভ করবে।[১]

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

---

১. نسائی ২. ترمذی

তাই বেশী দুরূদ শরীফ পাঠ করা চাই। অনেক বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন তাদের জীবনে কামালিয়াত এবং বুযুর্গী অর্জিত হয়েছে বেশী বেশী দুরূদ শরীফ পাঠ করার ওছীলায়।

দুরূদ পাঠের হুকুম

* হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করলে বা শুনলে দুরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়। জীবনে অন্ততঃ একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা ফরয।

* যদি কোন মজলিসে একাধিক বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক উল্লেখ করা হয়, তাহলে একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব, অবশিষ্ট বারগুলোতে মোস্তাহাব। এক হাদীছে এসেছে যে, মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক উচ্চারিত হয়, আর শ্রবণকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ না করে, সেই শ্রবণকারীর প্রতি আল্লাহর অভিশাপ হয়।

হাকিমের এক রেওয়ায়েতে এসেছে—একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করার জন্য মেম্বরে উঠছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেম্বরে তিনটা ধাপ ছিল। প্রথম ধাপে যখন উঠলেন, তখন বললেন, আমীন! আমীন অর্থ— হে আল্লাহ! কবূল কর। কোন্ কথার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বললেন সাহাবায়ে কেরাম তা বুঝলেন না। দ্বিতীয় ধাপে উঠে বললেন, আমীন! তৃতীয় ধাপে উঠেও বললেন আমীন। বয়ান শেষে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন একটা কথা বললেন যা কখনো শুনিনি এবং আমরা বুঝতেও পারিনি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করে বললেন: যখন আমি প্রথম ধাপে উঠেছিলাম, তখন জিবরীল (আ.) বলেছিলেন:

بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهٗ قُلْتُ اٰمِيْنَ.

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক। যে রমযান পেয়েও নিজের ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না। আমি ঐ বদ-দোয়ার জবাবে বলেছি আমীন। দ্বিতীয় ধাপেও যখন উঠেছি তখন জিবরীল (আ.) বলেছেন:

بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ اٰمِيْنَ.

অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার সামনে আপনার নাম উল্লেখ হল আর সে দুরূদ শরীফ পাঠ করল না, আমি বলেছি আমীন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তৃতীয় ধাপে যখন উঠেছি, তখন জিবরীল (আ.) বলেছেন :

بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرَ اَوْ اَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ . قُلْتُ اٰمِيْنَ . (رواه الحاكم)

অর্থাৎ, যে মাতা-পিতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, আর তাদের খেদমত করে, তাদেরকে খুশি করে জান্নাত লাভ করে নিতে পারল না সেও ধ্বংস হোক! আমি এই বদ-দুআর জবাবেও বলেছি আমীন।

এ হাদীছ থেকে রমযানে ক্ষমার জন্য দুআ ও আমলের গুরুত্ব, মাতা-পিতার খেদমতের গুরুত্ব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আসলে দুরূদ পাঠের গুরুত্ব বুঝে আসে।

* দুরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য উযূ থাকা জরুরী নয়। থাকলে ভাল। অনেকে বলে থাকে বিনা উযূতে দুরূদ শরীফ পাঠ করা ঠিক নয়, তাদের কথা ভুল। বিনা উযূতে আল্লাহর নাম নেয়া জায়েয হলে এবং কুরআন শরীফ পড়া জায়েয হলে দুরূদ শরীফ কেন পাঠ করা যাবে না।

* উঠা-বসা, হাঁটা-চলা, সর্বাবস্থায় দুরূদ পাঠ করা যায়। অনেকে বলে থাকে হাঁটতে-চলতে দুরূদ শরীফ পাঠ করা ঠিক নয়, তাদের কথা ভুল। হাঁটতে-চলতে সর্বাবস্থায় দুরূদ পাঠ করা যায়। ভুল কথার পিছনে পড়ে দুরূদ পাঠের ফযীলত থেকে বঞ্চিত না থাকা চাই।

* দুরূদে তাজ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এর ফযীলতে যা লেখা হয় তা ভিত্তিহীন। তদুপরি তার মধ্যে কিছু শিরক পূর্ণ কথা রয়েছে। অতএব তা পরিত্যাজ্য। পড়তে হলে সেই অংশ বাদ দিয়ে পড়া যায়। সাধারণ মানুষ অর্থ না বোঝার কারণে তাদের পক্ষে সেই অংশগুলোকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয় বিধায় তাদের পক্ষে দুরূদে তাজ পাঠ করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

* ছোট এবং বড় দুরূদের মধ্যে যেটাই ভাল লাগবে সেটাই পড়বে।

* সাধারণভাবে عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বললেই দুরূদ ও সালাম হয়ে যায়।

* সংক্ষেপে চাইলে নিম্নের দুরূদ শরীফ পাঠ করা যায়।[1]

---

১. দুরূদ শরীফ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য مجالس حکیم الاسلام، کیا ہے شرح فیض الکلام، فتاوی رحیمیہ جـ ١/ বেহেশত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ

* দুরূদে ইবরাহীমী পাঠ করাও উত্তম। নামাযের মধ্যে যে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয় সেটাই দুরূদে ইবরাহীমী। অর্থাৎ, নিম্নের দুরূদ শরীফ—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰۤى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰۤى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে অত্র গ্রন্থে বর্ণিত যাবতীয় বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মাকতাবাতুল আশরাফ
কর্তৃক প্রকাশিত
আরো কয়েকখানা কিতাব

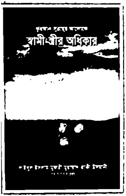

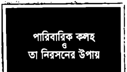

মাকতাবাতুল আশরাফ
কর্তৃক প্রকাশিত
আরো কয়েকখানা কিতাব

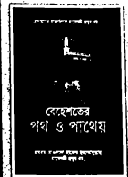

মাকতাবাতুল আশরাফ
مكتبة الأشرف
অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
MAKTABATUL-ASHRAF

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মতো কয়েকখানা কিতাব

মাকতাবাতুল আশরাফ